বিভূতি-রচনাবলী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একাদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫

চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭২

উপদেষ্টা পরিষদ :

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রী কালিদাস রায়

ডঃ সুকুমার সেন

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫১ ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯ হইতে আর. রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

॥ ১ ॥

বিভূতিভূষণের সর্বপ্রথম উপন্যাস যেমন 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত', তেমনি তাঁর পরিণত প্রতিভার শেষ অবদান 'দম্পতি' ও 'অথৈজল' (অসম্পূর্ণ)। কোন্ অজ্ঞাত কারণে শেষ উপন্যাসটি তিনি অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন জানি না, তবে উপন্যাস বলতে এই দুটি ছাড়া আর তিনি কিছু লেখেন নি। মৃত্যুর এক মাস আগে পূজা সংখ্যায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর যেসব গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে সেগুলি তাঁর শেষ রচনা—সেদিক থেকে 'কুশল-পাহাড়ী' গ্রন্থকেই সর্বশেষ বলা যেতে পারে। দুঃখের বিষয় এই তিনটি গ্রন্থের কোনোটি তিনি চোখে দেখে যেতে পারেন নি। তাই 'কুশল পাহাড়ী'র আগে 'জ্যোতিরিঙ্গণ' নামে যে গল্প-সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয়েছিল, বিভূতিভূষণের চোখে-দেখা হাতে-নেওয়া সেটিই সর্বশেষ গ্রন্থ।

মোট কথা বর্তমান খণ্ডটিকে বিভূতিভূষণের সর্বশেষ রচনাবলীর সংকলন বললে অত্যুক্তি হয় না। ঠিক কোনটি কার আগে-পরে কিভাবে রচিত, সন-তারিখ বিবরণসহ তা গ্রন্থপঞ্জীতে দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ আসল যে কথাটা বলতে চাই, বিভূতিভূষণের মত অসাধারণ শিল্পী ও স্রষ্টার পূর্ণতার শেষ স্বাক্ষর কেবল এই একাদশ খণ্ডটি নয়, এ তাঁর জীবনদর্শন, মননশীলতা ও ভাবলোকের যেন এক সুসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। 'পথের পাঁচালী' দিয়ে যে জীবনের শুরু ও 'কুশল পাহাড়ী'তে মহাসমাপ্তি, সেই সুদীর্ঘ সাহিত্যসাধনার চরম সিদ্ধি, 'বিভূতি'—এই খণ্ডের সব চেয়ে অমূল্য সম্পদ!

এখানে তাই প্রত্যাশা যেমন বেশী, কৌতূহল তেমনি সীমাহীন। সেই মহান শিল্পীর জীবনচর্চার যে ফলশ্রুতি, জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করা শেষ যে অমৃত তার রূপ নয়—স্বরূপ কি, কোন্ অনন্ত মহালোকের বার্তা সে বহন করে এনেছে, কি তার বৈভব—জানবার জন্যে ব্যাকুলতার অন্ত নেই পাঠকের মনে।

বিভূতিভূষণের শেষ উপন্যাস 'দম্পতি' ও 'অথৈজল' সর্বপ্রথম যে চমক লাগায়, তা হ'ল ওই উপন্যাস দুটির বিষয়বস্তু, যাকে অ-বিভূতিভূষণোচিত বা বিভূতিভূষণের ব্যতিক্রম বললে অত্যুক্তি হয় না। মূলতঃ দুটি উপন্যাসের বক্তব্য এক এবং দুটিই নায়কের পদস্খলনের কাহিনী। আবার দুই নায়কই প্রৌঢ়, বয়স চল্লিশের মত। দু'জনেই সংসারী, স্ত্রী-পুত্রকন্যা বর্তমান। সব চেয়ে বড় কথা দু'জনেই চরিত্রবান পুরুষ, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। উভয়ের গৃহে আদর্শ স্ত্রী, পতিগতপ্রাণা জীবনসঙ্গিনী—উভয়েই সুখী দম্পতি।

অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই দুই নায়কেরই মতিভ্রম ঘটল; একজনের মাথা ঘুরে গেল ফিল্ম-স্টার শোভারাণী মিত্রকে দেখে। অন্যজনে কিশোরী খেমটাউলী পান্নার

প্রেমে উন্মত্ত হয়ে সংসারধর্ম চরিত্র সবকিছু বিসর্জন দিয়ে বিবাগী হ'ল। এই পদস্খলনের দুই নায়ক গদাধর ও শশাঙ্ক—দু'জনেরই পূর্ব জীবনে কোন কলঙ্কের ইতিহাস নেই।

শশাঙ্ককে বরং আদর্শচরিত্র পুরুষই বলা যেতে পারে। সে গ্রামের ডাক্তার, ছেলেবেলা থেকে পল্লীসংস্কার ও গ্রামের যত হিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, সমাজের মাতব্বর। গ্রামের কোথাও কোন দুর্নীতি দেখলে আর রক্ষা নেই, তাকে যতক্ষণ না সমূলে বিনাশ করতে পারছেন চোখে ঘুম নেই। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকঘটিত কোন কলঙ্কের ব্যাপার দেখলে শাস্তির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত যেন স্থির হতে পারেন না। দেখা যায়, কোন একটি বধূর স্বামী কলকাতায় চাকরি করেন, মাসে হয়ত একদিন কি দুদিন দেশে যান, তার ঘরে পাশের বাড়ির একটি যুবক যাতায়াত করে। অধিক রাত্রে তাকে বধূটির ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে, লোকের মুখে সে খবর পেয়েই তিনি যুবকটিকে উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়ে যেমন শায়েস্তা করতে ভোলেন নি, তেমনি সেই বধূটিকেও ক্ষমা করেন নি। সে কলঙ্ক এড়াবার জন্যে বধূটিকে আত্মহত্যা করতে হয়।

এমন কি গ্রামের প্রবীণ দারোগা, এককালে সবাই যাঁর ভয়ে থরহরিকম্প, শশাঙ্ক তাঁকেও ক্ষমা করেন নি। তাঁর নামে দুর্নীতির অভিযোগ পেয়ে, তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে অবিলম্বে গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার আদেশ দিয়েছেন।

এহেন সমাজসেবী, আদর্শবাদী গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার, প্রৌঢ়—যাঁর বয়স চল্লিশ, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, তাঁর পদস্খলন হ'ল, কোথায় এক বারোয়ারীতে গিয়ে হঠাৎ এক খেমটাউলীর নাচ দেখে!

অন্যদিকে দম্পতির নায়ক গদাধর। পাটের আড়তদার, ঘোরতর ব্যবসায়ী। বিলাস-ব্যসন কাকে বলে জানে না। মাসিক আয় যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করে। জমিদারের মত যাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকা উচিত, সে পুরাতন ভদ্রাসনের ভাঙা জানলায় চটের পর্দা টাঙিয়ে বাস করে। ওসব তার কাছে বাজে খরচা। কোন নেশাভাঙ বা বিলাসব্যসনে কখনো একটি পয়সা বাজে খরচা করে না। একমাত্র একটি নেশা আছে, পায়রা-ওড়ানো। কলকাতা থেকে পায়রা কিনে এনে দেয় তার এক বন্ধু। তারও ঘরে সতীলক্ষ্মী স্ত্রী, পুত্রকন্যা। সংসারী ও সুখী দম্পতি। এর বয়সও চল্লিশের কাছাকাছি। কলকাতায় ব্যবসা করতে গিয়ে হঠাৎ ফিল্ম-স্টার শোভারানীর সঙ্গে পরিচয় ও তাকে উপলক্ষ করে সিনেমা-জগতের মায়াময়ী উর্বশী-মেনকাদের মোহে এমনি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যার ফলে পদস্খলন ঘটে ও পাটের ব্যবসা উঠে যায়।

যদিচ উভয় উপন্যাসের বক্তব্যে মিল ও বহু সামঞ্জস্য বর্তমান, তবু তারই মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে বৃত্তিগত মনোভাবের যে পার্থক্যটুকু এবং তার দরুণ পদস্খলনের মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রম ও ব্যবধানের স্বাক্ষর—ভিন্ন রসে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পদস্খলন উভয়েরই, তবু তার গতিপ্রকৃতিতেও ভিন্ন স্বাদ, ভিন্ন রং এবং চরিত্রগত পার্থক্য নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠেছে।

অবশ্য এই দুইটি উপন্যাসকে বিভূতিভূষণের ব্যতিক্রম বললে ভুল হবে। কারণ একেবারে শুরুতে গোড়ার উপন্যাস পথের পাঁচালী, অপরাজিত ও দৃষ্টিপ্রদীপে এই পরস্ত্রীর প্রতি মোহ ও আসক্তির ইঙ্গিত বর্তমান। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন: "লীলাকে পরিপূর্ণ ভাবে ভালোবেসেও অপুর হঠাৎ-পাওয়া কিশোরী বধূ অপর্ণাকে ভালোবেসে তাকে নিয়ে ঘর করতে কিছু বাধে নি। দৃষ্টিপ্রদীপের জিতু মালতীকে ছেড়ে এসেছিল কিন্তু তাঁকে মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে নি। অথচ হিরণ্ময়ীকে বিয়ে করতে খুব ইতস্তত করে নি। আসল কথা অপু-জিতুর মনে প্রবল টান ছিল তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ের দিকে। পূর্ণযৌবনা তরুণীদের সে অবশ্যই ভালোবাসত, তবে সে ভালোবাসা সৌন্দর্যের আসক্তি, যেন ভক্তের আরতি ও প্রদক্ষিণ! বেদীর দিকে হাত বাড়াবার মতো ভরসা হ'ত না।"

॥ ২ ॥

সেই প্রথম দিকের উপন্যাসের নায়কদের পরস্ত্রীর প্রতি যে মোহ ও কামনাবাসনা মনের গোপনে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখানে দেখি তারই নিরাবরণ প্রকাশ। যে আসক্তি এতদিন সংযম, আদর্শ ও সততার সুদৃঢ় বাঁধে অবরুদ্ধ ছিল, হঠাৎ সেই অবরোধের বাঁধ যেন ভেঙে গেল, বেনো জল ঢুকে ঘোরো জলকে বার করে নিয়ে গেল। সে যেন ইচ্ছাকৃত—স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মত।

আসক্তির কাছে এইভাবে আত্মসমর্পণ, এর স্বপক্ষে প্রৌঢ় নায়কদের যে যুক্তি তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বয়সটাই মুখ্য কারণ। চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ের তরুণীর প্রতি আসক্তি। অল্পবয়সী তরুণীর ভাবভঙ্গী হাসি-রসিকতা নৃত্যগীত ইতিপূর্বে যা তারা পায় নি তাকে পেতে চাওয়া। মনের একটা ক্ষুধা মিটে গেছে—আর একটার জন্যে ঘৃণা-লজ্জা-ভয় সংসার স্ত্রীপুত্র সব কিছু ত্যাগ করে সেই না-পাওয়া ক্ষুধাকে তৃপ্ত করার জন্যে ছুটে যাওয়া। এখানে সেই একই জীবনদর্শন—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নারীর দুই রূপ, বর্ষা ও বসন্ত—একটিকে পেয়ে যখন মানুষ তৃপ্ত তখন আর একটিকে পাবার জন্যে ক্ষুধিত হয়ে ওঠে তার মন। ঘরের স্ত্রীর কাছে সেবাযত্ন আদর সব কিছু পেয়েও এই বাইরের নারী, যারা শুধু রূপের ফাঁদ পাতে, নৃত্যগীতে মোহ সৃষ্টি করে, তাদের ফাঁদে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যেহেতু জিতু-অপুর মত নায়করা ছিল তরুণ—বিবাহের মধ্যে দিয়ে কিশোরী নারীকেই আস্বাদ করেছে। তাই দেহকে বাদ দিয়ে শুধু কল্পনাতেই সেই পরস্ত্রীর সঙ্গসুখ লাভ করে তৃপ্ত থাকত। যৌবনের উন্মত্ত কামনার তৃপ্তি তারা বিবাহিত পত্নীর মধ্যে খুঁজেছিল তাই মনটা দিয়েছিল শুধু পরস্ত্রীকে। এক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত। গদাধর ও শশাঙ্ক দুজনেই প্রৌঢ় নায়ক, বয়েস চল্লিশ, দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রীর সাহচর্যে নারীসম্ভোগে তৃপ্ত, মিটে গেছে তাদের সব দৈহিক ক্ষুধা। ঘরে সাতাশ বছর বয়সের স্ত্রী, পুত্রকন্যা। কাজেই বিবাহের যে অনিবার্য প্রয়োজন সেটা তাদের মধ্যে নির্বাপিত। এমন কি পুত্রকন্যা ও স্ত্রীকে জড়িয়ে সংসারের

সুখশান্তি—তার প্রতিও আর লোভ নেই। সতীসাধ্বী স্ত্রীর সেবাযত্ন আদর ভালবাসা প্রেম যা-কিছু কাম্য সব পেয়ে, অন্তর যখন পূর্ণ, 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ' কথাটা স্মরণে উদিত হওয়া মাত্র মনে হয় ঘরে যেন কি পাইনি। অবশ্য হাতের কাছে যদি সেই না-পাওয়া বস্তু এসে যায়! নৃত্য, গীত, হাস্য, লাস্য—বারনারীর যা স্বধর্ম অথচ ঘরের বৌ কুলবধূ যা দিতে পারে না—এই পদস্খলন তারই প্রতি আসক্তি থেকে সঞ্জাত। তাই উভয় ক্ষেত্রেই দৈহিক মিলনের উন্মত্ত কামনাবাসনার চিত্র অপেক্ষা সেই বারনারীর ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে চেহারা, হাসিমুখ সাহচর্যের প্রতি আকর্ষণের চিত্র অনেক বেশী।

গদাধর ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীর মনোভাব আগাগোড়া প্রকাশ পেয়েছে। ব্যবসায়ের পথেই এসেছে তার পদস্খলন। বারনারীর সঙ্গ পাবে বলেই পয়সা দিয়ে সিনেমা কোম্পানী তৈরি করেছে। সে অশিক্ষিত, গেঁয়ো মানুষ, পাটের আড়তদার—সে ইতিপূর্বে শহরের ওই ফিল্ম-স্টারদের চাকচিক্য কখনো চোখে দেখে নি। একেবারে সাক্ষাৎ তাদের সান্নিধ্যে এসে তাই হতচকিত। শোভারাণীকে দেখে প্রথম দিনই তার মনে হয়েছে, অনঙ্গ—তার স্ত্রী তাকে ঠকিয়েছে। মনে মনে তাকে দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে ওজন করেছে। ব্যবসায়ীর মনোভাব জাগ্রত হয়েছে। সর্বপ্রথম এই কথাটাই তার মনে এসেছে, অথচ এতকাল সে এই স্ত্রী অনঙ্গকে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দেই সংসার করছিল। সতীসাধ্বী আদর্শ পল্লীবধূ যেমন হয়, ভক্তিমতী স্বামী-গতপ্রাণা গৃহকর্মনিপুণা, পূজা-আর্চা, দান-ধ্যান ও গরীব-দুঃখী সকলের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্না। কোন অভিযোগ ছিল না তার বিরুদ্ধে।

এ তো গেল নারীর অন্তরের ঐশ্বর্য্যের দিক। বাইরের রূপও ছিল তার একই রকম। অধিকন্তু নারীর যে দৈহিক সম্পদ, গদাধরের স্ত্রী অনঙ্গের সেখানেও কোন দৈন্য ছিল না—"তাহার বয়স এই সাতাশ-আটাশ—প্রথম যৌবনের রূপলাবণ্য কবে ঝরিয়া গেলেও অনঙ্গ এখনও রূপসী। এখনও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। রং যে খুব ফর্সা তা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিলেই ভালো হয়, কিন্তু অনঙ্গর মুখের গড়নের মধ্যে এমন একটা আলগা চটক আছে, চোখ এমন টানাটানা, ভুরু দু'টি এমন সরু ও কালো, ঠোঁট এমন পাতলা, বাহু দু'টির গঠন এমন নিটোল, মাথার চুলের রাশ এমন ঘন ও ঠাসবুনানো, হাসি এমন মিষ্ট যে মনে হয় সাজিয়াগুজিয়া মুখে স্নো পাউডার মাখিয়া বেড়াইলে এখনও অনঙ্গ অনেকের মুণ্ডু ঘুরাইয়া দিতে পারে। নারীর আদিম শক্তি ইহার মধ্যে যেন এখনও নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির গর্ভের সুপ্ত অগ্নির মতই বিরাজমান।" (দম্পতি)

এ হেন স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় আসে গদাধর। স্ত্রী দেশ ছেড়ে আসতে চায় নি। কলকাতায় পাটের ব্যবসায় লাভ বেশী, ছেলেরা ভালভাবে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে, গাঁয়ে যে তিন-চার মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগতে হয়, তার হাত থেকেই রেহাই পাবে এই সব শুনেই রাজী হয়েছিল অনঙ্গ। গদাধর কলকাতায় একটা ছোট বাড়ি কিনে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসে সংসার পাতে।

মোট কথা এখানে আসার মুখ্য কারণ পাটের ব্যবসায়ে লাভ বেশী হওয়ার সম্ভাবনা, তা

ছাড়া অন্য ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধা। ব্যবসায় করতেই এসেছিল গাঁয়ের আড়তদার, পাট-ব্যবসায়ী গদাধর। কলকাতায় এসে নিজে ব্যবসায় কাজকর্মেই সর্বদা ব্যস্ত থাকে, শৌখীন প্রকৃতির লোক সে নয়। বেশ কিছুদিন কলকাতায় এসে গেলেও শহরের আমোদ-প্রমোদের কথা একদিনও মনে হয়নি।

একদিন এক বন্ধুর (এই বন্ধুটি দেবদাসের চুনির মতোই পাপপথের প্রদর্শক।) পীড়াপীড়িতে বায়োস্কোপ দেখতে যায় বাংলা ছবি—'প্রতিদান'। বলা বাহুল্য, ছবিটা তার খুব ভাল লাগল, কারণ অনেক কাল সে কোন থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখেনি। বিশেষ করে বাংলা ছবি যে এত চমৎকার হয়ে উঠেছে, এতকাল সে খবর সে রাখে নি। সে জানত না যে বন্ধু চা খাওয়াবার নাম করে সেদিন তাকে যেখানে নিয়ে গিয়েছিল সেটা বিখ্যাত ফিল্ম-স্টার শোভারাণী মিত্রের বাড়ি। এই মাত্র যে "প্রতিদান" ছবি দেখে এলো, তার নায়িকা এই শোভারানা।

এই শোভারানী তাকে ঘরে বসিয়ে কেবল নিজে হাতে চা দিলে না, গান গেয়ে শোনালে, তার ছবিটা কেমন লেগেছে জিজ্ঞাসাও করলে। এতেই গদাধর সঙ্কুচিত ও অভিভূত হয়ে পড়ল। এ ধরনের শিক্ষিতা সুন্দরী মহিলার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য ঘটা দূরে থাক, এর আগে কখনো চোখেও দেখে নি এমন মহিলা।

গদাধরের ধারণা শোভারানী খুব শিক্ষিতা। এত সব ভাল ভাল কথা যে মুখ দিয়ে বলতে পারে, এইমাত্র 'প্রতিদান' ছবিতে যা দেখে ও শুনে এলো, সে নিশ্চিত শিক্ষিতা।

সেদিন বাড়িতে ফিরে প্রথম মনে হ'ল, অনঙ্গ তাকে "কিন্তু কি ঠকাই ঠকাইয়াছে এতদিন! সত্যিকার মেয়ে বলিতে যা বোঝায় তা তিনি এইমাত্র দেখিয়া আসিলেন।"

অনেক রাত পর্যন্ত তার চোখে ঘুম এলো না। মনে হয় "জীবনটা তার বৃথা গেল। মেকী লইয়া কাটাইলেন, আসল নারী কি বস্তু তাহা কোনদিনও চিনিলেন না।"

ক্রমশ শোভারানীর সঙ্গে গদাধরের পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয়, স্ত্রীর কোন কথাই আর আগের মত ভাল লাগে না। মনে হয় "সেই পুরনো অনঙ্গ! এসব জাতীয় মেয়েদের মুখে অন্য কথা নেই—কেবল খাওয়া আর খাওয়া! কি কথাই বা জানা আছে যে বলিবে?"

সংসারও হঠাৎ তার কাছে নিতান্ত বিস্বাদ মনে হয়। "অনঙ্গ আধময়লা একখানা শাড়ী পরিয়া আছে, মাথার চুল এখনও বাঁধে নাই, কেমন যেন অগোছালো ভাব—তা ছাড়া ওর মুখ দেখিলে মনে হয় এই বয়সে বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে যেন।"

গঙ্গাধরের মনে হয় কিসের জন্যে এসব কাজ করে মরছে! কার জন্যে পাটের চালানী আর দুপুরের রোদে টো-টো করে মোকামে মোকামে ঘুরে পাটের কেনা-বেচা? সত্যিকারের জীবনের আনন্দ কি একদিনও সে পেয়েছে! "পুরুষমানুষের মন যা চায় নারীর কাছে অনঙ্গ কেন, কোন মেয়ের কাছেই কি এতদিন তা পাইয়াছেন! জীবনে তিনি কি দেখিলেন, কি বা পাইলেন! এই কলকাতার এঁটো বাসনের স্তূপ, ওই আধময়লা ভিজে কাপড়ের

রাশি, ওই কয়লাকাঠের গাদা, আলু-বেগুনের চুবড়িটা—এই সংসার ? এই জীবন ? ইহাই কি চিরকাল দেখিবেন ও জানিবেন ?"

অর্থাৎ সংসার, স্ত্রী ব্যবসা—সব কিছুই তার কাছে পুরনো ও বিস্বাদ মনে হয়। এতদিনের অভ্যস্ত জীবনটার প্রতি জাগে বিতৃষ্ণা !

বন্ধুর সঙ্গে ফিল্ম-স্টুডিওতে ঘোরাঘুরি ও নানা স্টারদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়াতে তাদের সকলকেই গদাধরের ভালো লাগে। মনে হয়—"তারা যেন অন্য লোকের জীব ! গান আর সুর দিয়া তৈরী ! জীবনের কতখানি কাটিয়া গেল···পৃথিবীতে এমন রূপ রস গন্ধ ·· তার কোন পরিচয় তিনি পাইলেন না !···এখনো···এখনো যদি তিনি পান !"

রেখা কৃশাঙ্গী মেয়ে। নাচের উপযুক্ত দেহের গড়ন। জ্যোৎস্নারাত্রে স্টুডিওর বাগানবাড়ীতে সেই নৃত্যরতা তরুণীর বিভিন্ন লাস্যভঙ্গি দেখে গদাধর ভাবেন—"টাকা সার্থক হয়, এই ব্যবসায়ে খরচ করেও সুখ, লাভ যদি পাই তাতেও সুখ ! যে বয়সের যা···আমার বয়স তো চলে যায়নি !"

এখানেও গদাধরের সেই ব্যবসায়ী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যবসাই করবে, কিন্তু সে পুরনো ব্যবসা নয়। পাটের আড়তদারীতে তার অরুচি ধরে গেছে। তাই এই নতুন ব্যবসা, ফিল্ম-স্টুডিও ভাড়া নিয়ে নিজস্ব ছবি তৈরী করবে, স্থির করে ফেলে।

এ ব্যবসায়ে টাকা নিয়োগ করে কারা কি রকম ধনী হয়েছে, সে-সব কাহিনী বন্ধুর মুখে বারংবার শুনেছিল বলেই যে এই ব্যবসায়ে এত আগ্রহী হয়ে উঠেছিল, একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান আছেই, একথা তার মত অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর কাছে অজানা ছিল না। তাই লাভ-লোকসানের কথা হিসাব করতে গিয়ে সর্বপ্রথম তার মনে হয়েছে, এ ব্যবসায়ে খরচ করেও সুখ ! টাকা সার্থক ! সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে রূপ-রস-গন্ধে-ভরা সেই নতুন জগতের স্বাদ গ্রহণের বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছে। নইলে শুধুমাত্র যে ব্যবসাদার, তার মনে বয়সের কথাটা জাগবে কেন ? ব্যবসার সঙ্গে বয়সের সম্পর্ক কি ? বিশেষ করে গদাধরের বয়স যখন চল্লিশ—সে প্রৌঢ়, কর্মক্ষম !

অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ-ভরা ছায়ালোকের সেই সব তরুণী, হাস্যলাস্যময়ী উর্বশী-মেনকার দল, সঙ্গীত-নৃত্য-পটীয়সী—যাদের দেখে তার মন ভেতরে ভেতরে লোভাতুর হয়ে উঠেছে, তাদের উপভোগ করার যে প্রকৃত বয়স, সেই জাগ্রত যৌবন আজ কেবল অতিক্রান্ত নয়, প্রৌঢ়ত্বেরও শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে—তাই অজ্ঞাতে বার বার সেই বয়সের কথাটাই উঁকি দেয় গদাধরের মনে।

অনঙ্গ কুলবধূ, আদর্শ স্ত্রী। তার কাছে সব কিছু পেয়েও তাই এই অভিনেত্রীর বাইরের চাকচিক্য চোখ-ঝলসানো বেশভূষা নৃত্যগীত দেখে মনে হয়েছে, এটাই নারীর আসল সম্পদ—এটা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে, সে ঠকেছে এতদিন।

আসলে নারীকে দুই রূপেই পেতে চায় পুরুষ। নারীকে দুই রূপে কামনা করা—এ সনাতন। বাংলা সাহিত্যেও এ প্রশ্ন বার বার উঠেছে। বিষবৃক্ষ থেকে শুরু। এককে পেয়ে

মানুষের মন ভরে না, তাই অন্যের দিকে ছুটে যায়। গদাধরের পদস্খলনের মূল কারণ ওই চিরকালীন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা! গদাধর পাটের ব্যবসা ছেড়ে তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফিল্মের ওই নতুন ব্যবসায়ে।

ব্যবসাদারের মত এখানেও সে পয়সার বিনিময়ে বেছে নিয়েছে নিজের পছন্দসই নায়িকাকে। প্রথম দুটো ছবিতে লোকসান খেয়ে যখন ঋণের দায়ে ঘরবাড়ি ব্যবসাপত্তর লাটে উঠে গেছে, তখনো আবার তৃতীয় ছবি করতে উদ্যত হয়েছে। এবং এবারের নায়িকা সেই বিখ্যাত ফিল্ম-স্টার শোভারাণী মিত্র। যার নামে বক্স-অফিস ভেঙে পড়ে—প্রোডিউসাররা ঘরে এসে যেচে অগ্রিম টাকা দিয়ে যায়। অর্থাৎ এবার লাভ অনিবার্য। আগের সব লোকসানের ক্ষতিপূরণ হয়ত উঠে আসবে।

এখানেও গদাধরের সেই ব্যবসায়ী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দুখানা ছবিতে লোকসান খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে না গিয়ে আবার সেই ব্যবসাতেই আত্মনিয়োগ করেছে।

গদাধরের সম্বন্ধে শোভারানীর মনোভাবও এখানে উল্লেখযোগ্য।—"লোকটির মধ্যে তেজ আছে, সাহস আছে,—বেশীর ভাগ পুরুষই তাহার কাছে আসিয়া কেমন যেন হইয়া যায়। মেরুদণ্ডবিহীন মোমের পুতুলদের দু'দণ্ড নাচানো যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে আনন্দ নাই, জয়ের গর্ব বড়ই ক্ষণস্থায়ী।"

এদিকে শোভারানী গদাধরের নতুন কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার পরে, অনেকদিন কোন খোঁজখবর না পেয়ে অনঙ্গ যখন চিন্তিত হয়ে পুরানো সরকার ভড়মশাইকে কলকাতায় পাঠালে স্বামীর খবরের জন্যে, তখন মুখোমুখি গদাধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলেও, স্টুডিওর একজন লোক ভড়মশাইকে বলেন—"শোভারানী নিজে এসে যোগ দিয়েছে—চমৎকার ছবি হচ্ছে—ডিস্ট্রিবিউটরেরা খরচের সব টাকা দিয়েচে। শোভারানীর নামের গুণ মশাই—মিঃ বোস এবারে বেশ কিছু হাতে করেছেন; শোভারানীর সঙ্গে—ইয়ে খুব মাখামাখি কিনা? একই সঙ্গে আছেন দু'জনে!"

বিভূতিভূষণের প্রতিভার শেষ স্বাক্ষর 'দম্পতি'র প্রতিটি চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কি মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে, কি চরিত্র অঙ্কনে কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই—বরং সম্পূর্ণতায় নিটোল নিখুঁত। বিশেষ করে ফিল্ম-জগতের কথা যেখানে বলেছেন, মনে হয় যেন তিনি ওই লাইনের লোক—দীর্ঘদিন ওদের মধ্যে থেকে, ওদের সংসর্গে কাটিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি বিভূতি-ভূষণের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান।

॥ ৩ ॥

'অথৈজল' যদিও আর একটি পদস্খলনের কাহিনী, তবু 'দম্পতি'র সঙ্গে এর আকাশপাতাল প্রভেদ। দুই নায়কের প্রকৃতি দু'রকমের। 'দম্পতি'র নায়ক গদাধর যেমন ব্যবসাদার, তেমনি টাকার বিনিময়ে অর্থাৎ নিজে ফিল্মের ব্যবসায় নেমে যথাসর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে তবে

ফিল্ম-স্টারদের দেহভোগের অধিকারী হতে পেরেছিল। অন্যদিকে দেখি 'অথৈজলে'র নায়ক শশাঙ্ক সেই খেমটাউলী কিশোরী পান্নার প্রেমে উন্মাদ হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। কিন্তু তাকে পাবার জন্যে সে টাকাপয়সা খরচ করে নি, বরং পান্নাই নিজের যা-কিছু উপার্জন সব দিয়ে শশাঙ্ককে ধরে রাখতে চেয়েছে। সে কোনদিন চায় নি যে শশাঙ্ক আলাদা রোজগার ক'রে টাকা এনে তাকে খাওয়াক-পরাক। বরং শশাঙ্কর সব ভার নিজে বহন করাতে দুঃখের চেয়ে সুখ পেয়েছে বেশী। অথচ কেন শশাঙ্কর মত এক প্রৌঢ়ের জন্যে পান্না এই কষ্ট স্বীকার করতে গেল? বড় বড় ধনী, জমিদাররা পর্যন্ত তাকে অনেক প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের জীবনসঙ্গিনী করতে চেয়েছিল। এক জমিদারের ছেলে ওর পেছনে অনেক টাকা খরচ করেও পান্নাকে পায় নি, ও তাকে দূর করে দিয়েছিল। এই কথাটা যেদিন পান্নার দলের নীলিমা শশাঙ্ককে আড়ালে ডেকে বলতে গিয়ে, একটু থেমে আবার বলেছিল, 'তাই বলি আপনার ক্ষমতা আছে'—তখন শশাঙ্ক অভিভূত হয়ে পড়েছিল—"জীবনের এসব অতি বড় অনুভূতি, আমি নিজে আস্বাদ করে বুঝেছি। মন এবং মনের বস্তু! টাকা না কড়ি না, বিষয়-আশয় না—এমন কি যশমানের আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত না। ওসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, নিজের সকল প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে পান্নাকে নিয়ে অকূলে ভেসেছি। ভেসে আজ বুঝতে পেরেছি, ত্যাগ না করলে বস্তুলাভ হয় না। আমার অনুভূতিকে বুঝতে হলে, আমার মত অবস্থায় এসে পড়তে হবে।"

ত্যাগ না করলে 'বস্তুলাভ' হয় না, শশাঙ্ক নিজেই ওই কথাটি স্বীকার করেছে। এখানে প্রশ্ন, এই বস্তুটা কি? নিশ্চয়ই দেহ নয়! দেহকে বাদ দিয়ে যে মন—যা দেহাতীত, অনুভূতিসাপেক্ষ—কেবলমাত্র অনুভূতির দ্বারাই পাওয়া যায়, লাভ করা যায়। রূপ ছেড়ে সেই রূপাতীত বস্তু দুর্লভরত্ন কিশোরী প্রেমকেই তিনি পেতে চেয়েছিলেন। এবং তার জন্যেই সর্বত্যাগী ভিখারী হয়েছেন।

এই উপন্যাস 'অথৈজল'কে তাই নেহাৎই এক পদস্খলনের কাহিনী বললে ভুল করা হবে। এখানে তিনি দেহবাদ নিয়ে গভীর তত্ত্বকথা আলোচনা করেছেন। বিভূতিভূষণ সাতান্ন বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। 'অথৈজল' তাঁর মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে রচিত। পান্না ও শশাঙ্কর প্রেম আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রতীক। দেহবাদের অতীত যে পরম প্রেম তাকেই যেন শশাঙ্ক পেতে চেয়েছে বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"ধন নয় মান নয়, কিছু ভালোবাসা, করেছিনু আশা।"

তাই 'দম্পতি'র নায়কের পদস্খলন ও 'অথৈজলে'র নায়কের পদস্খলন এক পর্যায়ে পড়ে না।

গদাধর যেমন লাভের প্রয়াসী, পয়সার বিনিময়ে নারীকে ভোগ করতে চেয়েছে; শশাঙ্ক তেমনি ত্যাগের মধ্যে দিয়ে দেহাতীত প্রেমকে পেতে চেয়েছে।

গদাধর যদি দেহবাদীর প্রতীক, শশাঙ্ক সেই দেহাতীত অধ্যাত্মিক প্রেমের প্রতীক;—"নিত্য থেকে লীলায় নেমে দেখি না, ব্যাপারটা কিরকম দেখায়।" এ প্রেম সেই লীলার

প্রতীক। তাই যত দিন যায়, তত শশাঙ্কর মনে সন্দেহ বাড়ে, সত্যি কি তার মত একজন প্রৌঢ়কে ওই তরুণী পান্না ভালবাসতে পারে?

এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় তার মন হয়ত সর্বদা "দোলাচলচিত্ত", এমন কি পান্না যখন ওর জন্যে ঘরদোর ছেড়ে আলাদা বাসা ভাড়া করলে তখনো সন্দেহ যায় না।

ওই কিশোরী তরুণী যেন এক পরমপ্রেমের প্রতীক। মানুষের অন্তরে যেমন ঈশ্বর-চেতনা ও ভগবৎপ্রেম, ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়ে পূর্ণতার মধ্যে এসে পড়লেও তার সন্দেহ যেতে চায় না, মন বলে সত্যি কি তাঁকে পেয়েছি! সর্বস্ব সমর্পন করেও মন নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না।

'পারে না বলেই সাধনার প্রয়োজন। ক্রমশ সেই দিকে মনকে একনিষ্ঠ করে তোলা!

পান্না খেমটাউলী, শশাঙ্কর জন্যে সব কিছু ত্যাগ ক'রেও তাই আশঙ্কা দূর হয় না, ভাবে পাছে তাকে ফেলে একদিন চলে যায়। নাচের আসরে শশাঙ্ককে সে বসে থাকতে বলে।—"তুমি কিন্তু উঠো না। তাহলে আমার নাচ খারাপ হয়ে যাবে। নীলি কি বলেচে জানো? বলেচে তোমার জন্যেই নাকি আমার নাচ ভাল হচ্ছে।"

অর্থাৎ দেববিগ্রহকে সামনে না দেখলে যেমন পূজায় মন বসে না, এও তেমনি। শশাঙ্ককে বুঝি পান্না তার হৃদয়দেবতার আসনে স্থাপিত করেছিল। অথচ পান্নার দিকে চেয়ে চেয়ে এক-একদিন শশাঙ্কর মনে হয়—"কোন্ স্বর্গে আমায় রেখেচে ও? ওকে পেয়ে ভুনিয়া ভুল হয়ে গিয়েচে আমার। পূর্ব্ব আশ্রমের কথা কিছুই মনে নেই। সুরবালা-টুরবালা কোথায় তলিয়ে গিয়েচে।"

পান্না নিজে উপার্জন করে শশাঙ্ককে খাওয়াবে চিরদিন, এই কথাটা শুনে পান্নার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে, সন্দেহ দূর হয়ে যায়। মনে হয়—"পান্না আমাকে ভালোবাসে নিশ্চয়ই। ভাল না বাসলে ও এমন বলতে পারত না। আমার বয়স হয়েচে, একটি ষোড়শী সুন্দরী কিশোরী আমাকে এমন ভালবাসবে, এ আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। একবার বিশ্বাস হয়, একবার হয় না।"

আবার সেইদিনই নির্জন পার্কে বসে, একা তার কথা ভাবতে ভাবতে মনে হয়—"পান্না আমাকে ভালোবাসে, ভালোবাসে, ভালোবাসে···"

এই কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কর দেহে অদ্ভুত এক শিহরণ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।—"শুধু ভেবেই আনন্দ। এত আনন্দ যে আছে চিন্তার মধ্যে, এত পুলক, এত শিহরণ, এত নেশা—একথাই কি আগে জানতাম? যেন ভাঙ্ খাওয়ার নেশার মত রঙীন নেশাতে মশগুল হয়ে বসে আছি! জীবনে এরকম নেশা আসে চিন্তা থেকে তাই বা কি আগে জানতাম!"

অর্থাৎ ঈশ্বরের চিন্তার মধ্যে যে পরম আনন্দ আছে এ সেই অনুভূতির ইঙ্গিত। তাই এর পরেই শশাঙ্কর মনে হয়—"সুরবালার সঙ্গে এতদিনের ঘরকন্না আমার ব্যর্থ হয়ে গিয়েচে। ভালবাসা কি জিনিস ও আমাকে শেখায় নি! যদি কখনো না জানতাম এ জিনিস, জীবনের একটা মস্ত বড় রসের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতাম। সুরবালার চিন্তা আমাকে কখনো নেশা লাগায় নি।"

এখানে সেই বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির কথাই মনে পড়ে। ‘সর্পে রজ্জুভ্রম, হেন অন্ধ করেছে নয়ন।” এক বেশ্যাকে ভালবেসে, তার প্রেমে অন্ধ হয়ে শেষে সেই ঈশ্বরের প্রেম লাভ করেছিল যেমন বিল্বমঙ্গল, শশাঙ্কর মনোভাবেরও তেমনি ক্রমপরিবর্তন লক্ষণীয়।—“ষোড়শী সুরবালাকে আমি বিবাহ করেছিলাম। কিন্তু কিসের অভাব ছিল তার মধ্যে? অভাব কিসের ছিল তা তখন বুঝি নি। এখন বুঝতে পারি, পান্নার ভালোবাসা পেয়ে আমার এই যে নেশার মত আনন্দ, এই আনন্দ দিতে পারে নি। নেশা ছিল না ওর প্রেমে। ওর ছিল কিনা জানি নে, আমার ছিল না। এত যে নেশা হয় তাই জানতাম না, যদি পান্নার সঙ্গে পরিচয় না হোত! এর অস্তিত্বই আমার অজ্ঞাত ছিল।”

এই যে অস্তিত্ববোধ, নিজের অন্তরে যে শ্রেয়বোধ সেটা জাগ্রত না হলে, মানুষ সেই পরম রসের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। সংসারের মধ্যে থেকে স্ত্রী-পুত্র পরিবেষ্টিত হয়ে সেই অমৃতের স্বাদ পাওয়া যায় না। তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার চাই, সংসার—পথের কণ্টক, পায়ের বেড়ী। সেটাকে ভেঙে, সব কিছু ফেলে বেরিয়ে আসতে না পারলে বুঝি সেই পরম-প্রেয়কে লাভ করা যায় না।

অর্থাৎ সব ত্যাগ করে একজনের পায়ে দেহমন সব কিছু সমর্পণ না করলে সে মানবী হোক আর দেবী হোক তাকে পাওয়া সম্ভব নয়। এই পরম সত্যটিকে বিভূতিভূষণ যেন বৈষ্ণব মহাজনদের পরকীয়াতত্ত্বের রস উপলব্ধির মত এখানে পরিবেশন করেছেন।

‘অথৈজল’ তাই বিভূতিভূষণের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মহান্ শিল্পীর হৃদয়-মন্থন-করা শেষ অমৃত।

যাঁরা ও-রসে বঞ্চিত, জানে না ওর আস্বাদ, তাদের তিনি বলেছেন—“ওরা বড্ড দুর্ভাগা। অমৃতের আস্বাদ পায় নি জীবনে। ভালবেসে আনন্দ নয়, ভালোবাসা পেয়ে আনন্দ। এ কোন আইডিয়ালিয়াষ্টিক ব্যাপার নয়, নিছক স্বার্থপর ব্যাপার।”

এখানে সেই ইংরেজ কবির উক্তিটি স্মরণীয়—“It is better to have loved and lost, than never to have loved at all.”

আরো বলেছেন, “একটু আস্বাদ করে, আরও আস্বাদ করতে প্রাণ ব্যগ্র হয়ে ওঠে।”

ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদও যারা একবার পায়, তারা ছাড়তে পারে না, আরো পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এমনি তার নেশা, এমনি মাদকতা!

উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা মধ্যে দিয়ে লেখকের বক্তব্য হয়ত ঠিকভাবে তিনি পরিস্ফুট করতে পারেন নি—এই মনে করে সবশেষে তিনি এক কবিকে এনেছেন। ভাবের কবি ঝড়ুমল্লিক। তিনি বলছেন, “যার মধ্যে ভাবের অভাব তাকে বলি পশু, এই যে তুমি—তুমি লোকটি কম নয়, নমস্ত! যদি বল কেন, তবে বলি—ডাক্তারী ছেড়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে ওই এক ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ের পেছনে পেছনে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি সর্বস্ব ছেড়ে ওর জন্যে। সবাই কি পারে? তোমার মধ্যে বস্তু আছে ভায়া, এসব সবাই বুঝবে না।”

তারপর আবার বললেন, "এজন্মে এই আসছে জন্মে এই ভাব দিয়ে তাঁকে পাবে!',

শশাঙ্ক চুপ করে শুনছিল। এবার প্রশ্ন করলে, "তাঁকে কাকে?"

উত্তর: "ভগবানকে।"

এখানেও বিভূতিভূষণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং এ জন্মে ভাল কাজ করলে পরজন্মে তার ফল পাওয়া যায়, এই মতবাদকে যেন সমর্থন করেছেন।

সেই জন্যই 'অথৈজল' উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের কেবল শেষ উপন্যাস নয়—অনন্য-সাধারণ মনীষার, সাধক শিল্পীর শেষ বিভূতি!

যদিও এই উপন্যাসটি তিনি শেষ করেননি, তবু যে না-বলা-বাণী এর মধ্যে রেখে গেছেন, তাতেই সম্পূর্ণতার তৃপ্তি মনে এনে দেয়।

॥ ৪ ॥

তাঁর শেষ গল্পগ্রন্থ 'কুশল পাহাড়ী' ও 'জ্যোতিরিঙ্গণ' গ্রন্থ দুটিতেও তাঁর শেষ জীবনের অভিজ্ঞতার ও লিপিকুশলতার দীপ্তি হোমানলের দ্যুতি ধারণ করেছে। প্রত্যেকটি গল্পের যে স্নিগ্ধ-প্রশান্ত ভাব তা মনকে এমন এক অব্যক্ত আনন্দময়লোকে পৌছে দেয়, যেখানে মন আপনি সমস্ত ক্লেদ ও দীনতা ভুলে গ্লানিমুক্ত হয়। গঙ্গায় স্নান করে উঠলে যেমন মনের ভাব হয়, তেমনি একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব রসের আস্বাদ এনে দেয়। প্রথমেই জ্যোতিরিঙ্গণ-এর গল্পগুলির কথা আলোচনা করব। এ যেন সিমেন্টের গাঁথুনি; কোথাও কোন ফাঁক, কোন শিথিলতা নেই। প্রত্যেকটি যেন রসে পরিপূর্ণ এক-একটি আঙুরের মত। জ্যোতিরিঙ্গণকে একগুচ্ছ আঙুর বলা যেতে পারে। যদিও জ্যোতিরিঙ্গণ কথাটির আভিধানিক অর্থ জোনাকি!

হ্যাঁ, জোনাকির মত ছোট ছোট অগ্নিপতঙ্গ। নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে যার দীপ্তি—পথ দেখায়। মনের গভীরে যে অতল অন্ধকার সেখানেও তেমনি ওই গল্পগুলি কেবল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আঁধার দূর করে না এ 'জ্যোতিরিঙ্গণ'—জোনাকির মত অন্ধকারের বুকে ক্ষণিক আলোর চকমকি নয়, তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতির বুকে ব্যথাবেদনা-ভরা এক সুগভীর অনুভূতির দীপ্তি।

অস্তগামী সূর্যের আলোকচ্ছটায় আকাশের বুকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন মেঘগুলি যেমন এক স্থির অচঞ্চল ভাবগম্ভীর মহিমময় রূপে প্রতিভাত হয়, বিভূতিভূষণের এই শেষ গল্পগুলির যেন তেমনি এক ধ্রুপদী ভাব। সমাজের সেই সব প্রাচীন সনাতন আদর্শ, যা আজ অবলুপ্তির পথে, তার প্রতি কেবল যে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল তাই নয়, সেই চিরন্তন সত্যগুলিকে যেন দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী নন। বিভূতিভূষণের পরিণত প্রতিভার মননশীলতার খণ্ড খণ্ড স্বাক্ষর এর প্রতিটি গল্পে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

অথচ উপদেশ দেবার ছলে, শিক্ষকের মত তিনি তার ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় কোথাও বিচার করতে যান নি। কোন গল্পই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারমূলক নয়। অসাধারণ প্রতিভাধর শিল্পী তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে একেবারে গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের জীর্ণ দীর্ণ

শতছিন্ন দারিদ্র্যের বাস্তব কাহিনীর মধ্যে দিয়েই সুনিপুণ তুলিতে চিত্রিত করেছেন সেই বিশ্বাস বা অনুভূতি।

গল্পগুলির সবচেয়ে বড় গুণ পড়তে পড়তে দুঃখে কষ্টে চোখে জল আসে না, সমবেদনায় মন ভরে ওঠে। কখন যে তাদের সুখদুঃখের ভাগীদার হয়ে, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছি বুঝতে পারা যায় না।

'সংসার' গল্পটিতে এক ছন্নছাড়া গৃহস্থের শত দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে স্বামী-পুত্র-শ্বশুরকে নিয়ে হতভাগিনী বধূর একটি দিনের পূর্ণ সাংসারিক জীবনযাত্রার যে চিত্র এঁকেছেন, ভাঙা ঘরে জ্যোৎস্নার আলোর মত, স্বর্গের সুখও তার কাছে তুচ্ছ!

'দাদু'র কাহিনী এক একশত বছরের বৃদ্ধের, ভীমরতির দরুন সকলের হেনস্থা ও অবহেলা সত্ত্বেও তার ছেলের একনিষ্ঠ ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে বাপের প্রতি। সেখানে একই সঙ্গে আদর্শ পিতৃভক্তির চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি সন্তানের প্রতি পিতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম টান ও স্নেহের কথাও ভোলা যায় না। এই পিতৃভক্ত সন্তান যখন মারা গেল, শত বৎসর পরমায়ু নিয়ে সেই পিতা তখনও জীবিত, তখনও তিনি ভাবছেন—'হরিশ এলি না কি রে,' 'কোথা গেলি হরিশ'!

'হিঙের কচুরী' ও 'থনটন কাকা' গল্প-দুটিতে মুখ্যতঃ কৃতজ্ঞতার বাণীই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষ ভোলে না তার স্নেহের ঋণ, একদিন যার কাছে যতটুকু পাক না কেন!

'বাসা' গাঁয়ের মানুষের প্রতি প্রেম, ভালবাসা ও আকর্ষণের এক আন্তরিকতাপূর্ণ অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি।

'বন্দী' গল্পটির নায়ক একজন নতুন কবি ও ঔপন্যাসিক, পল্লীগ্রামে তার প্রতিভার কেউ খবর রাখে না। পায়ে হেঁটে তাই সাত-আট মাইল পথ গিয়ে সাহিত্যিককে কবিতা শোনাতে যেতে হয়। অথচ এই কবি শিক্ষিত, এম-এ পাস, একদিন বিলাতে সাহিত্যের গবেষণা করতে পারে, মনে মনে তার কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল। অর্থের অভাবে তার সে সাধ পূর্ণ হয় নি। বিদেশ-ভ্রমণের বাসনা এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে—"বাল্যকাল থেকে কত সাধ ছিল, সন্ধ্যাবেলা মূরল্যাণ্ডে বেড়িয়ে বেড়াব, ক্রমে লেক দেখব। লর্ণা ডুন পড়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলুম কলেজে ডুন কাউন্টি দেখবো। ব্ল্যাকমূরের অমর কাহিনী—লিন্টন্, লিন্মাউথ, ইনক্রাক—এসব কতদিনের স্বপ্ন! হ'ল না। কোথায় ডেভনশায়ার লেনের সৌন্দর্য, কোথায় ডার্টমূর—আর কোথায় পড়ে আছি চালতেপোতা গাঁয়ে বাঁশবনে মশার কামড় খেয়ে!"

'কুশল পাহাড়ী' সর্বশেষ রচনা। এর বেশীর ভাগ গল্পেই যেন মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। কোন-না-কোন কারণে নায়কের মৃত্যু ঘটছে দেখতে পাওয়া যায়।

'ঝগড়া' গল্পে দেখা যায় কেশব গাঙ্গুলী রিটায়ার করে বাড়ি বসেছিলেন। তারপর

স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে ঝগড়া করে গৃহত্যাগ করেন এবং অবশেষে বিহারের এক স্টেশনের মুসাফির-খানায় তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে।

'অবিশ্বাস্য' গল্পটিতেও দেখি হঠাৎ দুর্ঘটনায় হাজুর মৃত্যু হয়েছে।

'খেলা' গল্পটি সব চেয়ে মর্মান্তিক। মতিলাল ছেলেকে নিয়ে নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে আগে ছেলেকে নাইয়ে ডাঙ্গায় দাঁড় করিয়ে রেখে তারপর নিজে নামল নদীতে স্নান করতে আর ফিরল না। খরস্রোতা বর্ষার ঢল-নামা নদীর টানে কোথায় তলিয়ে গেল।

'জাল', 'হরিকাকা', 'আর্টিস্ট', 'সীতানাথের বাড়ী ফেরা' প্রভৃতি গল্পগুলি প্রত্যেকটি সুসম্পূর্ণ নিটোল মুক্তোর মত ভাবে-ভাষায় অপরূপ।

'কুশল পাহাড়ী' গল্পটি একদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরি মধ্যে বিভূতিভূষণ যেন তাঁর শেষ বাণী দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনদর্শনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছেন এই গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে।

সুন্দরগড় আরণ্যপ্রকৃতির লীলাভূমি। সেখানে বেড়াতে গিয়ে যে সাধুর দর্শন পান তাঁর জবানীতেই তিনি যেন অন্তরের শেষ বাণী নিবেদন করে গেছেন।—"কুশল পাহাড়ীর শৈলশ্রেণী ভৈরবথানকে চারিদিকে ঘিরেছে। বহু পুরাতন পাথরের চাঁই! সব যেন এখানে সুপ্রাচীন—প্রাচীন সাধু, প্রাচীন শালবৃক্ষ, প্রাচীন অরণ্যভূমি। মনে হ'ল এ পরিবেশ ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছিনে। থেকে যাই এখানেই। ঋষি সাধু-প্রবক্তাদের জ্যোতির্বাহিনী এখানেই; এ জিনিস আর কোথাও পাব না—সুন্দরগড় রাজ্যের এই সুদূর বনভূমিতে যে বৃদ্ধ, পিতৃবৎ স্নেহশীল, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির পাদমূলে এসে আজ পৌঁছেচি তিনিই মনে শান্তি এনে দেবেন! পথেঘাটে এ দুর্লভ জিনিসের সন্ধান মেলে না।"

আরো মুগ্ধ হলাম যখন সাধুজী ঈশোপনিষদের একটা শ্লোক উচ্চারণ করে তার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বার বার বলতে লাগলেন: "কবির্মণীষী পরিভূঃ সয়ম্ভূ।" শ্লোকটির মধ্যেকার 'কবি' কথাটার অর্থ বৃদ্ধ। সাধুর মুখের সেই মধুর গম্ভীর বাণী আজও কানে বাজছে:—

"কবিই তিনি বটেন বাবা! এখানে বসে বসে দেখি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি কবিই বটে তিনি। আমি কিছুই পাইনি বাবা! ভড়ং দেখছো এসব বাইরের। ভেতরের জ্ঞান, এসব কিছু হয়নি। তবে দেখতে চেয়েচি তাঁকে, তাঁর এ কবি-রূপ দেখে ধন্য হয়েছি।"

এই উক্তি থেকেই বিভূতিভূষণের চরিত্রের অনেকখানি উদ্‌ঘাটিত হয়। বনজঙ্গল, প্রকৃতির প্রতি তাঁর যে আকর্ষণ তা ছিল যেন মন্দিরে ভক্তের পূজা দিতে যাওয়ার মত প্রাণের আকূতিতে ভরা। প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর স্রষ্টার মূর্তিকে চাক্ষুষ করতেন।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

"যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল-ভুবনে প্রবিষ্ট আছেন, যিনি ওষধিসমূহে বিরাজমান, যিনি বনস্পতিসমূহে বিরাজমান, সেই জ্যোতির্ময় দেবতাকে পুনঃ নমস্কার।"

বিভূতিভূষণের মুখে মাঝে মাঝে একটি কথা শোনা যেতো—'ওরে বাবা আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে।' সেই ব্রহ্মজ্ঞান যে কি তা কোনদিন ব্যাখ্যা করে বলেন নি বটে তবে সাধুজীর মুখ দিয়ে কুশল পাহাড়ীর শেষ কটি লাইনে ব্যক্ত করেছেন—

"মুক্তির ধারণা বন্ধন আছে বলেই আসে। যথার্থ বিচারের দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তিও নেই বন্ধনও নেই। ব্রহ্ম এক অচিনরাজ্য, যে সেখানে যায় সেই বোঝে ব্রহ্ম দ্বৈতও নয় অদ্বৈতও নয়। তিনি শাস্ত্রের ওপারে, বাদানুবাদের ওপারে, দ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্যও নয়, অদ্বৈতবাদের প্রাপ্য নয়। অনুভূতিই একমাত্র জিনিস। মানুষ মুক্ত আছেই, কেবল সে-সম্বন্ধে সচেতন নয় সে। মানুষ সত্যমুক্ত, সে মানুষ। কিছু পড়তে হবে না। কিছু সাধনা করতে হবে না। অনুভূতিই উত্তরায়ণের সেই অভিযাত্রী, যা তাকে পলকে মুক্তির জ্যোতির্লোকে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে। বিশ্বাস করো বাবা। মানুষ মুক্ত, সে-ই নিজেকে নিজে বেঁধেছে। সে-ই অনুভব করুক সে মুক্ত। সে মানুষ সে মুক্ত!"

॥ ৫ ॥

পরিশেষে বক্তব্য, বিভূতিভূষণের রচনা সম্বন্ধে ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ নতুনত্ব এনেছেন দুই ভাবে। এক তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর তাঁর রচনায় সহনীয় হয়েছে। দুই শিশুমনকে শিশুর মত সরলতায় ও সমবেদনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। রচনার সহৃদয়তা এবং অকৃত্রিমতার গুণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিরস্মরণীয়।" আমার মনে হয় আরো যে দু'টি কারণ মুখ্যতঃ বিভূতিভূষণের রচনার স্থায়িত্বের দাবী রাখে তার প্রধান ও প্রথম কারণ হল রচনার স্বচ্ছ সাবলীলতা। সহজ ও সরল ভঙ্গীতে। হ্যাজলিট্-এর ভাষায়—It is not easy to write a familiar style. Many people mistake a familiar for a vulgar style!"

রবীন্দ্রনাথের উক্তিও জ্ঞাতব্য:

"সহজ কথায়
লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না
লেখা সহজে।"

দ্বিতীয় কারণটি হ'ল: বিভূতিভূষণের সাহিত্যে প্রকৃতির যে অবাধ মেলামেশা এ

একটা বিশেষ গুণ, যার প্রসাদলাভে রচনা চিরস্থায়ী হয়। কারণ প্রকৃতি মানুষের সুখ-দুঃখের মধ্যে যে অন্তরের সুর বাজিয়ে রাখে তা অক্ষয় অমর। সেইজন্যে বোধ হয় প্রাচীন সাহিত্যে কালিদাস ভবভূতি থেকে রামায়ণ মহাভারত পর্যন্ত যে অমরত্বের স্বাদ তার মূলেও এই প্রকৃতি-প্রেম।

সুমথনাথ ঘোষ

অথৈ জল

বাড়ীতে কেউ নেই। ডিস্পেনসারির কাজ সেরে এইমাত্র বাজার থেকে ফিরে এসেছি।

পাড়ার সনাতন চক্কত্তি বাইরের বৈঠকখানায় বসে আছে।

বললাম—কি সনাতনদা, খবর কি?

সনাতন উত্তর দিল—এমনি করে শরীরটা নষ্ট কোরো না। বেলা একটা বেজে গিয়েছে। এখনও খাওয়া-দাওয়া কর নি?

সনাতনের কথা শুনে হাসলাম একটুখানি। আমি জানি, সনাতন আমার মন যোগাবার জন্যে একথা বলছে; সে ভালই জানে, আমার কেন দেরি হয় ডিস্পেনসারি থেকে উঠে আসতে। সকাল থেকে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাই কখন?

বললাম—রুগীর ভিড় জানো তো কেমন?

সনাতন মুখখানাতে হাসি এনে উজ্জ্বল করবার চেষ্টা করে বললে—তা আর জানি নে? তোমার মত ডাক্তার এ দিগরে ক'টা আছে? ওষুধের শিশি ধোওয়া জল খেলে রোগ সেরে যায়—

—চা খাবে সনাতনদা?

—পাগল? এখন চা খাবার সময়?

—তা হোক, চলুক একটু।

আমার নিজেরও এখন তাড়াতাড়ি স্নানাহার করবার ইচ্ছে নেই। সনাতনের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে একটু আড্ডা দেওয়া যাক। ডিস্পেনসারির চাকর বুধো গোয়ালা চাবি নিয়ে সঙ্গে এসেছিল, তাকে বললাম,—তোর মাকে বল গিয়ে দু' পেয়ালা চা করে দিতে।

সনাতন চক্কত্তি গ্রামের গেজেট। সে কেন এখানে এসেছে এত বেলায়—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

চা খেতে খেতে সনাতন বললে—আব্দুল ডাক্তারের পসার—বুঝলে ভায়া—

হাসি-হাসি মুখে সে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি বললাম—ব্যাপার কি?

—আর কি ব্যাপার—একেবারে মাটি!

—কে বললে তোমাকে?

—আমি বলছি। আমি জানি যে—

—কেন, সে তো ভাল ডাক্তার—

—রামোঃ, তোমার কাছে? বলে সেই 'চাঁদে আর কিসে'! হোমিওপ্যাথির জল কে খাবে তোমার ওষুধ ছেড়ে। বলে ডাকলে কথা কয়। রামু তাঁতীর বউটার কি ছিল? হিম হয়ে গিয়েছিল তো। তুমি গা ফুঁড়ে না ওষুধ দিলে এতদিনে দোগেছের শ্মশান-সই হোতে হোত।

নিজের প্রশংসা শুনতে খারাপ লাগে না, তা যেই করুক। তবুও আমি অন্য একজন ডাক্তারের নিন্দাবাদ আমার সামনে হোতে দিতে পারি না। আমাদের ব্যবসার কতকগুলো

নীতি আছে, সেগুলো মেনে চলাতেই প্রকৃত ভদ্রতা। বললাম—ডাক্তার রহিমকে যা-তা ভেবো না। উনি খুব ভাল চিকিৎসা করেন—অবিশ্যি আমি নিজে হয়তো হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিনে, কিন্তু—

সনাতন হাত নেড়ে বললে—না রে ভায়া, তুমি যাই বলো, তোমার কাছে কেউ লাগে না। একবার সাইনবোর্ডটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—ডাক্তার বি. সি. মুখার্জ্জি এম্ বি. মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব হাউস সার্জ্জন—সোনার পদক প্রাপ্ত—

—তুমি বোসো দাদা, আমি খেয়ে নিই—

—বিলক্ষণ! নিশ্চয়ই নেবে। তুমি যাও ভেতরে, আমি এই তক্তাপোশে একটু ঘুম দিই।

—বাড়ীতে কেউ নেই। তোমার বউমা গিয়েছেন রাজু গোঁসাইয়ের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে। কি একটা মেয়েলি ব্রত উদ্‌যাপন। সেই জন্যেই তো এত দেরি করলাম।

একটু পরে স্নান সেরে উঠেছি, গৃহিণী বাড়ী এলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সঙ্গে রাজু গোঁসাইদের বাড়ীর ঝি, তার হাতে একটা পুঁটুলি।

আমায় দেখে সুরবালা বললে—কি গো, এখনও খাও নি?

—কই আর খেলাম।

—দাঁড়াও ভাত এনে দিই, লক্ষ্মী জায়গা করে দে—

—খুব খাওয়ালে রাজু গোঁসাইয়েরা? কিসের ব্রত ছিল?

—এয়োসংক্রান্তির ব্রত। তোমার জন্যে খাবার দিয়েছে—

—আমার জন্যে কেন? আমি কি ওদের এয়ো?

—তা নয় গো। তুমি গাঁয়ের ডাক্তার, ডাক্তারকে হাতে রাখতে সবাই চেষ্টা করে।

—না না, ও আমি ভাল বাসি নে! লোকের অযথা ব্যয় করিয়ে দিতে চাই নে আমি। ও আনা তোমার উচিত হয় নি।

—আহা! কথার ছিরি দ্যাখো না। আমি বুঝি ছাঁদা বেঁধে আনতে গিয়েছিলাম—ওরা তো পাঠিয়ে দিলে ঝি দিয়ে।

পৈতৃক আমলের দোতলা কোঠা বাড়ী। আহারাদি সেরে পূবদিকের ঘরে বিশ্রাম করতে গেলাম। বড় পালঙ্কখাটে পুরু গদি-তোশক পাতা ভাল বিছানা। সুরবালার নিজের হাতের সূচের কাজের বালিশ-ঢাকা বালিশের-ওয়াড়। খাটের ঝালরও ওর নিজের হাতের। এই একটা বিষয়ে আমার শৌখিনতা আছে স্বীকার করছি, ভাল বিছানা না হোলে ঘুম হবে না কিছুতেই। তা ছাড়া, ময়লা কোনো জিনিস আমি দেখতে পারি নে, দশদিন অন্তর মশারি ধোপার বাড়ী দিতে হবেই। আমার এক রোগীর বাড়ী থেকে পুরনো দামে একখানা বড় আয়না কিনেছিলাম, ওপাশের দেওয়ালে সেটা বসানো, সুরবালার শখের ড্রেসিং টেবিল পালঙ্কের বাঁ ধারে, তিনখানা নতুন বেতের চেয়ার এবার কলকাতা থেকে আনিয়েছি,

সুরবালার ফরমাশ-মত খান-আষ্টেক বৌবাজার স্টুডিওর ছবি—কালীয়-দমন, রাসলীলা, অন্নপূর্ণার শিবকে ভিক্ষাদান, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী, শ্রীশ্রীসরস্বতী ইত্যাদি। আমার পছন্দসই আছে একখানা বিলিতি ল্যাণ্ডস্কেপ—সেও ওই বৌবাজারের দোকানেই কেনা।

জানালার গায়ে জামরুলগাছের ডালটা এসে নুয়ে পড়েছে, তার পেছনেই জাওয়া বাঁশের ঝাড়। শীতের বেলা, এর মধ্যেই বাগানের আমতলায় মুচুকুন্দ চাঁপা গাছটার তলায় ছায়া পড়ে এসেছে, ছাতারে পাখীর দল জামরুল গাছটার ডালে কিচ্ কিচ্ করছে—বাগানের সুদূর পাড়ের ঘাসের জমিতে আমাদের বাড়ীর গরু ক'টা চরে বেড়াচ্ছে।

সুরবালা পানের ডিবে হাতে এসে বললে—একটু ঘুমিয়ে নাও না।

—বাইরে সনাতন চক্কত্তিকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

—সে মিন্‌সের কি যাবার জায়গা নেই, এখানে এসে জুটেছে কেন দুপুরে?

—ঘুমুচ্ছে।

—তবে তুমিও ঘুমোও।

সুরবালাকে বেশিক্ষণ দেখতে পাইনে দিনের মধ্যে, খোকা-খুকিদেরও না। বললাম—বোসো আমার কাছে, আবার হয়তো এখুনি বেরুতে হবে। একটু গল্পগুজব করি।

সুরবালা বালিশে হাত রেখে বসলো পাশেই। বললে—আজ আর বেরিও না—এত বেলায় এলে—

—পাশের গাঁয়ে একটা শক্ত রুগী রয়েছে, তার কথাই ভাবছি—

—যেতে হবে? কল্ না দিলেও?

—আমি তাই তো যাই। ফি নিইনে নিজে গেলে। তুমি তো জানো।

—গরুর গাড়ীতে চলে না। তোমার শরীরের কষ্ট বড় বেশী হয়।

—দেখি একখানা মোটর কিনবার চেষ্টায় আছি! কলকাতায় গেলে এবার দেখবো।

সুরবালা আবদারের সুরে বললে—হ্যাঁগা, নিয়ে এসো কিনে একখানা—আমাদের একটু চড়ে বেড়াবার ইচ্ছে। আনবে এবার?

—কাঁচা রাস্তা যে! বর্ষাকালে—

—কেন, তোমার ডিস্‌পেনসারিতে রেখে দেবে বর্ষাকালে। বাজারে তো পাকা রাস্তা।

—তোমার ইচ্ছে?

—খু-উ-ব। জয়রাজপুরের মল্লিকবাড়ীতে তাহলে দুর্গা-পুজোয় মোটর চড়ে নেমন্তন্ন খেতে যাই এ বছর।

—এ বছর কি রকম? সামনের বছর বলো—

—ঐ হোল। খুনুকে টুনুকে বেশ করে সাজিয়ে মোটরে উঠিয়ে—

—না না, ওদের মাথায় ওসব ঢুকিও না এ বয়সে। ওদের কিছু বলার দরকার নেই।

—আহা! আমি যেন বলতে যাচ্ছি? তুমি বললে, তাই বললাম।

—বেশ, দেখছি আমি। তোমার হাতে কত আছে?

—গুনে দেখি নি। হাজার চারেক হবে। তুমি কিছু দিও—কিনতে হয় ভাল দেখে একখানা—

—ওতেই ভেসে যাবে।···

আমি সামান্য একটু ঘুমিয়ে নিই।

যখন উঠলাম তখন শীতের বেলা একেবারেই গিয়েছে। সুরবালা চা নিয়ে এল। বললাম —বাইরে সনাতনদা বসে আছে নিশ্চয়। ওকে চা পাঠিয়ে দাও—

সুরবালা বললে—মালিয়াড়া থেকে তোমার কল্ এসেছে, দু'জন লোক বসে আছে। বৃন্দাবন কম্পাউণ্ডার এসেছিল বলতে, আমি বললাম, বাবু ঘুমুচ্ছেন।

—এখন আমার ইচ্ছে নেই যাবার।

—সে তুমি বোঝো গিয়ে। কিছু খাবে?

—নাঃ, এই অবেলার শেষে খিদে নেই এখন। জামাটা দাও, নিচে নামি।

বাইরের ঘরে সনাতনদা ঠিক বসে আছে। আমায় বললে—কি হে, ঘুমুলে যে খুব? এরা এসেছে মালিয়াড়া থেকে তোমায় নিতে।

লোক দুটি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে। একজন বললে—এখুনি চলুন ডাক্তারবাবু, বীরেশ্বর কুণ্ডুর ছোট ছেলের জ্বর আজ ন'দিন। ছাড়ছে না কিছুতেই—

—কে দেখছে?

—গ্রামেরই শিবু ডাক্তার—

—বসুন। পঞ্চাশ টাকা নেবো এই অবেলায় যাওয়ার দরুন—

—বাবু, আপনার দয়ার শরীর। অত টাকা দেওয়ার সাধ্যি থাকলে শিবু ডাক্তারকে দেখাতে যাবো কেন বলুন।

—কত দিতে পারবেন? দশ টাকা কম দেবেন—

সনাতনদা এই সময় বলে উঠলো—দরদস্তুর করাটা কার সঙ্গে? উনি হাত বুলিয়ে দিলে রুগীর অসুখ সেরে যায়—কোনো কথা বোলো না।

সনাতনের ওপর আমি মনে মনে বিরক্ত হলাম। আমি তাকে দালালি করতে ডেকেছি নাকি। ও রকম ব্যবসাদারি কথা বলা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। সনাতনের প্রতি বিরক্তি প্রকাশের জন্যেই বললাম—দরদস্তুর আমি পছন্দ করিনে বটে, তবে গরীব লোকের কথা স্বতন্ত্র। যাগ গে, আর দশ টাকা কম দেবেন। কিসে যাবো? নৌকো এনেছেন? বেশ।

সনাতন আমার সঙ্গে নৌকোতে উঠলো।

রাঙা রোদ নদীতীরের গাছপালার মাথায়; সাদা বকের দল শেওলার দামে, ডাঙার সবুজ ঘাসে চরে বেড়াচ্ছে, শীত আজ ভালই পড়েছে। উপীন জেলে নদীর ধারে দোয়াড়িতে মাছ ধরছে, আমায় দেখে বললে—বাবু, একটা বড় বাটা মাছ প্যালোম এই মাত্তর—আপনার বাড়ী পেটিয়ে দেবো?

সনাতন বললে—কত বড় রে ?

—তা দেড় সের সাত পোয়ার কম হবে না, আন্দাজে বলছি। এখানে তো দাঁড়িপাল্লা নেই।

—বাবুর বাড়ি পাঠিয়ে দিবি নে তো ব্যাটা কোথায় দিবি ? এই অবেলায় সাতপোয়া মাছ নিয়ে দাম দেবার ক্ষ্যামতা আছে ক'জনের এ গাঁয়ে ? দে পাঠিয়ে দে।

আমি মৃদু বিরক্তি জানিয়ে বললাম—কি ওসব বাজে কথা বকো ওর সঙ্গে সনাতনদা। মাছ দিতে বললে, বললে—অত কথার দরকার কি ?

সনাতন অপ্রতিভ হবার লোক নয়, চড়াগলায় বললে—কেন, অন্যায় অন্যায্য কথা নেই আমার কাছে। ঠিকই বলেছি ভায়া। তুমি ছাড়া নগদ পয়সা ফেলবার লোক কে আছে গাঁয়ে ? আসল লোকই তো তুমি—

রোগীর বাড়িতে গ্রামের বৃদ্ধলোকেরা জুটেছে। শিবু ডাক্তারও ছিল। শিবু ডাক্তার সেকেলে আর. জি. করের স্কুলের পাশ গ্রাম্য ডাক্তার। আমাকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল।

আমি আড়ালে ডেকে বললাম—কি দিয়েছেন ? প্রেসক্রিপ্‌সানগুলো দেখি।

শিবু বললে—কুইনিন দিচ্ছি।

—ভুল করেচেন। যখন দেখলেন জ্বর বন্ধ হচ্ছে না, তখন কুইনিন বন্ধ করা উচিত ছিল। এ হল টাইফয়েড, সেদিকেই যাচ্চে।

—আমিও তা ভেবেচি—অ্যালকালি মিকশ্চার দুদিন দিয়েছিলাম।

—কাগজ আনুন। লিখে দিই।

—একটা ডুশ্‌ দেবো কি ? ভাবছিলাম—

—না। বাই নো মিন্‌স্—

গৃহকর্ত্তা কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসে বললেন—আপনি আমাদের জেলার ধন্বন্তরি। ছেলেটা মা-মরা, ছ'মাস থেকে মানুষ করেছি—

আমি আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললাম—ভয় নেই, ভগবানকে ডাকুন। সেরে যাবে, আমরা উপলক্ষ মাত্র। সঙ্গে লোক দিন ওষুধ নিয়ে আসবে।

শিবু ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে বললে—ওষুধ সার আমার ডিস্‌পেনসারি থেকে—

—আপনার এখানে সব ওষুধ নেই। আমি সম্প্রতি কলকাতা থেকে আনিয়েচি—সুবিধে হবে।

—যে আজ্ঞে সার।

শিবু একটু দমে গেল। ওষুধের দামে ভিজিটের তিনগুণ আদায় করে থাকে এই সব পল্লীগ্রামের ডাক্তার—আমার জানা আছে, আমি তার প্রশ্রয় দিই নে। পাঁচ আনার ওষুধের দাম আদায় করে দু টাকা।

সন্ধ্যার পর নৌকোতে ফিরলাম। অন্ধকার রাত, ঝোপে-ঝাড়ে শেয়াল ডাকচে,

জোনাকি জ্বলচে। এক জায়গায় শব নিয়ে এসেচে দাহ করতে। নদীতীরে বাবলা তলায় পাঁচ-ছ'জন লোক বসে জটলা করচে, তামাক খাচ্ছে, দুজনে চিতা ধরাচ্চে।

সনাতনদা হেঁকে বললে—কোথাকার মড়া হে?

এরা উত্তর দিলে—বাঁশদ' মানিকপুর—

—কি জাত?

—কর্ম্মকার—

—বুড়ো না জোয়ান?

ধমকের সুরে বললাম—অত খবরে তোমার কি দরকার হে? চুপ করে বোসো। ধরাও একটা সিগারেট, এই নাও।

সনাতন একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—একটা কথা আছে। আমাদের গ্রামের তুমিই এখন মাথা। তোমাকে বলতেই হবে। রামপ্রসাদ চাটুয্যে আমাদের গ্রামের লালমোহন চক্কত্তির মেয়েটার কাছে যাতায়াত করচে অনেকদিন থেকে। এ খবর রাখো?

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—সে কি কথা? শান্তিকে তো খুব ভাল মেয়ে বলেই জানি।

—তুমি ও খবর কি রাখবে? নিজের রুগী নিয়েই ব্যস্ত থাকো। দেবতুল্য মানুষ। এ কথা তোমাকে বলবো বলেই আজ নৌকোতে উঠেচি। এর একটা বিহিত করো।

—তুমি প্রমাণ দিতে পারো?

—চক্কত্তি পাড়ার সব লোক বলবে কাল তোমার কাছে। কালই সব ডাকাও।

—নিশ্চয়ই। এ যদি সত্যি হয় তবে এর প্রশ্রয় আমি দিতে পারি নে গাঁয়ে। আমায় তো জানো—

—জানি বলেই তোমার কানে তুললাম কথাটা—এখন যা হয় করো তুমি।

—শাসন করে দিতে হবেই যদি সত্যি হয়, কাল-সব ডাকি। দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না, দেবোও না কখনো।

—সে আর আমি জানি নে! কুঁদির মুখে বাঁক জব্দ। তুমি ভিন্ন ভায়া এ গাঁয়ে মানুষ কে আছে, কার কাছে বলবো! সবাই ওই দলের।

রাত্রে সুরবালাকে কথাটা বললাম। সে বললে—শান্তি ঠাকুরঝি এদিকে তো ভাল মেয়ে, তবে অল্প বয়সে বিধবা, একা থাকে। তুমি কিছু বলো না আগে—মেয়ে মানুষের ব্যাপার। আগে শোনো। মুখে সাবধান করে দিলেই হবে।

আমি ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম—মুখে সাবধানের কর্ম্ম নয়। দুর্নীতি গোড়া থেকে চেপে মারতে হয়—নইলে বেড়ে যায়। সেবার হরিশ সরকারের বৌটাকে কেমন করে শাসন করে দিয়েছিলুম জান তো? যার জন্যে দেশ ছাড়া হয়ে চলে গেল।

সুরবালা শান্ত সুরে বললে—সেটা কিন্তু তোমার ভাল হয় নি। অতটা কড়া হওয়া কি ঠিক?

—আলবৎ ঠিক। যা-তা হবে গাঁয়ের মধ্যে!

—চিরকাল হয়ে আসচে। ওসব দেখেও দেখতে নেই। নিজের নিয়ে থাকো, পরের দোষ দেখে কি হবে? ভগবান আমাদের যথেষ্ট দিয়েচেন—সবাই মানে চেনে ভয় করে গাঁয়ের মধ্যে। সত্যি কথা বলি তবে, শান্তি ঠাকুরঝি কাল আমার কাছে এসেছিল। এসে আমার হাত ধরলে। বললে, এই রকম একটা কথা আমার নামে দাদার কাছে ওঠাবে লোকে, আমার ভয়ে গা কাঁপচে। তুমি একটু দাদাকে বোলো বৌদি। বেচারী তোমার কাছে নালিশ হবে শুনে—

—ওসব কথার মধ্যে তুমি থেকো না। সমাজের ব্যাপার, গ্রামের ব্যাপার—এ অন্য চোখে দেখতে হয়। শাসন না করে দিলে চলে না—বেড়ে যাবে।

পরদিন গ্রামের পল্লীমঙ্গল সমিতির সভ্যদের ডাকাই। শান্তির ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরামর্শ করবার জন্যে।

পরামর্শ করবার প্রয়োজন নেই আমি জানি। এ সমিতির আমিই সব, আমার কথার ওপর কেউ কথা বলবার লোক নেই এই গাঁয়ে। আমিই সমিতির সেক্রেটারী, আমিই সভাপতি—আমিই সব।

সভায় আমি নিজেই প্রস্তাব করলাম, রামপ্রসাদ চাটুয্যেকে ডাকিয়ে এনে শাসন করে দেওয়া যাক। সকলে বললে—তুমি যা ভাল মনে করো।

সনাতনদা বললে—রামপ্রসাদ ইউনিয়ান বোর্ডের টেক্স আদায়কারী বলে ওর বড্ড বাড় বেড়েছে। লোকের যেন হাতে মাথা কাটছে—আরে, সেদিন আমি বললাম, আমার হাত খালি, এখন টেক্সটা দিতে পারচি নে, দুদিন রয়ে সয়ে নাও দাদা। এই বলে, তোমার নামে ক্রোকী পরওয়ানা বের করবো, হেন করবো, তেন করবো—

আমি বললাম—ও সব কথা এখানে কেন? ব্যক্তিগত কোনো কথা এখানে না ওঠানোই ভাল। তুমি টেক্স দাও নি, সে যখন আদায়কারী, তখন তোমাকে বলবে না কি ছেড়ে দেবে?

শম্ভু সরকার বললে—সে তো ন্যায্য কথা।

আমি বললাম—শাসন করবো একটু ভাল করেই। কাল দারোগা আমার এখানে আসচে, দারোগাবাবুকে দিয়েই কথাটা বলাই। তাহোলে ভয় খেয়ে যাবে এখন।

সভা থেকে ফিরবার পথে মুখুয্যে পাড়ার মোড়ে কাঁটালতলায় দেখি কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বোধ হয় আমার জন্যে অপেক্ষা করচে। আমি গাছতলায় পৌছতেই মেয়েটি হঠাৎ আমায় পায়ে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

শশব্যস্তে বলে উঠলাম—কে? কি হয়েচে, ছাড়ো ছাড়ো, পায়ে হাত দেয় যে—

ততক্ষণে চিনেচি, মেয়েটি শান্তি।

শান্তি লালমোহন চক্রবর্ত্তীর মেজমেয়ে। বছর বাইশ-তেইশ বয়েস, আমার চেয়ে অন্তত বারো-তেরো বছরের ছোট, আমাকে পাড়াগাঁ হিসাবে দাদা বলে ডাকে।

কান্না-ধরা গলায় বললে—শশাঙ্কদা আমায় বাঁচাও। তুমি আমার বড় ভাই।

—কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি শুনি।

—আমার নামে নাকি কি উঠেচে কথা। আমায় নাকি পুলিশে পাঠাবে, চৌকিদার দিয়ে ধরে থানাতে নিয়ে যাবে। সবাই বলাবলি করচে। তোমার পায়ে পড়ি দাদা—আমি কোনো দোষী নই—বাঁচাও আমায়।

শান্তিকে দেখে মনে দুঃখ হোল, রাগও হোল। লালমোহন কাকার মেয়ে গাঁয়ে বসে এমন উচ্ছন্ন যাচ্চে। এ যতই এখন মায়া কান্না কাঁদুক—আসলে এ মেয়ে ভ্রষ্টা, কলঙ্কিনী। ওর কান্না মিথ্যে ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুঃখ হোল ভেবে, লালমোহন কাকা এক পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে তেরো বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে ভবের হাটবাজার তুলে দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন—দুবছর চলে না যেতে যেতেই জামাই শ্বশুরের অনুসরণ করলেন। পনেরো বছরের মেয়ে চালাঘরে মায়ের কাছে ফিরে এল সিঁথির সিঁদুর মুছে। গরীব মা, নিজের পেট চালায় সামান্য একটু জমি-জমার আয়ে। ভাইও আছে—কিন্তু সে নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আলাদা বাস করে। মাকেই খেতে দেয় না—তার বিধবা বোন!

এ অবস্থায় কেউ যদি মেয়েটিকে প্রলোভন দেখায়—বিপথে পা দিতে সে মেয়ের কতক্ষণ লাগে?

মুখে কড়া স্বরে বললুম—শান্তি, রাস্তাঘাটে সে সব কথা হয় না। আমার বাড়ীতে যেও, তোমার বউদি থাকবেন, সেখানে কথাবার্ত্তা হবে; তবে তোমাকে থানাপুলিশের ভয় যদি কেউ দেখিয়ে থাকে সে মিছে কথা। পুলিশের এতে কি করবার আছে? বাড়ী যাও, ছিঃ!

শান্তি তবুও কান্না থামায় না। আকুল মিনতির স্বরে বললো—একটু দাঁড়াও দাদা, পায়ে পড়ি, একটু দাঁড়াও!

আঃ কি মুশকিল? শান্তির সঙ্গে নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা বলতে দেখলে কেউ কিছু মনেও করতে পারে। ও মেয়ের চরিত্র কেমন জানতে আর লোকের বাকী নেই।

বললাম—বিশেষ কিছু বলবার আছে তোমার?

—শশাঙ্কদা, তুমি আমায় বাঁচাবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—হবে, হবে। কোনো ভয় নেই।

পরক্ষণেই শান্তি এক অদ্ভুত ধরনে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে—সত্যি শশাঙ্কদা? আমি—আমাকে—

আমি এতক্ষণ বুঝতে পারিনি ও কি বলতে চাইচে, এইবার ওর কথার সুরে ও মুখের ভাবে বুঝে নিয়ে অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলাম। আমি ডাক্তার, ও সাহায্য চাইচে আমার কাছে, কিন্তু এ সাহায্য আমার দ্বারা হবে ও ভাবলে কেমন করে? আশ্চর্য্য!

শান্তি মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো।

অবশেষে আমার মুখে কথা ফুটলো। আমি বললাম—তুমি এতদূর নেমে গিয়েচ শান্তি?

তুমি না লালমোহন কাকার মেয়ে? কত ভাল লোক ছিলেন কাকা, কত ধার্ম্মিক ছিলেন—এ সব কথা মনে পড়ে না তোমার?

শান্তি আবার কাঁদতে শুরু করলে।

নাঃ, এ সব ছলনাময়ী ঘ্যানঘেনে প্যানপ্যানে মেয়ের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি জাগে না। পুনরায় কড়া স্বরে বললাম—আমার দ্বারা তোমার কোনো সাহায্য হবে এ তোমার আশা করাই অন্যায়। জানো, এ সবের প্রশ্রয় আমি দিই নে?

—আমার তবে কি উপায় হবে শশাঙ্কদা?

—আমি বলতে পারি নে। আমি চললাম, তোমার সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় নেই আমার।

বাড়ি এসে সুরবালাকে সব বললাম। সুরবালা বললে—ওই পোড়ারমুখীই যত নষ্টের গোড়া। রামপ্রসাদ ঠাকুরপোর কোন দোষ নেই।

—তোমার এ কথা আমি মানলাম না।

—মেয়েমানুষের ব্যাপার তুমি কি জানো? তুমি শান্তির কান্নাতে গলে গিয়েচো, ভাবচো ও বুঝি নিরীহ, আসলে তা নয়, এই তোমাকে বললাম।

—তোমার যুক্তি আমি বুঝতে পারলাম না।

—পারবেও না। ডাক্তারিই পড়েচ, আর কিছুই জান না সংসারের।

রামপ্রসাদের উপর অত্যন্ত রাগ হোল। আমাদের গ্রামের মধ্যে এমন সব কাজ যে করতে সাহস করে, তাকে ভালভাবেই শিক্ষা দিতে হবে।

দারোগাকে একখানা চিঠি লিখে পাঠালুম। দারোগা লিখলে—একদিন আপনাদের ওখানে গিয়ে লোকটাকে এমন জব্দ করে দেব যে, সে এ মুখে আর কোনদিন পা দেবে না।

রামপ্রসাদ চাটুয্যে লোকটি মদ খায় বলে তার ওপর শ্রদ্ধা কোনদিনই ছিল না। কতদিন তাকে বলেছি—রামপ্রসাদদা, লিভারের অসুখ হয়ে মরবে। এখনো মদ ছাড়ো।

কোনদিন সে কথায় কান দেয় নি। বলতো—কোথায় মদ খাই বেশি? তুমিও যেমন ভাই! হাতে পয়সা কোথায় যে বেশি মদ খাবো?

অথচ সবাই জানে, রামপ্রসাদ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। রামপ্রসাদের বাবা হরিপ্রসাদ আবাদে কোন এক বড় জমিদারের নায়েবী করে অনেক পয়সা রোজগার করে যথেষ্ট জায়গা-জমি রেখে গিয়েছিলেন। হরিপ্রসাদের দুই বিবাহ ছিল, দ্বিতীয় পক্ষের তিনটি ছেলে এখনও নাবালক, বিমাতা বর্ত্তমান—রামপ্রসাদেরও নিজেরও দু-তিনটি মেয়ে। নাবালক বৈমাত্র ভাইগুলির ন্যায্য সম্পত্তির উপস্বত্ব একা রামপ্রসাদই ফাঁকি দিয়ে ভোগ করে। এ নিয়েও ওকে আমি একদিন বলেছিলাম। আমি গ্রামে বসে থাকতে কোন অবিচার হোতে পারবে না। রামপ্রসাদ সে কথাতেও কান দেয় নি।

দারোগা আমার বাড়িতে এল। এসে বললে—আজই আপনাদের সেই লোকটাকে ডাকান তো।

—খাওয়া দাওয়া করে ঠাণ্ডা হোন, ওবেলা সকলের সামনে ওকে ডাকবো।

—বেশ, তাহলে এবেলা আমি এখানে খাবো না, মণিরামপুরে একটা সুইসাইডের কেস আছে, তদন্ত করে আসি, ওবেলা বরং চা খাবো এসে।

দারোগা সাইকেলে চলে গেল।

বিকেলের দিকে দারোগা ফিরে এল। রামপ্রসাদের ডাক পড়লো গ্রামের পল্লীমঙ্গল সমিতির ঘরের সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র মাঠে। লোকজন অনেক জড় হোল ব্যাপার কি দাঁড়ায় দেখবার জন্যে। রামপ্রসাদ চোখে চশমা দিয়ে ফরসা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে সভায় এসে হাজির হোল। গ্রামের সব লোকই আমার পক্ষে। ডাক্তারকে কেউ চটাবে না!

দারোগা রামপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলে—আপনার বিরুদ্ধে গ্রামের লোকের কি অভি-যোগ জানেন?

রামপ্রসাদ শুষ্কমুখে বললে—আজ্ঞে—আজ্ঞে—না।

—আপনি গ্রামের একটা মেয়েকে নষ্ট করেছেন!

—আজ্ঞে, আমি!

—হ্যাঁ, আপনি।

আমার ইঙ্গিতে সনাতনদা বললে—উনি সে মেয়েটিকে নিজের বাড়িতে দিনকতক রেখে-ছিলেন। উনি বিপত্নীক। আর একটা কথা, বাড়ীতে ওঁর একটা মেয়ে প্রায় বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে, অথচ সেই মেয়েমানুষটাকে উনি বাড়ী নিয়ে গিয়ে রাখেন।

দারোগা বললে—আমি এমন কথা কখনো শুনি নি। ভদ্রলোকের গ্রামে আপনি বাস করেন, অথচ সেই গ্রামেরই একটি মেয়েকে আপনি এভাবে নষ্ট করেছেন?

সনাতন বললে—সে মেয়েও ভদ্রঘরের মেয়ে, স্যার। উনিই তাকে নষ্ট করেছেন।

—মেয়েটি কি জাতের?

—ব্রাহ্মণ বংশের স্যার। সে কথা বলতে আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে—ওঁর ঘরে সোমত্ত মেয়ে, অথচ উনি—

দারোগা রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে বললে—একি শুনছি? আপনাকে এতক্ষণ 'আপনি' বলছিলাম, কিন্তু আপনি তো তার যোগ্য নন—'তুমি' বলতে হচ্ছে এইবার। তুমি দেখছি অমানুষ। ভদ্দরলোকের গ্রামের মধ্যে যা কাণ্ড তুমি করছো, ব্রাহ্মণের ছেলে না হলে তোমাকে চাব্‌কে দিতাম! বদমাশ কোথাকার!

রামপ্রসাদের মুখ অপমানে রাঙা হয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সে হাজার হোক, গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, চশমা চোখে, ফরসা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বেড়ায়, যদিও লেখাপড়া কিছুই জানে না—এভাবে সর্বসাধারণের সমক্ষে জীবনে কখনো সে অপমানিত হয় নি। লজ্জা ও ভয়ে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। পুলিশকে এই সব পল্লীগ্রামে বিশেষ ভয় করে চলে লোকে, তার সঙ্গে যোগ-সাজস করেছে আমার মত ডাক্তার, এ অঞ্চলে যার যথেষ্ট পসার ও প্রতিপত্তি। ভয়ে ও অপমানে রামপ্রসাদ কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে দারোগার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা বাজখাঁই আওয়াজে ধমক দিয়ে বললে—উত্তর দিচ্ছ না যে বড়, বদমাশ কাঁহাকা!

রামপ্রসাদ আমতা আমতা করে কি বলতে গেল, কেউ বুঝতে পারলে না।

আমি তবুও একটা কথা দারোগাকে এখনো বলি নি। সেটা হোল শান্তির বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার কথা। শান্তি যতই দুশ্চরিত্রা হোক, সে আমার সাহায্য চেয়েছিল চিকিৎসক বলে। রোগীর গুপ্ত কথা প্রকাশের অধিকার নেই ডাক্তারের, সাহায্য আমি তাকে করি না করি সে আলাদা কথা।

বৃদ্ধ চৌধুরী মশাই আমায় বললেন—যথেষ্ট হয়েছে বাবাজী, হাজার হোক ব্রাহ্মণের ছেলে, ওকে ছেড়ে দাও এবার। কাঁদো-কাঁদো হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু রামপ্রসাদ কাঁদো কাঁদো হয় নি, ওটা বৃদ্ধের ভুল। ভয়ে ও এমন হয়ে গিয়েছে। বাপের অনেক সম্পত্তি ছিল, তার বলে সে বাবুগিরি করছে, লোকের উপর কিছু কিছু প্রভুত্বও করেছে, কিন্তু লেখাপড়া না শেখার দরুন দারোগা পুলিশকে তার বড় ভয়। পুলিশের দারোগা দিন-দুনিয়ার মালিক এই তার ধারণা। আমি এটুকু জানতাম বলেই আজ দারোগাকে এনে তাকে শাসনের এই আয়োজন। নইলে অনেক ভাল কথা বলে দেখেছি, অনেক শাসিয়েছি, তাতে কোন ফল হয় নি। আমি চৌধুরী মশাইকে বললাম—ওকে ভাল করে শিক্ষা না দিয়ে আজ ছাড়ছি নে। এ ধরনের দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারি নে গাঁয়ে।

রামপ্রসাদ হাতজোড় করে বললে—এবারের মত আমায় মাপ করুন দারোগাবাবু—

দারোগা বললে—আমি তোমার কাছে থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নেবো—যাতে এমন কাজ আর কখনো ভদ্রলোকের গ্রামে না করো। তাতে লিখে দিতে হবে—

রামপ্রসাদ আরও ঘাবড়ে গিয়ে বললে—এবারের মত আমায় মাপ করুন দারোগাবাবু।

—মুচলেকা না দিয়েই? কক্ষনো না। লেখো মুচলেকা!

পাড়াগাঁয়ের লোক রামপ্রসাদ, যতই শৌখিন হোক বা বাবু হোক, পুলিশ-টুলিশের হাঙ্গামাকে যমের মত ভয় করে। আমি জানি এ মুচলেকা দেওয়ার কোনো মূল্যই নেই আইনের দিক থেকে, কোনো বাধ্যবাধকতাই নেই এর—রামপ্রসাদ কিন্তু ভয়ে কাঁটা হয়ে গেল মুচলেকা লিখে দেওয়ার নাম শুনে।

—দাও, দাদা—লেখো আগে।

—এবার দয়া করুন দারোগাবাবু। আমি বরং এ গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, বলুন আপনি—

—কোথায় যাবে?

—পাশের গ্রামে বর্দ্ধমবেড়ে চলে যাই। আপনি যা বলেন।

—সেই মেয়েটিকে একেবারে ছেড়ে চলে যেতে হবে—

—আপনার যা হুকুম।

দারোগা আমার দিকে চেয়ে বললে—তাহলে তাই করো। বছরখানেক এ গাঁ ছেড়ে

অন্যত্র চলে যাও। মেয়েটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না আর, এই বলে দিচ্ছি।

—যে আজ্ঞে—

—ক'দিনের মধ্যে যাবে ?

—পনেরোটা দিন সময় দিন আমায়।

—তাই দিলাম। যাও, এখন চলে যাও।

দারোগাবাবু আমার বাড়ী চা খেতে এসে বললে—কেমন জব্দ করে দিয়েছি বলুন ডাক্তারবাবু? আর কখনো ও এপথে পা দেবে না। যদি ওর জ্ঞান থাকে। কি বলেন ?

—আমার তাই মনে হয়।

—কবে আমার ওখানে আসছেন বলুন—একদিন চা খাবেন আমার বাড়ী।

—হবে সামনের হপ্তায়।

—ঠিক তো? কথা রইল কিন্তু।

—নিশ্চয়ই।

দারোগা চলে গেলে সুরবালার সঙ্গে দেখা হোল বাড়ীর ভেতরে। সে বললে—হ্যাগা, আমি কি তোমার জ্বালায় গলায় দড়ি দেবো, না, মাথা কুটে মরবো ?

—কেন, কি হোল ?

—কি হোল ? কেন তুমি রামপ্রসাদবাবুকে আজ অমন করে পাঁচজনের সামনে অপমান করলে বলো তো ? তোমার ভীমরতি ধরবার বয়েস তো এখনও হয় নি ?

—কে বললে তোমাকে এসব কথা ?

সুরবালা ঝাঁঝের সঙ্গে বললে—আমার কানে কথা যায় না ভাবছো ? সব কথা যায়। নাক-ছেঁদা গিন্নি এসে আমায় সব কথা বলে গেল—বৌমা, এই রকম কাণ্ড। নাক-ছেঁদা গিন্নি অবিশ্যি খুব খুশি। তোমাকে নমস্কার কে না করবে এ গাঁয়ের মধ্যে ? কিন্তু এ কাজটা কি ভাল।

—নাক-ছেঁদা গিন্নি এ সংবাদ এর মধ্যে পেয়ে গিয়েছেন ? বাবাঃ গাঁয়ের গেজেট কি আর সাধে বলে ! তা কি বকবে শুধুই, না, খেতে টেতে দেবে আজ ?

সুরবালা আর এক দফা সদুপদেশ বর্ষণ করলে খাওয়ার সময়। গ্রামের মধ্যে কে কি করছে সে সব কথার মধ্যে আমার দরকার কি ? নিজের কাজ ডাক্তারি, তা নিয়ে আমি থাকতেই তো পারি। সব কাজের মধ্যে মোড়লি না করলে কি আমার ভাত হজম হয় না ?

আমি ধীরভাবে বললাম—তা বলে গাঁয়ে যে যা খুশি করবে ?

—করুক গে, তোমার কি ? যে পাপ করবে, ঈশ্বর তার বিচার করবেন। তোমার সর্দারি করতে যাওয়ার কি মানে ? অপরের পাপের জন্যে তোমায় তো দায়ী হতে হবে না।

—কি জানো, তুমি মেয়েমানুষের মত বলছো। আমি এখন এ গাঁয়ে পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী, পাঁচজনে মানে চেনে। এ আমি না দেখলে কে দেখবে বলো। গ্রামের নীতির জন্যে আমি দায়ী নিশ্চয়ই।

—বেশ, ভাল কথায় বুঝিয়ে বল না, কে মানা করেছে? অপমান করবার দরকার কি?

—বুঝিয়ে বলি নি? অনেক বলেছি। শুনতো যদি তবে আজ আমায় এ কাজ করতে হোত না।

সুরবালা যা-ই বলুক, সে মেয়েমানুষ, বোঝেই বা কি—আমি কিন্তু আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম সে রাত্রে। আমি থাকতে এ গ্রামে ও সব ঘটতে দেব না। একটা পুরুষমানুষ ভুলিয়ে একটা সরলা মেয়ের সর্ব্বনাশ করবে, এ আমি কখনই হোতে দিতে পারি নে।

সুরবালা এখানে আমার সঙ্গে এক মত নয়। সে বলে রামপ্রসাদের দোষ নেই। শান্তিই ওকে ভুলিয়েছে। অসম্ভব কথা, শান্তিকে আমি এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি, মাখম মাস্টারের স্কুলে যখন পড়ি, শান্তি তখন ছোট্ট শাড়ি পরে সাজি হাতে পাঠশালার বাগানে ফুল তুলতে আসতো, আঁচলে বেঁধে গুগলি কুড়িয়ে নিয়ে যেতো নাক-ছেঁদা গিন্নিদের ডোবা থেকে—সেই শান্তি কাউকে ভোলাতে পারে!

সকালে উঠে আমি দূরগ্রামে ডাকে চলে গেলাম। ফিরে আসতেই সুরবালা বললে—আজ খুব কাণ্ড হয়ে গেল—কি হাঙ্গামাই তুমি বাধিয়েছ!

—কি হোল?

—শান্তি ঠাকুরঝি সকালে এসে হাজির। কেঁদে কেটে মাথা কুটে সকালবেলা সে এক কাণ্ডই বাধালো। আমার পায়ে ধরে সে কি কান্না, বলে—শশাঙ্কদা এ কি করলেন? আমি তাঁকে বিশ্বাস করে সব কথা বললাম, অথচ তিনি—

সুরবালা সব কথা জানে না, আমি বললাম—ওর ভুল। ওর কোন গোপন কথা সেখানে প্রকাশ করিনি—

সুরবালা অবাক হয়ে বললে—কর নি?

—কক্ষনো না।

সুরবালা আশ্বস্ত হওয়ার সুরে বললে—যাক, এ কথা আমি কালই বলব শান্তিকে।

আমি রেগে বললাম—ওকে আর বাড়ী ঢুকতে দিও না—

—ছিঃ ছিঃ, মানুষের ওপর অত কড়া হতে নেই। তুমি তাকে কিছু বলতে পারো তোমার বাড়ী এলে?

—খুব পারি, যার চরিত্র নেই সে আবার মানুষ?

—আমার একটা কথা রাখবে লক্ষ্মীটি?

—কি?

—থাকগে তোমার ডাক্তারি। চল এ গাঁ থেকে আমরা দিনকতক অন্য জায়গায় চলে যাই।

—কেন বল তো?

—কেন জানি নে। তোমার মোড়লগিরি দিনকতক বন্ধ রাখো। লোকের শাপমন্যি কুড়িয়ে কি লাভ? রামপ্রসাদকে দারোগা গাঁ ছেড়ে যেতে বলেছে—এটা কি ভাল?

—ওই এক কথা পঞ্চাশ বার আমার ভাল লাগে না। যে দুশ্চরিত্র, তাকে কখনো এ গাঁয়ে আমি শান্তিতে থাকতে দেবো না।

—আমার কথা শোনো লক্ষীটি, তোমার ভাল হবে।

কিন্তু ওসব কথায় কান দিতে গেলে পুরুষ মানুষের চলে না। মনে মনে শান্তির ওপর খুব রাগ হোল। আমার বাড়ীতে আসবার কোনো অধিকার নেই তার। এবার ঢুকলে তাকে অপমান হতে হবে।

সনাতনদা বিকেলের দিকে আমার এখানে চা খেতে এসে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বলে—আরে, তুমি যা করলে—বাবাঃ—পেটে খিল ধরে যাচ্ছে হেসে—

—কি, হয়েছে কি সনাতনদা?

সনাতনদা দম নিয়ে বললে—ওঃ! রও, একটু সামলে নিই—

—কি ব্যাপার?

—হ্যাঁ, জব্দ করে দিলে বটে! বাবাঃ, কুঁদির মুখে বাঁক থাকে? কার সঙ্গে লেগেছে রামপ্রসাদ ভেবে দেখেছে কি? পুরুষ মানুষের মত পুরুষ মানুষ বটে তুমি! সমাজে চাই এমনি বাঘের মত মানুষ, নইলে সমাজ শাসন হবে কি করে?

সনাতনদার কথাগুলো আমার ভালোই লাগলো। সনাতনদাকে লোকে দোষ দেয় বটে, কিন্তু ও খাঁটি কথা বলে। বেঁটে খাটো লোক, অপ্রিয় কথাও বলতে অনেক সময় ওর বাধে না। অমন লোক আমি পছন্দ করি।

তবুও আমি বললাম—যাক, পরনিন্দে করে আর কি হবে সনাতনদা, ওতে যদি রামপ্রসাদদা ভাল হয়ে যায়, আমি তাই চাই। ওর ওপর অন্য কোন রাগ নেই আমার।

সনাতনদা গলার সুর নিচু করে বললে—ও কাল কি করেছিল জানো? তোমাদের ওই ব্যাপারের পরে কাল বড় মুখুয্যে মশায়ের কাছে গিয়েছিল। গিয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে —আমাকে পাঁচজনের সামনে এই যে অপমানটা করলে, আপনারা এর একটা বিহিত করুন। নইলে গ্রামে বাস করি কি করে?

—কি বললেন জ্যাঠামশায়?

—বললেন, শশাঙ্ক হলো গ্রামের ডাক্তার—শুধু ডাক্তার নয়, বড় ডাক্তার। বিপদে আপদে ওর দ্বারস্থ হতেই হয়। তার বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারবো না। এই কথা বলে বড় মুখুয্যে মশায় বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। সত্যিই তো, ছেলেপিলে নিয়ে সবাই ঘর করে, কে তোমাকে চটিয়ে গাঁয়ে বাস করবে বল তো?

—তা নয় সনাতনদা। এ জন্যে আমায় কেউ খোসামোদ করুক—এ আমি চাই নে। ডাক্তারি আমার ব্যবসা, কিন্তু সমাজের প্রতিও আমার একটা কর্তব্য আছে, যেটা খুব বড়। যতই তার ওপর রাগ থাকুক, বিপদে পড়ে ডাকতে এলে বরং শত্রুর বাড়ী আমি আগে

বাবো ! ওই রামপ্রসাদদার যদি আজ কোন অসুখ হয়, তুমি সকলের আগে সেখানে আমায় দেখতে পাবে।

সনাতনদা কথাটা শুনে একটু বোধ হয় অবাক হয়ে গেল, আমার মুখের দিকে খানিকটা কেমন ভাবে চেয়ে রইল। তারপর কতকটা আপন মনেই বললে—শিবচরণ কাকার ছেলে, তুমি, তিনি ছিলেন মহাপুরুষ লোক, এমন কথা তুমি বলবে না তো কে বলবে ?

সনাতনদা আমার মন রাখবার জন্যে বললে। কারণ এ গ্রামে কে না জানে, আমার বাবা তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক উড়িয়েছিলেন মদে আর মেয়েমানুষে। তবে শেষের দিকে হাতে পয়সা যখন কমে এল, তখন হঠাৎ তিনি ধর্ম্মে মন দেন এবং দানধ্যান করতে শুরু করেন। প্রতি শীতকালে গরীব লোকের মধ্যে বিশ-ত্রিশখানা কম্বল বিলি করতেন, কাপড় দিতেন—এসব ছেলেবেলায় আমার দেখা। পৈতৃক সম্পত্তির যা-কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা তিনি উড়িয়ে দেন এই দানধ্যানের বাতিকে। কেবল এই বসত বাড়ীটুকু ঘুচিয়ে দিতে পারেননি শুধু এই জন্যে যে, সেকালে লোকের ধর্ম্ম ছিল, ব্রাহ্মণের ভদ্রাসন কেউ মর্টগেজ রাখতে রাজী হয় নি !

সন্ধ্যার সময় ওপাড়া থেকে ফিরছি, পথে আবার শান্তির সঙ্গে দেখা। দেখা মানে হঠাৎ দেখা নয়, যতদূর বুঝলাম, শান্তি আমার জন্যে ওৎ পেতে এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বললাম—কি শান্তি, ব্যাপার কি ? এখানে দাঁড়িয়ে এ সময় ?

শান্তি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি শশাঙ্কদা।

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলাম। এ ভাবে নির্জ্জন পথে শান্তির মত মেয়ের সঙ্গে কথা বলা আমি পছন্দ করি নে। বললামও কথাটা। তার দরকার থাকে, আমার বাড়ীতে সে যেতে পারে। তার বৌদির সামনে কথাবার্ত্তা হবে। পথের মাঝখানে কেন ?

শান্তি বললে—শশাঙ্কদা, তোমার ওপর আমার ভক্তি আগেও ছিল। এখন আরও বেশি।

আমি এ কথা ওর মুখ থেকে আশা করি নি, করেছিলাম অনুযোগ—তাও নিতান্ত গ্রাম্য ধরনে, অর্থাৎ গালাগালি। তার বদলে এ কি কথা ! এই কথা শোনাবার জন্যে ও এখানে দাঁড়িয়ে আছে ! বিশ্বাস হোল না !

বললাম—আসল কথাটা কি শান্তি ?

—আর কিছু না, মাইরি বলচি শশাঙ্কদা—

—বেশ, তুমি বাড়ী যাও—

শান্তি একটু হেসে বললে—আমার একটা কথা রাখবে শশাঙ্কদা ? তোমার ডাক্তারখানা থেকে আমায় একটু বিষ দিতে পারো ?

আমার বড় রাগ হয়ে গেল। বললাম—ঘোর-পেঁচ কথা আমি ভালবাসি নে, যা বলবে সামনা সামনি বলো। ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলাম—কোন্ কথা থেকে এ কোন্

কথার আমদানি করলে? বিষ কি হবে? খেয়ে মরবে তো? তা অনেক রকম উপায় আছে মরবার। আমায় এর জন্যে দায়ী করতে চাও কেন জিজ্ঞেস করি? ভক্তি আছে বলে বুঝি?

শান্তি বললে—ঠিক বলেছ দাদা। আর তোমাদের বোঝা হয়ে থাকবো না। দাঁড়াও একটু পায়ের ধুলো দ্যাও দাদা—

কথা শেষ করেই শান্তি আমার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে দুহাতে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। মনে হোল, ও কাঁদচে, কারণ কথার শেষের দিকে ওর গলা কেঁপে গেল যেন।

পায়ের ধুলো নিয়ে মাথা তুলেই ও আর কোন কথাটি না বলে চলে যেতে উদ্যত হোল।

আমার তখন রাগটা কেটে গিয়ে একটু ভয় হয়েছে। মেয়ে-মানুষকে বিশ্বাস নেই, সত্যি সত্যি মরবে না কি রে বাবা!

বললাম—দাঁড়াও, একটা কথা আছে শান্তি!

শান্তি ফিরে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—কি?

—সত্যি সত্যি মরো না যেন তাই বলে।

—তা ছাড়া আমার কি আছে করবার? সমাজের পথ আজ বন্ধ হোল, সব পথ বন্ধ হোল, বেঁচে থেকে লাভ কি বলো?—

—সমাজের পথ কে বন্ধ করলে? অন্য লোকের দোষ দাও কেন, নিজের দোষ দেখতে পাও না?

—আমি কারো দোষ দিচ্ছি নে শশাঙ্কদা, সবই আমার এই পোড়া অদৃষ্টের দোষ—অদৃষ্টের দোষ—কথা শেষ করে শান্তি নিজের কপালে হাতের মুঠো দিয়ে মারতে লাগলো, আর থামে না।

ভাল বিপদে পড়ে গেলাম এ সন্ধ্যাবেলায় পথের মধ্যে। বাধ্য হয়ে ওর কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে বললাম—এই! কি হচ্ছে ও সব?

শান্তি তবুও থামে না, আমি তখন আর কি করি, ওর হাতখানা ধরে ফেলে বললাম—ছিঃ, ও রকম করতে নেই—যাও, বাড়ী যাও—কি কেলেঙ্কারী হচ্ছে এ সব?

শান্তি বললে—না দাদা, আর কেলেঙ্কারী করে তোমাদের মুখ হাসাবো না। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করছি শীগগির—বলে আবারও সেই রকম অদ্ভুত হাসলে।

—আর যাই করো, আত্মহত্যা মহাপাপ, ও কোরো না—

—কে বললে?

—আমি বলছি। শাস্ত্রে আছে।

শান্তি হেসে বললে—আচ্ছা দাদা, তোমরা শাস্তর মানো?

—মানি।

—আত্মহত্যে হলে কি হয়?

—গতি হয় না।

—বেশ তো, হ্যাঁ দাদা, আমি ম'লে তুমি গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসতে পারবে না আমার নামে? বেঁচে থাকতে না পারো পোড়ার মুখী বোনের উপকার সাহায্য করতে—মরে গেলে কোরো।

শান্তির কথা শুনে আমার বড় মমতা হোল ওর ওপর। কেমন এক ধরনের মমতা!

সুর নরম করে বললাম—ও সব কিছু করতে হবে না শান্তি—

—তা হোলে বলো তুমি উপকার করবে?

—তোমার উপকার করা মানে মহাপাপ করা। তুমি যে উপকারের কথা বলছো, তা কখনও ভাল ডাক্তারে করে না। আমি নিরুপায়।

—সত্যি দাদা, সাধে কি ভক্তি হয় আপনার ওপর? আপনার ধূলির যোগ্য কেউ নেই এ গাঁয়ে।

—আমার কথা ছেড়ে দাও শান্তি। আর একজন আছে এ গাঁয়ে—সে সত্যিই কোনো দুর্নীতি দেখতে পারে না সমাজের। সনাতনদা।

শান্তি অবিশ্বাসের সুরে বললে—তুমি এদিকে বড্ড সরল, শশাঙ্কদা, ওকে তুমি বিশ্বাস করো?

—কেন?

—সনাতনদা এসেছে কাজ বাগাতে তোমার কাছে। খোশামোদ করা ছাড়া ওর অন্ত কোনো কাজ নেই—

—যাক্‌গে, ও কথার দরকার নেই, আমার কাছে কথা দিয়ে যাও তুমি আত্মহত্যার কথা ভাববে না।

—আমার উপায় হবে কি তবে?

—সে আমি জানি নে। তার কোন ব্যবস্থা আমায় দিয়ে হবে না।

—তা হলে আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করি, তুমি যখন কিছুই করবে না—

শান্তি চলে গেল বা ওকে আমি যেতেই দিলাম। আর বেশীক্ষণ ওর সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা আমার উচিত হবে না। হয় তো কেউ দেখে ফেলবে, তখন পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে শুরু করে দেবে, শান্তির যা সুযশ এ গাঁয়ে!

বাড়ী ফিরে সুরবালাকে কথাটা এবার আর বললাম না কি ভেবে, কিন্তু সারা রাত ভাল ঘুম হোল না। সত্যি, শান্তির উপায় কি? একা মেয়েমানুষ, কি করে এ দারুণ অপযশ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে,—আর হয়তো ছমাস পরে সে বিপদের দিন ওর জীবনে এসে পড়বেই। আমার দ্বারা তখন সাহায্য হতে পারে, তার পূর্ব্বে নয়।

কিন্তু সকালবেলা যা কানে গেল তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

বেলা সাড়ে আটটা। সবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি, এমন সময় সনাতনদা আর

মুখুয্যে জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলে হারাধন হন্তদন্ত হয়ে হাজির। ওদের চেহারা দেখে আমি বুঝলাম, একটা কিছু ঘটেছে! আমি কিছু বলবার পূর্ব্বেই সনাতনদা বললে—এদিকে শুনেছ কাণ্ড?

—কি ব্যাপার?

—শান্তি আর রামপ্রসাদ দুজনে কাল ভেগেছে।

—কে বললে? কোথায় ভাগলো?

—নাক-ছেঁদা গিন্নি ভোরবেলায় পূজোর ফুল তুলতে গিয়েছিলেন বড় মুখুয্যে মশায়ের বাড়ী। তিনি শুনলেন শান্তির মা ঘরের মধ্যে কাঁদছে! শান্তি নেই, তার বাক্সের মধ্যে কাপড় ও দু-একখানা যা সোনার গহনা ছিল, তাও নেই। ওদিকে দেখা গেল রামপ্রসাদও নেই।

—আমি অবাক হয়ে বললাম—বল কি?

সনাতনদা বললে,—তোমার কাছে গাঁ সুদ্ধ সবাই আসছে শান্তির মাকে নিয়ে। এর কি করবে করো।

আমি বললাম—এর কিছু উপায় নেই সনাতনদা। শান্তি নিজের পথ নিজে করেছে। আপদ গেছে গাঁয়ের। এ নিয়ে কোনো গোলমাল হয় এ আমার ইচ্ছে নয়।

সুরবালা বললে—মেয়েমানুষকে চিনতে এখনও তোমার অনেক দেরি। শান্তি ঠাকুর-ঝিকে বড্ড ভাল মানুষ ভেবেছিলে, না?

বর্ষা নেমেছে খুব। দুজায়গায় ডাক্তারখানায় যাতায়াত, জলকাদায় সাইকেল চলে না—গরুর গাড়ী যেখানে চলে সেখানে গরুর গাড়ী, নয়তো নৌকো যেখানে চলে নৌকো। ছইয়ের বাইরে বসে দেখি বাঁকে বাঁকে পাড়-ভাঙা ডুমুর গাছ কিংবা বাঁশ ঝাড়ের নিচে বড় বড় শোল-মাছ ঘোলা জলে মুখ উঁচু করে খাবি খাওয়ার মত ভাসছে, কোথাও ভুস্ করে ডুব দিলে মস্ত বড় কচ্ছপটা।

মঙ্গলগঞ্জের কুঠীঘাটে নৌকো বাঁধা হয়। নেমে যেতে হয় সিকি মাইল দূরে মঙ্গলগঞ্জের বাজারে—এখানেই আমার একটা শাখা ডাক্তারখানা আজ দুমাস হোল খুলেছি। সপ্তাহের মধ্যে বুধবার আর শনিবার আসি। সনাতনদা কোনো কোনো দিন আসে আমার সঙ্গে, কোনো দিন একাই আসি।

ডাক্তারখানা মঙ্গলগঞ্জের ক্ষুদ্র বাজারটির ঠিক মাঝখানে। আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে। এখানকার লোকের পীড়াপীড়িতেই এখানে ক্লিনিক খুলেছি, নয়তো রোগীর ভিড় কোনদিনই কম পড়েনি আমার গ্রামে। এখানেও লেখা আছে সমাগত দরিদ্র রোগীগণকে বিনাদর্শনীতে চিকিৎসা করা হয়।

ডাক্তারখানায় পৌছবার আগেই সমবেত রোগীদের কলরব আমার কানে গেল।

কম্পাউণ্ডার রামলাল ঘোষ দূর থেকে আমায় আসতে দেখে প্রফুল্লমুখে আবার ডিসপেন্-

সারি ঘরের মধ্যে ঢুকলো। আমার মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল অত ভিড় দেখে। ভেবেছিলাম, কাজ সেরে সকাল সকাল সরে পড়ব এবং সন্ধ্যার আগে বাড়ি পৌঁছে চা খেয়ে সনাতনদার সঙ্গে বসে এক বাজি পাশা খেলবো, তা আজ হল না দেখছি।

—কত লোক?

—প্রায় পঁয়ত্রিশজন ডাক্তারবাবু।

—গরুর গাড়ী?

—দু'খানা।

—মেয়ে রোগী?

—সাত জন।

—খাতা নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি করো—

রামলাল ঘোষ হেসে বললে—বাবু, তা হবে না। দুটো অপারেশনের রোগী।

অপ্রসন্ন মুখে বললাম—কি অপারেশন? কি হয়েছে?

—একজনের ফোড়া, একজনের হুইটলো।

—দূর ওসব আবার অপারেশন? নরুন দিয়ে চেরা—তুমি আমায় ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে। ডাক দাও সব জলদি জলদি—মেঘ আবার জমে আসছে। একটু চা খাওয়াবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় স্টোভটা তো জ্বালতেই হবে, জল গরমের জন্যে। আগে চা করে দিই।

এই সময় বাজারের বড় ব্যবসাদার জগন্নাথ কুণ্ডু এসে নমস্কার করে বললে—ডাক্তারবাবু, ভাল তো?

—নিশ্চয়ই, নয়তো এই দুর্যোগে কাজে আসি?

—একটা কথা। কিছু চাঁদা দিতে হবে। সামনের ঝুলনের দিন এখানে ঢপ দেবো ভাবছি।

—তা বেশ। কোথাকার ঢপ?

—এখনো কিছু ঠিক করি নি। কেষ্টনগরের রাধারাণী, রানাঘাটের গোলাপী কিংবা নদে শান্তিপুরের—

—আচ্ছা, আচ্ছা, যা হয় করবেন, আমার যা ক্ষমতা হয় দেবো নিশ্চয়ই। এখন কাজের ভিড়ের সময় বসে বসে বাজে গল্প করবার অবসর নেই আমার।

জগন্নাথ কুণ্ডু যাবার সময় বলে গেল—ওদিকে গিয়ে একবার কাজকর্ম দেখবেন টেকবেন, আপনারা দাঁড়িয়ে হুকুম দিলে আমরা কত উৎসাহ পাই।

অপারেশন করে নৌকোতে ওঠবার যোগাড় করছি, এমন সময় এক নূতন রোগী এল। তার কোমরে বেদনা, আরও সব কি কি উপসর্গ। মুখ খিঁচিয়ে বলি—আজ আর হবে না, একটু আগে আসতে কি হয়?

—বাবু, বাড়িতে কেউ নেই। মোর ছোট ছেলেডা হাতে ধরে নিয়ে এল, তবে এ্যালাম। একটু দয়া করুন—

আবার আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল, যা ভেবেছিলুম সেই সন্ধ্যেই নামলো। এ সময়ে অন্তত জন্তিপুরের ঘাট পেরুনো উচিত ছিল। নৌকোয় উঠে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। রুগীদের বিরক্তিকর এক ঘেয়ে বোকা বোকা কথা, স্টোভের ধোঁয়ার সঙ্গে মেশানো আইডোফরমের গন্ধ, ফিল্‌টার থেকে জল পড়বার শব্দ, সামান্য কুইনিন ইনজেকস্যন করবার সময় চাষীদের ছেলেমেয়েদের বিকট চিৎকার যেন তাদের খুন করা হচ্ছে গলা টিপে—এ সব মানুষের কতক্ষণ ভাল লাগে?

মাঝিকে বললাম—বাপু অভিলাষ, একটু বেশ নদীর মাঝখান দিয়ে চল, হাওয়া গায়ে লাগুক।

—বাবু, কুঁদিপুরের বাঁওড়ের মুখে গল্‌দাচিংড়ি মাছ নেবেন বললেন যে?

—সে তো অনেক দূর এখনো। একটু তো চলো।

সারাদিনের পর যখন কাজটি শেষ করি তখন সত্যিই বড় আরাম পাই। মঙ্গলগঞ্জ থেকে ফেরবার পথে এ নৌকাভ্রমণ আমি বড় উপভোগ করি। সনাতনদা সঙ্গে থাকলে আরও ভালো লাগে। একা থাকলে বসে বসে দেখি, উঁচু পাড়ের গায়ে গাঙ শালিকের গর্ত্ত, খড়ের বনের পাশে রাঙা টুকটুকে মাকাল ফল লতা থেকে ঝুলছে, লোকে পটলের ক্ষেত নিড়ুচ্চে।

ভেবে দেখি, ভগবান আমায় কোন কিছুর অভাব দেন নি। বাবা যা জায়গা জমি রেখে গিয়েছেন, আর আমি যা করেছি তার আয় ভালই, অন্তত ষাট-সত্তর ঘর প্রজা আছে আশে-পাশের গাঁয়ে। আম কাঁঠালের বড় বড় দুটো বাগান, তিনটে ছোট বড় পুকুর, পঁয়ত্রিশ বিঘে ধানের জমিতে যা ধান হয় তাতে বছরের চাল কিনতে হয় না। সুরবালার মত স্ত্রী। পাড়াগাঁয়ে অত বড় বাড়ী হঠাৎ দেখা যায় না—অন্তত আমাদের এ অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে বেশি নেই। নিজে ভাল ডাক্তার, মেডিকেল কলেজের ভাল ছেলেই ছিলাম। কেষ্টনগরে কিংবা রানাঘাটে ডাক্তারখানা খুলতাম কিন্তু বাবা নিষেধ করেছিলেন। তখন তিনি বেঁচে, আমি সবে পাশ করেছি মাস দুই হোল। খুলনা জেলার জয়দিয়া গ্রামে আমার এক মাসিমা ছিলেন, তিনি আমাকে ছেলের মত স্নেহ করতেন, পরীক্ষা দিয়ে তাঁদের ওখানে মাস-দুই গিয়ে ছিলাম। সেখানেই খবর গেল পাশের। বাড়ি ফিরতেই বাবা জিগ্যেস করলেন—কোথায় বসবে, ভাবলে কিছু?

—তুমি কি বলো?

—আমি যা বলি পরে বলব, তোমার ইচ্ছেটা শুনি।

—আমি তো ভাবছি রানাঘাট কিংবা কেষ্টনগরে—

—অমন কাজও করো না।

—তবে কোথায় বলো?

—এই গ্রামে বসবে। সেই জন্যে তোমাকে চাকরি করতে দিলাম না, তুমি শহরে গিয়ে

বসলে গাঁয়ের দিকে আর দেখবে না, এ বাড়ী ঘর কত যত্নে করা—সব নষ্ট হবে। অশথ গাছ গজাবে ছাদের কার্নিসে, আম-কাঁটালের বাগান বারোভূতে খাবে। পৈতৃক ভিটেয় পিদিম দেবার লোক থাকবে না। গাঁয়ের লোকও ভাল ডাক্তার চেয়েও পাবে না। এদের উপকার করো।

বাবার ইচ্ছার কোনো প্রতিবাদ করি নি। আমার অর্থের কোনো লালসা ছিল না। স্বচ্ছল গৃহস্থ ঘরের ছেলে, খাওয়া পরার কষ্ট কখনো পাই নি। গ্রামে থেকে গ্রামের লোকের উন্নতি করবো—এ ইচ্ছাটা আমার চিরকাল আছে—ছাত্রজীবন থেকেই।

গ্রামের লোকের ভাল করবো এই দাঁড়ালো বাতিক। এর জন্যে যে কত খেটেছি, কত মিটিং করে লোককে বুঝিয়েছি! পল্লীমঙ্গল সমিতি স্থাপন করেছি, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছি, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছি।

ঠিক সেই সময় একটি ঘটনা ঘটলো।

হরিদাস ঘোষের স্ত্রীর নামে নানা রকম অপবাদ শোনা গেল। বাইশ-তেইশ বছরের যুবতী, স্বামী কলকাতায় ঘিয়ের দোকান করে, মাসে দু-একবার বাড়ী আসে কি-না সন্দেহ। পাশের বাড়ীর নিবারণ ঘোষের ভাইপোকে নাকি লোকে দেখেচে অনেক রাত্রে হরিদাসের ঘর থেকে বেরুতে। আমার কাছে রিপোর্ট এল। দুর্নীতির ওপর আমি চিরদিন হাড়ে চটা, মেয়েটিকে কিছু না বলে নিবারণ ঘোষের ভাইপোকে এক দিন উত্তম মধ্যম দেওয়া গেল। হরিদাস ঘোষকেও পত্র লেখা গেল। তারপর কিসে থেকে কি ঘটলো জানি নে, একদিন হরিদাসের স্ত্রীকে রান্নাঘরে ঘরের আড়া থেকে দোদুল্যমান অবস্থায় দেখা গেল। গোয়ালের গরুর দড়ি দিয়ে একাজ নিষ্পন্ন হয়েচে। তাই নিয়ে হৈ চৈ হোল, আমি মাঝে থেকে পুলিশের হাঙ্গামা মিটিয়ে দিলাম।

লোকের ভালো করতে গিয়ে অপবাদ কুড়ুতেও আমি পেছপাও নই। দুর্নীতিকে কোনো রকমে প্রশ্রয় দেবো না এ হোল আমার প্রতিজ্ঞা। এতে যা হয় হবে। বড় মুখুয্যেমশায় গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও প্রবীণ লোক। কোন মামলা মোকদ্দমা বাধলে মামলা মিটিয়ে দেবার জন্যে উভয় পক্ষ তাঁকে গিয়ে ধরতো। দু পক্ষ থেকে প্রচুর ঘুষ খেয়ে একটা যা হয় খাড়া করতেন। আমি ব্যবস্থা করলাম, পল্লীমঙ্গল সমিতির পক্ষ থেকে গ্রামের ঝগড়া-বিবাদের সুমীমাংসা ক'রে দেওয়া হবে, এজন্যে কাউকে কিছু দিতে হবে না। দু-একটা বিবাদ এভাবে মিটিয়েও দেওয়া গেল। মুখুয্যে জ্যাঠামশায় আমার ওপর বেজায় বিরক্ত হয়ে উঠচেন শুনতে পেলাম। একদিন আমায় ডেকে বললেন—শশাঙ্ক, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—আজ্ঞে বলুন জ্যাঠামশায়?

—তুমি এসব কি করচো গাঁয়ে?

—কি করচি বলচেন?

—চিরকাল মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে সব ব্যাপারের মুড়ো মরেচে। তোমায় কাল দেখলাম ন্যাংটো হয়ে বেলতলায় খেলে বেড়াতে, তুমি এ সবের কি বোঝো যে মামলার মীমাংসা

করো? আর যদিই বা করলে তো নমস্কারী বলে কিছু আদায় করো। একদিন লুচি পাঁটা দিক ব্যাটারা। শুধু হাতে ও কাজে গেলে মান থাকে না বাপু। ওটা গ্রামের মোড়ল-মাতব্বরের হক পাওনা। দুটাকা জরিমানা করলে, একটাকা বারোয়ারি ফণ্ডে দিলে, একটাকা নিলে নিজের নজর। এই তো হোল বনেদি চাল। তবে লোকে ভয় করবে, নইলে যত ব্যাটা ছোটলোক মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে যে!

—আপনাদের কাল চলে গিয়েচে জ্যাঠামশায়। এখন আর ওসব করতে গেলে—

মুখুয্যে জ্যাঠামশায়ের গলার শির ফুলে উঠলো উত্তেজনায়। চোখ বড় বড় হোল রাগে। হাত নেড়ে বললেন—কে বলেচে, চলে গিয়েচে? কাল এতটুকু চলে যায় নি। তোমরা যেতে দিচ্চ। কলেজে-পড়া চোখে-চশমা ছোকরা তোমরা, সমাজ কি করে শাসনে রাখতে হয় কি বুঝবে? সমাজ শাসন করবে, প্রজা শাসন করবে জুতিয়ে। তুমি থেকো না এর মধ্যে, শুধু বসে বসে ভাখো, আমার চণ্ডীমণ্ডপে বসে জুতিয়ে শাসন করতে পারি কি না।

আমি হেসে বললাম—সে জানি, আপনি তা পারেন জ্যাঠামশায়। কিন্তু আজকাল আর ওসব চলবে না।

মুখুয্যে জ্যাঠা ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললেন—আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে বসে শুধু ভাখো বাবাজি—

কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হোল যুগ সত্যিই বদলে যাচ্চে। নইলে কেউ কি কখনো শুনেচে তাঁর বড় ছেলের চেয়েও বয়সে ছোট কোন এক অর্ব্বাচীন যুবক গ্রামের ও সমাজের মাতব্বর হয়ে দাঁড়াবে তিনি দুচোখ বুজবার আগেই।

শুধু বললেন—এই আমতলার রাস্তা দিয়ে কেউ টেরি কেটে যেতে পারতো না। যাবার হুকুম ছিল না। একবার কি হোল জানো, গিরে বোষ্টমের ভাই নিতাই বোষ্টম গোবরাপুরের মেলা থেকে ফিরচে, দুপুর বেলা, বেশ গুন্ গুন্ করে গান করতে করতে চলেচে, মাথায় টেরি। আমি বসে কাছারির নিকিশি কাজ তৈরি করচি। বললাম—কে? তো বললে—আজ্ঞে, আমি নিতাই। যেমন সামনে আসা অমনি চটি না খুলে পটাপট্ দু ঘা পিঠে বসিয়ে দিয়ে বললাম—ব্যাটার হাতে পয়সার গোমর হয়েছে বুঝি? কাল নাপিত ডাকিয়ে চুল কদম ছাঁট ছেঁটে এখানে দেখিয়ে যাবি। তখন তা করে। রাশ রাখতে হোলে অমনি করতে হয়, বুঝলে?

আমি মুখুয্যে জ্যাঠার কথার কোনো প্রতিবাদ করি নি। তিনি কিছু বুঝবেন না।

সেদিন চলে এলুম, কিন্তু বড় মুখুয্যেমশায় মনে মনে হয়ে রইলেন আমার শত্রু। বড় ছেলে হারানকে বলে দিলেন, আমার বাড়ীতে যেন বেশি যাতায়াত না করে, আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা না কয়। এমন কি নাতির অন্নপ্রাশনের সময় আমাকে নিমন্ত্রণ করবার আগে একটি কথাও জানালেন না। পাড়াগাঁয় সেটা নিয়ম নয়। কোনো বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্মের সময় পাড়ার বিশিষ্ট লোকদের ডেকে কি করা উচিত বা অনুচিত সে সম্বন্ধে পরামর্শ করতে হয়, তাদের দিয়ে ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা করাতে হয়। সে সব কিছুই না। শুকনো নেমন্তন্ন

করে গেল তাঁর মেজ জামাই। তাও অন্নপ্রাশনের দিন সকালে। একটা কথাও তার আগে আমায় কেউ বললে না।

সনাতনদা বললে—এর শোধ নিতে হবে ভায়া। আমরা সবাই তোমার দলে। তুমি যদি বলো, এপাড়ার একটি প্রাণীও মুখুয্যে বাড়ী পাত পাড়বে না!

—আমি তা বলচি নে। সবাই খাবে মুখুয্যে-জ্যাঠার বাড়ী।

সনাতনদা অবাক হয়ে বললে—এই অপমানের পরেও তুমি যাবে? না, না, তা আমরা হোতে দেবো না। আমার উপর ভার দ্যাও, দ্যাখো কোথাকার জল কোথায় মারি। কে না জানে ওঁর বংশে গোয়ালা অপবাদ আছে? ওঁর মেজ খুড়ী বিধবা হোয়ে ওই নিবারণ ঘোষের কাকা অধর ঘোষের সঙ্গে ধরা পড়েন নি?

—আঃ, কি বলচ সনাতনদা? ওসব মুখে উচ্চারণ কোরো না। আর কেউ যদি না-ও যায়, আমি খেতে যাবো।

—বেশ, তোমার ইচ্ছে। গাঁয়ের লোক কিন্তু তোমার অপমানে ক্ষেপে উঠেছে।

—তাদের অসীম ধন্যবাদ। বাড়ী গিয়ে ডাবের জল খেয়ে ঠাণ্ডা হোতে বলো।

নিমন্ত্রণের আসরে ভিন্নগ্রামের বহুলোকের সমাগম। দু-তিনটি চাকর অভ্যাগতদের পদধৌত করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করচে। মস্তবড় জোড়া শতরঞ্চি পড়েচে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায়। উঠোনজোড়া নীল শামিয়ানা টাঙানো। একপাশে দুটি নতুন জলভরতি জালা, জালার মুখে পেতলের ঘটি, জালার পাশে একরাশ মাটির গেলাস।

আমায় ঢুকতে দেখে মুখুয্যে জ্যাঠামশায় কেমন একটু অবাক হয়ে গেলেন। তখুনি সামলে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—আরে শশাঙ্ক যে! এসো এসো।

—একটু দেরি হয়ে গেল জ্যাঠাবাবু। রুগীপত্তর দেখে আসতে—

—ঠিক ঠিক, তোমার পশার আজকাল—

—আচ্ছা, আমি একবার রান্নাবান্নার দিকে দেখে আসি কি রকম হোল।

—যাও যাও, তোমাদেরই তো কাজ বাবা।

সেই থেকে বিষম খাটুনি শুরু করলাম। মাছের টুকরো কতবড় করে কাটা উচিত, চাটনিতে গুড় পড়বে—না চিনি, বাইরের অভ্যাগতদের নিজের হাতে জলযোগ করানো, খাওয়ার জায়গা করা, বালতি হাতে মাছের কালিয়া ও পায়েস পরিবেশন, আবার এরই মধ্যে ভোজসভায় এক গেঁয়ো ঝগড়া মেটানো। পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণভোজন বড় সাবধানের ব্যাপার, পান থেকে চুন খসলে এখানে অঘটন ঘটে। একজন নিমন্ত্রিতের পাতে নাকি মাছ পড়ে নি—দুবার চেয়েচেন তিনি, তবুও কেমন ভুল হয়ে গিয়েচে। এত তাচ্ছিল্য সহ্য হয়? সে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়ান আর কি! শামিয়ানার তলায় যত ব্রাহ্মণ খেতে বসেছিল সবাই হাত গুটিয়ে বসলে, কেউ খাবে না। ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হবার উপক্রম হোল! ভোজ্য-বস্তুর বালতি হাতে পরিবেশকেরা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে।

আমি ছিলাম ভাঁড়ার ঘরে, একটা হৈ চৈ শুনে ছুটে বাইরে গেলাম। মুখুয্যে জ্যাঠার ছেলে হারান হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে, হাতে মাছের বালতি, আমায় দেখে বললে—একটু এগিয়ে যান দাদা—আপনি দেখুন একটু—

রণাঙ্গনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। এর সামনে হাতজোড় করি, ওর সামনে মুখ কাঁচুমাচু করে মাপ চাই! মাছ? কে দেয়নি মাছ? অর্ব্বাচীন যত কোথাকার। এই, এদিকে—নিয়ে এসো মাছের বালতি। যত সব হয়েচে—মানুষ চেনো না? রায়মশায়ের পাতে ঢালো মাছ। উনি যত পারেন, দেখছো না খাইয়ে লোক? খান, খান, আজকাল সব কেউ কি খেতে পারে? আপনাদের দেখলেও আনন্দ হয়। নিয়ে এসো, মুড়ো একটা বেছে এই পাতে। সন্দেশের বেলা এই পাত ভুলো না যেন। দয়া করে খান সব। আপনারা প্রবীণ, সমাজের মাথার মণি, ছেলে-ছোকরাদের কথায় রাগ করে? ছিঃ, আপনারা হুকুম করবেন, আমরা তামিল করবো। খান।

ত্ব-একজন ভিন্ন গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ বললেন—এই তো! এতক্ষণ আপনি এলেই পারতেন ডাক্তারবাবু। কেমন মিষ্টি কথাবার্ত্তা ত্যাখো তো! পেটে বিদ্যে থাকলে তার ধরনই হয় আলাদা।

হেঁকে বললাম—এদিকে মাছ নিয়ে এসো বেছে বেছে। মুড়ো দাও একটা এখানে—

যে বেশি ঝগড়াটে, তার পাতে মাছের মুড়ো দিয়ে ঠাণ্ডা করি। সামাজিক ভোজে মাছের মুড়ো দেওয়া হয় সমাজের বিশিষ্ট লোকদের পাতে। চাঁপাবেড়ের ঈশান চক্কত্তির পাতে কস্মিন্‌কালে ভোজের আসরে মাছের মুড়ো পড়ে নি—কারণ সে ঝগড়াটে ও মামলাবাজ হোলেও গরীব। সে আজ বাধিয়ে তুলেছিল এক কাণ্ড, ওর পাতে মাছের মুড়ো দেওয়ার ত্বর্লভ সম্মানে লোকটার রাগ একেবারে জল হয়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে বললে—সন্দেশের সময় তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকো বাবাজি—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এই আমি দাঁড়ালাম, কোথাও যাচ্চি নে।

ভোজনপর্ব্ব সমাধানান্তে যে যার বাড়ী চলে গেল, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি ভাঁড়ার ঘর থেকে ডালঝোলদধিসন্দেশ মাখা হাতে ও কাপড়ে বেরিয়ে নিজের বাড়ী যেতে উদ্যত হয়েছি, মুখুয্যে জ্যাঠা পেছন থেকে ডেকে বললেন—কে যায়?

—আজ্ঞে, আমি শশাঙ্ক।

—খেয়েচ?

—আজ্ঞে না।

—কোথায় যাচ্চ তবে? সোনা ফেলে আঁচলে গেরো?

—সমস্ত দিনের ইয়ে—বাড়ী গিয়ে গা ধুয়ে—

—সে হবে না। গা এখানেই ধোও পুকুরঘাটে। সাবান কাপড় সব দিচ্চে।

—আজ্ঞে তা হোক জ্যাঠামশায়। আমি বরং—

মুখুয্যে জ্যাঠামশায় এসে আমার হাত ধরলেন।

—তা হবে না বাবাজি, তুমি যাচ্ছ খাবে না বলে, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি আজ আমার জাত রক্ষে করেছ—তুমি না থাকলে আজ ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হয়েছিলো। খুব বাঁচিয়ে দিয়েচ বাবাজি। আমি তোমাকে আজ যে কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো, বেঁচে থেকো—দীর্ঘজীবী হও। চললে যে ?

—আমি যাই—

—কেন ?

—আপনি তো আমায় নেমন্তন্ন করেন নি জ্যাঠাবাবু ?

আমার গলার মধ্যে একটু অভিমানের সুর এসে গেল কি ভাবে নিজের অলক্ষিতে।

মুখুয্যে জ্যাঠামশায় কাতরভাবে আমার হাত দুটো ধরে বললেন—আমার মতিচ্ছন্ন। রত্ন চিনতে পারি নি। তুমি আমার কানটা মলে দাও—দাও বাবাজি—

আমি জিভ কেটে হাত জোড় করে বিনীতভাবে বলি—ওকি কথা জ্যাঠামশায় ? আমি আপনার ছেলের বয়সী, আমাকে ওকি কথা !

—বেশ, চল আমার সঙ্গে। পুকুরে নাইবে, সাবান দিচ্চি। তোমাকে না খাইয়ে আমি জলস্পর্শ করবো না। চলো—

সনাতনদা সেই রাত্রেই আমার বৈঠকখানায় এল। বললে—খুব ভায়া, খুব ! দেখালে বটে একখানা !

—কি রকম ?

—আজ তো উল্‌টে গিয়েছিল সব ! তুমি এসে না সামলালে—খুব বাঁচান বাঁচিয়েচ।

আমার কেমন সন্দেহ হোল, আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম—তোমার কাজ, সনাতনদা ?

—কে বললে ?

—তুমি ওদের উসকে দিয়েচ ? ঈশান চক্কত্তিকে তুমি খাড়া করেছিলে ?

—হ্যাঁ আমি না হতো—

—ঠিক তুমি। আমি নাড়ী টিপে খাই তা তুমি জানো ? বলো, হ্যাঁ কি না ?

সনাতনদা মুখ টিপে হাসতে লাগলো। বললে—তা তোমার অপমান তুমি তো গায়ে মাখলে না—আমাদের একটা কিছু বিহিত করতে হয় ? তবে হ্যাঁ—দেখালে বটে। তুমি অন্য ডালের আম, আমাদের মত নও। যারা যারা জানে, সবাই দেখে অবাক হয়ে গেছে। আবার কেউ কেউ বোকাও বলছে।

আমি তিরস্কারের কড়াসুরে বললাম—এমন করে আমার উপকার করবে না সনাতনদা, অনিষ্টই করবে ; আমি তোমাদের দলাদলির মাথায় ঝাড়ু মারি। আমি ওসবের উচ্ছেদ করবো বলেই চেষ্টা করচি। এতে যে আমার দলে থাকবে থাকো, নয়তো দূর হয়ে চলে যাও—গ্রাহ্যও করি নে। কুচুক্কুরেপনা যদি না ছাড়তে পারো—আমার সঙ্গে আর মিশো না।

সনাতনদা খুব দমে গেল, কিন্তু সেটা চাপবার চেষ্টায় সহাস্য স্বরে বললে—হয়েচে, নাও নাও। লেকচার রাখো, একটু চা করতে বলে দাও দিকি বৌমাকে।

মঙ্গলগঞ্জ ডিস্‌পেনসারির কাজ সেরে বার হয়েচি সেদিন, সকাল সকাল বাড়ী ফিরবো, নৌকো বাঁধা রয়েচে বাজারের ঘাটে, এমন সময় ভূষণ দাঁ এসে বললে—আজ যাবেন না ডাক্তারবাবু, আজ যে ঝুলনের বারোয়ারি—

—কখন?

—একটু অপেক্ষা করতে হবে, সন্দের পর আলো জ্বেলেই আসর লাগিয়ে দেবো।

—যাত্রা?

—না ডাক্তারবাবু, আজ খেমটা। ভালো দল এসেচে একটি। কেষ্টনগরের। অনেক কষ্টে সুপারিশ ধরে তবে বায়না বাঁধা।

আমার তত থাকবার ইচ্ছা নেই। খেমটা নাচ দেখবার আমি পক্ষপাতী নই, তবুও ভাবলাম এ সব অজ পাড়াগাঁয়ে আমোদ-প্রমোদের তেমন কিছু ব্যবস্থা নেই, আজ বরং একটু থেকে দেখেই যাই। অনেকদিন কোন কিছু দেখি নি। একঘেয়ে ভাবে ডাক্তারিই করে চলচি।

এ সব জায়গায় খেমটা নাচওয়ালীদের বিশেষ খাতির, সেটা আমি জানি। বাজার সুদ্ধ মাতব্বর লোকেরা স্টেশনে যায় খেমটার দলের অভ্যর্থনা করতে। ওদের বিশ্বাস, খেমটা-ওয়ালীরা সবাই সুশিক্ষিতা ভদ্র ও শহুরে মেয়ে, তারা এ পাড়াগাঁয়ে এসে কোনরকম দোষ না ধরে, আদর যত্ন ও ভদ্রতার কোন খুঁৎ না বের করে ফেলে। ভূষণ দাঁ সব সময় হাত জোড় করে ওদের সামনে ঘুরচে, কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না! শ্রীশ দাঁর আড়তে খেমটার দলের জায়গা দেওয়া হয়েচে—এ গ্রামের মধ্যে ঐটিই সব চেয়ে বড় আর ভাল বাড়ী।

সনাতনদা এলে আজ বেশ হোত। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে, গল্প-গুজব করবার লোক থাকলে আনন্দে কাটে। বর্ষাকাল হলেও আজ দুদিন বৃষ্টি নেই। মঙ্গলগঞ্জের ঘাটের উপরেই একটা কদম গাছে থোকা থোকা কদম ফুল ফুটেচে। সজল মিঠে বাতাস, এখানে বৃষ্টি না হলেও অন্য কোথাও বৃষ্টি হয়েচে।

নেপাল প্রামাণিকের তামাকের দোকান বাজারের ঘাটের কাছেই। আমাকে একা বসে থাকতে দেখে সে এল। বললাম—নেপাল, একটু চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারো?

নেপাল তটস্থ হয়ে পড়লো।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখুনি ক'রে নিয়ে আসছি দোকান থেকে।

আমি বললাম—খেমটা আরম্ভ হতে কত দেরি?

—সন্দের পর হবে ডাক্তারবাবু। কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করবো?

—না, না, শুধু চা করো। আমার এখানেই হবে, স্টোভ আছে, সব আছে, কেবল দুধ নেই।

—দুধ আমি বাড়ী থেকে আনছি। খাওয়ার ব্যবস্থা না করলে কষ্ট হবে আপনার। কখন খেমটা শেষ হবে, তখন বাড়ী যাবেন—সে অনেক দেরি হয়ে যাবে। খাবেন কখন? সে হয় না।

এখানকার বাজারের মধ্যে ভূষণ দাঁ ও নেপাল প্রামাণিক—এরা সব মাতব্বর লোক। ওরাই চাঁদা ওঠায়, বারোয়ারির আয়োজন করে বছর বছর। পাঁচজনে শোনেও ওদের কথা। আমি যখন এখানে ডাক্তারখানা খুলেচি, সকলকেই সন্তুষ্ট রাখতে হবে আমার। সুতরাং বললাম—তবে তুমি কি করতে চাও?

—খানকতক পরোটা ভাজিয়ে আনি আর একটু আলুর তরকারি।

—তার চেয়ে ডাক্তারখানায় স্টোভে দুটি ভাত চড়িয়ে দিক আমার কম্পাউণ্ডার।

—সে অনেক হাঙ্গামা। কোথায় হাঁড়ি, কোথায় বেড়ি, কোথায় চাল, কোথায় ডাল!

একটু পরে নেপাল চা করে নিয়ে এল, তার সঙ্গে চাল-ছোলা ভাজা। আমি বললাম—তুমিও বসো, এক সঙ্গে খাই।

নেপাল বসে বসে নানারকম গল্প করতে লাগলো। ওর জীবনটা বেশ। শোনাবার মত জিনিস সে গল্প। এ সব বাদলার বিকেলে চালছোলা-ভাজার সঙ্গে মজে ভাল।

বললাম—নেপাল, দুটি বিয়ে করলে কেন এক সঙ্গে?

—একসঙ্গে তো করি নি, এক বছর পর পর।

—কেন?

—প্রথম পক্ষের বৌ আমাকে না বলে বাপের বাড়ী পালিয়ে গেল, সেই রাগে তাকে ত্যাগ করবো বলে যে-ই দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছি, অমনি প্রথম পক্ষের বৌও সুড় সুড় করে এসে ঢুকলো সংসারে। আর নড়তে চাইলে না, সেই থেকেই আছে। দুজনেরই ছেলেমেয়ে হচ্চে। এখন মনে হয়, কি ঝকমারিই করেছি, তখন অল্প বয়স, সে বুদ্ধি কি ছিল ডাক্তারবাবু? এখন পাঁচ পাঁচটা মেয়ে, কি করে বিয়ে দেবো সেই ভাবনাতেই শুকিয়ে যাচ্ছি —আর একটু চা করি?

—বেশ।

দুজনেই সমান চা-খোর। রাত আটটা বাজবার আগে আমাদের দু-তিন বার চা হয়ে গেল। নেপাল বসে বসে অনেক সুখ দুঃখের কাহিনী বলে যেতে লাগলো। কোন্ পক্ষের বৌ ওকে ভালবাসে, কোন বৌ তেমন ভালবাসে না—এই সব গল্প।

—প্রথম পক্ষের বৌটা সত্যিই ভালো। সত্যিই ভালোবাসে। দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিলাম বটে কিন্তু ও আমার ওপর রাগ করে নি।

—ছোটবউ কেমন?

—ওই অমনি একরকম। সুবিধে না।

—কেন?

—তেমন আঁটা নেই কারো ওপর। আমার ওপরও না। থাকতে হয় তাই থাকে,

সংসার করতে হয় তাই করে।

—দেখতে কে ভালো?

—বড়বৌ।

এমন সময় ভূষণ দাঁ নিজে এসে জানালে আসর তৈরী হয়েচে, আমি যেন এখুনি যাই।

নেপাল প্রামাণিক বললে—ডাক্তারবাবু, আপনার খাবার কি ব্যবস্থা হবে?

—খেমটা দেখে চলে যাবো বাড়ীতে। গিয়ে খাবো।

—খেমটা ভাঙ্গতে রাত একটা। আপনার বাড়ী পৌছতে রাত সাড়ে তিনটে। ততক্ষণ না খেয়ে থাকবেন? তার চেয়ে একটা কথা বলি।

—কি?

—বলতে সাহস হয় না। চলুন, আমার বাড়ী। বড় বউকে বলেই এসেচি, আমি খেতে যাবার সময় সে আপনার জন্যে পরোটা ভেজে দেবে। আর যদি না যান, আমি কলাপাতে মুড়ে পরোটা ক'খানা এখানেই নিয়ে আসবো এখন।

—ওসব দরকার নেই, আর একবার চা খেলেই আমার ঠিক হয়ে যাবে।

—চাও করবো এখন আপনার স্টোভে। তার আর ভাবনা কি? চা যতবার খেতে চান, তাতে দুঃখ নেই! আপনি বসবেন, না, আসরে যাবেন?

আসরে গিয়ে বসলাম। নিতাই শীলের কাপড়ের দোকান ও হরি ময়রার সন্দেশ মুড়কির দোকানের পিছনে যে ফাঁকা জায়গা, ওখানটায় পাল খাটানো হয়েচে। তার তলায় বড় আসর। আসরের চারিদিকে বাঁশের রেলিং। চাষাভূষো লোকের জন্যে আসরের বাইরে দরমা পাতা, ভেতরে বড় শতরঞ্চি ও মাদুর বিছানো। চার-পাঁচটা বড় বড় ঝাড় ও বেল ঝুলচে, দুটো হ্যাজাক লণ্ঠন। মোটের উপর বেশ আলো ফুটেচে আসরে। আমি যখন গেলুম, তখন খেমটা নাচ আরম্ভ হয়েচে।

একপাশে খানকতক চেয়ার বেঞ্চি পাতা, স্থানীয় বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্যে। আমাকে সবাই হাত ধরে খাতির করে চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসালে।

পাশে বসে আছে মঙ্গলগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট রামহরি সরকার—পাশের গ্রামে বাড়ী, জমিজমাযুক্ত পাড়াগাঁয়ে সম্পন্ন গৃহস্থ। পেটে 'ক' অক্ষর নেই, ধূর্ত্ত ও মামলাবাজ। তার সঙ্গে বসেচে গোবিন্দ দাঁ, ভূষণ দাঁর জ্যেঠতুতো ভাই—কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীটে রংয়ের দোকান আছে, পয়সাওয়ালা, মূর্খ ও কিছু অহঙ্কারী। সে নিজেকে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদারদের একজন বলে গণ্য করে, এখানে পাড়াগাঁয়ে এসে এই সব ছোট গানের আসরে ছোটখাটো ব্যবসাদারদের সঙ্গে দেমাকে নাক উঁচু করে বসেছে। আমায় সে চেনে, একবার ওর ছোট নাতির ঘুংড়ি-কাসির চিকিৎসা করেছিলাম এই মঙ্গলগঞ্জে আর-বারে। ওর ওপাশে বসেচে কুঁদিপুর গ্রামের আবদুল হামিদ চৌধুরী, ঐ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও লোকালবোর্ডের মেম্বার। আবদুল হামিদের বাড়ী একচল্লিশ গোলা ধান, এ অঞ্চলের বড় ধেনো মহাজন, দশ-পনেরোখানা গ্রামের কৃষক সব আবদুল হামিদের খাতক প্রজা। তার পাশে বসে আছে

কলাধরপুরের প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, জাতে কলু, তিনপুরুষে ব্যবসাদার। হাতে আগে যত টাকা ছিল, এখন তত নেই, সরষের ব্যবসায়ে ক'বার ধরে লোকসান দিয়ে অনেক কমে গিয়েচে। প্রহ্লাদ সাধুখাঁর ভাই নরহরি সাধুখাঁ তার ডানপাশেই বসেচে। নরহরি এই মঙ্গলগঞ্জে ধানপাটের আড়তদারি করে।

গোবিন্দ দাঁ পকেট থেকে একটি সিগারেট বার করে বললে—আসুন ডাক্তারবাবু!

—ভাল আছেন?

—বেশ আছি। আপনি?

—মন্দ নয়।

—এ পাড়াগাঁ ছেড়ে আর কোথাও জায়গা পেলেন না? কতবার বললাম—

—আপনাদের মত বড়লোক তো নই। অন্য জায়গায় গেলে চলতে পারে কি? কি রকম চলচে আপনাদের ব্যবসা?

—আগের মত নেই, তবুও এক রকম মন্দ নয়।

আবদুল হামিদ চৌধুরী বললে—কতক্ষণ এলেন ডাক্তারবাবু?

—তা দুপুরের পরই এসেচি। এতক্ষণ চলে যেতাম, ভূষণ দাঁ গিয়ে ধরলে গান না শুনে যেতে পারবো না। ভালো সব?

—খোদার ফজলে একরকম চলে যাচ্চে। আমাদের বাড়ীতে একবার চলুন।

—আমি ডাক্তার মানুষ, বাড়ীতে নিয়ে গেলেই ভিজিট দিতে হবে, জানেন তো?

—ভিজিট দিতে হয়, ভিজিট দেওয়া যাবে। একদিন গিয়ে একটু দুধ খেয়ে আসবেন।

কলাধরপুরের প্রহ্লাদ সাধুখাঁ হেসে বললে—সে ভাল তো ডাক্তারবাবু। ট্যাকাও পাবেন, আবার দুধও খাবেন। আপনাদের অদেষ্ট ভাল। যান, যান—

রামহরি সরকার এতক্ষণ কথা বলবার ফাঁক পাচ্ছিল না, সেও একজন যে-সে লোক নয়, মঙ্গলগঞ্জ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। পাড়াগাঁ অঞ্চলে এ সব পদে যারা থাকে, তারা নিজেদের এক একজন কেষ্টবিষ্টু বলে ভাবে, উন্নাসিক আভিজাত্যের গর্ব্বে সাধারণ লোক থেকে একটু দূরে রাখে নিজেকে।

রামহরি এই সময় বললে—ডাক্তার আর এই গিয়ে পুলিশ, এদের সঙ্গে ভাব রাখাও দোষ, না রাখাও দোষ। পরশু আমার বাড়ী হঠাৎ বড় দারোগা এসে তো ওঠলেন। তখুনি পুকুর থেকে বড় মাছ তোলালাম, মাছের ঝোল ভাত হোল।

আবদুল হামিদ চৌধুরীর মনে কথাটা লাগলো। সেও তো বড় কম নয়, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার, পুলিশ কি শুধু রামহরি সরকারের বাড়ীতেই আসে, তার ওখানেও আসে। সুতরাং সে বললে—ও তো আমার বাড়ী দুবেলা ঘটচে। সে দিন বড়বাবু আর মেজবাবু একসঙ্গে এ্যালেন আশুভাঙা খুনী কেসের এন্‌কোয়ারী সেরে। দুপুর বেলা, ভাত খেয়ে চক্ষু একটু বুজেচি, দুই ঘোড়া এসে হাজির। তখুনি খাসি মারা হোল একটা, সরু চালের ভাত আর খাসির মাংস হোল।

রামহরি বললে—রাঁধলে কে ?

—ওই দোবেজি বলে এক কনেস্টবল আছে না ? সে-ই রাঁধলে।

—মাংস রাঁধলে দোবেজি ?

—না, মাংস রাঁধলে বড়বাবু নিজে। ভাল রসুই করেন।

গোবিন্দ দাঁর ভাল লাগছিল না এ সব কথা, সে যে বড় তা দেখানোর ফুরসত সে পাচ্চে না। এরা তো সব পাড়াগাঁয়ে প্রেসিডেণ্ট। এরা পুলিশকে খাতির করলেও সে থোড়াই কেয়ার করে। খাস কলকাতা শহরে ব্যবসা তার, সেখানে শুধু ওঁরা জানে লাট সায়েবকে আর পুলিশ কমিশনারকে।

গোবিন্দ বললে—পুলিশের হ্যাপা আমাদেরও পোয়াতে হয়। সেবার হলো কি, আমরা হ্যাবাক জিংকের পিপে কতগুলো রেখেচি দালানে, তাই সার্চ করতে পুলিশ এল।

আমি বললাম—কিসের পিপে ?

—হ্যাবাক জিংকের পিপে। ব্যাপারটা কি জানেন, বিলিতি হ্যাবাক জিংকের হন্দর সাড়ে উনিশ টাকা, আর সেই জায়গায় জাপানী জিংকের হন্দর সাড়ে সাত টাকা। আমরা করি কি, আপনার কাছে বলতে দোষ কি—বিলিতি হ্যাবাক জিংকের খালি পিপে কিনে তাতে জাপানী মাল ভরতি করি।

—কেউ ধরতে পারে না ?

—জিনিস চেনা সোজা কথা না। ও ব্যবসার মধ্যে যারা আছে, তারা ছাড়া বাইরের লোকে কি চিনবে ? চেনে মিস্ত্রিরা, তাদের সঙ্গে—

গোবিন্দ দুই আঙুলে টাকা বাজাবার মুদ্রা করলে।

প্রহ্লাদ সাধুখাঁ কথাটা মন দিয়ে শুনছিল, লাভের গন্ধ যেখানে, সেখানে তার কান খাড়া হয়ে উঠবেই, কারণ সে তিন-তিন পুরুষ ব্যবসাদার। সে বললে—বলেন কি দাঁ মশায়, এত লাভ ? গোবিন্দ ধূর্ত্ত হাসির আভাস মাত্র মুখে এনে গলার স্বরকে ঘোরালো রহস্যময় করে বললে—তা নইলে কি আজ কলকাতা শহরে টিকতে পারতাম সাধুখাঁ মশাই ? আমার দোকানের পাশে ডি, পাল এ্যাণ্ড সন্—লক্ষপতি ধনী, টালা থেকে টালিগঞ্জ এস্তোক আঠারো-খানা বাড়ী ভাড়া খাটচে, বড়বাবু মেজবাবু নিজের নিজের মোটরে দোকানে আসেন, সে মোটর কি সাধারণ মোটর ? দেখবার জিনিস। তাদের বলা যায় আসল বড়বাবু মেজবাবু। মেয়ের বিয়েতে সতেরো হাজার টাকা খরচ করলে। মোটর গাড়ী থেকে নেমে আমার দোকানে এসে হাতজোড় করে নেমন্তন্ন করে গেলেন। আসল বড়বাবু মেজবাবু তাঁদের বলা যেতে পারে। নইলে আর সব—হুঁ—

আবদুল হামিদ চৌধুরী পুলিশের দারোগাদের বড়বাবু ছোটবাবু বলেছিল একটু আগে। সে এ বক্রোক্তি হজম করবার পাত্র নয়। বললে—তা আমরা পাড়াগাঁয়ে মানুষ, আমাদের কাছে ওঁরাই আসল বড়বাবু, মেজবাবু ? এখানে তো আপনার কলকাতার বাবুরা আসবেন না মুশকিলের আসান করতে ? এখানে মুশকিলের আসান করবে পুলিশই।

প্রহ্লাদ সাধুখাঁ কুঁদিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে বাস করে সুতরাং ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ চৌধুরীকে তুষ্ট রাখার তার স্বার্থ আছে। সে আবদুল হামিদকে সমর্থন করে বললে—ঠিক বলেচেন মৌলবী সাহেব, ঠিক বলেচেন। কলকাতার বাবুদের কি সম্পর্ক ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—সে কথা হচ্চে না। আসল বড়লোকের কথা হচ্চে। তোমার এখানে যদি চুনোপুঁটি মাছের টাকা টাকা সের হয়, তবে কি পুঁটি মাছের কদর রুই মাছের সমান হবে ? পাড়াগাঁয়ে সব সমান, বলে, বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা। ডাক্তারবাবু কি বলেন ?

এই সময় আমার চোখ পড়লো আসরের দিকে, দুটি সুসজ্জিতা খেমটাওয়ালী লঘু পদ-বিক্ষেপে আসরে ঢুকল। একটির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের কম নয় বরং বেশি। সমস্ত গায়ে গহনা—গিল্‌টির কি সোনার, বোঝবার উপায় নেই। গায়ের রংয়ের জলুস অনেকটা কমে এসেচে। ওর পেছনে যে মেয়েটি ঢুকল তার বয়স কম, ষোল কি সতেরো কিংবা অতও নয়, শ্যামাঙ্গী, চোখ দুটিতে বুদ্ধি ও দুষ্টুমির দীপ্তি, অত্যন্ত আঁটসাঁট বাঁধুনি, সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোথাও ঢিলেঢালা নেই, মুখশ্রী সুন্দর, সব চেয়ে দেখবার জিনিস তার মাথার ঘন কালো চুলের রাশ—মনে হয় সে চুল ছেড়ে দিলে যেন হাঁটুর নীচে পড়বে। এর গায়ে তত গহনার ভিড় নেই, নীল রঙের শাড়ী ও কাঁচুলি চমৎকার মানিয়েচে নিটোল-গড়ন দেহটিতে।

ওরা নাচ গান আরম্ভ করেচে।

বড় মেয়েটি নাচতে নাচতে আমাদের কাছে আসচে, কারণ সে বুঝেচে এই চাষাভূষোর ভিড়ের মধ্যে আমরাই সম্ভ্রান্ত। সে মেয়েটা বার বার এসে আমাদের কাছে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতে লাগলো।

আবদুল হামিদ চৌধুরী দুটাকা প্যালা দিলে। প্যালা দিয়ে সে সগর্ব্বে আমাদের দিকে চাইতে লাগলো। গোবিন্দ দাঁ সেটা সহ্য করতে পারলে না, পাড়াগাঁয়ের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কি তাদের মত শাঁসালো ব্যবসাদারের কাছে লাগে ? থাকলেই বা বাড়ীতে একচল্লিশটা ধানের গোলা। অমন ধেনো মহাজনকে ক্লাইভ স্ট্রীট ও রাজা উডমণ্ট স্ট্রীটের রঙ ও হার্ডওয়ারের বাজারে এবেলা কিনে ওবেলা বেচতে পারে, এমন বহুত ধনী সওদাগর তার দোকানে এসে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন করে যায়।

গোবিন্দ দাঁ একটা রুমালে দুটি টাকা বেঁধে খেমটাওয়ালীর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

আমি এ পর্যন্ত কিছু দিই নি, শেষ অবধি যখন কৃপণ প্রহ্লাদ সাধুখাঁও একটা টাকা প্যালা দিয়ে ফেললে, তখন আমার কেমন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগলো। না দিলে এই সব অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে লোক, যারা নিজেদের যথেষ্ট গণ্য মান্য ও সম্ভ্রান্ত বলে ভাবে, তারা আমার দিকে কৃপার চোখে চাইবে। এরা ভাবে খেমটার আসরে বসে খেমটাওয়ালীকে প্যালা দেওয়াটা খুব একটা ইজ্জতের কাজ বুঝি। এ নিয়ে আবার এদের আড়াআড়ি ও বাদাবাদি চলে। এক রাত্রে আসরে বসে বিশ-চল্লিশ টাকা প্যালা দিয়ে ফেলেছে ঝোঁকের মাথায়, এমন লোকও দেখেচি।

এবারে নাচওয়ালীটি আমার কাছে এসে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে লাগলো :

'ও সই পিরিতির পসরা নিয়ে ঘুরে মরি দেশ বিদেশে'—

আমারই সামনে এসে বার বার গায়, ভাবটা বোধ হয় এই, সবাই দিচ্ছে তুমি দেবে না কেন। আমার পকেটে আজকার পাওনা দশ বারোটি টাকা রয়েচে বটে, কিন্তু আমি ভাবছি, ওদের দেখাদেখি আমি যদি এই নর্ত্তকীদের পাদপদ্মে এতগুলো টাকা বিসর্জ্জন দিই তবে সে হবে ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ।

এই সময় আমার নাকের কাছে রুমাল ঘুরিয়ে আবদুল হামিদ চৌধুরী আবার দুটাকা ছুঁড়ে ফেলে দিলে খেমটাওয়ালীর দিকে। দেখাদেখি আরও দু-তিন জন প্যালা দিলে এগিয়ে গিয়ে।

এইবার সেই অল্পবয়সী নর্ত্তকীটি আমার কাছে এসে গান গাইতে লাগলো। বেশি বয়সের মেয়েটিই ওকে আমার সামনে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলে, সেটা আমি বুঝতে পারলাম। ও তো হার মেনে গেল, এ যদি সফল হয় কিছু আদায় করতে।

আমি প্রথমটা ও মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখি নি। এখন খুব কাছে আসতে ভাল করে চেয়ে দেখলাম যে বেশ দেখতে। রঙ ফরসা নয় বটে কিন্তু একটি অপূর্ব্ব কমনীয়তা ওর সারা দেহে। ভারী চমৎকার বাঁধুনি শরীরের। যতবার আমার কাছে এল, ওর ঢল ঢল লাবণ্য-ভরা মুখ ও ডাগর কালো চোখ দুটি আমার কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে উঠতে লাগলো। গলার স্বরও কি সুন্দর, অমন কণ্ঠস্বর আমি কখনো শুনি নি কোন মেয়ের।

আমাদের গ্রামে শান্তি বেশ সুন্দরী মেয়ে বলে গণ্য, কিন্তু শান্তি এর পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারে না।

আবার মেয়েটি ঠিক আমার সামনে এসেই গান গাইতে লাগলো। আমার দিকে চায়, আবার লজ্জায় মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়, আবার আমার দিকে চায়—সে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গি। আমার মনে হোল, এখনো ব্যবসাদারি শেখেনি মেয়েটি, শুধু অন্য নর্ত্তকীটির শিক্ষায় ও এমনি করচে। বোধ হয় তাকে ভয় করেও চলতে হয়।

হঠাৎ কখন পকেটে হাত দিয়ে দুটি টাকা বার করে আমি সলজ্জ ও সকুণ্ঠভাবে মেয়েটির সামনে রাখলাম। মেয়েটি আমায় প্রণাম জানিয়ে টাকা দুটি তুলে নিলে।

গোবিন্দ দাঁ ও আবদুল হামিদ চৌধুরী একসঙ্গে বলে উঠলো—বলিহারি!

আরও দুবার মেয়েটি আমার কাছে ঘুরে ঘুরে গেল। আমি দুবারই তাকে টাকা দেবার জন্যে তুলেও আবার পকেটে ফেললাম। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগলো, দিতে পারলাম না পাছে আবদুল হামিদ কি গোবিন্দ দাঁ কিংবা প্রহ্লাদ সাধুখাঁ কিছু মনে করে। কিন্তু কি ওরা মনে করবে, কেন মনে করবে, এসব ভেবেও দেখলাম না।

আবদুল হামিদ আমায় একটা সিগারেট দিলে, অন্যমনস্ক ভাবে সেটা ধরিয়ে আবার নাচের দিকে মন দিলাম।

অনেক রাত্রে নাচ বন্ধ হোল। গোবিন্দ দাঁ বললে—ডাক্তারবাবু, বাকী রাতটুকু গরীবের বাড়ীতেই শুয়ে থাকুন, রাত তো বেশি নেই, সকালে চা খেয়ে—

আমার মন যেন কেমন চঞ্চল। কিছু ভাল লাগচে না। কোথাও রাত কাটাতে আমার ইচ্ছে নেই। মাঝিকে নিয়ে সেই রাত্রেই নৌকো ছাড়লাম। গভীর রাত্রের সজল বাতাসে একটু ঘুম এল ছইয়ের মধ্যে বিছানায় শুয়ে। সেই অল্পবয়সী মেয়েটি আমার চোখের সামনে সারা রাত নাচতে লাগলো। এক একবার কাছে এগিয়ে আসে, আমি রুমাল বেঁধে প্যালা দিতে যাই, সে তখুনি হেসে দূরে সরে যায়, আবার কিছুক্ষণ পরে কাছে এগিয়ে আসে।

মাঝির ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো। মাঝি বলছে—উঠুন বাবু নৌকো ঘাটে এসেচে।

উঠে দেখি ওপারের বড় শিমূল গাছটার পিছনে সূর্য্য উঠেছে, বেলা হয়ে গিয়েচে। দীনু বাড়ুই ঘাটের পাশে জেলে-ডিঙিতে বসে মাছ ধরচে, আমায় দেখে বললে—ডাক্তারবাবু রাত্তিরি ডাকে গিয়েছিলেন? কনেকার রুগী?

পরদিন মঙ্গলগঞ্জে যাবার দিন নয়।

সুরবালা বললে—ওগো আজ ও পাড়ার অজিত ঠাকুরপোর মেয়েকে দেখতে আসবে। তোমাকে সেখানে থাকতে বলেচে।

আমি বললাম—আজ আমার থাকা হবে না।

—কেন, আজ আবার সেখানে? শক্ত রোগী আছে বুঝি?

—না। ওদের বারোয়ারি লেগেচে। আমি না থাকলে চলবে না।

মনে মনে কিন্তু বুঝলাম, কথাটা খাঁটি সত্যি নয়! আমার সেখানে না থাকলে খুব চলবে। ওদের আছে প্রেসিডেন্ট রামহরি সরকার, ক্লাইভ স্ট্রীটের রঙের দোকানের মালিক গোবিন্দ দাঁ, কলাধরপুরের প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, কুঁদিপুরের প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ চৌধুরী, আরও অনেকে। আমাকে ওরা যেতেও বলে নি।

এই বোধ হয় জেনে শুনে প্রথম মিথ্যা কথা বললাম সুরবালাকে।

আমায় যেতে হবে কেন তা নিজেও ভাল জানি নে।

মনে মনে ভাবলাম—নাচ জিনিসটা তো খারাপ নয়! ওটা সবাই মিলে খারাপ করেচে। দেখে আসি না, এতে দোষটা আর কি আছে? সকালে সকালে চলে আসবো।

দীনু বাড়ুই আজও জিজ্ঞাসা করলে—বাবু, রুগী দেখতে চললেন বুঝি?

ওর প্রশ্নে আজ যেন বিরক্ত হয়ে উঠি। যেখানেই যাই না কেন তোর তাতে কি রে বাপু? তোকে কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে হবে না কি? মুখে অবিশ্যি কিছু বললাম না।

মাঝিকে বললাম—একটু তাড়াতাড়ি বাইতে কি হচ্চে তোর? ওদিকে আসর যে হয়ে গেল—

খেমটার প্রথম আসরেই আমি একেবারে সামনে গিয়ে বসলাম। আবদুল হামিদ আজও আমার পাশে বসেছে। অন্যান্য সব বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যারা কাল উপস্থিত ছিল, আজও

তারা সবাই রয়েচে, যেমন, প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, ওর ভাই নরহরি সাধুখাঁ, গোবিন্দ দাঁ, ইত্যাদি। আমি যেতেই সবাই কলরব করে উঠলো—আসুন, ডাক্তারবাবু, আসুন।

আবার সেই অল্পবয়সী মেয়েটি ঘুরে ঘুরে আমার সামনে এসে হাজির হোতেই আমি দুটি টাকা প্যালা দিয়ে দিলাম সকলের আগে। পকেট ভরে আজ টাকা নিয়ে এসেছি প্যালা দেওয়ার জন্যে। আবদুল হামিদ যে আমার নাকের সামনে রুমাল ঘুরিয়ে প্যালা দেবে, তা আমার সহ্য হবে না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই ?

আবদুল হামিদের চোখে বড় হবার জন্যেই কি পকেট পুরে টাকা এনেছি প্যালা দেবার জন্যে ?

নিজের কাছেই নিজের মনোভাব খুব স্পষ্ট নয়।

আবদুল হামিদ আমার দেখাদেখি দুটাকা প্যালা দিলে।

আমার চোখ তখন কোনো দিকে ছিল না। আমি এক দৃষ্টে সেই অল্পবয়সী মেয়েটিকে দেখচি। কি অপূর্ব্ব ওর মুখশ্রী! টানা টানা ডাগর চোখ দুটিতে যেন কিসের স্বপ্ন মাখা। ওর সারা দেহে কি হাড় নেই ? এমন লীলায়িত ভঙ্গিতে দেহ-লতায় হিল্লোল তুলেচে তবে কি করে ? নারীদেহ এমন সুন্দরও হয় !

মেয়েটি আমার দিকে আবার এগিয়ে আসচে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে। কিন্তু ওর মুখে চোখে বেপরোয়া ভাব নেই, ব্রীড়া ও কুণ্ঠায় চোখের পাতা দুটি যেন আমার দিকে এগিয়ে আসার অর্দ্ধপথেই নিমীলিত হয়ে আসচে। সে কি অবর্ণনীয় ভঙ্গি !

আর গান ?

সে গানের তুলনা হয় না। কিন্নরকণ্ঠ বলে একটা কথা শোনাই ছিল, কখনো জানতাম না সে কি জিনিস। আজ ওর গলা শুনে মনে হোল, এই হোল সেই জিনিস। এ যদি কিন্নরকণ্ঠী না হয়, তবে কার প্রতি ও বিশেষণ সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হবে ?

আবদুল হামিদ এতক্ষণ কি বলেচে আমি শুনতে পাই নি। সে এবার আমার পা ঠেলতেই আমি যেন অনেকটা চমকে উঠলাম। দুপাটি দাঁত বের করে আমার সামনে একটা সিগারেট ধরে সে বলচে—শুনতে পান না যে ডাক্তারবাবু! নিন্—

আমার লজ্জা হোল। কি ভেবে আবদুল হামিদ একথা বলচে কি জানি। ও কি বুঝতে পেরেচে যে আমি ওই মেয়েটিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখচি ? বোধ হয় পারে নি। কত লোকই তো দেখচে, আমার কি দোষ ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—একবার কলকাতায় গেলে আমার দোকানে পায়ের ধুলো দেবেন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কেন যাবো না ?

—আমড়াতলা গলির রায় চৌধুরীদের দেখেচেন ?

—না।

—মস্ত বাড়ী আমড়াতলা লেনের মুখেই। টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্চে, যাকে বলে বড়লোক—

—ও!

—সেবার আমাকে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন করলে। তা ভাবলাম, অত বড়লোক, কি দিয়ে মুখ দেখি? একটা সোনার কাজললতা গড়িয়ে নিলাম রাধাবাজারে কুণ্ডু কোম্পানীর দোকান থেকে। আর খাওয়ানো কি! এ সব পাড়াগাঁয়ে শুধু কচুঘেঁচু খেয়ে মরে। দেখে আসুক গিয়ে কলকাতায় বড়লোকের বাড়ী—

—ঠিক তো।

আবদুল হামিদ এতক্ষণ নিজের কথা বলতে পায় নি। এবার সে ফাঁক বুঝে বললে—তা ঠিক, দাঁ মশায় যা বলেচেন। সেবার আমার ইউনিয়নের সাতটা টিউবওয়েল বসাবো। বড়বাবু নিজে থেকে টিউবওয়েলের স্যাঙ্কসন করিয়ে দিলেন। গ্যালাম নিজে কলকেতায়। বলি, নিজে নিয়ে এলে দুপয়সা সস্তা হবে। নিজের ইউনিয়নের কাজ নিজের বাড়ীর মত দেখতে হবে। নইলে এত ভোট এবার আমাদের দেবে কেন? সবাই বলে, চৌধুরী সাহেব আমাদের বাপ-মা। তারপর হোল কি—

রামহরি সরকার বড় অসহিষ্ণুভাবে বললে, ভোটের কথা যদি ওঠালেন, চৌধুরী সাহেব, এবার দু নম্বর ইউনিয়ন থেকে আমার ভোট যা হয়েচে—ফলেয়ার হারান তরফদার দাঁড়িয়েছিল কি-না—ফলেয়ার যত ভোট সব তার—তা, ভাবলাম, এবার আর হোল না বুঝি। কিন্তু গাজিপুর, মঙ্গলগঞ্জ, আর নেউলে-বিষ্ণুপুর এই ক'খানা গাঁয়ের একজন লোকও ভোট দিয়েছিল হারান তরফদারকে?

গোবিন্দ দাঁ'র ভাল লাগছিল না। কি পাড়াগাঁয়ের ভোটাভুটির কাণ্ড সে এখানে বসে শুনবে? ছোঃ, কলকাতায় কর্পোরেশনের কোনো ধারণাই নেই এদের।

সেবার—। গোবিন্দ দাঁ গল্পটা কেঁদেছিল সবে, এমন সময় সেই অল্পবয়সী নর্ত্তকীটি ঘুরতে ঘুরতে আবার আমাদের কাছে এল। এবার সত্যিই বুঝলাম, সে আমার মুখের দিকে বার বার চাইচে, চাইচে আর চোখ ফিরিয়ে নিচ্চে। সে এক পরম সুশ্রী ভঙ্গি। অথচ আমি প্যালা দিচ্চি না আর। আবদুল হামিদ এর মধ্যে দুবার টাকা দিয়েচে।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল, সেই জন্যেই বা মেয়েটি বার বার আমার কাছে আসচে। আচ্ছা এবারটা দেখি। এক পয়সা প্যালা দেবো না।

এবার রামহরি সরকার ও গোবিন্দ দাঁ এক সঙ্গে প্যালা দিলে।

আমি জানি এসব পল্লীগ্রামের খেমটা বা ঢপকীর্ত্তনের আসরে, প্যালা দেওয়ার দস্তুরমত প্রতিযোগিতা চলে গ্রাম্য বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে। অমুক এত দিয়েচে, আমিই বা কম কিসে, আমি কেন দেবো না—এই হোল আসল ভাব। কে কেমন দরের লোক এই থেকেই নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়। আমি সবই জানি, কিন্তু চুপ করে রইলাম। এর কারণ আছে। আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই।

এ সময় নেপাল প্রামাণিক এসে হাজির হোল।

বললে—আজ আমার ওখানে একটু চা খাবেন ডাক্তারবাবু।

—তোমার ওখানে সেদিন চা তো খেয়েছি—আজ আমার ডাক্তারখানায় বরং তুমি আর আবদুল হামিদ চা খেও।

গোবিন্দ দাঁ বললে—আমি বুঝি বাদ যাবো ?

—বাদ যাবে কেন ? চলো আমার সঙ্গে।

—তা হোলে আমার বাড়ীতে আপনি রাতে পায়ের ধুলো দেবেন বলুন ?

—এখন সে কথা বলতে পারি নে। কত রাতে আসর ভাঙবে, কে জানে ?

—সমস্ত রাত দেখবেন ?

—দেখি। ঠিক বলতে পারি নে।

আবার মেয়েটি ঘুরে ঘুরে আমার সামনে এসেচে। কি জানি ওর মুখে কি আছে, আমি যতবার দেখচি, প্রত্যেকবারেই নতুন কিছু, অপূর্ব্ব কিছু চোখে পড়ছে। অনেক মেয়ে দেখেচি জীবনে, কিন্তু অমন মুখ অমন চোখ আমি কারো দেখেচি বলে মনে তো হয় না।

আমি এবারেও প্যালা দিলাম না।

কিন্তু একবার ওর মুখের দিকে চাইতেই দেখি ও আমার মুখের দিকেই চেয়ে আছে।

আমার অত্যন্ত আনন্দ হোল হঠাৎ! অকারণ আনন্দ।

ওই অপরিচিতা বালিকাটি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, এতে আমার আনন্দের কারণ কি ? কে বলবে ?

সেই আনন্দের অদ্ভুত মুহূর্ত্তে আমার মনে হোল, আমি সব যেন বিলিয়ে দিতে পারি, যা কিছু আমার নিঃস্ব আছে। সব কিছু দিয়ে দিতে পারি। সব কিছু। তুচ্ছ পয়সা, তুচ্ছ টাকা-কড়ি।

সেই মুহূর্ত্তে দুটাকা প্যালা হাত বাড়িয়ে দিতে গেলাম, মেয়েটি সাবলীল ভঙ্গিতে আমার সামনে এসে আমার হাত থেকে টাকা দুটি উঠিয়ে নিলে। আমার হাতের আঙুলে ওর আঙুল ঠেকে গেল। আমার মনে হোল ও ইচ্ছে করে আঙুলে আঙুল ঠেকালে। অনায়াসে টাকা দুটি তুলে নিতে পারতো সন্তর্পণে।

চোখ বুজে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলাম।

হঠাৎ এই খেমটার আসর আমার কাছে অসাধারণ হয়ে উঠলো! আমার সাধারণ অস্তিত্ব যেন লোপ পেয়ে গেল। আমি যুগযুগান্ত ধরে খেমটা নাচ দেখচি এখানে বসে। আমি অমর, বিজর, বিশ্বে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। যুগযুগান্ত ধরে ওই মেয়েটি আমার সামনে এসে অমনি নাচচে।

ওর অঙ্গুলির স্পর্শে আমার অতি সাধারণ একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন জীবন ভূমার আনন্দ আস্বাদ করল। অতি সাধারণ আমি অতি অসাধারণ হয়ে উঠলাম। আরও কি কি হোল, সেসব বুঝিয়ে বলবার সাধ্য নেই আমার। আমি গ্রাম্য ডাক্তার মানুষ, এ গ্রামে ও গ্রামে রোগী

দেখে বেড়াই, সনাতনদা'র সঙ্গে গ্রাম্য-দলাদলির গল্প করি, একে ওকে সামাজিক শাসন করি, আর এই প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, নেপাল প্রামাণিক, ভূষণ দাঁয়ের মত লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে বেড়াই। আমি হঠাৎ এ কি পেয়ে গেলাম? কোন্ অমৃতের সন্ধান পেলাম আজ এই খেমটা নাচের আসরে এসে? আমার মাথা সত্যিই ঘুরচে। উগ্র মদের নেশার মত নেশা লেগেচে যেন হঠাৎ। কি সে নেশার ঘোর, জীবনভোর এর মধ্যে ডুবে থাকলেও কখনো অনুশোচনা আসবে না আমার।

নেপাল প্রামাণিক বললে—তাহোলে আমি বাড়ী থেকে দুধ নিয়ে আসি। ক'পেয়ালা চা হবে?

আমি সবিস্ময়ে বললাম—কিসের চা?

—এই যে বললেন আপনার ডাক্তারখানায় চা হবে।

—ও! দুধ?

—হ্যাঁ, দুধ না হোলে চা হবে কিসে!

আবদুল হামিদ মন্তব্য করলে—ডাক্তারবাবুর এখন উঠবার ইচ্ছে নেই।

আমার বড় লজ্জা হোল। ও বোধ হয় বুঝতে পেরেচে আমার মনের অবস্থা। ও কি কিছু লক্ষ্য করেচে?

আমি বললাম—চলো চলো, চা খেয়ে আসা যাক। ততক্ষণ নেপাল দুধ নিয়ে আসুক।

আধঘণ্টা পরে আমার ডাক্তারখানায় বসে সবাই চা খাচ্চি, গোবিন্দ দাঁ বলে উঠলো—ছোট ছুঁড়িটা বেশ দেখতে কিন্তু। না?

আবদুল হামিদ ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে অমনি বললে—আমিও তাই বলতে যাচ্ছি—বড্ড চমৎকার দেখতে। ডাক্তারবাবু কি বলেন?

—কে? হ্যাঁ—মন্দ নয়।

গোবিন্দ দাঁ বললে—মন্দ নয় কেন? বেশ ভালো।

আমি বললাম—তা হবে।

আবদুল হামিদ বললে—ছুঁড়িটার বয়স কত হবে আন্দাজ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—তা বেশি নয়। অল্প বয়েস।

—কত?

—পনেরো কিংবা ষোল। দেখলেই বোঝা যায় তো—

আবদুল হামিদ সশব্দে হেসে বলে উঠলো—হ্যাঁ, ওসব যথেষ্টই ঘেঁটেচেন আমাদের দাঁ মশায়। ওঁর কাছে আর আমাদের—

ওদের কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগছিল না। ওদের এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই বললাম—চলো চা খাইগে। রাত হয়ে যাচ্চে। আমি এখান থেকে অনেক দূর চলে যেতে চাই ওদের সঙ্গ ছেড়ে। ওরা যে মেয়েটির দিকে বার বার চাইবে, এও আমার অসহ্য—

সুতরাং ওদেরও সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

নেপাল প্রামাণিক দুধ নিয়ে এল। আমি সকলকে চা পরিবেশন করলাম।

আবদুল হামিদ বললে—একদিন এখানে ফিস্ট করুন ডাক্তারবাবু, আমি একটা খাসি দেবো।

গোবিন্দ দাঁ পিছপাও হবার লোক নয়, সে বললে—আমি কলকাতা থেকে ভাতুয়া ঘি আনিয়ে দেবো। হুজুরিমল রণছোড়লাল মস্ত বড় ঘিয়ের আড়তদার, পোস্তার খাঁটি পশ্চিমে ভাতুয়া। আমার সঙ্গে যথেষ্ট খাতির। আমাদের দোকান থেকে রঙ নেয় ওরা। সেবার হোল কি—

রামহরি সরকার ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললে—কিসের পশ্চিমের ঘি? আমার ইউনিয়নে যা গাওয়া ঘি মেলে, তার কাছে ওসব কি বললে ভাতুয়া মাতুয়া লাগে না। দেড় টাকা সের গাওয়া ঘি কত চাই? এখনি হুকুম করলে দশ সের ঘি নিয়ে এসে ফেলবে। করুন না ফিস্টি।

এরা যে আবার আসরে গিয়ে বসে, এ যেন আমি চাই নে। ছুতো নাতায় দেরি হয়ে যাক এ আমারও ইচ্ছে। সুতরাং আমি এদের ওই স্থূল ধরনের কথাবার্ত্তায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলাম। আরও পাঁচরকম ঘি-এর কথা হোল, কি কি খাওয়া হবে তার ফর্দ্দ হোল, কবে হতে পারে তার দিন স্থির করতে কিছু সময় কাটলো। ওরা আসরে গিয়ে মেয়েটিকে না দেখুক।

নেপাল প্রামাণিক এই সময় আমায় হাতজোড় করে বললে—একটা অনুরোধ আছে, আমার বাড়ীতে লুচি ভেজেচে। বড়বৌ যত্ন করে ভাজচে আপনার জন্যে। একটু পায়ের ধুলো দিতে হবেই।

আমার নিজেরও ইচ্ছে আর আসরে যাবো না। ওর ওখানে খেতে গেলে যে সময় যাবে, তার মধ্যে খেমটার আসর ভেঙ্গে যাবে। বললাম—বেশ, তাতে আর কি হয়েচে? চলো যাই।

নেপাল প্রামাণিকের বড় চৌচালা ঘরের দাওয়ায় আমার জন্যে খাবার জায়গা করা হয়েচে, নেপাল প্রামাণিকের বড় বৌ থালায় গরম লুচি এনে পরিবেশন করলে। বড় ভক্তিমতী স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণের ওপর অমন ভক্তি আজকার কালে বড় একটা দেখা যায় না। আমার সঙ্গে কথা বলে না, তবে আকারে ইঙ্গিতে বুঝতে পারি ও কি বলতে চাইচে। যেমন একবার লুচির থালা নিয়ে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, আমি বললাম—না মা, আর লুচি দিতে হবে না।

নেপালকে আমার অদূরে খাবার জায়গা করে দেওয়া হয়েচে। সে বললে—নিন নিন ডাক্তারবাবু, ও অনেক কষ্ট করে আপনার জন্যে লুচি ভেজেচে। সন্দে থেকে আমাকে বলচে ডাক্তারবাবুকে অবিশ্যি করে খেতে বলবা।

বড়বৌয়ের ঘোমটার মধ্যে থেকে মৃদু হাসির শব্দ পাওয়া গেল।

খান-আষ্টেক গরম লুচি চুড়ির ঠুনঠান শব্দের সঙ্গে পাতে পড়লো।

উঁহুঁ হুঁ—এত কেন? কি সর্ব্বনাশ!

বড় বৌ ফিস্ ফিস্ করে অদূরে ভোজনরত নেপালের কানের কাছে মুখ নামিয়ে কি বললে, নেপাল আমায় বললে—বড়বৌ বলচে ডাক্তারবাবুর ছোকরা বয়েস, কেন খাবেন না এ ক'খানা লুচি—এই তো খাবার বয়েস।

আমি বললাম—আমার বয়েস সম্বন্ধে মায়ের একটু ভুল হচ্চে। ছোকরা বড় নই, পঁয়-ত্রিশের কোঠায় পা দেবো আশ্বিন মাসে।

আবার ফিস্ ফিস্ শব্দ। নেপাল তার অনুবাদ করে বললে—বড়বৌ হাসচে, বলচে, ওর ছোট ভাইয়ের চেয়েও কম বয়েস।

আমি জানতাম নেপালের দুই সংসার। কিন্তু ওর বড় বৌটি সত্যই সুন্দরী, এর আগেও দুবার দেখেচি বৌটিকে। বয়েস চল্লিশের ওপরে হোলেও দীর্ঘকাল নিঃসন্তানা ছিল বলেই হোক বা যে কারণেই হোক, এখনো বেশ আঁটসাঁট গড়ন, দিব্যি স্বাস্থ্যবতী, গায়ের রঙ পঁচিশ বছরের যুবতীর মত। বেশ শান্ত মুখশ্রী।

আমি উত্তর দিলাম—মাকে বল আর দুখানা পটলভাজা দিতে—

বৌটি পটলভাজা পাতে দিলে এনে।

আমি মুখ তুলে তাকেই উদ্দেশ্য করে বললাম—আচ্ছা, এ রকম কেন মা করো, বলো তো? চমৎকার রান্না কিন্তু নুন দাও না কেন? সেবারও তাই, এবারও তাই। সেবার বলে গেলাম তোমায়, তুমি নুন দিও তরকারিতে, ওতে আমার জাত যাবে না। তবুও নুন দাও নি এবার।

বড় বৌ এবার খুব জোরে ফিস্ ফিস্ করলে এবং খানিকক্ষণ সময় নিয়ে।

নেপাল হেসে বললে—বড়বৌ বলচে, ব্রাহ্মণের পাতে নুন দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবো সে ভাগ্যি করি নি। এ জন্মে আর তা হয়ে উঠবে না। নরকে পচে মরবো শেষে? ছোট জাত আমরা—

—ও সব বাজে কথা।

—না ডাক্তারবাবু, আপনাদের মত অন্যরকম। আপনারা ইংরেজী পড়ে এ সব মানেন না, কিন্তু ভগবানের কাছে দোষী হতে হবে তো?

—ইংরেজী পড়ে নয় নেপাল, মানুষের সঙ্গে তফাৎ সৃষ্টি করেচে সমাজ, ভগবানকে টেনো না এর মধ্যে।

—ভগবান নিজেই ব্রাহ্মণের পায়ের চিহ্ন বুকে ধরে আছেন। আছেন কি না আছেন বলুন?

—আমি দেখি নি ভগবানকে, তাঁর বুকে কি আছে না আছে বলতে পারবো না। কিন্তু নেপাল, এটুকু তুমিও জানো আমিও জানি, তাঁর দেওয়া ছাপ কপালে নিয়ে কেউ পৃথিবীতে আসে নি।

—তবে বাবু, কেউ ব্রাহ্মণ কেউ শূদ্দুর হয় কেন ?

—আমি জানি নে, তুমিই বলো।

—কর্ম্মফল। আপনার সুকৃতি ছেল আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেচেন, আমার পুণ্যি ছেল না, আমি শূদ্দুর হয়ে—

এ তর্কের মীমাংসা নেই, বিশেষত এদের বুঝানো আমার সম্ভব নয়, সুতরাং চুপ করে খাওয়া শেষ করলাম।

রাত বেশি হয়েচে। নেপাল বললে—আপনি শোবেন এখানে তো ? বড়বৌ বলচে।

—না, আমি ডিসপেন্সারিতে শোবো। রাত বেশি নেই। ভোর রাত্রে নৌকো ছাড়বো।

—কষ্ট করে কেন শোবেন। বড়বৌ আপনার জন্যি পুবির ঘরে তক্তাপোশে বিছেন পেতে রেখেচে।

তখন যদি নেপাল প্রামাণিকের কথা শুনতাম, তার ভক্তিমতী, সতিলক্ষ্মী স্ত্রীর কথা শুনতাম ! তারপরে কতবার এ কথা আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।

আমি নেপালের বাড়ী থেকে চলে এলাম ডাক্তারখানায়। নেপাল লণ্ঠন ধরে এগিয়ে দিয়ে গেল। ডাক্তারখানার ওদিকে বারান্দায় নৌকার মাঝিটা অঘোরে ঘুমুচ্চে। আমি ঘরে ঢুকে নেপালকে বিদায় দিয়ে বিছানা পাতবার যোগাড় করচি, এমন সময় বাইরে গোবিন্দ দাঁ আর আবদুল হামিদের গলা পেলাম।

আবদুল হামিদ বললে—ও ডাক্তারবাবু, আলো জ্বালুন—ঘুমুলেন নাকি ?

বললাম—কি ব্যাপার ?

নিশ্চয়ই এরা চা খেতে এসেচে। কিন্তু এত রাত্রে আমি দুধ পাই কোথায় যে ওদের জন্যে চা করি আবার ? বিপন্ন মুখে দোর খুলে ওদের পাশের ঘরে বসিয়ে শোয়ার ঘর থেকে লণ্ঠন নিয়ে ডিসপেন্সারি ঘরে ঢুকেই আমি দেখলাম একটি মেয়ে ওদের সঙ্গে। স্বভাবতই আমার মনে হোল কারো অসুখ করেচে ; নইলে এত রাত্রে ওরা দুজনে ডিসপেন্সারিতে আসবে কেন ?

ব্যস্ত সুরে বললাম—কি হয়েচে বলো তো ? কে মেয়েটি ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—বসুন, ডাক্তারবাবু, বসুন—কথা আছে।

—কে বলো তো, ও মেয়েটি ?

আবদুল হামিদ দাঁত বের করে হেসে বললে—আপনার রুগী। দেখুন তো—

সেই কিশোরী নর্ত্তকীটি। আমার মাথা যেন ঝিম ঝিম করে উঠলো। মেয়েটির সলজ্জ দৃষ্টি মাটির দিকে নামানো। মনে হোল, ওর কপাল ঘেমে উঠচে ক্লান্তিতে ও সকরুণ কুণ্ঠায়।

আমি এগিয়ে এসে বলি—কি, কি ব্যাপার? হয়েচে কি?

গোবিন্দ দাঁ হা হা করে হেসে উঠলো—আবদুল হামিদের হাসির সুরটা খিক্ খিক্ শব্দে নদীর ধারে পুরোনো শিমুল গাছে শিকরে পাখীর আওয়াজের মত।

বিরক্ত হয়ে বললাম—আঃ, বলি কি হয়েচে শুনি না!

গোবিন্দ দাঁ বললে—মাথা ধরেচে, মাথা ধরেচে—নেচে গেয়ে মাথা ধরেচে, এখন ওষুধ দিন, রোগ সারান।

টেবিলের ওপর থেকে স্মেলিং সল্টের শিশিটা তুলে বললাম—এটা জোরে শুঁকতে বলো, এখুনি সেরে যাবে।

আবদুল হামিদ আর একবার শিকরে পাখীর আওয়াজের মত হেসে উঠলো। গোবিন্দ দাঁ বললে—আপনি চিকিচ্ছে করুন। আমরা চলি।

—কেন, কেন?

—আমাদের আর এখানে থাকার কি দরকার?

সত্যই ওরা উঠে চলে যেতে উদ্যত হোল দেখে আমি বললাম—বোসো বোসো। কি হচ্চে? ওষুধ শিশিতে দিচ্চি—

গোবিন্দ দাঁ বললে—আপনি ওষুধ দেবেন, দিন। দিয়ে ওকে পটল কলুর আটচালা ঘরে ওদের বাসা, সেখানে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা চলি।

আবদুল হামিদ বললে—ওষুধের দামটা আমার কাছ থেকে নেবেন।

গোবিন্দ দাঁ বললে—কেন, আমি দেবো।

ওদের ইতর ব্যবহারে আমার বড় রাগ হোল। আমি ধমক দেওয়ার সুরে বললাম—কি হচ্চে সব? ওষুধ যদি দিতে হয় তার দামটা আমি না নিতেও তো পারি। বসো সব। কেউ যেও না। কি হয়েচে শুনি?

গোবিন্দ দাঁ বললে—মাথা ধরেচে বললাম তো। ওগো, বল না গো, তোমার কি হয়েচে, তোমার চাঁদ মুখ দিয়ে কথা না বেরুলে আমাদের ডাক্তারবাবু বিশ্বাস করচেন না যে! বললে মাথা ধরেচে—নিয়ে এলাম ডাক্তারের কাছে। এখন রুগী-ডাক্তারে কথাবার্ত্তা হোক, আমরা তো বাড়তি মাল—হাবাক্ জিঙ্কের পিপের সোল এজেন্ট—এখানে আর আমরা কেন? ওঠো আবদুল হামি—

সত্যিই ওরা চলে গেল। আমি মেয়েটির মুখের দিকে চাইলাম। দুটি চোখের সলজ্জ চাউনি আমার মুখের দিকে স্থাপিত। এভাবে আমি একা কোন মেয়ের সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত নই, আমি যেন ঘেমে উঠলাম। তার উপরে অন্য কোন মেয়ে নয়, যে মেয়েটি কাল থেকে আমার একঘেয়ে জীবনে সম্পূর্ণ নতুনের স্বাদ এনে দিয়েচে, সেই মেয়েটি। হঠাৎ আমি নিজেকে দৃঢ় করে নিলাম। আমি না ডাক্তার? আমার গলা কাঁপবে একটি বালিকার সঙ্গে চিকিৎসক হিসেবে কথাবার্ত্তা বলতে?

বললাম—কি হয়েচে তোমার?

মেয়েটি আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনি ডাক্তারবাবু ?

অদ্ভুত প্রশ্ন। এতটুকু মেয়ের মুখে। গম্ভীর মুখে বলবার চেষ্টা করলাম—তবে এখানে কি জন্য এসেচ ? দেখতেই তো পাচ্চ।

আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য। মেয়েটি ফিক্ করে হেসে ফেলে পরক্ষণেই লজ্জায় মুখখানি নীচু করে আঁচল চাপা দিলে—আঁচল-চাপা মুখ আমার দিকে তুলে আবার ফিক্ করে হেসে উঠলো। সে এক অদ্ভুত ভঙ্গি, সে ভঙ্গির অপূর্ব্ব লাবণ্য আমার বর্ণনা করবার শক্তি নেই। আমার বুদ্ধি যেন লোপ পাবার উপক্রম হোল—এমন ধরনের মেয়ে আমি কখনও দেখি নি। মেয়ে দেখেছি সুরবালাকে—শান্ত, সংযত ভদ্র বড় জোর; দেখেচি শান্তিকে। না হয় নির্জ্জন রাস্তায় অবসর খুঁজে কথা বলে, তাও দরকারী কথা, নিজের গরজে। এমন সাবলীল ভঙ্গি তাদের সাধ্যের বাইরে। তাদের দেহে হয় না, জন্মায় না। ছেলেমানুষ নারী বটে, কিন্তু সত্যিকার নারী।

বললাম—হাসচো কেন! কি হয়েচে ?

—মাথা ধরেচে। অসুখ হয়েচে।

—মিথ্যে কথা।

—উহুঁ-হুঁ! ভারী ডাক্তার আপনি!

যেন কত কালের পরিচয়। কোনো সঙ্কোচের বালাই নেই।

ওর সামনের চেয়ারে বসে ওর হাত ধরলাম। ও হাত টেনে নিলে না। নির্জ্জন ঘরে ও আর আমি। রাত একটা কিংবা তুটো। কে জানে, কে-ই বা খবর রাখে। আমার মনে হোল জগতে ঐ মেয়েটি আমার সামনে বসে আছে যুগ যুগ ধরে। সারা বিশ্বে তুটি মাত্র প্রাণী—ও আর আমি।

আমি বললাম—তোমার নাম কি ?

—কি দরকার আপনার সে খোঁজে ?

—তবে এখানে এসেচ কেন ?

—ওষুধ দিন। হাতটা ধরেই রইলেন যে, দেখুন না হাত।

—কিছুই নয় নি তোমার।

—না, সত্যি আমার মাথা ধরেছিল।

—এখন আর নেই।

—কি করে বুঝলেন ?

—তুমি একটি তুষ্টু বালিকা। কত বয়েস তোমার ? পনেরো না ষোলো।

—জানি নে।

আমি ওর হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—তবে, এখুনি যাও।

ওর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। আমার গলার সুর বোধ হয় একটু কড়া হয়ে পড়েছিল। ভীরু চোখে আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—রাগ করলেন ? না, না রাগ

করবেন না। আমার বয়েস ষোলো।

—নাম কি?

—পান্না। ভালো নাম সুধীরাবালা।

—যার সঙ্গে এসেচ ও তোমার কে হয়?

—কেউ নয়। ওর সঙ্গে মুজরো করে বেড়াই, মাইনে দেয়, প্যালার অর্দ্ধেক ভাগ দিতে হয়।

—কোথায় থাকো তোমরা?

—দমদমা সিঁথি। বাড়ীওয়ালীর বাগানবাড়ীতে।

—সে আবার কে?

—বাড়ীউলী মাসির টাকায় তো খেমটার দল চলে। থাকতে দেয় খেতে দেয়। সেই-ই তো সব।

ওষুধ দেবো? মিথ্যা কথা বলে এসেছ কেন এখানে? ওই তোমার সঙ্গের মেয়েটা এখানে তোমায় পাঠিয়েছে?

—না।

সত্যি বলো। মিথ্যে ভান করচো কেন অসুখের? ও পাঠিয়েচে—না? তোমায় শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েচে?

মেয়েটি লজ্জায় কেমন যেন ভেঙ্গে পড়ে বললে—তা না।

বলেই মুখ নীচু করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো ও সত্যি কথা বলচে। ওর সঙ্গিনী পাঠায় নি, ছল করে ও নিজেই এসেচে। স্বেচ্ছায় এসেচে। অসুখ-বিসুখও নয়—কোনো অসুখ নেই ওর।

হঠাৎ মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে কেমন এক রকম অদ্ভুত স্বরে বললে,—আমি চললাম, আপনি বড় খারাপ লোক।

বিস্ময়ের সুরে বললাম—খারাপ? কেন, কি করলাম তোমার?

—আমি বলি নি তো কিছু। আমি যাই, আসর কোন্ দিকে? বাপরে, কত রাত হয়ে গিয়েচে! আমায় একটু এগিয়ে দিন না।

—তা পারবো না। আসরে অনেক লোক, তোমার সঙ্গে আমায় দেখতে পেলে কে কি বলবে! আমি পথ দেখিয়ে দিচ্চি—তুমি যাও। কোনো ভয় নেই, বাজারের মধ্যে চারিদিকে লোক, ভয় কিসের।

মেয়েটি চলে যেতে উদ্যত হলে আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলো। আমি খপ করে ওর হাত ধরে ওকে সেই চেয়ারখানাতে আবার বসিয়ে দিয়ে বললাম—কেন এসেছিলে, না বলে যাবার জো নেই পান্না,—না, এই নামই তো? রাগ করলে নাকি—ডাকনাম ধরে ডাকলাম বলে?

মেয়েটি হেসে বললে—ডাকুন না যত পারেন।

—তুমি এখানে এসে বসে আছ, তোমার সঙ্গের মেয়েটা কি ভাববে?

—ভাবুক সে। আমার তাতে কি?

—তুমি তো দেখছি খুব ছেলেমানুষ—তোমার কথার সুরেই তার প্রমাণ।

পান্না চোখের ভুরু ওপর দিকে দুবার তুলে আবার নামিয়ে চোখ নাচিয়ে কৌতুকের সুরে বললে—হুঁ-উ-উ?

শেষের দিকের জিজ্ঞাসার সুরটা নিরর্থক। কি সুন্দর হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে!

আমার হঠাৎ মনে হল ওকে আমি বুকে টেনে নিয়ে ওর ফুলের মতো লাবণ্যভরা দেহটা পিষে দিই বলিষ্ঠ বাহুর চাপে! মাথার মধ্যে রক্ত চন্ চন্ করে উঠলো। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি। এ অবস্থা ভাল নয়। ও এখান থেকে চলে যাক্। ছিঃ—

—পান্না, তুমি চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।

—আপনি বড় মজার লোক কিন্তু—আমি কেন এসেছিলাম জিজ্ঞেস করলেন না যে?

—তুমি বললে না তো আবার জিগ্যেস করে কি হবে? তুমি এক নম্বরের দুষ্টু—পান্না।

—'পান্না' কেন, আমার ভালো নামে ডাকুন না? সু-ধী-রা বা-লা—

—ওর চেয়ে পান্না ভালো লাগে—সত্যি বলচি।

আমিও সত্যি বলচি আপনাকে আজ রাত্রে—

এই পর্য্যন্ত বলেই কি একটা বলবার মুখে হঠাৎ থেমে গিয়ে ও সলজ্জ হেসে মুখ নীচু করে চুপি চুপি কি কতকগুলো কথা আপনা-আপনি বলে গেল।

—কি বললে?

—বলচি এই গিয়ে—আপনাকে আজ রাত্তিরে-এ-এ—

আঃ, লজ্জায় তো ভেঙে পড়লে। বলো না কি?

—আমার লজ্জা করে না বুঝি! আমি যাই—এগিয়ে দিন।

আমি উঠলাম। আমার সম্বিৎ ফিরে এসেচে। আমি চিকিৎসক, আমার ডাক্তারখানায় সমাগত একটি রোগিণীর সঙ্গে রাতদুপুরে বিশ্রম্ভালাপ শোভা পায় না আমার। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস হয়েচে। বিবাহিত ভদ্রলোক।

বললাম—চলো না, ওঠো। এগিয়ে দিয়ে আসি—

হরি ময়রার দোকান পর্যন্ত এসে দেখি আসরের দিকে তখনও মেলা লোকের ভিড়। কেউ পানবিড়ি খাচ্চে, কেউ জটলা করে গল্প করচে। স্থানীয় বাজারের লোকে এখনও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, পানবিড়ির দোকান এখনও খোলা।

পান্না নিজেই আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ কুণ্ঠায় ভদ্রঘরের বধূটির মত বললে—আপনি যান, লোকের ভিড় রয়েচে। আপনাকে দেখতে পাবে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি, ও চলে যাচ্চে—যেতে যেতে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—আজ আমাদের শেষ দিন—জানেন তো?

—জানি।

—আপনি আসবেন ?

—তা বলতে পারি নে—আজ এত রাত পর্য্যন্ত জেগে। কাল বাড়ীর ডাক্তারখানায় রুগী দেখতে হবে—

—সন্দের পর কাল আরম্ভ হবে তো ? আপনি আসবেন, কেমন তো ? তার পরেই মাথা দুলিয়ে বললে—ঠিক, ঠিক, ঠিক। যাই—

আমি কিছু বলবার আগেই পান্না হরি ময়রার দোকানের ছেঁচতলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফিরে চলে এলাম ডাক্তারখানাতে। মাথার মধ্যে কেমন করচে। পান্নার সঙ্গে জীবনের যেন অনেকখানি চলে গেল। জীবনকে এতদিনে কিছুই জানি নি, দেখি নি। শুধু ঘুরে মরেছি পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারি করে আর সনাতনদার মত গেঁয়ো লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে। আজ যেন মনে হল, এ জীবন একেবারে ফাঁকা, এতে আসল জিনিস কিছুই নেই। নিজেকে ঠকিয়েছি এতদিন।

মাঝি বললে—বাবু, বাড়ী যাবেন তো ? নৌকো ছাড়ি ?

—একটা শক্ত কেস্ আছে, যাবো কি না তাই ভাবচি।

—চলুন বাবু, কাল খাওয়া-দাওয়া করে চলে আসবেন।

কাঠের পুতুলের মত গিয়ে নৌকোতে উঠলাম। নৌকো ছাড়লো, আমি শুয়ে রইলাম চোখ বুজে কিন্তু কেবলই পান্নার মুখ মনে পড়ে,—তার সেই অদ্ভুত হাসি, সকুণ্ঠ চাউনি। লাবণ্যময়ী কথাটা বইয়ে পড়ে এসেছি এতদিন, ওকে দেখে এতদিন পরে বুঝলাম নারীর লাবণ্য কাকে বলে। কি যেন একটা ফেলে যাচ্ছি মঙ্গলগঞ্জের বারোয়ারি-তলায়, যা ফেলে আমি কোথাও গিয়ে শান্তি পাবো না।

মনে মনে একটা অদ্ভুত কল্পনা জাগলো।

নিজেই অবাক হয়ে গেলাম এ ধরনের কল্পনার সম্ভাব্যতায়—আমার এ ধরনের কল্পনার সম্ভাব্যতায়। ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছি, সংসার ছেড়ে দিয়েছি, পান্না যদি আমাকে চায় তবে ওকে নিয়ে চলে গিয়েছি সুদূর পশ্চিমে কোনো অজ্ঞাত ছোট শহরে। পান্নার সীমন্তে সিন্দুর, মুখে সেই হাসি…আমার সঙ্গে এক নির্জ্জন ছাদে…দুজনে মুখোমুখি…কেউ কোথাও নেই…কেউ আমাকে ডাক্তারবাবু বলে খাতির করবার নেই। এখানে আমার বংশগৌরব আমার সব স্বাধীনতা হরণ করেচে।…

কিসের বংশগৌরব, কিসের যশমান ?

ওকে যদি পাই ?

হয়তো তা আকাশ-কুসুম। ও সব আলেয়ার আলো, হাতের মুঠোয় ধরা দেয় না কোনো দিন। পান্না আমার হবে, এ কথা ভাবতেই আমার সারা দেহমনে যেন বিদ্যুতের

স্রোত বয়ে গেল। পান্না খাঁটি নারী, আমি এতদিন নারী দেখি নি। ওদের চিনতাম না। আজ বুঝলাম ওকে দেখে।

পান্না আজ আমার ডাক্তারখানায় কেন এসেছিল? ওষুধ নিতে নয়। না, ওষুধ নিতে? কিছুই বুঝলাম না ওর কাণ্ড। অসুখ কিছু ছিল না, মাথা ধরতে পারে হয়তো। কিন্তু যদি এমন হয়, ও ওষুধ নেবার ছল করে এসেছিল অভিসারে আমার কাছে? কিন্তু আবদুল হামিদ আর গোবিন্দ দাঁ সঙ্গে কেন?

নাঃ, কিছুই পরিষ্কার হল না।

আচ্ছা, যদি সত্যিই ও অভিসারে এসেছিল এমন হয়?

কথাটা ভাবতে আমার দেহমনে আবার যেন বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল। তাও কি সম্ভব? আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ, পান্না ষোল বছরের কিশোরী। অসম্ভব কি খুব? তবে এমন অনেক ঘটনার কথা জানি যেখানে এর চেয়েও বেশি বয়সে কিশোরীর প্রেম লাভ করেছিল, সে সব···

আমার মত গেঁয়ো ডাক্তারের অদৃষ্টে কি ওসব সম্ভব হবে? যা নাটক নভেলে পড়েছি, তা হবে আমার জীবনে মঙ্গলগঞ্জের মত অজ পাড়াগাঁয়ে?

মাথার মধ্যে কেমন নেশা···উঠে নদীর জল চোখে মুখে দিলাম। আমার শরীরের অবস্থা যেন মাতালের মত। মাঝি বললে—ডাক্তারবাবু, ঘুমোন নি?

বললাম—না বাপু, মাথা গরম হয়ে গিয়েচে না ঘুমিয়ে।

—চলুন বাবু, বাড়ী গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুম দেবেন এখন।

আমি তখন ভাবছি, এসে ভুল করেছি। না এলেই হোত।

যদি এমন কিছু ঘটে বাড়ী গিয়ে, কাল সন্দেবেলা মঙ্গলগঞ্জে আসা না ঘটে? পান্নার সঙ্গে আর দেখা হবে না, ও চলে যাবে কলকাতায়। তা হবে না, অমন ভাবে পান্নাকে আমি হারাতে রাজী নই।

বাড়ী এসে স্নান করে একটু মিছরির শরবৎ খেয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছি, এমন সময় বড় মুখুয্যের ছেলে হারান এসে বললে—শশাঙ্কদা, একবার আমাদের বাড়ী যেতে হচ্ছে—

—কেন হে, এত সকালে?

—জামাই এসেচেন, একটু চা খাবে তাঁর সঙ্গে সকালে।

—মাপ করো ভাই, কাল সারারাত ঘুমুই নি। মঙ্গলগঞ্জে শক্ত কেস্ ছিল—

—ভালো কথা, হ্যাঁ হে, মঙ্গলগঞ্জে নাকি বারোয়ারিতে ভালো খেমটা নাচ হচ্ছে, কে যেন বলছিল—

আমার বুকের ভেতরটা যেন ধড়াস করে উঠলো। জিব শুকিয়ে গেল হঠাৎ। এর কারণ কিছু নয়, মঙ্গলগঞ্জের কথা উঠতেই পান্নার মুখ মনে পড়লো···ওর হাসি···সেই অপূর্ব্ব লীলায়িত ভঙ্গি মনে পড়ে গেল···

আমি সামলে নিয়ে বললাম—বারোয়ারি? হ্যাঁ, হচ্চে শুনেছি .....

হঠাৎ আমার মনে হল খেমটা নাচ হচ্চে শুনে হারান যদি আজ আমার নৌকোতেই (কারণ আমি আজ যাবোই ঠিক করে ফেলেছি) মঙ্গলগঞ্জে যেতে চায় তবে সব মাটি। পান্নার সঙ্গে দেখা করার কোন সুবিধে হবে না ও আপদের সামনে, এমন কি, হয়তো নাচের আসরেই যেতে পারবো না।

সুতরাং ওপরের উক্তিটি শুধরে নেবার জন্যে বললাম—কিন্তু সে কাল বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েচে।

শেষ হয়ে গিয়েচে?

উদাসীন সুরে বলি—তাই শুনছিলাম। আমার তো ওদিকে যাওয়া-টাওয়া নেই—লোকে বলছিল—

হারান বললে—হ্যাঁ, তুমি আবার যাবে খেমটার আসরে নাচ দেখতে! তোমাকে আমি আর জানি নে! তা ছাড়া, তোমার সময়ই বা কোথায়? তাহলে চলো একটু চা খেয়ে আসবে।

—না ভাই, আমায় মাপ করো। হাতে অনেক কাজ আজকে—

একটু পরে সনাতনদা এসে বললে—কাল নাকি সারা রাত কাটিয়েচ মঙ্গলগঞ্জে? কি কেস ছিল?

বিরক্তির সঙ্গে বললাম—ও ছিল একটা—

—আজ যাবে নাকি আবার?

—এত খবর তোমায় দিলে কে? কেন বলো তো? গেলে কি হবে?

সনাতনদা একটু বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চাইলে, এই সামান্য প্রশ্নে আমার বিরক্তির কারণ কি ঘটতে পারে, বোধ হয় ভাবলে। বললে—না, না—তাই বলছিলাম—

—হ্যাঁ, যেতে হবে। কেন বলো তো?

যা ভয় করছিলাম, সনাতনদা বলে বসলো—আমাকে নিয়ে যাবে তোমার নৌকোতে? নাকি, ভালো বারোয়ারি গান হচ্চে মঙ্গলগঞ্জে। একটু দেখে আসতাম—

আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ করে উঠলো। বললাম—কে বললে ভালো? রামো, বাজে খেমটা নাচ হচ্চে, কলকাতার খেমটা-উলীদের—

সনাতনদা জানে, আমি নীতিবাগীশ লোক, সুতরাং আমার সামনে সে বলতে পারলে না যে খেমটা নাচ দেখতে যাবে। আমিও তা জানতাম। খেমটা নাচের কথা শুনে সনাতনদা তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—খেমটা? ঝাঁটা মারো! ও আবার ভদ্রলোকে দেখে। তুমি গিয়েছিলে নাকি?...নাঃ, তুমি আবার যাচ্ছ ওই দেখতে!

—গিয়েছিলাম একটুখানি।

সনাতনদা সবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—তুমি!

হেসে বললাম—হ্যাঁ, গো, আমি।

সনাতনদা ভেবে বললে—তা তোমাকে খাতিরে পড়ে যেতে হয়। পাঁচজনে বলে, তুমি হোলে ডাক্তারমানুষ—

সনাতনদা আর ও সম্বন্ধে কিছু বললে না। অন্য কথাবার্ত্তা খানিকক্ষণ বলে উঠে চলে গেল। আমি বাড়ীর ভেতর গিয়ে স্নানাহার করে নিয়ে ওপরে শোবার ঘরে যেতেই সুরবালা এসে ঘরের জানালা বন্ধ করে দিয়ে গেল। চোখে আলো লাগলে দিনমানে আমার ঘুম হয় না সে জানে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি নে, উঠলাম যখন তখন বেলা বেশি নেই। তখুনি সুরবালা চা নিয়ে এল, বললে—ঘুম হয়েচে ভালো? এর মধ্যে কাপাসডাঙা থেকে একটা রুগী এসেছিল, বলে পাঠিয়েচি, বাবু ঘুমুচ্চেন। তারা বোধ হয় এখনো বাইরে বসে আছে। শক্ত কেস্।

বললাম—আমাকে আজও মঙ্গলগঞ্জে যেতে হবে।

—আজও? কেন গা?

সুরবালা সাধারণতঃ এরকম প্রশ্ন করে না। খাঁটি মিথ্যে কথা ওর সঙ্গে কখনো বলি নি। সংক্ষেপে বললাম—দরকার আছে। যেতেই হবে।

—কাপাসডাঙায় যাবে না?

—না। যেতে পারা যাবে না।

এদিকে কাপাসডাঙার লোকে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলে। তাদের রুগীর অবস্থা খারাপ, যত টাকা লাগে তা দেবে, অবস্থা ভালো, আমি একবার যেন যাই। ভেবে দেখলাম কাপাসডাঙায় রুগী দেখতে গেলে সারা রাত কাটবে যেতে আসতে।

সে হয় না।

মাঝিকে নিয়ে সন্ধ্যার পরেই রওনা হই। মঙ্গলগঞ্জ পেঁছিবার আগে আমার বুকের মধ্যে কিসের ঢেউ যেন ঠেলে উঠচে বেশ অনুভব করি! মুখ শুকিয়ে আসচে। হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করচে। এ আবার কি অনুভূতি, আমার এত বয়স হোল, কখনও তো এমন হয় নি।

একটি ভয় মনের মধ্যে উঁকি মারছে। পান্না আজ হয়তো অন্য রকম হয়ে গেছে। আজ সে হয়তো আর আমাকে চিনতেই পারবে না। তা যদি হয়, সে আঘাত বড় বাজবে বুকে।

গোবিন্দ দাঁ দেখি ডাক্তারখানায় বসে।

আমায় দেখেই দাঁত বের করে বললে—হেঁ হেঁ ডাক্তারবাবু যে! এসেচেন?

—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার কিছু নয়। ভাগ্যিস আপনি এলেন?

—আমি? কেন অসুখ বিসুখ কারো?

গোবিন্দ দাঁ সুর নিচু করে বললে—অসুখ যার হবার, তার হয়েছে। একজন যে মরে। সকাল থেকে সতেরো বার এনকুয়ারি করচে ডাক্তারবাবু আজ আসবেন তো? আপনি না এলে তার অবস্থা যে কেষ্ট-বিরহে রাধার মত।

রাগের সুরে বললাম—যাও, কি সব বাজে কথা বলো—

গোবিন্দ দাঁ টেবিল চাপড়ে বললে—একটুও বাজে কথা নয়। মা কালীর দিব্যি। আবদুল হামিদকে তো জানেন? ঘোড়েল লোক! ও যতবার সে ছুঁড়ির সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছে, ততবার সে হাঁকিয়ে দিয়েছে। আমি একবার গিয়েছিলাম কখন আসর হবে জিজ্ঞেস করতে। আমাকে বললে—ডাক্তারবাবু আজ আসবেন তো? আমি যেমন বলেছি, তা তো জানি নে আসবেন কি না, অমনি মুখ দেখি কালো হয়ে গেল।

আমার বুকের ভেতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়চে। গোবিন্দ দাঁ হ্যাবাক জিংকের ব্যবসা করে, মনের খবর ও কি জানবে। জানলে এ সব কথা কি বলতো?

মুখে বললাম—ও সব কথা আমায় শুনিয়ে লাভ কি? যাও!

গোবিন্দ দাঁকে হঠাৎ একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বড় ইচ্ছে হল। কিন্তু জিজ্ঞেস করাটা উচিত কি না বুঝতে না পেরে একটু ইতস্তত করচি, দেখি ধূর্ত্ত গোবিন্দ দাঁ বললে—কিছু বলবেন?

—একটা কথা। কাল রাত্তিরে ওকে তোমরা এনেছিলে কেন? ঠিক কথা বলবে?

—আমি বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না। ও আমাকে বললে, ডাক্তারবাবু কোথায় থাকেন? আবদুল হামিদও ছিল আমার সঙ্গে। তাই নিয়ে এসেছিলাম, হয় না হয় জিজ্ঞেস করে দেখবেন আবদুল হামিদকে। একবার নয়, ও ক'বার জিজ্ঞেস করেচে, আপনি কোথায় থাকেন। তখন বললাম—কেন? ও বললে—হাত দেখাবো, অসুখ করেচে।

—ও কি করে জানলে আমি ডাক্তার? ও আসরে ছাড়া আমায় ত্থাখে নি?

—তা আমি জানি নে সত্যি বলচি, কাউকে হয়তো জিজ্ঞেস করে থাকবে।

কি একটা কথা বলতে যাবো এমন সময় বাইরে কে ডাকল—কে আছেন?

কম্পাউণ্ডার তখন আসে নি, আমি নিজেই বাইরে গিয়ে দেখি একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বললাম—কোত্থেকে আসচো? মনে হোল ওকে আমি খেমটা নাচের দলেই তবলা বাজাতে দেখেছি।

লোকটা বললে—ডাক্তারবাবু আছেন?

বললাম—কি দরকার?

—দরকার আছে।

কি মনে হোল, বললাম—না, আসেন নি।

—ও! আসবেন কি?

—তা বলতে পারি নে।

গোবিন্দ দাঁ লোকটাকে দেখে নি, ঘরের মধ্যে ঢুকতেই আমায় জিজ্ঞেস করলে—কে? নেই বলে দিলেন কেন? হয়তো শক্ত রোগ।

—তুমি থামো না! আমার ব্যবসা আমি ভালো বুঝি।

এমন সময় নেপাল প্রামাণিক এসে হাত জোড় করে বললে—একটা অনুরোধ। বড়বৌ বিশেষ করে ধরেচে, যাও ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসো। রাত্তিরে যদি এখানে থাকতে হয়, তবে চলুন আমার কুটিরে। একটু কিছু খেয়ে আসবেন।

বেশ লোক এই নেপাল ও তার স্ত্রী। কিন্তু আজ আমার যাওয়ার তত ইচ্ছে ছিল না, গোবিন্দ দাঁ বললে—যান না, নাচ শুরু হবে সেই দশটায়। হ্যাঁ, নেপালদা, বলি আমাদের মত গরীব লোকের কি জায়গা হয় না তোমাদের বাড়ী?

নেপাল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো না, চলো।

আমরা সবাই মিলে নেপালের বাড়ী এসে চা খেলাম; চায়ের সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা ও নারকোল কোরা। একটু পরে গোবিন্দ দাঁ উঠে চলে গেল। আমি একাই বসে আছি; এমন সময়ে গোবিন্দ দাঁ আবার এল, আমায় বললে—একটু বাইরে আসুন।

—কি?

—আপনি সেই যে লোকটাকে ডাক্তার নেই বলে দিয়েছিলেন, সে কে জানেন? সে হোল ওদের খেমটার দলের লোক। আপনি আসবেন না শুনে পান্নার মন ভারী খারাপ হয়েছে।

—চুপ চুপ। এখানে কি ওসব কথা? কে বললে তোমায়?

—আরে গরীবের কথাটাই শুনুন। তিনি নিজেই আমাকে এই মাত্তর ডেকে বললেন—ডাক্তারবাবু এসেছেন কি না। দেখে আসচি বলে তাই চলে এলাম আপনার কাছে। এখন একটা মজা করা যাক। আমি গিয়ে বলি আপনি আসেন নি।

—তারপর?

—তারপর আপনি হঠাৎ আসরে গিয়ে বসে প্যালা দিতে যাবেন। বেশ মজা হবে। কেমন?

—না, ও আমার ভালো লাগে না। ও করে কি হবে?

—করুন, করুন। আপনার হাতে ধরচি।

—বেশ, যাও, তাই হবে।

নেপালের ভক্তিমতী স্ত্রী খুব যত্ন করে আমাকে খাওয়ালো। বড় ভালো মেয়ে। সামনে বসে কখনো কথা বলে না, কিন্তু আড়াল থেকে সব সুখ-সুবিধে দেখে, গরম গরম লুচি এক একখানা করে ভেজে পাতে দেওয়া, দুধ গরম আছে কিনা দেখা, সব বিষয় নজর। দুদিন এখানে খেলাম, প্রতিদানে কি দেওয়া যায় তাই ভাবছি। একটা কিছু করা দরকার।

আহারাদির ঘণ্টা দুই পরে আসর বসলো। আমাকে গোবিন্দ দাঁ ডাকতে এল। ওর সঙ্গে গিয়ে আসরে বসলাম।

একটু পরে পান্না ও তার সঙ্গিনী সাজসজ্জা করে আসরে ঢুকলো। আমি লক্ষ্য করে দেখচি, পান্না এসেই আসরের চারিদিকে একবার দেখলে। আমি বসেচি আবদুল হামিদের

পেছনে। প্রথমটা আমায় ও দেখতে পেলে না। ওর কৌতূহলী চোখ দুটি যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল, সেটা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

পান্না গাইতে গাইতে কখনও পিছিয়ে যায়, কখনো এগিয়ে যায়। একটু পরে আমার মনে হল, ও সামনের দিকে মুখ উঁচু করে চেয়ে চেয়ে দেখচে। গোবিন্দ দাঁ আমাকে ঈষৎ ঠেলা দিয়ে মৃদুস্বরে কি বললে, ভালো শুনতে পেলাম না। ও কি সত্যি সত্যি আমাকে খুঁজচে? আমার কত বয়স হয়েচে, আর ও কতটুকু মেয়ে। আমার বিরহ অনুভব করবে ও মনের মধ্যে!

আর একটা নেশা আমায় পেয়ে বসলো। মদের নেশার চেয়েও বেশি। নাচের আসরে বসে আমি দুনিয়া ভুলে গেলাম। কেউ কোথাও নেই। আছে পান্না, আছি আমি। ঐ সুন্দরী কিশোরী আমাকে ভালোবাসে! এ বিশ্বাস করি নি এখনও মনে প্রাণে। তবুও ভাবতে ভালো লাগে, নেশা লাগে।

হয়তো এটা আমার দুর্ব্বলতা। আমার বুভুক্ষিত হৃদয়ের আকৃতি। কখনো কেউ আমায় ওভাবে ভালোবাসেনি। সুরবালা? সে আছে, এই পর্য্যন্ত। কখনো তাকে দেখে আমার এমন নেশা আসে নি মনে।

নাচের আসর থেকে উঠে চলে এলাম, গোবিন্দ দাঁর প্রতিবাদ সত্ত্বেও। ওরা কি বুঝবে আমার মনের খবর? ওরা স্থূল জিনিস দেখতে অভ্যস্ত, স্থূল জিনিস নিয়ে কারবার করতে অভ্যস্ত। ওদের ভাষা আমি বুঝি না।

ডাক্তারখানায় এসে দেখি, কেউ নেই। কম্পাউণ্ডার গিয়ে বসেছে খেমটার আসরে। চাকরটাও তাই। নিজে আলো জ্বালি, বসে বসে স্টোভ ধরিয়ে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। পুরনো খবরের কাগজ একখানা পড়ে ছিল টেবিলে, তাই দেখি উলটে পালটে। ওই গোবিন্দ দাঁটা আবার এসে টানাটানি না করে। ও কি বুঝবে আমার মনের খবর?

মাঝি কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে বললে—বাবু, চা খাচ্চেন, একটু দেবেন মোরে?

—কিসে করে খাবে? নিয়ে এসো একটা কিছু—

—নারকোলের মালা একটা আনবো বাবু?

—যা হয় করো।

—বাবু, বাড়ী যাবেন না।

—না সকালের দিকে খোঁজ করিস। এখন ঘুমিয়ে নিগে যা—

মাঝির সঙ্গে কথা বলে যেন আমি বাস্তব জগতের সংস্পর্শে এলাম। যে জগতে আমি গ্রাম্য-ডাক্তারি করে খাই, সেখানে প্রেমও নেই, চাঁদের আলোও নেই, কোকিলের ডাকও নেই। কড়া চা খেয়ে ভাবি একটু ঘুমুবো, মাঝিও চলে গেল, সম্ভবত ঘুমুতে গেল। এমন সময় নেপাল দোর ঠেলে ঘরে ঢুকলো।

বললাম—কি নেপাল, এত রাতে?

—বাবু, আপনি শোবেন তা ভাবলাম এখানে মশারি নেই—আমার বাড়ী যদি—বৌ বলে দিলে—

—তোমার বউ কোথায় ? খেমটার আসরে নাকি ?

নেপাল জিভ কেটে বললে—রামোঃ, বড়বৌ কক্ষনো ওসব শুনতে যায় না।

—শুনে বড় সুখী হলাম নেপাল। না যাওয়াই ভালো।

—বাবু, একটা কথা বলি, আবদুল হামিদ আর গোবিন্দ দাঁর সঙ্গে আপনি মিশবেন না। ওরা লোক ভালো না।

—সে আমি জানি !

—বড় বৌও বলছিল—

—কি বলছিলেন ?

—বলছিল, ডাক্তারবাবুকে বলে দিও যেন ওদের সঙ্গে না মেশেন। ওরা কুপথে নিয়ে যাবে তাঁকে। কত লোককে যে ওরা খারাপ করেচে আমার চোখের ওপর, তা আর কি বলবো আপনাকে ডাক্তারবাবু। এই বাজারে ছিল হরি পোদ্দারের ছেলে বিধু, তাকে ওরা মদে মেয়েমানুষে সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দিল।

—ও সব কিছু নয় নেপাল। নিজের ইচ্ছে না থাকলে কেউ কখনো কোথাও যায় না। ওসব ভুল কথা। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আমায় খারাপ করতে পারে না জেনো। আমি যখন ওপথে নামবো, তখন নিজের ইচ্ছেতেই যাবো। লোকে বললেও যাবো, না বললেও যাবো।

—না, আমি এমনি কথার কথা বলচি—মশারি দিয়ে যাই ?

—আনতে পারো।

নেপাল চলে যাবার আধঘণ্টা পরে আবার কে দোর ঠেলচে দেখে খিল খুলে দিতে গেলাম। গিয়ে দেখি পান্না দাঁড়িয়ে বাইরে। আসরের সাজ পরনে। ঝলমল করচে রূপ, মুখে পাউডার; জরিপাড় চাঁপা রঙের শাড়ি পরনে, এক গোছা সোনার চুড়ি হাতে, ছোট্ট একটা মেয়েলি হাত-ঘড়ি চুরির গোছার আগায়, চোখে সুর্মা। সঙ্গে কেউ নেই।

অবাক হয়ে বললাম—কি ?

ও 'কিছু না' বলে ঘরে ঢুকলো। বসলো একখানা চেয়ার নিজেই টেনে। আমার বুকের ভেতর তখন কি রকম করচে। আমি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়েই আছি। পান্নাও কোন কথা বলে না। আমি একবার বাইরে মুখ বাড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলাম, কেউ নেই।

ফিরে এসে একটু কড়াস্বরে বললাম—কি মনে করে ?

পান্না আমার মুখের দিকে চোখ তুলে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর আবার চোখ নিচু করে ঘরের মেঝের দিকে চাইল। কোন কথা বললে না। ঈষৎ হাসির রেখা ওর ওষ্ঠের প্রান্তে।

আমি বললাম—কিছু বললে না যে ?

—এলাম এমনি।

বলেই ও একটু হেসে আবার মুখ নিচু করে মেঝের দিকে চাইলে।

বললাম—তুমি কি করে জানলে আমি এখানে?

—আমি জানি।

—জানো মানে কি? কে বলেচে?

ও ছেলেমানুষের মত দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে—বলব না।

আমি রাগের সুরে বললাম—তুমি না বললেও আমি জানি। আবদুল হামিদ, না হয় গোবিন্দ দাঁ।

পান্না এবার আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দৃঢ়স্বরে বললে—না।

ও সত্যি কথা বলচে আমার মনে হল। কৌতূহলের সুরে বললাম—তবে কে আমি জানতে চাই।

পান্না মুষ্টিবদ্ধ হাতে নিজের বুকে একটা ঘুষি মেরে বললে—এই!

—কি এই?

—এইখানে জানতে পারে!

হঠাৎ কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনি তা বুঝবেন না। বলেই আবার ও মুখ নিচু করে মেজের দিকে চাইলে। এবার শুধু মুখ নিচু নয় ঘাড় সুদ্ধ নিচু। সে এক অদ্ভুত ভঙ্গি। ওর অতি চমৎকার সুডোল লাবণ্যময় গ্রীবাদেশে সরু সোনার হার চিক চিক্ করচে, এলানো নামানো খোঁপা থেকে হেলা গোছা চুল এসে ঘাড়ের নিচের দিকে ব্লাউজের কাপড়ে ঠেকেচে। ওর মুখ দেখতে পাচ্চি নে—মনে হচ্চে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী লাবণ্যবতী কিশোরী আমার সামনে। ধরা দেবার সমস্ত লক্ষণ ওর ঘাড় নিচু করার ভঙ্গির মধ্যে সুপরিস্ফুট। অল্পক্ষণেরু জন্যে নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম, কি হোত এ অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলে, মানে আর কিছুক্ষণ স্থায়ী হলে, তা আমি বলতে পারি নে, সে সময় আমার মনে পড়লো নেপাল মশারি নিয়ে যে-কোনো সময়ে এসে পড়তে পারে। আমি ব্যস্তভাবে ওর হাত ধরে চেয়ার থেকে জোর করে উঠিয়ে বললাম—তুমি এক্ষুনি চলে যাও—

ও একটু ভয় পেয়ে গেল। বিস্ময়ের সুরে বললে—এখুনি যাবো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এখুনি।

—আমায় তাড়িয়ে দিচ্চেন?

—এখুনি নেপাল আসবে মশারি নিয়ে। ওর বাড়ী থেকে মশারি আনতে গেল আমার জন্যে।

পান্নার চোখে ভয় ও না-বোঝার দৃষ্টিটা চকিতে কেটে গেল। ব্যাপারটা তখন ও বুঝতে পেরেচে। বললে—আপনি আসরে চলুন।

—না।

—কেন যাবেন না? আমি মাথা কুটবো আপনার সামনে এখুনি। আসুন।

—না।

—তবে দেখবেন? এই দেখুন—

সত্যিই ও হঠাৎ নিজের শরীরকে মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে মেজের ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে যেতেই আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—থাক্ থাক্ যাচ্ছি আসরে—তুমি যাও।

পান্না কোনো কথাটি আর না বলে ভালো মানুষের মত চলে গেল।

একটু পরেই নেপাল মশারি নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

বললে—কোথায় চললেন? ঘরে কিসের গন্ধ!

—কি?

নেপাল মুখ ইতস্তত ফিরিয়ে নাক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস টেনে টেনে বললে—সেণ্ট্ মেখেছেন বুঝি? সেণ্টের গন্ধ।

—তা হবে।

পান্নার কাণ্ড। সস্তা সেণ্ট মেখে এসে ঘরময় এই কীর্ত্তি করে গিয়েছে। তবুও গন্ধটা যেন বড় প্রিয় আমার কাছে। ও যেন কাছে কাছে রয়েছে ওই গন্ধের মধ্যে দিয়ে।

বললাম—শোব না। একটু আসরে যাচ্ছি।

—কি দেখতে যাবেন ডাক্তারবাবু! যাবেন না।

—তা হোক, কানের কাছে গোলমালে ঘুম হয় না। তার চেয়ে আসরে বসে থাকা ভালো।

—চলুন আমার বাড়ী শোবেন। বড়বৌ বড় খুশী হবে এখন।

—না। আসরে যাই একটু—

নেপালের ওপর মনে মনে বিরক্ত হই। তুমি বা তোমার বড়বৌ আমার গার্জ্জেন নয়; আমিও কচি খোকা নই। বার বার এক কথা বলবার দরকার কি?

একটু পরে আমি আসরে গিয়ে বসলাম। সামনেই পান্না। কিন্তু ওর দিকে যেন চাইতে পারচি নে। চোখের কোণ দিয়ে ওকে দেখচি। গোবিন্দ দাঁ, আবদুল হামিদ সবাই বসে। ওদের দলের মাঝখানে বসে আমার লজ্জা করতে লাগলো পান্নার দিকে চাইতে। পান্নাও আমার দিকে চেয়ে প্রথম বার সেই যে একবার মাত্র দেখলে, তারপর সেও আর আমার কাছে এলোও না, আমার দিকে ফিরেও চাইলে না।

অনেকক্ষণ পরে একবার চাইলে, ভীরু কিশোরীর সলজ্জ চাউনি তার প্রণয়ীর দিকে। এই চাউনি আমায় মাতাল করে দিলে একেবারে, আমার অভিজ্ঞতা ছিল না, ভগবান জানেন সুরবালা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের দিকে কখনো খারাপভাবে চোখ মেলে চাই নি বা প্রেম করি নি। পাড়াগাঁয়ে ওসব নেইও অতশত। সুযোগ সুবিধার অভাবও বটে, তা ছাড়া আমার মত নীতিবাগীশের এদিকে রুচিও ছিল না। সলজ্জ লুকানো চাউনির অদ্ভুত মাদকতা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই আমার থাকবার কথা নয়। আমার হঠাৎ বড় আনন্দ হল। কেন

আনন্দ, কিসের আনন্দ সে সব আমি ভেবে দেখিনি, ভেবে দেখবার প্রবৃত্তি তখন আমার নেইও। অত্যন্ত আনন্দে গা-হাত-পা যেন বেলুনের মত হাল্‌কা হয়ে গেল। আমি যেন এখনি আকাশে উড়ে যেতে পারি। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষ এই মুহূর্ত্তে যদি কেউ থাকে তবে সে আমি। কারণ পান্নার ভালবাসা আমি লাভ করেছি।

ওই চাউনি আমায় বুঝিয়ে দিয়েচে সে কথা।

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাগল করেচে ওই চিন্তা! আমার মনের মধ্যে-আর একটা বুভুক্ষু মন ছিল, তার এতদিন সন্ধান পাইনি, আজ সে মন জেগে উঠেচে পান্নার মত রূপসী কিশোরীর স্পর্শে। আমার মত মধ্যবয়সী লোককে সতেরো-আঠারো বছরের একটি সুন্দরী কিশোরী ভালোবেসে ফেলেচে—এ চিন্তা এক বোতল উগ্র সুরার চেয়েও মাদকতা আনে। যার ঠিক ওই বয়সে ওই অভিজ্ঞতা হয় নি, সে আমার কথা কিছুই বুঝতে পারবে না। জীবনের সব কিছু অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। সে রস যে পায় নি, হাজার বর্ণনা দিলেও সে বুঝতে পারবে না সে রসের ব্যাপার। এই জন্যেই বলেচে, অনধিকারীর সঙ্গে কোন কথা বলতে নেই।

এমন একটি অনধিকারী এই গোবিন্দ দাঁ! আবদুল হামিদটাও তাই। স্থূল মনে ওদের অন্য কোন রসের স্পর্শ লাগে না, স্থূল রস ছাড়া। আবদুল হামিদ দাঁত বের করে বললে—আপনি বড় বেরসিক ডাক্তারবাবু—

আমি বললাম—কেন?

—অমন মাল নিয়ে গেলাম আপনার ডাক্তারখানায়—আর আপনি—

—ওসব কথা এখানে কেন।

—তাই বলচি।

গোবিন্দ দাঁ বললে—ছুঁড়িটা কিন্তু চমৎকার দেখতে, যাই বলুন ডাক্তারবাবু। আর কি ঢং, কি হাসি মুখের, দেখুন না চেয়ে!

আবদুল হামিদ বললে—ডাক্তারবাবু ওর ওপর কেমন চটা। কই, আপনি তো ওর দিকে ফিরেও চাইচেন না? অথচ দেখুন, আসর সুদ্ধ লোক ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে—

আমি যে কেন ওর দিকে চাইচি না, কি করে বুঝবে এই সব স্থূলবুদ্ধি লোক। আমি সব দিকে চাইতে পারি, শুধু চাইতে পারি না পান্নার মুখে। পান্নাও পারে না আমার দিকে চাইতে। এ তত্ত্ব বোঝা এদের পক্ষে বড়ই কঠিন।

আবদুল হামিদকে বললাম—বক্ বক্ না করে চুপ করে থাকতে পারো না?

গোবিন্দ দাঁ বললে—ডাক্তারবাবু আমাদের সাধুপুরুষ কিনা, ওসব ভাল লাগে না ওঁর। ও রসে বঞ্চিত।

আমি উঠেই চলে যেতাম আসর থেকে, শুধু পান্নার চোখের মিনতি আমাকে আটকে রেখেচে ওখানে। ওদের কথাবার্ত্তা আমার ভালো লাগছিল না মোটে।

আবদুল হামিদ আমার সামনে রুমালে বেঁধে দুটাকা প্যালা দিলে—আমাকে দেখিয়ে দিলে। আমি পারলাম না প্যালা দিতে। পান্নার সঙ্গে সেরকম ব্যবসাদারি করতে আমার বাধে।

আমি বললাম—এ ক'দিনে যে অনেক টাকা প্যালা দিলে আবদুল—

আবদুল হামিদ বললে—টাকা দিয়ে সুখ এখানে, কি বলেন ডাক্তারবাবু? কত টাকা তো কতদিকে যাচ্ছে।

—সে তো বটেই, টাকা ধন্য হয়ে গেল।

—ঠাট্টা করচেন বুঝি? আপনিও তো টাকা দিয়েচেন।

—কেন দেবো না?

—তবে আমাকে যে বলচেন বড়?

—কিছু বলচি নে। যা খুশি করতে পারো।

গোবিন্দ দাঁ বললে—ওসব কথা বোলো না ডাক্তারবাবুকে। উনি অন্য ধাতের লোক। রসের ফোঁটাও নেই ওঁর মধ্যে।

আবদুল একচোট হো হো করে হেসে নিয়ে বললে—ঠিক কথা দাঁ মশায়। অথচ বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট। আমাদের এ বয়সে যা আছে, ওঁর তাও নেই।

আমি কাউকে কিছু না বলে ডিস্‌পেন্‌সারিতে চলে গেলাম। মাঝিটা অঘোরে ঘুমুচ্চে। তাকে আর ওঠালাম না। নিজেরও ঘুম পেয়েচে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে এমন একটা গোলমালের সৃষ্টি করেচে যে ঘুম প্রায় অসম্ভব। আমি ব্যাপারটাকে ভালো করে ভেবে দেখবার অবকাশ পেয়েও পাচ্ছিনে। মন এখান থেকে একটা ভালো টুকরো, ওখান থেকে আর এক টুকরো নিয়ে আস্বাদ করেই মশগুল, সমস্ত জিনিসটা ভেবে দেখবার তার সময় নেই।

এমন সময় দোরে মৃদু ঘা পড়লো। আমার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। আমি বুঝেচি কে এত রাত্রে দরজায় ঘা দিতে পারে।

পান্না গায়ে একখানা সিল্কের চাদর। খোঁপা এলিয়ে কাঁধের ওপর পড়েচে; চোখ দুটোতে উত্তেজনা ও উদ্বেগের দৃষ্টি। সে যেন আশা করে নি আমায় এখন দেখতে পাবে। দেখে যেন আশ্বস্ত হয়েচে। ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আমি বললাম—কি?

পান্না চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, একবার ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, বললে—এলাম আপনার এখানে।

—তা তো দেখতে পাচ্ছি, কি মনে করে?

—দেখতে এসেছি, মাইরি বলছি।

—বেশ। দেখে চলে যাও—

—তাড়িয়ে দিচ্চেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি বড় নিষ্ঠুর, সত্যি—

আমি হেসে ফেললাম। বললাম—আমি না তুমি? তুমি জান এখানে আসা কত অন্যায়?

—তবুও আসি কেন, এই তো ?

—ঠিক তাই।

—যদি বলি, না এসে থাকতে পারি নে ?

—আমার বিশ্বাস হয় না।

—কি করলে বিশ্বাস হয় ? আমি এই দেয়ালে মাথা কুটবো। দেখুন—

পান্না সত্যিই দেয়ালের দিকে এগিয়ে যায় দেখে আমি গিয়ে ওর হাত ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে কি হোল, তীব্র একটা বৈদ্যুতিক স্পর্শে যেন আমার সারা দেহ ঝিমঝিমিয়ে উঠলো। সুরবালাকে ছাড়া আমি কোন মেয়েকে স্পর্শ করি নি তা নয়। আমি ডাক্তার মানুষ, ব্যবসার খাতিরে কতবার কত মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে রোগ পরীক্ষা করতে হয়েছে, কিন্তু এমন বৈদ্যুতিক্ তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় নি সারা দেহে।

পান্না ফিক্ করে হেসে বললে—ছুঁলেন যে বড় ?

বললাম—কেন ছোঁব না ? তুমি মেথর নও তো—

—আপনার চোখে তাদের চেয়েও অধম।

—বেশ, যদি তাই হয়, তবে এলে কেন ?

—ওই যে আগে বললাম, আমার মরণ, থাকতে পারি নি।

—কেন, গোবিন্দ দাঁ, আবদুল হামিদ ?

—আমি ঠিক এবার মাথা কুটবো আপনার পায়ে। আর বলবেন না ও কথা।

পান্না খুব দৃঢ়স্বরে এই কথাগুলি বললে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে আবার।

আমি বললাম—কি দেখচো ?

—ঘরে কেউ নেই ? আপনি একা ?

—কেন বল তো ?

—তাই বলচি।

—না। মাঝি ঘুমুচ্চে বাইরের বারান্দায়।

—আপনার বাড়ী কোথায় ?

—এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। নৌকো করে যাতায়াত করি।

—আপনার নৌকোর মাঝি ? ওকে বিদায় দিন।

—বা রে, কেন বিদেয় করবো ?

পান্না মুখ নিচু করে রইল। জবাব দিলে না আমার কথার। আমি বললাম—শোনো, তুমি এখান থেকে যাও।

পান্না বললে—তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?

—দিচ্ছিই তো।

—আচ্ছা, আপনার মনে এতটুকু কষ্ট হয় না যে আমি যেচে যেচে—

এই পর্য্যন্ত বলেই পান্না হঠাৎ থেমে গেল। ওর ব্রীড়ামূর্চ্ছিত হাসিটুকু বেশ দেখতে।

আমি বললাম—আচ্ছা, বসো পান্না।

পান্না মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসলে। চোখের চাউনিতে আনন্দ। যে চেয়ার-খানা ধরে সে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই চেয়ারটাতেই বসে পড়লো। ঘরের কোনো দিকে কেউ নেই। নির্জ্জন রাত্রি। বর্ষার মেঘ জমেছে আকাশে শেষ রাতের শেষ প্রহরে, খোলা জায়গা দিয়ে দেখতে পাচ্চি। পান্না এত কাছে, এই নির্জ্জন স্থানে, নিজে সেধে ধরা দিতে এসেছে। আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো। বৃদ্ধ হয়ে পড়ি নি এখনো। পান্না চেয়ারে বসে সলজ্জ হাসি হাসলে আবার। ওর মুখে এমন হাসি আমি আজ রাত্রেই প্রথম দেখেচি। পুরুষের সাধ্য নেই এই হাসির মোহকে জয় করে। চেয়ারের হাতলে রাখা পান্নার সুডৌল, সুগৌর, সালঙ্কার বাহু আমার দিকে ঈষৎ এগিয়ে দিলে হয়তো অন্যমনস্ক হয়েই। কেউ কোনো কথা বলচি না, ঘরের বাতাস থম থম করছে—যেন কিসের প্রতীক্ষায়। নাগিনী কুহক দৃষ্টিতে আকর্ষণ করচে তার শিকারকে।

এমন সময়ে বাইরের বারান্দাতে মাঝিটার জেগে ওঠবার সাড়া পাওয়া গেল। সেই হাই তুলে তুড়ি দিচ্চে, এর কারণ ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি এসেচে বাইরে। বৃষ্টির ছাটে মাঝির ঘুম ভেঙেচে।

আমার চমক ভেঙ্গে গেল, মোহগ্রস্ত ভাব পলকে কেটে যেতে আমি চাঙ্গা হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পান্নাও উঠে দাঁড়ালো। শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—ও কে?

—আমার মাঝি। সেই তো যার কথা বলেছিলাম খানিক আগে।

—ও ঘরে আসবে নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—আমি তবে এখন যাই। আপনি যাবেন, না থাকবেন?

—যাবো।

—না, যাবেন না। আজ আমাদের শেষ দিন। কাল চলে যাবো। আপনাকে থাকতে হবে। আমার মাথার দিব্যি। আমি আসবো আবার। কখনো যাবেন না।

হেসে বললাম—তুমি হিপনটিজম্ করা অভ্যেস্ করেচ নাকি? ও রকম বার বার করে একটা কথা বলচো কেন?

—সে আবার কি?

—সে একটা জিনিস। তাতে যে-কোনো লোককে বশ করা যায়।

—সত্যি? শিখিয়ে দেবেন আমাকে সে জিনিসটা?

মনে মনে বললাম—সে আমাকে শেখাতে হবে না। সে তুমি ভীষণভাবে জানো।

পান্না সামনের দোর খুলে বেরিয়ে গেল চট্ করে।

রাত কতটা ছিল আমার খেয়াল হয়নি। সে খেয়াল ছিলও না। পান্না চলে গেলে মনে

হল আমার সমস্ত সত্তা যেন ও আকর্ষণ করে নিয়ে চলে গেল। মেয়েমানুষের আকর্ষণে এমন হয় তা কোনো দিন আমার ধারণা নেই। সুরবালাও তো মেয়েমানুষ, কিন্তু তার আসঙ্গ-লিপ্সা আমাকে এমন কুহকজালে ফেলে নি কোনো দিন। মনের মধ্যে পান্নার চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা স্থান পায় তার সাধ্য কি। জীবনের এ এক অদ্ভুত ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা। আজ মনে পড়লো, রামপ্রসাদ ও শান্তির কথা। বেচারী রামপ্রসাদের বোধ হয় এমনি অবস্থা হয়েছিল, তখন আমার অমন অবস্থা হয় নি, আমি ওর মনের খবর কেমন করে জানবো ?

পান্নার কি আছে তাও জানি না। এমন কিছু অপূর্ব্ব ধরনের রূপসী সে নয়। অমন মেয়ে আর কখনও দেখি নি, এ কথাও অবিশ্বাস্য। সুরবালা যখন নববধূরূপে এসেছিল আমাদের বাড়ী, তখন ওর চেয়ে অনেক রূপসী ছিল, এখন অবিশ্যি তার বয়েস অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে ; এখন আর তেমন রূপ নেই। কিন্তু ওসব কিছু নয় আমি জানি। পান্নার রূপ ওর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, ওর মুখের শ্রীতে, ওর চোখের চাউনিতে, ওর মাথার চুলের ঢেউ-খেলানো নিবিড়তায়, ওর চটুল হাসিতে, ওর হাত-পায়ের লাস্যভঙ্গিতে। মুখে বলা যায় না সে কি। অথচ তা পুরুষকে কি ভীষণভাবে আকর্ষণ করে—আর আমার মত পুরুষকে, যে কখনও ছাত্রবয়সেও মেয়েদের ত্রিসীমানা মাড়ায় নি। মেডিকেল কলেজে পড়বার সময় মিস রোজার্স বলে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্সকে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে কত দ্বন্দ্ব, কত নাচানাচি, কত রেষারেষি চলতো। কে তাকে নিয়ে সিনেমাতে বেরুতে পারে, কে তাকে একদিন হোটেলে খাওয়াতে পারে—এই নিয়ে কত প্রতিযোগিতা চলতো—আমি ঘৃণার সঙ্গে দূর থেকে সে সুন্দর-উপসুন্দর যুদ্ধ দেখেছি। কিন্তু আমার মনের অবস্থা যে কখনও এমন হতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

এখন বুঝেচি, মেয়েদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে, সব মেয়ে সব পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। কে কাকে যে টানবে, সে কথা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। আচ্ছা, শান্তিও তো চটুল মেয়ে আমাদের গ্রামের, শুনতে পাই অনেক পুরুষকে সে নাচিয়েচে, কিন্তু একদিনও তাকে বোন ছাড়া অন্য চোখে দেখি নি।

•

মাঝি উঠে এসে বললে—বাবু, বাড়ী যাবেন নাকি ?

—না, আজ আর যাবো না।

—বাড়ীতে ভাববেন।

—তুই যা না কেন, আমি একখানা চিঠি দিচ্চি।

—তার চেয়ে বাবু, আমি বলি, আপনি চলুন না কেন। আমি আবার আপনাকে দুপুরের পর পৌঁছে দেবো।

—আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি, তুই বাইরে বোস্।

ফরসা হয়ে গেল রাত। সঙ্গে সঙ্গে রাতের মোহ যেন খানিকটা কেটে গেল। মনে

মনে ভাবলাম—যাই না কেন বাড়ীতে। সুরবালার সঙ্গে দেখা করে আবার আসবো এখন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না, নিয়তির ফল বোধ হয় খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। যদি যেতাম বাড়ীতে মাঝির কথায়, তবে হয় তো ঘটনার স্রোত অন্য দিকে বইতো। কিন্তু আমি ডাক্তারি পাশ করেছিলাম বটে মেডিকেল কলেজ থেকে, তবুও আমি মূর্খ। ডাক্তারি শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্র আমি পড়ি নি, ভালো কথা কোনো দিন আমায় কেউ শোনায় নি, জীবনের জটিলতা ও গভীরতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আমার। সরল ও অনভিজ্ঞ মন নিয়ে পাড়াগাঁয়ের নিরক্ষর রোগীদের হাত দেখে বেড়াই।

যাওয়া হলো না, কারণ গোবিন্দ দাঁ ও আবতুল হামিদ এসে প্রস্তাব করলে আজ একটা বনভোজনের আয়োজন করা যাক। আমি দেখলাম যদি পিছিয়ে যাই তবে ওরা বলবে, ডাক্তার টাকা দিতে হবে বলে পিছিয়ে গেল। ওদের মঙ্গলগঞ্জ থেকে বছরে অনেক টাকা আমি উপার্জ্জন করি, তার কিছু অংশ ন্যায্যত আমোদ-প্রমোদের জন্যে দাবি করতে পারে।

বললাম—কি করতে চাও? যা চাও দেবো।

আবতুল হামিদ বললে—ভালো একটা ফিষ্টি।

গোবিন্দ দাঁ বললে—আপনার নৌকোটা নিয়ে চলুন মহানন্দ পাড়ার চরে। তুটো মুরগি যোগাড় করা হয়েচে, আরও তুটো নেবো। পোলাও, না ঘি-ভাত, না লুচি যা-কিছু বলবেন আপনি।

আমি বললাম—আমি দাম দিয়ে দিচ্ছি জিনিসপত্তরের। তবে আমাকে জড়িও না।

তুজনেই সমস্বরে হৈ চৈ করে উঠলো। তা কখনো নাকি হয় না। আমাকে বাদ দিয়ে তারা স্বর্গে যেতেও রাজী নয়।

গোবিন্দ দাঁ বললে—কেন, মুরগিতে আপত্তি? বলুন তো বাদ দিয়ে সেখহাটি থেকে উত্তম মণ্ডলের ভেড়া নিয়ে আসি? পনেরো সের মাংস হবে।

আমি বললাম—আমায় বাদ দাও।

—কেন, বলুন।

খুব সামলে গেলাম এ সময়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল আর একটু হলে যে, আমার মন ভালো নয়। ভাগ্যিস্ সে কথা উচ্চারণ করি নি। ওরা তখুনি বুঝে নিত। ঘুঘু লোক সব। বললাম—শরীর খারাপ হয়েচে।

গোবিন্দ দাঁ তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—দিন, দিন, দশটা টাকা ফেলে দিন। শরীর খারাপ টারাপ কিছু নয়, আমরা দেখব এখন। মাছের চেষ্টায় যেতে হবে। তা হলে আপনার নৌকো ঠিক রইল কিন্তু!

—মাঝিকে বাড়ী পাঠাবো ভেবেছি। আমি যাচ্চি নে খবরটা দিতে হবে তো।

—কালও তো যান নি।

—যাই নি বলেই আজ আরও বেশি করে খবর পাঠানো দরকার।

গোবিন্দ দাঁ বললে—আমি সাইকেলে লোক পাঠাচ্চি এক্ষুনি।

সব ঠিকঠাক হল। ওদের রুচিমত ওদের পিকনিক হবে, এতে আমার মতামতের কোন স্থান নেই, মূল্যও নেই। কিন্তু আমি ঘোর আপত্তি জানালাম যখন বুঝতে পারলাম যে ওদের নিতান্ত ইচ্ছে, পান্নাকে নিয়ে যাবে আমার নৌকো করে পিকনিকের মাঠে। ওরাও নাছোড়বান্দা। আমি শেষে বললাম, ওরা নিয়ে যেতে চায় পান্নাকে খুব ভালো, আমি যাবো না সেখানে।

গোবিন্দ দাঁ বললে—কেন এতে আপত্তি করচেন ডাক্তারবাবু?

—না। তোমরা পান্নাকে পিকনিক্-সহচরী করতে চাও—ভালো। আমাকে বাদ দাও।

—সে কি হয় ডাক্তারবাবু? তবে পান্নাকে বাদ দেওয়া যাক, কি বল প্রেসিডেণ্ট সাহেব?

প্রেসিডেণ্ট আবদুল হামিদ (নসরাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের) একগাল অমায়িক হাসি হেসে বললে—না, ও পান্না টান্নাকে বাদ দিতে পারি, কিন্তু ডাক্তারবাবুকে—কক্ষনো না।

আমি কৃতার্থ হই। যথারীতি ওদের স্থূলরুচি অনুযায়ী বনভোজন সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার আগে ওরা তাড়াতাড়ি ফিরলো আসরে যাবে বলে। আমি গেলুম ওদের সঙ্গে। সেই রাত্রে পান্না আবার আমার ডাক্তারখানায় এসে হাজির। আমি জানতাম ও ঠিক আসবে, মনে মনে ওর প্রতীক্ষা করি নি এ কথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। আমার সমস্ত মনপ্রাণ ওর উপস্থিতি কামনা করেনি কি?

ও এসেই হাসিমুখে সহজ সুরে বললে—আসরে যাওয়া হয় নি যে বড়?

অদ্ভুতভাবে দুষ্টু মেয়ের মত চোখ নাচিয়ে ও প্রশ্নটা করলে। এখন যেন ও আমাকে আর সমীহ করে না। আমার খুব কাছে যেন এসে গিয়েচে ও। যেন কতদিনের বন্ধুত্ব ওর সঙ্গে, কতকাল থেকে আমাকে চেনে। বললাম বসো।

ও গালে হাত দিয়ে কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে বলল—ওমা, কি ভাগ্যি! আমাকে আবার বসতে বলা! কক্ষনো তো শুনি নি।

আমি হেসে বললাম—ক'দিন তোমার সঙ্গে আলাপ, পান্না? এর মধ্যে বসতে বলবার অবকাশই বা ক'বার ঘটলো?

—ভালো, ভালো। আবার নাম ধরেও ডাকা হলো! ওমা, কার মুখ দেখে না জানি আজ উঠেছিলুম, রোজ রোজ তার মুখই দেখবো।

—মতলব কি এঁটে এসেচ বল দিকি?

পান্না হাসিমুখে ঘাড় একদিকে ঈষৎ হেলিয়ে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—ভয়ে বলবো, না নির্ভয়ে বলবো?

—নির্ভয়ে বলো।

—ঠিক ?

—ঠিক।

—আমার সঙ্গে কলকাতায় চলুন। আজই, এখুনি—

কথা শেষ করে ছুটে এসে আমার পায়ের কাছে পড়ে ফুলের মত মুখ উঁচু করে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—চলুন।

ওর চোখে মিনতি ও করুণ আবেদন।

অপূর্ব্ব রূপে পান্না যেন ঝলমল করে উঠলো সেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে। পান্না যেন সুন্দরী মৎস্যনারী, অনেকদূরের অথৈ জলে টানচে আমাকে ওর কুহক দৃষ্টি।

সেই ভোর রাত্রেই পান্নার সঙ্গে আমি কলকাতা রওনা হই।

পান্না ও আমি এক গাড়ীতে।

ওর সে সহচরী কোথায় গেল তা আমি দেখি নি। তাকে ও তত গ্রাহ্য করে বলে মনেও হল না। তার বয়স বেশি, তাকে কেউ সুনজরে বড় একটা দেখে না।

গাড়ীতে উঠে পান্না আমার সামনের বেঞ্চিতে বসলো। হু হু করে গাড়ী চলেচে, গাছপালা, গরু, পাখী, ঝোপঝাপ সটসট করে বিপরীত দিকে চলে যাচ্চে, স্টেশনের পর স্টেশন যাচ্চে আসচে!

আমার কোনো দিকে নজর নেই।

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে আছি, বেশি কথা বলতে পাচ্ছি নে ওর সঙ্গে, কারণ গাড়ীতে লোক উঠচে মাঝে মাঝে। এক একবার খুব ভিড় হয়ে যাচ্চে, এক একবার গাড়ী ফাঁকা হয়ে যাচ্চে। তখন পান্না আমার দিকে অনুরাগ ভরা দৃষ্টি মেলে চাইচে।

মদের চেয়েও তার তীব্র নেশা।

এক স্টেশনে পান্না বললে—তাহোলে ?

ওর সেই বদমাইশ ধরনের চোখ নাচিয়ে কথাটা শেষ করে। আমি জানি, পান্না খুব বদমাইশ মেয়ে, আমি ওকে দেবী বলে ভুল করি নি মোটেই। দেবী হয় সুরবালাদের দল। দেবীদের প্রতি আমার কোনো মোহ নেই বর্ত্তমানে। দেবীরা এমন চোখ নাচাতে পারে ? এমন বদমাইশির হাসি হাসতে পারে ? এমন ভালমানুষকে টেনে নিয়ে ঘরের বার করতে পারে ? এমন পাগল করে দিতে পারে রূপে ও লাবণ্যের লাস্যলীলায় ?

দেবীদের দোষ, মানুষকে এরা আকৃষ্ট করতে পারে না। শুধু দেবী নিয়ে কি ধুয়ে খাবো ? আমার গোটা প্রথম যৌবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েচে দেবীদের সংসর্গে। দূর থেকে ওদের নমস্কার করি।

পান্না যে প্রশ্ন করলে, তার উত্তর আমি দিলাম না।

আমি এখন ওর প্রশ্নের উত্তর দেবার অবস্থায় নেই। আমার মন যেন অসীম অনন্ত আকাশে নিরবলম্ব ভ্রমণে বেরিয়েচে। দুরন্ত সে পথ-যাত্রা। কিন্তু পান্না যে আগ্রহ জাগিয়েচে তা পরিতৃপ্ত করতে পারবে কি ?

পান্নার মুখে আবার সেই দুষ্টুমিভরা হাসি। বললে—উত্তর দিলেন না যে ?

আমি বললাম—পান্না, তুমি আমার সঙ্গে কতদূর যেতে পারবে ?

ও হাসি-হাসি মুখে বললে—কেন ?

—কলকাতায় গিয়েও কাজ নেই।

—সে কি কথা, কোথায় যাবো তবে ?

—আমি যেখানে বলবো।

—কলকাতায় যাবো না—তবে আমার বাসাবাড়ী, জিনিসপত্তর কি হবে ? থাকবো কোথায় বলুন ?

—ও সব ভাবনা যদি ভাববে তবে আমায় নিয়ে এলে কেন ?

—আপনার কি ইচ্ছে বলুন।

—বলবো পান্না ? পারবে তা ?

—হ্যাঁ, বলুন।

—আমার সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভাসতে পারবে ?

পান্না ঘাড় একদিকে বেঁকিয়ে বললে—কোথায় ?

—যেখানে খুশি। যেখানে কেউ থাকবে না, তুমি আর আমি শুধু থাকবো। যেখানে হয়, যত দূরে—

—হুঁ-উ-উ-উ—

—ঠিক ?

—ঠিক।

বলেই ও আবার আগের মত হাসি হাসলে।

ওর ওই হাসিই আমাকে এমন চঞ্চল, এমন ছন্নছাড়া করে তুলেচে। নিরীহ গ্রাম্য ডাক্তার থেকে আমি দুঃসাহসী হয়ে উঠেচি—ওই হাসির মাদকতায়। বললাম—সব ভাসিয়ে দিতে রাজী আছ আমার সঙ্গে বেরিয়ে ?

—সব ভাসিয়ে দিতে রাজী আছি আপনার সঙ্গে।

বলেই ও খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

গাড়ীতে এই সময়টায় কেউ নেই। আমি ওর হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে বললাম—তাহলে কলকাতায় কেন ?

—না। আপনি যেখানে বলেন—

—ভেবে ছাখো। সব ছাড়তে হবে কিন্তু। খেমটা নাচতে পারবে না। টাকাকড়ি

রোজগার করতে পারবে না।

পান্না যদি তখন বলতো, 'খাবো কি'—তবে আমার নেশা কেটে যেতো, শূন্য থেকে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে যেতাম তখুনি। কিন্তু পান্নার মুখ দিয়ে সে কথা বেরুলো না। সে ঘাড় দুলিয়ে বললে—এবং বললে অতি অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত সুরে; বললে—তুমি আর আমি একা থাকবো। যেখানে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়—মুজরো করতে দাও করবো, না করতে দাও, তুমি যা করতে বলবে করবো—

আমি তখন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেচি, প্রেমের ও মোহের নিষ্ঠুরতায়—ওর মুখে 'তুমি' সম্বোধনে। আমি বলি—যদি গাছতলায় রাখি? না খেতে দিই?

—মেরে ফেলো আমাকে। তোমার হাতে মেরো। টুঁ শব্দটি যদি করি তবে বালো পান্না খারাপ মেয়ে ছিল।

—তোমার আত্মীয় স্বজন?

—কেউ নেই আমার আত্মীয় স্বজন।

—তোমার মা নেই?

পান্না তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্‌টে দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহের সুরে বললে—ভারী মা!

—বেশ চলো তবে। যা হয় হবে। আমি কিন্তু পয়সা নিয়ে বার হই নি, তা তুমি জানো।

—আবার ওই কথা?

বেলা তিনটের সময় ট্রেন শেয়ালদ' পৌছুলে স্টেশন থেকে সোজা একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে ভবানীপুর অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র গলিতে পান্নার বাসায় গিয়ে ওঠা গেল।

রাত্রে আমার ভাল ঘুম হল না। আমি এমন জায়গায় কখনো রাত কাটাই নি। পল্লীটা খুব ভালো শ্রেণীর নয়, লোক যে না ঘুমিয়ে সারা রাত ধরে গান বাজনা করে, এও আমার জানা ছিল না। সকালে উঠে পান্নাকে বললাম—পান্না, আমি এখানে থাকবো না।

পান্না বিস্ময়ের সুরে বললে—কেন?

—এখানে মানুষ থাকে?

—চিরকাল তো এখানে কাটালুম।

—তুমি পারো, আমার কর্ম্ম নয়।

—আমি কি করবো তুমিই বলো। আমার কি উপায় আছে?

আমি এ কথার উত্তর দিলাম না। একটু পরে বেলা হলে এক প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকে আমার দিকে দু-একবার চেয়ে দেখে আবার চলে গেল। পান্না কোথায় গেল তাও জানি নে, একাই অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

বেলা ন'টার সময় প্রৌঢ়াটি আবার ঘরে ঢুকে আমায় বললে—আপনার বাড়ী কোথায়?

এ প্রশ্ন আমার ভালো লাগলো না। বললাম—কেন?

—তাই শুধুচ্চি।

—যশোর জেলায়।

বুড়ী বসে পড়লো ঘরের মেজেতে। সে ঘরের মেজেতে সবটা গদি-তোশক পাতা, তার ওপরে ধবধবে চাদর বিছানো, এক কোণে দুটো রূপোর পরী, তাদের হাতে হুঁকো রাখবার খোল। দেওয়ালে দুটো ঢাকনি-পরানো সেতার কিংবা তানপুরো, ভালো বুঝি না। পাঁচ-ছ'খানা ছবি টাঙানো দেওয়ালে। এক কোণে চৌকি পাতা, তার ওপরে পুরু গদি পাতা বিছানা, ঝালর বসানো মশারি, বড় একটা কাঁসার পিকদান চৌকির তলায়। ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকা সত্ত্বেও মনে হয় সবটা মিলে অমার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিচ্চে, গৃহস্থবাড়ীর শান্তশ্রী এখানে নেই।

বুড়ী বললে—তুমি ক'দিন থাকবে বাবা?

—কেন বলুন তো?

—পান্না তোমাদের দেশে গান করতে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—তাই যেন তুমি ওর সঙ্গে এসেচ পৌঁছে দিতে?

—তাই ধরুন আর কি।

—একটা কথা বলি। স্পষ্ট কথার কষ্ট নেই। এ ঘরে তুমি থাকতে পারবে না। ওকে রোজগার করতে হবে, ব্যবসা চালাতে হবে। ওর এখানে লোক যায় আসে, তারা পয়সা দেয়। তুমি ঘরে থাকলে তারা আসবে না। যা বলো আমি স্পষ্ট কথা বলবো বাপু! এতে তুমি রাগই করো, আর যাই করো। এসেচ দেশ থেকে ওকে পৌঁছে দিতে, বেশ। পৌঁছে দিয়েচ, এখন দু'-একদিন শহরে থাকো, দেখো শোনো, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও—আমি যা বুঝি। চিড়িয়াখানা দেখেচ? মুসায়েম্‌ দেখেচ? না দেখে থাকো আজ দুপুরে গিয়ে দেখে এস—

এই সময় পান্না ঘরে ঢুকে বুড়ীর দিকে চেয়ে বললে—মাসী, ঘরে বসে কি বলচো ওঁকে?

বুড়ী ঝাঁঝের সঙ্গে বললে—কি আবার বলবো? বলচি ভালো মানুষের ছেলে, কলকেতা শহরে এসেচ, শহর দেখে দু'দিন দেখাশুনো করে বাড়ী চলে যাও। পৌঁছে তো দিয়েচ, এখন দেখো শোনো দুদিন, খাও মাখো—আমি তো না বলচি নে বাপু। ও ছুঁড়ি যখনই বাইরে যায়, তখনই ওর পেছনে কেউ না কেউ—সেবার খুলনে গেল, সঙ্গে এল সেই পরেশ-বাবু। পোড়ারমুখো নড়তে আর চায় না। পনেরো দিন হয়ে গেল, তবু নড়ে না—বলে, পান্নার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও মাসী—সে কি কেলেঙ্কারী! তবে পান্না তাকে মোটেই আমল দেয়নি, তাই সে টিকতে পারলো না—নইলে বাপু, তা অমন কত এল, কত গেল।

পান্না বললে—আঃ মাসী, কি বলচো বসে বসে? যাও—

বুড়ী হাত-পা নেড়ে বললে—যাবো না কি থাকতে এসেচি? তোমার ঘাড়ে বাসা বেঁধে বসেচি? এখন অল্প বয়েস, বয়েস-দোষ যে ভয়ানক জিনিস। হিত কথা শুনবি

তো এই মাসীর মুখেই শুনবি—বেচাল দেখলে রাশ কে আর টানতে যাবে, কার দায় পড়েচে ?

বুড়ী গজ্ গজ্ করতে করতে উঠে চলে গেল।

আমি পান্নাকে অনেকক্ষণ দেখি নি। অনুযোগের সুরে বললাম—আমি বাড়ি চলে যাব আজ, ঠিক বলচি—

—কেন ? কেন ? ওই বুড়ীর কথায় ! তুমি—

—সে জন্যে না। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

—এই !

পান্না মুখে কাপড় দিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো।

আমি রাগের সঙ্গে বললাম—হাসচো যে বড় ?

ও বললে—তোমার কথা শুনলে না হেসে থাকা যায় না। তুমি ঠিক ছেলেমানুষের মত। আমি এমন মানুষ যদি কখনো দেখেচি !

বলেই হাত দুটো অসহায় হাস্যের ভঙ্গিতে ওপরের দিকে ছুঁড়ে ফেলবার মত তুলে আবার হাসতে লাগলো।

ওর সেই অপূর্ব ভঙ্গি হাত ছোঁড়ার, সারা দেহের ঝলমলে লাবণ্য, মুখের হাসি আমাকে সব ভুলিয়ে দিলে। ও আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে বললে—তুমি চলে গেলেই হল ! মাইরি। পায়ে মাথা কুটবো না ?

আমাকে ও চা দিয়ে গেল। বললে—খাবে কিছু ?

সুরবালার কথা মনে পড়লো। সুরবালা এমন বলতো না, খাবার নিয়ে এসে রাখতো সামনে। আমি জানি এদের সঙ্গে সুরবালাদের তফাৎ কত। না জেনে বোকার মত আসি নি। সুরবালা সুরবালা, পান্না পান্না—এ নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বাক্যবিন্যাস করে কোন লাভ নেই। পান্না খাবার নিয়ে এল। চারখানা তেলেভাজা নিমকি, এক মুঠো ঘুঘনি দানা, দুখানা পাঁপড় ভাজা। এই প্রথম ওর হাতের জিনিস আমাকে খেতে হবে। মন প্রথমটা বিদ্রোহ করে উঠেছিল—কিন্তু তার পরেই শান্ত হয়ে এল। কেন খাবো না ওর হাতে ?

একটা কথা আমার মনে খচ্‌খচ্ করে বাজছিল। পান্নার ঘরে লোক আসে রাত্রে, বুড়ী বলছিল। যতবার এই কথাটা মনে ভাবি, ততবার যেন আমার মনে কি কাঁটার মত বাজে।

বললাম কথাটা পান্নাকে।

পান্না বললে—কি করতে বলো আমায় ?

—এ সব ছেড়ে দাও।

হয় পান্না খুব চালাক মেয়ে, নয় আমার অদৃষ্টলিপি—আবার পান্না বললে—যা তুমি বলবে—

সে বললে না, 'খাবো কি' 'চলবে কিসে' প্রভৃতি নিতান্ত রোমান্স-বর্জ্জিত বস্তুতান্ত্রিক কথা। কেন বললে না কতবার ভেবেছি। বললেই আমার নেশা তখুনি সেই মুহূর্ত্তেই ছুটে যেতো। কিন্তু পান্না তা বললে না। প্রতিমার মাটির তৈরী পা ও আমাকে দেখতে দিলে না।

দু-দুবার এরকম হল। অদৃষ্টলিপি ছাড়া আর কি!

আমি বললাম—চলো আমরা—

কিন্তু মাথা তখন ঘুরছে। কোনো সাংসারিক প্ল্যান আঁটবার মত মনের অবস্থা তখন আমার নয়। ওই পর্য্যন্ত বলে চুপ করলাম। পান্না হেসে বললে—খুব হয়েচে, এখন নাইবে চলো।

—চলো। কোথায়?

—কলতলায়।

—ওখানে বড্ড নোংরা। তা ছাড়া, এ বাড়ীতে চারিদিকে দেখচি শুধু মেয়েছেলের ভিড়। ওদের মধ্যে বসে নাইবো কি করে?

—ঘরে জল তুলে দিই—?

—তার চেয়ে চলো কালীঘাটের গঙ্গায় দুজনে নেয়ে আসি।

পান্নাও রাজী হল। দুজনে নাইতে বেরুবো, এমন সময়ে সেই বুড়ী মাসী এসে হাজির হোল। কড়াস্বরে আমায় বললে—বলি ওগো ভালমানুষের ছেলে, একটা কথা তোমায় শুধুই বাপু—

আমি ওর রকম-সকম দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বললাম—বলুন।

—তুমি বাপু ওকে টুইয়ে কোথায় নিয়ে বের করচো?

—ও নাইতে যাচ্ছে আমার সঙ্গে।

—ও! আমার ভারী নবাবের নাতি রে। পান্না তোমার ঘরের বৌ নাকি যে, যা বলবে তাই করতে হবে তাকে? ওর কেউ নেই? অত দরদ যদি থাকে পান্নার ওপর, তবে মাসে ষাট টাকা করে দিয়ে ওকে বাঁধা রাখো। ওর গহনা দেও, সব ভার নাও—তবে ও তোমার সঙ্গে যেখানে খুশি যাবে। ফেলো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর?

আমি চুপ করে রইলাম। পান্না সেখানে উপস্থিত ছিল না, সাবানের বাক্স আনতে ঘরের মধ্যে গিয়েছিল। বুড়ী ওর অনুপস্থিতির এ সুযোগটুকু ছাড়লে না। আবার বললে—তুমি এয়েচ ভালোমানুষের ছেলে পান্নাকে পৌঁছে দিতে। মফঃস্বলের লোক। বেশ, যেমন এয়েচ, দুদিন থাকো, খাও মাখো, কলকাতার পাঁচটা জায়গা দেখে বেড়াও, বেড়িয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। পান্নাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবার দরকার কি তোমার? তুমি গেঁয়ো নোক, শহরের রাত্ কি, তুমি তা জানো না। তোমার ভালোর জন্যেই বলচি বাছা—

বুড়ীর সে কথা যদি তখন আমি শুনতাম!

যাক সে কথা।

পান্নাকে আর আমি পীড়াপীড়ি করি নি নাইতে যাবার জন্যে। ওকে কিছু না বলে আমি নিজেই নাইতে গেলাম একা। ফিরে আসতে পান্না বললে—এ কি রকম হল?

—কেন?

—একা নাইতে গেলে?

—আমি গেঁয়ো লোক। কলকাতা দেখতে এসেচি, দেখে ফিরে যাই। দরকার কি আমার রাজকন্যের খোঁজে।

—আমি কি রাজকন্যে নাকি?

—তারও বাড়া।

—কেন?

—সে সব কথা দরকার নেই। আমি আজই বাড়ী চলে যাবো।

—ইশ্! মাইরি? পায়ে মাথা কুটবো না? কি হয়েচে বলো—সত্যি বলবে!

আমি বুড়ীর কথা কিছু বলা উচিত বিবেচনা করলাম না। হয়তো তুমুল ঝগড়া আর অশান্তি হবে এ নিয়ে। না, এ বাড়ীতে আমার থাকা সম্ভব হবে না আর। একদিনও না। নিজের মন তৈরি করে ফেললাম, কিন্তু পান্নাকে সে কথা কিছু বলি নি। বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার নাম করে বেরিয়ে সোজা শেয়ালদ'তে গিয়ে টিকিট কাটবো।

খাওয়ার সময় পান্না নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালে। আগের রাত্রে আমি নিজেই দোকান থেকে লুচি ও মিষ্টি কিনে এনে খেয়েছিলাম। আজ ও বললে—আমি নিজে মাংস রান্না করচি তোমার জন্যে, বলো খাবে? এমন সুরে অনুরোধ করলে, ওর কথা এড়াতে পারলাম না। বড় এক বাটি মাংস ও নিজের হাতে আমার পাতের কাছে বসিয়ে দিলে, সামনে বসে যত্ন করে খাওয়াতে লাগলো বাড়ীর মেয়েদের মত। কিন্তু একটা কাজ ও হঠাৎ করে বসলো, আমার মাংসের বাটি থেকে একটু মাংস তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে তখন বলচে—খাবো একটু তোমার এ থেকে?

তারপর হেসে বললে—দেখচি কেমন হয়েচে।

আমার সমস্ত শরীর যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো, এত কালের সংস্কার যাবে কোথায়? আমি বললাম—ও এঁটো হাত যেন দিও না বাটিতে? ছিঃ—

পান্না দুষ্টুমির হাসি হেসে হাত খানিকটা বাটির দিকে বাড়িয়ে বললে—দিলাম হাত, ঠিক দেবো—দিচ্ছি কিন্তু—

পরে নিজেই হাত গুটিয়ে নিয়ে বললে—না, না, তাই কখনো করি? হয়তো তোমার খাওয়া হবে না—খাও, তুমি খাও—

আমি জানি কোনো মার্জ্জিতরুচি ভদ্রমহিলা অতিথিকে খাওয়াতে বসে তার সঙ্গে এমন

ধরনের ব্যবহার করতো না—কিন্তু পান্না যে শ্রেণীর মেয়ে, তার কাছে এ ব্যবহার পেয়ে আমি আশ্চর্য্য হই নি মোটেই।

পান্না বললে—মাংস কেমন হয়েচে ?

—বেশ হয়েচে।

—আমায় নিয়ে যাও এখান থেকে।

—কোথায় ?

—যেখানে তোমার খুশি—

পরে বাঁকা ভুরুর নিচে আড় চাউনি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললো—আমি তোমার, যেখানে নিয়ে যাবে—

সে চাউনি আমাকে কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়ে দিলে, আমি এঁটো হাতেই ওর পুষ্পপেলব হাতখানা চেপে ধরতে গেলাম, আর ঠিক সেই সময়েই সেই বুড়ী সেখানে এসে পড়লো! আমার দিকে কটমট চোখে চেয়ে দেখলে, কিছু বললে না মুখে। কি জানি কি বুঝলে।

আমি লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে ভাতের থালার দিকে চাইলাম। কোনো রকমে দু'চার দলা খেয়ে উঠে পড়ি তখুনি!

কাউকে কিছু না বলে সেই যে বেরিয়ে পড়লাম, একেবারে সোজা শেয়ালদ' স্টেশনে এসে গাড়ী চেপে বসে দেশে রওনা।

সুরবালা আমায় দেখে অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলে। তারপর বললে—কোথায় ছিলে ?

—কলকাতায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আসচি।

—তা আমিও ভেবেছি। সবাই তো ভেবে-চিন্তে অস্থির, আমি ভাবলাম ঠিক কোনো দরকারি কাজ পড়েচে, কলকাতায় টলকাতায় হঠাৎ যেতে হয়েচে। একটা খবর দিয়েও তো যেতে হয়! এমন তো কখনো করো নি ?

—এমন অবস্থাও তো এর আগে কক্ষনো হয় নি। সবাই ভালো আছে ?

—তা আছে। নাও, তুমি গা হাত ধুয়ে নাও, চা করে নিয়ে আসি। খাওয়া হয়েচে ?

একটু পরে সুরবালা চা করে নিয়ে এল। বললে—বাবাঃ এমন কখনো করে ? ভেবে চিন্তে অস্থির হতে হয়েচে। সনাতনবাবু তো দু'বেলা হাঁটাহাঁটি করচেন। নৌকার মাঝি ফিরে এসে বললে—বাবু, শেষ রাত্তিরে কোথায় চলে গেলেন হঠাৎ—আমাকে কিছু বলে তো যান নি—সনাতনদা আবার যাবেন বলছিলেন মঙ্গলগঞ্জে খোঁজ নিতে। যান নি বোধ হয়—

সনাতনদা ভাগ্যিস মঙ্গলগঞ্জে যায় নি। সেখানে গেলেই সব বলে দিতো গোবিন্দ দাঁ বা আবদুল হামিদ। এখনও ওরা অবিশ্যি জানে না, আমি বাড়ী চলে এসেছিলাম না কলকাতায় গিয়েছিলাম। সনাতনদা অনুসন্ধান করতে গেলেই ওরা বুঝতে পারতো আমি পান্নার সঙ্গেই চলে গিয়েছি।

একজন লোককে পাঠিয়ে দিলাম সনাতনদা'র বাড়ীতে খবর দিতে যে আমি ফিরে এসেছি।

সুরবালার মুখ দেখে বুঝলাম ওর মনে কোন সন্দেহ জাগে নি। ওর মন তো আমি জানি, সরলা শান্ত স্বভাবের মেয়ে। অতশত'ও কিছু বোঝে না। ও আমাকে খাওয়াতে মাখাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

তবুও আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ও যেন কি দেখলে।

আমি বললাম—কি দেখচো?

—তোমার শরীর ভালো আছে তো?

—কেন?

—তোমার মুখ যেন শুকিয়ে গিয়েছে—কেমন যেন দেখাচ্চে—

হেসে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললাম—ও, এই!

সুরবালা উদ্বেগের সুরে বললে—না সত্যি। তোমার মুখে যেন—

—ও কিছু না। একটু ঘুমুই—

—একটু ওষুধ খাও না কিছু? তুমি তো বোঝ—

—কিছু না। মশারিটা ফেলে দিয়ে যাও, ঘুমুই একটু—

সকালে সনাতনদা এসে হাজির হল। বললে—একি হে? তুমি হঠাৎ কোথাও কিছু নয়, কোথায় চলে গেলে? বৌমা কেঁদে কেটে অস্থির।

বললাম—কলকাতায় গিয়েছিলাম!

—কেন, হঠাৎ?

—বিশেষ কারণ ছিল।

—সে আমি বুঝতে পেরেছি। নইলে তোমার মত লোক হঠাৎ অমনি না বলা-কওয়া কলকাতা চলে যাবে? তা কি কারণটা ছিল—

—সে একটা অন্য ব্যাপার।

সনাতনদা আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না। আমার মুশকিল আমি মিথ্যে কথা বড় একটা বলি নে, বলতে মুখে বাধে—বিশেষ কাজে হয়তো বলতে হয় কিন্তু পারতপক্ষে না বলারই চেষ্টা করি। অন্য কথা পাড়লাম তাড়াতাড়ি। সনাতনদা দুতিনবার চেষ্টা করলে কলকাতা যাবার কারণটা জানবার। আমি প্রতিবারই কথা চাপা দিলাম। সনাতন বললে—মঙ্গলগঞ্জে যাবে নাকি?

—যাবো বৈকি। রুগী রয়েচে।

—আমিও চলো যাই—

—তুমি যাবে?

—চলো বেড়িয়ে আসি—

সর্ব্বনাশ। বলে কি সনাতনদা? মঙ্গলগঞ্জে গেলেই ও সব জানতে পারবে হয়তো।

ওর স্বভাবই একে-ওকে জিজ্ঞেস করা। গোবিন্দ দাঁ সব বলে দেবে। কিন্তু আমার এখনও সন্দেহ হয় গোবিন্দ দাঁ বা মঙ্গলগঞ্জের কেউ এখন হয়তো জানে না আমি কোথায় গিয়েছিলাম।

সনাতন বললে—কবে যাবে ?

—দেখি কালই যাবো হয়তো।

সনাতনদা চলে গেল। আমি তখনই সাইকেল চেপে মঙ্গলগঞ্জে যাবার জন্যে তৈরি হলাম। আগে সেখানে গিয়ে আমায় জানতে হবে। নয়তো সনাতনদাকে হঠাৎ নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

সুরবালাকে বলতেই সে ব্যস্তভাবে বললে—না গো না, এখন যেও না—

—আমার বিশেষ দরকার আছে। মঙ্গলগঞ্জে যেতেই হবে।

—খেয়ে যাও।

—না, এসে খাবো।

সাইকেলে যেতে তিন চার মাইল ঘুর হয়। রাস্তায় এই বর্ষাকালে জল কাদা, তবুও যেতেই হবে।

বেলা সাড়ে দশটার সময় মঙ্গলগঞ্জের ডিসপেনসারির দোর খুলতেই চাকরটা এসে জুটলো। বললে—বাবু, পরশু এলেন না ? আপনি গিয়েলেন কনে ?

—কেন ?

—আপনার সেই মাঝি নৌকো নিয়ে ফিরে গেল।

—তোর সে খোঁজে কি দরকার ? যা নিজের কাজ দেখগে—

একটু পরে গোবিন্দ দাঁ এল কার মুখে খবর পেয়ে। ব্যস্তভাবে বললে—ডাক্তার, ব্যাপার কি ? কোথায় ছিলেন ?

—কেন ?

—সেদিন গেলেন কোথায় ? মাঝি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। শেষে নৌকো নিয়ে গেল। এখন আসা হচ্চে কোথা থেকে ?

—বাড়ী থেকেই আসচি। সেদিন একটু বিশেষ দরকারে অন্যত্র গিয়েছিলাম।

—তবুও ভালো। আমরা তো ভেবে চিন্তে অস্থির।

গোবিন্দ দাঁ সন্দেহ করে নি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল ! গোবিন্দই সব চেয়ে ধূর্ত্ত ব্যক্তি, সন্দেহ যদি করতে পারে, তবে ওই করতে পারতো। ও যখন সন্দেহ করে নি, তখন আর কারো কাছ থেকে কোনো ভয় নেই। আমি ভয়ানক কাজে ব্যস্ত আছি দেখাবার জন্যে আলমারি খুলে এ শিশি ও শিশি নাড়তে লাগলাম। গোবিন্দ দাঁ একটু পরে চলে গেল।

ও যেমন চলে গেল আমি একা বসে রইলুম ডিসপেনসারি ঘরে। অমনি মনে হল পান্না ঠিক ওই দোরটি ধরে সেদিন দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হল একা এখানে এসে।

আমি ভুল করেছি। পান্নার অদৃশ্য উপস্থিতিতে এ ঘরের বাতাস ভরে আছে—হঠাৎ তার সেই অদ্ভুত ধরনের দুষ্টুমির হাসিটি ফুটে উঠলো আমার সামনে। মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সে কি সাধারণ চঞ্চলতা?

অমন যে আবার হয় তা জানতাম না।

পান্না এখানে ছিল সে গেল কোথায়? সেই পান্না, অদ্ভুত ভঙ্গি, অদ্ভুত দুষ্টুমির হাসি নিয়ে। তাকে আমার এখুনি দরকার। না পেলে চলবে না, আমার জীবনে অনেকখানি জায়গা যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, সে শূন্যতা যাকে দিয়ে পুরতে পারে সে এখানে নেই—কতদূর চলে গিয়েছে। আর কি তাকে পাবো?

পান্নার অদৃশ্য আবির্ভাব আমাকে মাতাল করে তুলেচে। ওই চেয়ারটাতে সেদিন সে বসেছিল। এখান থেকে ডিস্‌পেনসারি উঠিয়ে দিতে হবে।

পকেট খুঁজে দেখি মোটে দুটো টাকা। বিষ্ণু সাধুখাঁর দোকান পাশেই। তাকে ডাকিয়ে বললাম—দশটা টাকা দিতে পারবে?

—ডাক্তারবাবু, প্রাতঃপ্রণাম। কোথায় ছিলেন?

—বাড়ী থেকে আসচি। টাকা ক'টা দাও তো?

—নিয়ে যান।

তার দোকানের ছোকরা চাকর মাদার এসে একখানা নোট আমার হাতে দিয়ে গেল। আমি সাইকেলখানা ডিস্‌পেনসারির মধ্যে চাবি দিয়ে রেখে স্টেশনে চলে এলাম। আড়াই ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে হল সেজন্যে।

পান্না আমায় দেখে অবাক। সে নিজের ঘরের সামনে চুপ করে একখানা চেয়ারে বসে আছে—কিন্তু সাজগোজ তেমন নেই। মাথার চুলও বাঁধা নয়।

আমি হেসে বললাম—ও পান্না—

—তুমি!

—কেন! ভূত দেখলে নাকি?

—তুমি কেমন করে এলে তাই ভাবছি!

—কেন আসবো না?

—সত্যি তুমি আমার এখানে এসেচ?

পান্না যে আমাকে দেখে খুব খুশী হয়েচে সেটা তার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারলাম। ওর এ আনন্দ কৃত্রিম নয়। পান্না আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে খাটের ওপর বসিয়ে একখানা হাতপাখা এনে বাতাস করতে লাগলো। ওর এ যত্ন ও আগ্রহ যে নিছক ব্যবসাদারি নয় এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাকে দিয়েচেন। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম বেশ একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে। সে মুখে ব্যবসাদারির ধাঁজও নেই। আমি বিদেশ থেকে ফিরলে সুরবালার মুখ এমনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু সুরবালার

এ লাবণ্যভরা চঞ্চলতা, এত প্রাণের প্রাচুর্য্য নেই। এমন সুন্দর অঙ্গভঙ্গি করে সে হাঁটতে পারে না, এমন বিদ্যুতের মত কটাক্ষ তার নেই, এমন দুষ্টুমির হাসি তার মুখে ফোটে না।

পান্না বললে—দেশে গিয়েছিলে?

—হাঁ।

—তবে এলে যে আবার?

—তোমায় দেখতে।

—সত্যি বলো না?

—বিশ্বাস করো। আজ মঙ্গলগঞ্জ থেকে সোজা তোমার এখানে আসচি।

—কেন? বলো, বলতেই হবে।

—বলবো না।

—বলতেই হবে, লক্ষ্মীটি।

—তোমার জন্যে মন কেমন করে উঠলো। তুমি সেদিন দোর ধরে দাঁড়িয়েছিলে, সে জায়গাটা দেখেই মন বড় অস্থির হল, তাই ছুটে এলাম।

—খুব ভালো করেচ। জানো? আমি মরে যাচ্ছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। তুমি যে দিনটি চলে গেলে, সেদিন থেকে—

—কেন মিথ্যে কথাগুলো বলো? ছিঃ!

পান্না খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—কি? আমি তোমার পায়ে মাথা কুটে মরবো দেখো তবে—আমি মিথ্যে কথা বলচি?

আমি সুখের সমুদ্রে ডুবে গেলাম। কি আনন্দ! সে আনন্দের কথা মুখে বলে বোঝানো যাবে না। এই সুন্দরী লাবণ্যময়ী চঞ্চলা ষোড়শী আমার মত মধ্যবয়স্ক লোককে ভালোবাসে! এ আমার এত বড় গর্ব্ব, আনন্দের কথা, ইচ্ছে হয় এখুনি ছুটে বাইরে চলে গিয়ে দু'পারের দুই পথের প্রত্যেক লোককে ধরে ধরে চীৎকার করে বলি—ওগো শোনো—পান্না আমাকে ভালোবাসে, আমার জন্যে সে ভাবে।···ভালোবাসা! জীবনে কখনো আস্বাদও করি নি। জানি নে ও জিনিসের রূপ কি। এবার যেন ভালোবাসা কাকে বলে বুঝেচি। ভালোবাসা পেতে হয় এরকম সুন্দরী ষোড়শীর কাছ থেকে, যার মুখের হাসিতে, চোখের কোণের বিদ্যুৎ কটাক্ষে ত্রিভুবন জয় হয়ে যায়!

কেন, আমি আজ তেরো বছর হল বিয়ে করেছি। সুরবালা কখনো ষোড়শী ছিল না? সে আমাকে ভালোবাসে না? মেয়েদের ভালোবাসা কখনো কি পাই নি? সে কথার জবাব কি দেবো আমি নিজেই খুঁজে পাই না। কে বলে সুরবালা আমায় ভালোবাসে না? কিন্তু সে এ জিনিস নয়। তাতে নেশা লাগে না মনে। সে জিনিসটা বড্ড শান্ত, স্থির, সংযত, তার মধ্যে নতুন আশা করবার কিছু নেই—নতুন করে দেখবার কিছু নেই—ও কি বলবে আমি তা জানি, বলতেই তাকে হবে, সে আমার বাড়ী থাকে, খায়, পরে। ভালো মিষ্টি

কথা তাকে বলতে হবে। তার মিষ্টি কথা আমার দেহে মনে অপ্রত্যাশিতের পুলক জাগায় না। সুরবালা কোনোকালেই এ রকম সজীব, প্রাণচঞ্চলা সুন্দরী, ষোড়শী ছিল না—তার চোখে বিদ্যুৎ ছিল না।

পান্নার হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বললাম—বসো, ছেলেমানুষি কোরো না—

—তা হলে বললে কেন অমন কথা ?

—ঠাট্টা করছিলাম। তোমার মুখে কথাটা আবার শুনতে চাচ্ছিলাম—

—চা করি ?

—তোমার ইচ্ছে—

—কি খাবে বলো ?

—আমি কি জানি ?

—আচ্ছা বোসো। লক্ষ্মী হয়ে বোসো, ভালো হয়ে বোসো, পা তুলে বোসো, পা ধুয়ে জল দিয়ে মুছিয়ে দেবো, রাজার-ধন-এক-মানিক বসো ?

—যাও—

আমি বসে একটা সিগারেট ধরিয়েচি, এমন সময় পান্নার মাসী সেই বুড়ী এসে আমার দিকে কটমট করে চাইলে। আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। যেন প্রাইভেট টিউটর ছাত্রকে দিয়ে বাজারের দোকানে সিগারেট কিনতে পাঠিয়ে ছাত্রের অভিভাবকের সামনে পড়ে গিয়েচে।

বুড়ী আরও কাছে এসে বললে—সেই তুমি না ? সেদিন চলে গেলে ?

গলা ভিজিয়ে বলি—হ্যাঁ।

—তা আবার এলে আজ ?

—একটু কাজ আছে—

—কি কাজ ?

—কলকাতার কাজ। এই হাটবাজারের—

—তোমার দোকান-টোকান আছে নাকি ?

—হ্যাঁ, ওষুধের দোকান—

—ওষুধ কিনতে এসেচ, তা এখানে কেন ?

—পান্নার সঙ্গে দেখা করতে।

—কোথায় গেল সে ছুঁড়ী ? দেখা হয়েচে ?

—হ্যাঁ।

—তোমরা সবাই মিলে ও ছুঁড়ীর পেছনে পেছনে অমন ঘুরচো কেন বলো তো ? তোমাদের পাড়াগাঁ অঞ্চলে মেয়েকে পাঠালেই এই কাণ্ড গা ? জলে পুড়ে মনু বাপু তোমাদের জালায়। আবার তুমি এসে জুটলে কি আক্কেলে ?

আমি এ কথার কি জবাব দেবো ভাবচি, এমন সময় বুড়ী বললে—তোমাকে সেবার

ভালো কথা বল্লু বাছা তা তোমার কানে গেল না। তুমি বাপু কি রকম ভদ্দর নোক? বয়েস দেখে মনে হয় নিতান্ত তুমি কচি খোকাটি তো নও—এখানে এলেই পয়সা খরচ করতে হয় বলি জানো সে কথা? বলি এনেচ কত টাকা সঙ্গে করে? ফতুর হয়ে যাবে বলে দিচ্চি। শহুরে বাবুদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে টাকা খরচ করতে গিয়ে একেবারে ফতুর হয়ে যাবে, এখনো ভালোয় ভালোয় বাড়ী চলে যাও—

—যাবোই তো। থাকতে আসি নি।

—সে কথা ভালো। তবে এত ঘন ঘন এখানে না-ই বা এলে বাপু? ও ছুঁড়িকেও তো বাইরে যেতে হবে, তোমার সঙ্গে জোড়-পায়রা হয়ে বসে থাকলে তো ওর চলবে না।

এমন সময় পান্না খাবারের রেকাব ও চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকে বললে—কি মাসী, কি বলচো ওঁকে? যাও এখন ঘর থেকে—

বৃদ্ধা আমার দিক থেকে ওর দিকে ফিরে বললে—ছাখ পান্নু, বাড়াবাড়ি কোন বিষয়ে ভালো না। দু'জনকেই হিত কথা শোনাচ্চি বাপু,—কষ্ট পেতে আমার কি, তোরা দুজনেই পাবি—

পান্না ব্যঙ্গের সুরে বললে—তুমি এখন যাবে একটু এ ঘর থেকে? ওঁকে এখন বোকো না। সমস্ত রাত ওঁর খাওয়া হয় নি জানো?

বুড়ী বললে—বেশ তো, আমি কি বল্লু খেয়ো না, মেখো না, খাও দাও, তারপর সরে পড়ে—

—তুমি এবার সরে পড়ো দিকি মাসী, দেখি—

বুড়ী গজ গজ করতে করতে চলে গেল। পান্না আমার সামনে এসে রেকাব নামাল, তাতে একটুখানি হালুয়া ছাড়া অন্য কিছু নেই। এই অবস্থায় সুরবালা কত কি খাওয়াতো। পান্নার মত মেয়েরা সেদিক থেকে বড্ড আনাড়ি, খাওয়াতে জানে না। আমার খাওয়ার সময়ে পান্না নিজেই বললে—বুড়ী বড় খিটখিট করে, না? চলো আজ দু'জনে কালীঘাট ঘুরে আসি, কি কোথাও দেখে আসি—

আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম যেন। ব্যগ্রভাবে বলি—যাবে তুমি? কখন যাবে? উনি বকবেন না? যেতে দেবেন তোমাকে?

পান্না হেসে লুটিয়ে পড়ে বললে—আহা, কথার কি ছিরি! ওই জন্যেই তো—হি-হি-হি—যাবে তুমি? কখন যাবে? হি-হি-হি—

এই তো অনুপমা পান্না, অদ্বিতীয়া পান্না, হাস্যলাস্যময়ী আসল পান্না, হাজারো মেয়ের ভিড়ের মধ্যে থেকে যাকে বেছে নেওয়া যায়। এমন একটি মেয়ের চোখে তো পড়ি নি কোনদিন। মন খুশিতে ভরে উঠলো, যার দেখা পেয়েচি, যে আমাকে ভালোবেসেচে পথে ঘাটে দেখা মেলে না তার।

না। পান্না যে আমাকে ভালোবাসে, এ সম্বন্ধে আমি তত নিশ্চিত ছিলাম না। ওর

ভালোবাসা আমাকে জয় করে নিতে হবে এই আমার বড় উদ্দেশ্য জীবনের। এখন যেটুকু ভালোবাসে, ওটা সাময়িক মোহ হয় তো। ওটা কেটে যাবার আগে আমি ওকে এমন ভালোবাসাবো যে আর সমস্ত কিছু বিস্বাদ হয়ে যাবে ওর কাছে। এই আমার সাধনা, এই সাধনায় আমায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে। আমাকে পাগল করে দিতে হবে। আমার জন্যে পাগল করে দিতে হবে।

পান্নাকে দেখবার জন্যে ওদের বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত করবার সাহস আমার হল না। ওর মাসীর মুখের দিকে চাইলে আমার সাহস চলে যেতো।

একদিন পান্নাকে বললাম—চলো, আমার সঙ্গে।

পান্না হেসে বললে—কোথায় যাবো?

—যে রাজ্যে মাসী পিসীরা নেই।

পান্না খিলখিল করে হেসে উঠে বললে—কোথায়? নদীর ওপারে?

তারপর অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগলো—বলি—উত্তরপাড়া? কোন্নগর? হুগলী?

—না।

—তবে?

—আমি যেখানে ভালো বুঝবো। যাবে?

—নিশ্চয়ই।

—এখুনি?

—এখুনি।

পান্নাকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি নে বটে কিন্তু আমি মানুষ চিনি। ওর চোখের দিকে চেয়ে বুঝলাম পান্না মিথ্যে কথা বলচে না। ও আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছে, যেখানে ওকে নিয়ে যাবো। শুধু এইটুকু জানা বোধ হয় আমার দরকার ছিল। যে-ই বুঝলাম ও আমার সঙ্গে যতদূর নিয়ে যাবো যেতে পারে, তখনই আমি একটা অদ্ভুত আনন্দ মনের মধ্যে অনুভব করলাম। সে আনন্দ একটা নেশার মত আমাকে পেয়ে বসলো। সে নেশা আমাকে ঘরে থাকতে দিলে না—সোজা এসে বড় রাস্তার ওপর পড়লাম। সেখান থেকে ট্রামে গড়ের মাঠে এসে একটা গাছের তলায় বেঞ্চিতে নির্জ্জনে বসলাম।

হাতে কত টাকা আছে? কুড়ি পঁচিশের বেশি নয়। এই টাকা নিয়ে কতদূর যেতে পারি দু'জনে? কাশী হয় তো! ফিরতে পারবো না। ফিরবার দরকারও নেই। আর আসবো না। সব ভুলে যাবো, ঘর বাড়ী, সুরবালা, ছেলেমেয়ে। ওসবে আমার কোন তৃপ্তি নেই। সত্যিকার আনন্দ কখনো পাই নি। এবার নতুন ভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করবো পান্নাকে নিয়ে।

আজ রাত্রেই যাবো।

মাতালের মত টলতে টলতে বড় রাস্তায় এসে ট্রাম ধরলাম। এমন সময় পেছন থেকে কে বলে উঠলো—কি রে, শোন্, শোন্—

ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম। পেছন দিকে চেয়ে দেখি আমার মেডিকেল কলেজের সহপাঠী করালী। অনেক দিন দেখা হয় নি, দেখে আনন্দ হল। ওর সঙ্গে পুরানো কথাবার্ত্তায় অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। করালী ডায়মণ্ডহারবারের কাছে কি একটা গ্রামে প্র্যাক্‌টিস্ করচে। আমায় বললে, চল একটু চা খাই কোনো দোকানে।

—বেশ, চলো।

আমার চা খাবার বিশেষ কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিল স্বাভাবিক কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম স্বাভাবিক অবস্থায় আমি আদৌ নেই। করালী গ্রাম্য প্র্যাক্‌টিসের অনেক গল্প করলে। দু'একটা শক্ত কেসের কথা বললে। আমি একমনে বসে শুনছিলাম। করালীকে বললাম—অমনি একটা নিরিবিলি গ্রামের ঠিকানা আমায় দিতে পারিস ?

—কেন রে ?

—আমি প্র্যাক্‌টিস করবো তোর মত।

—কেন তুই তো গ্রামেই বসেছিলি—তাই না ? চাকরি নিয়েচিস নাকি ?

—জায়গাটা বদলাবো।

—বদলাবি বটে কিন্তু একটা কথা বলি। ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নেই গ্রামে বেশি পয়সা হবে না।

—যা হয়।

—আমি দেখবো খোঁজ করে। তোর ঠিকানাটা দে আমাকে।

—তোর ঠিকানাটা দে, আমি বরং তোকে আগে চিঠি দেবো।

করালী বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আমি পান্নার বাড়ীতেই চললাম সোজা। ওর ঘরের বাইরে একটা কাঠের বেঞ্চি আছে, বেঞ্চিটার ঠিক ওপরেই দেওয়ালে একটা পুরানো সস্তা খেলো ক্লকঘড়ি। ঘরের মধ্যে ঢোকবার সাহস আমার কুলালো না, ঘড়ির নীচে বেঞ্চিখানাতে বসে পড়লাম।

অনেকক্ষণ পরে পান্নাই প্রথম এল ওদিকের একটা ঘর থেকে।

আমায় দেখে অবাক হয়ে বললে—এ কি !

বললাম—চুপ, চুপ।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—কোথায় ?

পান্না হেসে বললে—কে ? মাসী ? হরিসংকীর্ত্তন না কথকতা কি হচ্ছে গলির মোড়ে, তাই শুনতে গিয়েচে ! বুড়ীর দল সবাই গিয়েচে। তাই মলিনাদের ঘরে একটু মজা করে চা আর সাড়ে বত্রিশ ভাজার মজলিশ করছিলাম। আনবো আপনার জন্যে ? দাঁড়ান—

আমি ব্যস্তভাবে বললাম—শোনো, শোনো, থাক ওসব। কথা আছে তোমার সঙ্গে—

পান্না যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে আবার যেতে যেতে বললে—বসুন ঠাণ্ডা হয়ে।

বুড়ীরা নিশ্চিন্দে হয়ে বেরিয়েচে—রাত ন'টার এদিকে ফিরবে না। চা আর ভাজা খেয়ে কথা হবে এখন বসে বসে।

—বেশ, আমি এত রাত্রে যাব কোথায়?

—এখানে থাকবেন।

—সে সাহস আমার নেই।

পান্না ধমক দিয়ে বললে—আপনি না পুরুষমানুষ? ভয় কিসের। আমি আছি। সে ব্যবস্থা করবো।

—তুমি থাকলে তবু ভরসা পাই।

—বসুন—আসচি—

একটু পরেই পান্না চা আর বাদাম ভাজা নিয়ে ফিরলো। বললে—চলুন ঘরে।

—না, আমি ঘরে যাব না। এখানেই বসো।

পান্না হঠাৎ এসে খপ্ করে আমার হাত ধরে বললে—তা হবে না, আসুন।

আমি কৃত্রিম রাগের সুরে বললাম—তুমি আমার হাত ধরলে কেন?

—বেশ করেচি, যাও।

—জ্ঞান ওসব আমি পছন্দ করি নে।

—আমি ভয়ও করি নে।

দু'জনে খুব হাসলাম—পান্না তুমি কি আমায় ভালোবাসো? সত্যি জবাব দাও।

পান্না ঘাড় দুলিয়ে বললে—না—

—না, হাসি ঠাট্টা রাখো, সত্যি বলো।

—কখনই না।

—বেশ, আমি তবে এই রাত্তিরে চলে যাবো।

—সত্যি?

—যদি ভালো না বাসো, তবে আর মিথ্যে কেন খয়ে-বন্ধন—

পান্না খিলখিল করে হেসে উঠলো মুখে আঁচল দিয়ে। ততক্ষণ সে আমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেচে!

আমি কিন্তু মন ঠিক করে রেখেছি। ফাঁকা কথায় ভুলবার নই আমি। কাল সকালে পান্না আমার সঙ্গে যেতে পারবে কিনা? যেখানে আমি নিয়ে যাবো। সে বিচারের ভার আমার উপর ছেড়ে দিতে পারবে কি ও? আমি জানতে চাই এখুনি।

পান্না সহজ ভাবে বললে—নাও ওগো গুরুঠাকুর, কাল সকালে যখন খুশি তুমি কৃপা করে আমায় উদ্ধার কোরো—এখন চা'টুকু আর ভাজা ক'টা ভাল মুখে খেয়ে নাও তো দেখি?

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল। আমি বললাম—এখন?

পান্না হেসে বললে—কি এখন?

—এখন কি করা যাবে?

—এখানে থাকতে হবে রাত্রে, আবার কি হবে ?

আমারও তাই ইচ্ছে। পান্নাকে ছেড়ে যেতে এতটুকু ইচ্ছে নেই আমার। ওর মুখের সৌন্দর্য্য আমাকে এত মুগ্ধ করেচে যে ওর মুখের দিকে সর্ব্বদা চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিছুক্ষণ না দেখলে মনে হয় পান্নার মুখ আমার মনে নেই, আদৌ মনে নেই। আর একবার কখন দেখা হবে ? পান্নার মুখ ভুলে গেলাম ? ওকে না দেখে থাকতে পারি নে। ওর মুখের নেশা মদের নেশার মতই তীব্র আমার কাছে। বুঝচি মোহ আনচে। সর্ব্বনাশ করচে আমার, অমানুষ করে দিচ্চে আমাকে। কিন্তু ছাড়বার সাধ্য নেই আমার। ছাড়বোই যদি, তবে আর মোহ বলেচে কেন ?

মনে মনে ভাবলুম, পান্নার মাসী যে খাণ্ডার, এখানে আমাকে রাত্রে দেখতে পেলে যা খিট্‌খিট্ করবে।

পান্নাকে বললাম, কিন্তু তোমার সেই মাসী ? যিনি জন্মাতেই তাঁর মা জিবে মধু দিয়েছিলেন ?

পান্না খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। আমার মুখের দিকে হাসি-উপছে-পড়া ডাগর চোখে চেয়ে বললে, সে কি ? আবার বলুন ত কি বল্লেন ?

—তোমার সেই খাণ্ডার মাসী—

—হ্যাঁ, তারপর ?

—যিনি জন্মাতেই তাঁর মা জিবে মধু দিয়েছিলেন।

—ওমা ! কি কথার বাঁধুনি !

পান্না হেসে আবার গড়িয়ে পড়লো। কি সুন্দর, লাবণ্যময়ী দেখাচ্ছিল ওকে। হাত দু'টি নাড়ার কি অপূর্ব ভঙ্গি ওর। এ আমি ওর সঙ্গে আলাপ হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আসচি। আমার আরও ভাল লাগলো ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে। আমি ঠিক বলতে পারি সুরবালা বুঝতে পারতো না আমার কথার শ্লেষটুকু, বুঝতে পারলেও তার রস গ্রহণের ক্ষমতা এত নয়, সে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারতো না। পান্নাকে নতুন ভাবে দেখতে পেলুম সেদিন। আমি ভোঁতা মেয়ে ভালবাসি নে, ভালবাসি সেই মেয়েকে মনে মনে, যার ক্ষুরের মত ধার বুদ্ধির, কথা পড়বা মাত্র যে ধরতে পারে।

পান্না আমার কথা শুনে আমার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো, ওর চোখের চাউনির ভাষা গেল বদলে। মেয়েদের এ অদ্ভুত খেলা দু' মিনিটের মধ্যে। তবে সব মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয় এ খেলা তাও জানি। সুরবালাদের মত দেবীর দল পারে না।

পান্নাকে বললাম, খাবো কি ?

—কেন আমাদের রান্না খাবেন না ?

—না।

—তবে ?

—হোটেল থেকে খেয়ে আসবো এখন।

সে রাত্রে মাসী আমার দিকেও এলো না। কেন কি জানি। হয়তো পান্না বারণ করে থাকবে। কেবল অনেক রাত্রে পান্না আর আমি যখন গল্প করচি, ওর মাসী বাইরে এসে আমাদের কথা শুনতে পেয়ে বললে—ওমা, ই কি অনাছিষ্টি কাণ্ড! এখনো তোমাদের চোখে ঘুম এলো না? রাত দুটো বেজেচে যে! পান্না চোখ টিপে আমায় চুপ ক'রে থাকতে বললে। দিব্যি গদি-পাতা ধপধপে বিছানা, পান্না ওদিকে আমি এদিকে বালিশ ঠেস দিয়ে গল্প করছি। আমি ওকে যেন আজ নতুন দেখচি। একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারচি নে। কত প্রশ্ন, কত আলাপ পরস্পরে।

এমনি ভাবেই ভোর হয়ে গেল।

পান্না উঠে বললে—ফুলশয্যের বাসর শেষ হল। তুমি চা খাবে তো? মুখ ধুয়ে নাও—আমি চা করি।

—করো। আজ মনে আছে?

—হ্যাঁ মনে আছে।

—কি বলো তো?

—আজ তুমি আমায় নিয়ে যাবে।

—চা খেয়ে আমি একটু বেরুবো। তুমি তৈরী হয়ে থাকবে।

—বেশ।

—মাসীকে কিছু বলো না যেন যাওয়ার কথা। বাইরে দেখে এসো তো কেউ নেই, না আছে?

পান্না মুখ টিপে হেসে বললে—সে আগেই আমি দেখেচি। এখনো কেউ ওঠে নি। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো।

চা খেয়ে আমি বাড়ীর বার হয়ে একটা পার্কে গিয়ে বসলাম। সারারাত ঘুম হয় নি, ঘুমে চোখ ঢুলে পড়েচে, কিন্তু একটা অদ্ভুত আনন্দে মন পরিপূর্ণ। করালী ঠিকানা দিয়েচে, ওকে একটা চিঠি লিখি। ওর দেশেই গিয়ে একটা বাসা নিয়ে প্র্যাকটিস্ করবো।

আপাততঃ কলকাতায় একটা ছোটখাটো বাসা দেখে আসা দরকার।

পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। যখন জেগে উঠলাম তখন বেলা সাড়ে ন'টা। একটা নাপিতকে ডেকে দাড়ি কামিয়ে নিলাম। চায়ের দোকানে আর এক পেয়ালা চা খেলাম। এইবার অবসাদ একটু কেটেচে। তারপর বাসা খুঁজতে বেরুই।

কলকাতায় আমায় কেউ চেনে না। ডাক্তারি পড়বার সময়ে যে মেসে থাকতাম, সেটা কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে। সে মেসে আমাদের সময়কার এখন কেউ নেই—যে যার পাশ করে বেরিয়ে গিয়েচে আট দশ বছর আগে। তাহলেও এই অঞ্চলের অনেক মুদী, নাপিত, চায়ের দোকানী আমায় চেনে হয়তো। ও অঞ্চলেও গেলাম না বাসা খুঁজতে। এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে আমাকে কেউ চেনে না। কলকাতা শহর জনসমুদ্র বিশেষ,

এখানে লুকিয়ে থাকলে কার সাধ্য খুঁজে বার করে? কে কাকে চেনে এখানে? অজ্ঞাতবাস করতে হলে এমন স্থান আর নেই।

বাসা ঠিক হয়ে গেল। লেবুতলা এক ক্ষুদ্র গলির মধ্যে বাসা। আপাততঃ থাকবার জন্যে, ডাক্তারি এখান থেকে চলবে না, বড় রাস্তার ধারে তার জন্যে ঘর নিতে হবে বা একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসে কোন একটা ডিস্‌পেনসারিতে বসবার চেষ্টা করতে হবে। বাড়ীটা ভালো, ছোট হলেও অন্য কোন ভাড়াটে নেই এই একটা মস্ত সুবিধে। এই রকম বাড়ীই আমি চেয়েছিলাম। ওপরে দুটি ঘর, দুটিই বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করা যায়, আলো হাওয়া মন্দ নয়।

বাড়ীওয়ালা একজন স্বর্ণকার, এই বাড়ী থেকে কিছুদূরে কেরাণী-বাগান লেনের মোড়ে তার সোনারুপোর দোকান।

বাড়ী আমার দেখা হয়ে গেলে সে আমায় জিজ্ঞেস করলে আমি কবে আসবো। আমি জানালুম আজই আসচি। চাবিটা কোথায় পাওয়া যাবে? সে ওর সোনারুপোর দোকান থেকে চাবিটা নিয়ে আসতে বললে।

এই বাড়ীতে পান্না আর আমি নিভৃতে দু'জন থাকবো?

পান্নাকে এত নিকটে, এত নির্জ্জনে পাবো? ওকে নিয়ে এক বাসায় থাকতে পাবো? এত সৌভাগ্য কি বিশ্বাস করা যায়?

আনন্দে কিসের একটা ঢেউ আমার গলা পর্য্যন্ত উঠে আসতে লাগলো। আজই দিনের কোন এক সময়ে পান্না ও আমি এই ঘরে সংসার পেতে বাস করবো। এই ক্ষুদ্র দোতলা বাড়ীটা—বাইরে থেকে যেটা দেখলে ঘোর অভক্তি হয়—সে সৌভাগ্য বহন করবে এই বাড়ীটাই।

না, হয়তো কিছুই হবে না। পান্না আসবে না, পান্নার মাসী পথ আটকাবে—ওকে আসতেই বাধা দেবে।

বাড়ীওয়ালা আমার দেরি দেখে নিচে থেকে ডাকাডাকি করতে লাগলো। সে কি জানবে আমার মনের ভাব?

বাড়ী দেখে যখন বেরুলাম তখন বেলা একটা। খিদে পেয়েচে খুবই, কিন্তু আনন্দে মন পরিপূর্ণ, খাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই।

বৌবাজারের মোড়ের একটা শিখ-হোটেল থেকে দু'খানা মোটা রুটি আর কলাইয়ের ডাল, বড় এক গ্লাস চা পান করি। চা জিনিসটা আমার সর্ব্বদাই চাই। অন্ন আহার না করলেও আমার কোন কষ্ট হয় না, যদি চা পাই। ঠিক করলাম বাসাতে পান্নাকে এনে আজই ওবেলা সর্ব্বাগ্রে আমার চায়ের সরঞ্জাম কিনে আনতে হবে। পান্না চা করতে জানে না ভালো, ওকে শিখিয়ে নিতে হবে চা করতে।

বেলা তিনটের পর পান্নাদের বাসাতে গিয়ে পৌঁছুলাম। পান্না অঘোর ঘুমুচ্চে, কাল রাত্রি জাগরণের ফলে। পান্নার মাসীও ঘুমুচ্চে ভিন্ন ঘরে। পান্নাকে আমি ঘুম থেকে

উঠিয়ে বললাম—সব তৈরী। বাসা দেখে এসেচি। কখন যাবে?

পান্না ঘুমজড়িত চোখে বললে—কোথায়?

—বেশ! মনে নেই? উঠে চোখে জল দাও।

—খেয়েচ?

—না খেয়ে এসেচি?

—আমি তোমার জন্তে লুচি ভেজে রেখেচি কিন্তু। আমাদের এখানে লুচি খেতে দোষ কি?

—দোষের কথা নয়। তুমি চল আমার সঙ্গে। সেখানে তুমি ভাত রেঁধে দিলেও খাবো।

—ইস্! মাইরি! আমার কি ভাগ্যি!

—আমি গাড়ী নিয়ে আসি?

—বোসো। চোখে জল দিয়ে আসি—

—তোমার মাসী ঘুমুচ্চে—এই সবচেয়ে ভাল সময়।

—বোসো। আসচি।

একটু পরে পান্না সত্যিই সেজেগুজে এল।

বললে—কোনো জিনিস নেই আমার, একটা পেঁটরা আছে কেবল। সেটা নিলুম আর এই কাপড়ের বোঁচকাটা।

আমি বললাম—চলো ওই নিয়ে। বাসে উঠবো, আর দেরি করো না।

—দেওয়ালে দু'খানা পিক্চার আছে, আমার নিজের পয়সায় কেনা, খুলে নিই—

পান্না ঠকাঠক শব্দ করে পেরেক তুলতে লাগলো দেখে আমার ভয় হল। বললাম—আঃ কি করো? ওসব থাকগে। তোমার মাসী জেগে কুরুক্ষেত্র বাধাবে এখুনি।

পান্না হেসে বললে—সে পথ বন্ধ। আমি বলেই রেখেচি মুজরো করতে যেতে হবে আমাকে আজ। নীলি সঙ্গে যাবে। নীলি সেই মেয়েটি গো, আমার সঙ্গে যে গিয়েছিল মঙ্গলগঞ্জ।

একটু পরে আমরা দু'জনে রাস্তায় বার হই।

লেবুতলার বাসার সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে কেরাণীবাগান লেনের স্বর্ণকারের দোকানে চাবি আনতে গেলাম। বাড়ীওয়ালা একগাল হেসে বললে—এসেচেন?—কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—চাবি নিয়ে আসিগে। দাঁড়ান একটু।

—আমি আমার স্ত্রীকে যে রিক্শাতে বসিয়ে রেখে এসেছি। ওই বাড়ীর সামনে।

—আপনি মাঠাকুরুনের কাছে চলে যান। আমি চাবি নিয়ে যাচ্ছি—

পান্না নাকি মাঠাকুরুন। মনে মনে হাসতে হাসতে এলাম।

আমার ইচ্ছে নয় যে বাড়ীওয়ালা পান্নাকে দেখে। পান্নার সিঁথিতে সিঁদুর নেই, হঠাৎ মনে পড়লো। পান্নাকে বললাম—তাড়াতাড়ি ঘোমটা দাও। বাড়ীওয়ালা আসচে।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠেই পান্না হঠাৎ চুপ করে ঘোমটা টেনে দিল। অভিনয় করতে দেখলুম ও বেশ পটু। যতক্ষণ বাড়ীওয়ালা আমাদের সঙ্গে রইল বা ওপরে নিচের ঘরদোর দেখাতে লাগলো, ততক্ষণ পান্না এমন হাবভাব দেখাতে লাগলো যেন সত্যিই ও নিতান্ত লজ্জাশীলা একটি গ্রাম্যবধূ।

বাড়ীওয়ালা বললে—একটা অসুবিধা দেখচি যে—

—কি ?

—আপনি আপিসে বেরিয়ে যাবেন। মাঠাকরুন একা থাকবেন—

—তা একরকম হয়ে যাবে।

—আমার মেয়ে আছে, না হয় সে মাঝে মাঝে এসে থাকবে।

—তা হবে।

বাড়ীওয়ালা তো চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে পান্না ঘোমটা খুলে বললে—বাবাঃ, এমন বিপদেও—দম বন্ধ হয়ে মরেছিলুম আর একটু হলে আর কি।

তারপর বললে—বাসা তো করলে দিব্যিটি। কিন্তু এত বড় বাড়ী নিলে কেন ? একটা ঘর হলে আমাদের চলে যেতো। এত বড় বাড়ী সাজাবে কি দিয়ে ? না আছে একটা মাদুর বসবার, না একখানা কড়া, না একটা জল রাখবার বালতি।

—সব হবে ক্রমে ক্রমে।

—না হলে আমার কি ? আমি মেজেতেই শুতে পারি।

একটি মাত্র পেঁটরা সঙ্গে এসেচে। তার মধ্যে সম্ভবতঃ পান্নার কাপড় চোপড় পেতে বসবার পর্য্যন্ত একটা কিছু নেই। তাও ভাগ্যে বাড়ীওয়ালা ঘরগুলো ধুয়ে রেখেছিল, নতুবা ঘর ঝাঁট দেবার ঝাঁটার অভাবে ধূলিশয্যা আশ্রয় করতে হোত। পান্না বললে—চা একটু খাবে না ? সকাল বেলা চা খাওনি তো।

কথাটা আমার ভালো লাগলো, ও যদি বলতো, চা একটু খাবো তা হলে ভালো লাগতো না। ও যে আমার সুখ-সুবিধে দেখচে, গৃহিণী হয়ে পড়েচে এর মধ্যেই, এটা ওর নারীত্বের স্বপক্ষে অনেক কিছু বললে। সত্যিকার নারী।

আমি বললাম—দোকান থেকে আনি—

—তাও তো পাত্র নেই, পেয়ালা নেই, চা খাবে কিসে ?

—নারকোলের খোলায় !

দু'জনেই হেসে উঠলুম একসঙ্গে। উচ্চরবে মন খুলে, এমন হাসি নি অনেকদিন। পান্না বেশ মেয়ে, সঙ্গিনী হিসাবে আনন্দ দান করতে পারবে প্রতি মুহূর্ত্তে। সুরবালার মত দেবী সেজে থাকবে না।

সকাল ন'টা। রান্নার কি ব্যাপার হবে ওকে জিজ্ঞেস করলাম। দু'জনে আবার পরামর্শ করতে বসি। অমন সাজানো ঘর-সংসার ছেড়ে এসে রিক্ততার আনন্দ নতুন লাগচে। এখানে আমাকে নতুন করে সব করতে হবে। কিছু নেই আমার এখানে।

পান্না বললে—কাছে হোটেল নেই?

—তা বোধ হয় আছে।

—দু'থালা ভাত নিয়ে এসো আমাদের জন্যে, এবেলা কিছুরই যোগাড় নেই, ওবেলা যা হয় হবে।

—থালা দেবে?

—তুমি খেয়ে এসো, আমার জন্যে নিয়ে এসো শালপাতা কি কলার পাতা কিনে।

—সে বেশ মজা হবে কি বলো?

—খুব ভালো লাগবে। তুমি নাইবে, তোমার কাপড় আছে?

—কিছু না। শুধু-হাতে বাড়ী থেকে বেরিয়েচি। কাপড় কোথায়?

—আমার শাড়ী পোরো একখানা। নেয়ে নাও। কলের জল চলে যাবে।

নতুন ঘরকন্না। নতুন সংসারের সহস্র অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। হোটেলের অখাদ্য ডাল ভাত আর শাক বেগুনের চচ্চড়ি খেয়ে কি খুশী দু'জনে। আমার দিক থেকে এটুকু বলতে পারি, আমার দেশের সংসারের অবস্থা অসচ্ছল নয়, সুরবালা আমার খাওয়া-দাওয়ার দিকে সর্ব্বদা নজর রাখতো, সুতরাং হোটেলের ডাল-ভাতের মত খাদ্য আমার মুখ জীবনে ক'দিনই বা দিয়েচে। কিন্তু তবুও তো খেলুম, বেশ আনন্দ করেই খেলুম।

পান্না উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলে দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলে। বললে—পান নিয়ে এসো দু পয়সার। পয়সা দিচ্চি—বলেই পেঁটরা খুলতে বসলো। আমি হেসে বললাম—শুধু পানের দাম কেন, তা হলে এক বাক্স সিগারেটের দাম দাও। ওর মুখ দেখে মনে হল ও আমার এ কথাটাকে শ্লেষ বলে ধরতে পারে নি, দিব্যি সরলভাবে একটা টাকা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে—টাকাটা ভাঙিয়ে পান সিগারেট কিনে এনো।

—কত আনবো?

—এক বাক্স আনবে, না একসঙ্গে দু'বাক্সই না হয় আনো। আবার দরকার হবে তো?

—যদি কিছু ফেরৎ না দিই?

—কেন, আর কিছু কিনবে? তা যা তোমার মনে হয় নিয়ে এসো।

—কত টাকা আছে তোমার কাছে দেখি?

পান্না তোরঙ্গ থেকে একখানা খাম আর একটা পুঁটুলি বের করে গুনতে আরম্ভ করলে। চল্লিশ টাকা আর কয়েক আনা পয়সা দেখা গেল ওর পুঁজি। আমি বললাম—মোটে?

ও বেশ সরল ভাবেই বললে—এর মধ্যে আবার মুজরো করতে গেলেই হাতে পয়সা হবে।

—সে কি! তুমি আবার খেমটা নাচ নাচতে যাবে নাকি?

—যাবো না?

—তুমি আমার স্ত্রী পরিচয়ে এখানে এসে আসরে খেমটা নাচতে যাবে?

পান্না বোধ হয় এ কথাটা ভেবে দেখে নি, সে বললে—তবে আমার টাকা আসবে কোথা থেকে?

—দরকার কি?

—তুমি দেবে এই তো? কিন্তু আমি কত টাকা রোজগার করি তুমি জানো? দেখেছিলে তো মঙ্গলগঞ্জে?

—কত?

—ছ'টাকা করে ফি রাত। নীলি নিত সাত টাকা।

—মাসে ক'বার নাচের বায়না পাও?

—ঠিক নেই। সব মাসে সমান হয় না। পাঁচ ছ'টা তো খুব। দশটাও হোত কোনো মাসে।

—তার মানে মাসে গড়ে ত্রিশ বত্রিশ টাকা, এই তো?

—তার বেশি। প্রায় চল্লিশ টাকা।

আমি মনে মনে হাসলাম। পান্না জানে না ডাক্তারিতে একটা রুগী দেখলে অনেক সময় পাড়াগাঁয়ে ওর বেশিও পাওয়া যায়। আমায় ভাবতে দেখে পান্না বললে—ধরো যদি নাচের বায়না না নিতে দাও তবে কলকাতার সংসার চালাবে কি করে? তোমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, কলকাতার খরচ কি জানো? যাট টাকার কমে মাস যাবে না। তুমি একা পারবে চালাতে?

আমার হাসি পেল। আমি বললাম—আমায় একটা কিছু বাজাতে শেখাবে?

— কি?

- এই ধরো বাঁশি কি ডুগি-তবলা।

—গানের দলে তোমার সঙ্গে বেরুতাম। দুজনে রোজগার হোত।

—ইস্! ঠাট্টা হচ্চে বুঝি। গানের দলে ডুগি-তবলা বাজানোর দাম আছে, সে তোমার কর্ম্ম নয়। আমি তো যেমন তেমন, নীলির নাচে বাজাতে পারা যার-তার বিদ্যেতে কুলোবে না। হ্যাঁ গো মশাই, নীলি থিয়েটারে নাচতো তা জানো?

—সখীর ব্যাচে তো? সে যে-কোনো ঝি নাচতে পারে। তাতে বিশেষ কি কৌশল বা কারিকুরি আছে?

পান্না হাসতে হাসতে বললে—তুমি নাচের কি বোঝো যে ওই সব কথা বলচো? আমরা কষ্ট করে নাচ শিখেছি, কত বকুনি খেয়ে, কত অপমান হয়ে তা জানো? কিসে কি আছে না আছে তুমি কিছুই জানো না।

—তোমার নাচের সরঞ্জাম সব এখানে আছে ?

—নেই ? ওমা, তবে করবো কি ? সব আছে।

—আজ আমার সামনে নেচে দেখাবে না ?

—ওবেলা। রাত্তিরে। একটু ঘুমুই। বড্ড ঘুম পাচ্চে।

পান্না ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ওর নিদ্রিত মুখের দিকে চেয়ে থাকি। আমার বয়েস আর ওর বয়েস কত তফাৎ। আমি চল্লিশ, পান্না ষোলো বা সতেরো। এ বয়সের মেয়ে আমার মত বয়সের লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়ে ?

নিশ্চয়ই এ প্রেম। পান্না আমাকে ভালো না বাসলে আমার সঙ্গে ঘর-দোর আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে পালিয়ে এল কেন ? তা কখনো আসে ? নারীর প্রেম কি বস্তু কখনো জানি নি জীবনে। সুরবালাকে বিবাহ করেছিলুম, সে অন্যরকম ব্যাপার। এ উন্মাদনা তার মধ্যে নেই। অল্পবয়সের বিবাহ, সুরবালা আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট—এ অবস্থায় স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এক ধরনের সাংসারিক ভালোবাসা হোতেই পারে, আশ্চর্য্য নয়। একটি পরম বিস্ময়ের বোধ ও তজ্জনিত উন্মাদনা সে ভালোবাসার মধ্যে ছিল না। সে তো আগে থেকেই ধরে নিয়ে বসেছিলাম—সুরবালা আমায় ভালোবাসবেই। ভালোবাসতে বাধ্য। এ রকম মনোভাব প্রেমের পক্ষে অনুকূল নয়। কাজেই প্রেম সেখান থেকে শতহস্ত দূরে ছিল।

কিন্তু জিনিসপত্রের কি করি ?

জিনিসপত্র না হলে বড় মুশকিল। পান্না শুয়ে আছে শুধু মেজেতে একখানা চাদর পেতে। শতরঞ্জি নেই, কার্পেট নেই—একখানা মাদুর পর্য্যন্ত নেই। সংসার পাততে গেলে কত কি জিনিস দরকার তা কখনো জানতাম না। সাজানো সংসারে জন্মেছি, সাজানো সংসারে সংসার পাতিয়েছিলাম। এখন দেখছি একরাশ টাকা খরচ হয়ে যাবে সব জিনিস গোছাতে। কিছুই তো নেই। থাকবার মধ্যে আছে আমার এক সুটকেস, পান্নার এক টিনের পেঁটরা, তাতে ওর কাপড় চোপড়। মাথায় দেবার একটা বালিস নেই, জল খাবার একটা গ্লাসও নেই। দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হল না।

পান্না ঘুম থেকে উঠলে আমি ওকে সব খুলে বলি।

পান্নার মুখ কি সুন্দর দেখাচ্চে। অলস, ঢুলুঢুলু, ডাগর ডাগর চোখ দু'টিতে তখনও ঘুম জড়ানো। ও কোনো কিছুই গায়ে মাখে না। হাসিমুখে আমোদ নিয়েই ওর জীবন। হেসে বললে—বেশ মজা হয়েচে, না ?

—মজাটা কি রকম ? এখুনি যদি জল খেতে চাই, একটা গ্লাস নেই। ভারি মজা !

—একটা কাঁচের গ্লাস কিনে নিয়ে এসো না ? বাজারে পাওয়া যাবে তো।

—তবেই সব হল। তুমি কিছু বোঝো না পান্না। ঘরসংসার কখনো পাতাও নি। তোমার দেখছি নির্ভাবনার দেহ।

পান্না হঠাৎ পাকা গিন্নীর মত গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—তাইতো কি করা যায় তাই ভাবচি।

রাত্রে পান্না বড় মজা করলে।

দেওয়ালের কাছে একটা শাড়ী পেতে আমাকে বললে—তুমি এখানে শোবে।

—তুমি ?

—এইখানে দেওয়ালের ধারে।

—মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান। রাত্রে যদি তোমার ভয় করে ?

—তোমার কথা আমি বুঝতে পারি নে বাপু, ভয় করবে কেন ? কত জায়গাতে ঘুরবো আমি। কত জায়গায় ঘুরেচি মুজরো করতে।

—বড্ড সাহসিকা তুমি।

—নিশ্চয়ই সাহসিকা।

পান্না হেসে উঠলো এবার।

—থাক বাপু, যাতে যার সুবিধে হবে সে তাই করুক।

আমি কিন্তু ঘুমুতে পারলুম না সারা রাত। পান্না আমার এত কাছে থাকবে, একই ঘরে, এ আমার কাছে এতই নতুন যে নতুনত্বের উত্তেজনায় চোখে ঘুম এলো না আমার।

দু'জনেই গল্প আরম্ভ করে দিলাম।

—কি রকম মুজরো করো তোমরা ?

—যেমন সবাই করে। তোমার যেমন কথাবার্ত্তা!

—বাড়ীর জন্যে মন কেমন করচে ?

—কেন করবে ?

—বাড়ী ছেড়ে থেকে অব্যেস হয়ে গিয়েচে কি না।

—আমি আর নীলি কত দেশ ঘুরেচি।

—কোন্ কোন্ দেশ ?

—কেষ্টনগর, দামুড়, হুকো, চাকদা, জঙ্গিপুর আরও কত জায়গা!

—নীলির জন্যে মন-কেমন করচে ?

—কিছু না।

—আমার কাছে থাকবে ?

—কেন থাকবো না ? তবে এলাম কেন ?

আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারচি না, পান্না কি সব দিক দেখে-শুনে আমার কাছে এসেছে ? আমার বয়েস কত বেশি ওর তুলনায়। আমার সঙ্গে সত্যি ওর ভালবাসা হোতে পারে ?

কি জানি, এই রহস্যটাই আমার কাছে সব চেয়ে বেশি রহস্য।

নানা কথাবার্ত্তায় এই কথাটা আমি পান্নার কাছ থেকে জানতে চাই। ওর মনোভাব কি, এ কথা ওই কি আমায় বলতে পারে ?

সকাল হবার আগে পান্না আমায় বললে—একটু ঘুমুই ?

—ঘুম পাচ্ছে ?

—পাবে না ? ফর্সা হয়ে এল যে পূবে।

—ঘুমোও না একটু।

একটু পরে ভোর হয়ে গেল।

পান্না তখন অঘোরে ঘুমুচ্চে। ডান হাতে মাথা রেখে দিব্যি ঘুমুচ্চে ও, দেখে মায়া হল। মা ছেড়ে, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে ও কিসের আশায় চলে এল আমার সঙ্গে ? পান্না ভদ্রঘরের কুলবধূ বা কুমারী নয়, গৃহত্যাগ করে চলে এসেচে আমার সঙ্গে।

আবার যখন অসুবিধে হবে, ও চলে যেতে পারবে, আটকাচ্চে কোথায় ?

আমি চায়ের দোকানে চা খেয়ে পান্নার জন্যে চা নিয়ে এলাম।

পান্না উঠে চোখ মুছচে।

—ও পান্না ?

পান্না এক কাণ্ড করে বসলো। তাড়াতাড়ি উঠে মাথায় আঁচল দিয়ে আমায় এসে এক প্রণাম ঠুকে দিলে।

আমি হেসে উঠলুম। বলি এ কি ব্যাপার ?

—কেন ? নমস্কার করতে নেই ?

—থাকবে না কেন ? হঠাৎ এত ভক্তি ?

—ভক্তি করতে কিছু দোষ আছে ?

—কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো ?

—বলো যেন শীগ্‌গির করে মরে যাই।

—কেন, জীবনে এত অরুচি হোল কবে ?

—বেশিদিন বেঁচে কি হবে ? তুমি তো বামুন ?

—তাতে সন্দেহ আছে নাকি ? তুমি কি জাত ?

—বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণ। মায়ের মুখে শুনেছি।

—ওসব ভুল কথা। তোমার মা বংশের কৌলীন্য বাড়াবার জন্যে ওই কথা বলেছেন। আমার বিশ্বাস হয় না।

—ভয় কিসের ? আমি কি বলবো আমায় বিয়ে কর ?

—সে কথা হচ্চে না। আমি বলচি তুমি যে জাতই হও, আমার কাছে সব সমান। বামুনই হও আর তাঁতিই হও—চা খাবে না ?

—চা এনেচ ?

—খেয়ে নাও, জুড়িয়ে যাবে।

এইভাবে সেদিন থেকে আমাদের নতুন জীবনযাত্রা নতুন দিন নতুনভাবে শুরু হল। আমার হাতে নেই পয়সা ! বাড়ী থেকে কিছু আনি নি, ভাঁড় নিয়ে এলুম জল খাবার জন্যে। সস্তায় দু'খানা মাদুর কিনে আনলুম। শালপাতা কুড়িদরে কিনে আনি দু'বেলা ভাত খাওয়ার জন্যে। পান্না তাতে এতটুকু অসন্তুষ্ট নয়। যা আনি, ও তাতেই খুশি। আমার কাছে মুখ

ফুটে এ পর্য্যন্ত একটা পয়সাও চায় নি। বরং দিতে এসেচে ছাড়া নিতে চায় নি। অদ্ভুত মেয়ে এই পান্না।

রাস্তায় নেমে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম কেউ কোনো দিকে নেই। কি জানি কেন, আজকাল সর্ব্বদাই আমার কেমন একটা ভয় ভয় হয়, এই বুঝি আমাদের গ্রামের কেউ আমাদের দেখে ফেললে। আমার এ সুখের সংসার একদিন এমনি হঠাৎ, সম্পূর্ণ আকস্মিক-ভাবে ভেঙে যাবে।

আমার বুক সর্ব্বদা ধড়ফড় করে ভয়ে। ভয় নানারকম, পান্নাকে হয়তো গিয়ে আর দেখতে পাবো না। ও যে ভালবাসা দেখাচ্চে হয়তো সব ওর ভান। কোনদিন দেখবো ও গিয়েচে পালিয়ে।

চা নিয়ে ফিরে এলুম। তখনও পান্নার চুলবাঁধা শেষ হয় নি।

পান্না বললে—খাবার কই ?

—খাবার আনিনি তো !

—বাঃ, শুধু চা খাবো ?

—পয়সাতে কুলোলো কই ? চার আনাতে কি হবে।

—পাউডারের কৌটোর মধ্যে যা ছিল সব নিয়ে গেলে না কেন ? আবার যাও, নিয়ে এসো। একটা টাকা নিয়ে যাও।

টাকা নিয়ে আমি বেরিয়ে চলে গেলুম এবং গরম গরম কলাইয়ের ডালের কচুরি খান আটদশ একটা ঠোঙায় নিয়ে ফিরলুম একটু পরেই। আমি সচ্ছল গৃহস্থঘরের ছেলে, নিজেও যথেষ্ট পয়সা রোজগার করেছি ডাক্তারি করে, কিন্তু এমন ভাবে মাদুরের ওপর বসে শাল-পাতার ঠোঙায় কচুরি খেয়ে সেদিন যা আনন্দ পেয়েছিলাম, আমার সারা গৃহস্থ-জীবনে তেমন আমোদ ও তৃপ্তি কখনো পাই নি।

পান্নাকে বললাম, পান্না, পয়সা ফুরিয়ে যাচ্চে, কি হবে ? বাসাখরচ চলবে কিসে ?

ও হেসে বললে—বারে, আমার কাছে ত্রিশ বত্রিশ টাকার বেশি আছে না ?

—তুমি নিতান্ত বাজে কথা বলো। খরচের সম্বন্ধে কি জ্ঞান আছে তোমার ? ওতে কতদিন চলবে ?

—সোনার হার আছে, কানের দুল আছে।

—তাতেই বা ক'দিন চলবে ?

পান্না একটু ভেবে বললে—তোমাকে ঠিকানা দিচ্চি, তুমি নীলির কাছে যাও। আমরা দু'জনে মিলে মুজরো করলে আমাদের চলে যাবে।

—সে হবে না।

—কেন ?

—নীলির কাছে গেলেই তোমার মা জানতে পারবে।

—নীলিকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো।

—ঠিকানা দাও, আমি এখুনি যাবো।

সন্ধ্যার আগেই ঠিকানা অনুযায়ী নীলিকে খুঁজে বার করলাম। একটা বড় খোলার বস্তির একটা ঘরে নীলিমা ও তার বড় দিদি সুশীলা থাকে। আমাকে দেখে প্রথমতঃ চিনতে পারে নি নীলিমা। আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দেওয়ার পরে সুশীলা এসে আমায় নিয়ে গেল ওদের ঘরের মধ্যে। দু'টো বড় বড় তক্তপোশ একসঙ্গে পাতা, মোটা তোশক পাতা বিছানা, কম দামের একটা ক্লকঘড়ি আছে ঘরের দেওয়ালে এবং যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, খানকতক ঠাকুর-দেবতার ছবি। সুশীলার বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ হবে, মুখে বসন্তের দাগ না থাকলে ওর মুখ দেখতে একসময় মন্দ ছিল না বোঝা যায়।

সুশীলা থাকাতে আমার বড় অসুবিধে হল। সুশীলার অস্তিত্বের বিষয় আমি অবগত ছিলাম না, ওর সামনে সব কথা বলা উচিত হবে না হয়তো। নীলিকে নির্জ্জনে কোনো কিছু বলবার অবকাশও তো নেই দেখছি। মুশকিলে পড়ে গেলাম। সুশীলা ভেবেছে আমি হয়তো ওদের জন্যে কোনো একটা বড় মুজরোর বায়না করতে এসেছি। ও খুব খাতির করে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। বললে—চা খাবেন তো?

—তা মন্দ নয়।

—বসুন, করে নিয়ে আসি। নীলি, বাবুকে বাতাস কর।

—না না, বাতাস করতে হবে না। বোসো এখানে।

সুশীলা ঘর থেকে চলে গেলেই আমি সংক্ষেপে নীলিমাকে সব কথা বললাম। আমাদের ঠিকানাও দিলাম। নীলিমা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বললে—আপনি তো মঙ্গলগঞ্জের ডাক্তার ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি ডাক্তারি করবেন না?

—কোথায় করবো? সে সুবিধে দেখচিনে।

—তবে চলবে কি করে?

—সে জন্তেই তো তোমাকে ডেকেছে পান্না। তুমি গিয়ে দেখা করতে পারবে? যাবে আমার সঙ্গে?

—কেন যাবো না?

—তোমার দিদি কিছু বলবে না তো?

—না না। দিদি কি বলবে? আমি এখুনি যাবো। তবে দিদিকে মিথ্যে কথা বলতে হবে। বলবেন, আমি মুজরোর বায়না করতে এসেছি, ওকে একবার পান্নার কাছে নিয়ে যাবো। পান্নাকে দিদি চেনে না।

—মিথ্যে কথা আমি বলতে পারবো না। তুমি যা হয় বলো।

সুশীলা চা নিয়ে এলে নীলিমা বললে—দিদি, বাবুর সঙ্গে আমাকে এখুনি এক জায়গায় যেতে হবে।

—কেন?

—বাবুর দরকার আছে। মুজরোর বায়না হবে এক জায়গায়। সেখানে যেতে হবে।

—যা। আমি সঙ্গে আসবো?

—না, তোমায় যেতে হবে না। বাবু আমায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

—আজ রাতেই দিয়ে যাবো। ন'টার মধ্যেই।

—সেজন্যে কিছু নয় বাবু, সে আপনি নিয়ে যান না? তবে ছু'টো টাকা দিয়ে যাবেন। খরচপত্তর আছে তো? ও গেলে চলে না।

—সে আমি ওর হাতেই দেবো এখন।

—না বাবু, টাকাটা এখুনি আপনি দিয়ে যান।

সুশীলার হাতে আমি টাকা ছু'টো দিতে ও খুব অমায়িক ভাবে হাসলে। এরা গরীব, এদের অবস্থা দেখেই বুঝলাম। পান্নারা এদের কাছে বড়লোক। নীলিমা আমাকে বললেও সে কথা রাস্তায় যেতে যেতে। পান্না না হলে ওদের মুজরোর বায়না হয় না। এর প্রধান কারণ পান্না দেখতে অনেক সুশ্রী এর চেয়ে।

বাসায় ফিরে এলুম। নীলিমাকে দেখে পান্না খুব খুশী, আমায় বললে—চা খাবার কিছু নিয়ে এসো। শীগ্‌গির যাও—ওকে পান্না কি বলেচে জানিনে, চা খাবার নিয়ে ফিরে এসে দেখি নীলি কৌতূহলের সঙ্গে বার বার আমার দিকে চাইচে। আমায় বললে—এই অবস্থায় ওকে নিয়ে এসে রেখে দিয়েচেন?

—কেন?

—এ অবস্থায় মানুষ থাকে?

পান্না প্রতিবাদ করে বললে—আমি কিছু বলছিলাম নীলি? আমি কিছু বলি নি। ও নিজেই ওসব বলচে। আমি বলি, কেন বেশ আছি। তোর ওসব বলবার দরকার কি?

নীলি বললে—খাবি কি? চলবে কি করে?

—সেই জন্যেই তো তোকে ডাকা। মুজরোর যোগাড় কর। সংসার চালাতে তো হবে।

—তবে পুরুষ মানুষ রয়েচে কি জন্যে? ও মা—

—ওর ওপর কোনো কথা বলবার তোমার দরকার কি নীলি? ধরো ও পুরুষ মানুষকে আমি নড়তে দেবো না। আমাকে মুজরো করে চালাতে হবে। এখন কি দরকার তাই বলো।

ওর কথা শুনে নীলি অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। এমন কথা সে কখনো শোনে নি। আমিও যে শুনেচি তা নয়। এমন ধরনের কথা ওর মুখে। অভিনয় করচে বলেও তো মনে হয় না। বলে কি পান্না! নীলি বললে—বেশ যা ভালো বুঝিস তাই কর। আমার কিছু বলবার দরকার কি?

—কি করবি এখন তাই বল?

—মুজরোর চেষ্টা করি। সাজ-পোশাক আছে ?

পান্না হেসে বললে—সেজন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে সব গুছিয়ে এনেছি। ওই করেই যখন খেতে হবে।

নীলিকে আমি আবার পৌঁছে দিতে গেলাম। নীলিমা বললে—খুব গেঁথেচেন।

—মানে ?

—মানে দেখলেন না ? ও কি বলে সব কথা। ওর মুখে অমন কথা। পান্নাকে গেঁথেচেন ভাল মাছ। আমি ওকে জানি। ভারি সাদা মন। নিজের জিনিসপত্তর পরকে বিলিয়ে দেয়।

—তোমাকে কোন কথা বলেচে আমার সম্বন্ধে ?

এই কথাটার উত্তর শুনবার জন্যে আমি মরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এ কথার সোজাসুজি উত্তর নীলিমা আমায় দিলে না। বললে—সে কথা এখন বলবো না। তবে আপনার ক্ষমতা আছে। অনেকে ওর পিছনে ছিল, গাঁথতে পারে নি কেউ। আমি তো সব জানি। হরিহরপুরে একবার মুজরো করতে গিয়েছিলাম, সেখানকার জমিদারের ছেলে ওর পেছনে অনেক টাকা খরচ করেছিল। তাকে ও দূর করে দিয়েছিল এক কথায়। তাই তো বলি, আপনার ক্ষমতা আছে।

নীলিমার কথা শুনে আমি যে কোন স্বর্গে উঠে গেলাম সে বলা যায় না—ও অবস্থায় যে কখনো না পড়েছে তার কাছে। জীবনের এ সব অতি বড় অনুভূতি, আমি নিজে আস্বাদ করে বুঝেছি। মন এবং মনের বস্তু। টাকা না কড়ি না, বিষয় আশয় না এমন কি যশমানের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত না। ও সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, নিজের সফল প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে দিয়ে পান্নাকে নিয়ে অকূলে ভেসেচি। ভেসে আজ বুঝতে পেরেচি, ত্যাগ না করলে বস্তুলাভ হয় না। আমার অনুভূতিকে বুঝতে হোলে আমার মত অবস্থায় এসে পড়তে হবে।

পান্না আমায় রাত্রে বললে—নীলি পোড়ারমুখী কত কি বলে গেল আমায়।

—কি ?

—বললে, এ সব কি আবার ঢং। ও বাবু কি তোকে চিরকাল এমনি চোখে দেখবে ? তুই নিজের পসার নিজে নষ্ট করতে বসেচিস—

—তুমি কি বললে ?

—আমি হেসেই খুন।

আমাকে অবাক করে দিয়েচে পান্না। ওর শ্রেণীর মেয়েরা শুনেচি কেবলই চায়, পুরুষের কাছ থেকে শুধুই আদায় করে নিতে চায়। কিন্তু ও তার অদ্ভুত ব্যতিক্রম। নিজের কথা কিছুই কি ও ভাবে না।

আমার মত একজন বড় ডাক্তারকে গেঁথে নিয়ে এল, এসে কিছুই দাবি করলে না তার কাছে, বরং তাকে আরও নিজেই উপার্জ্জন করে খাওয়াতে চলেচে। এমন একটি ব্যাপার

ঘটতে পারে আমি তাই জানতাম না। তার ওপর আমার বয়স ওর তুলনায় অনেক বেশি। দেখতেও আমি এমন কিছু কন্দর্প পুরুষ নয়। নাঃ, অবাক করেই দিয়েচে বটে।

পান্না নীলিমার সঙ্গে মুজরো করতে যাবে বেথুয়াডহরি, আমি বাসা আগলে তিন চার দিন থাকবো এমন কথা হোল।

যাবার দিন হঠাৎ ও আমাকে বললে—তুমি চলো।

—সেটা ভালো দেখাবে ?

—খুব দেখাবে। এই বাসাতে একা পড়ে থাকবে, কি খাবে, কি না খাবে। সেখানে হয়তো কত ভাল ভাল খাওয়া জুটবে। তুমি খেতে পাবে না।

—তাতে কি ?

—তাতে আমার কষ্ট হবে না ?

—সত্যি, পান্না ?

—আহা-হা, ঢং !

পান্না ছাড়লে না। ওদের সঙ্গে আমায় যেতে হল বেথুয়াডহরি। ভাল কাপড় পরে যেতে পারবো না বলে আধময়লা জামা কাপড় পরে ওদের সঙ্গে গেলাম। সারা রাস্তায় ট্রেনে মহাফুর্ত্তি। আমি যে ডাক্তার সে কথা ভুলে গিয়েচি। ওদের দলে এমন মিশে গিয়েচি যেন চিরকাল খেমটাওয়ালীর দলে তল্পিতল্পা আগলেই বেড়াচ্চি।

পান্না বললে—তুমি যে যাচ্ছ, তুমি নিগুর্ণ যদি জানতে পারে ?

—বয়েই গেল।

—ডুগি-তবলা বাজাতেও পারো না ?

—কিছু না।

—তোমাকে আমি শিখিয়ে দেবো। ঠেকা দিয়ে যেতে পারবে তো অন্ততঃ। দলে একটা কিছু বাজাতে না জানলে লোকে মানবে কেন ?

—শিখিও তুমি।

বেথুয়াডহরি গ্রামে বারোয়ারি যাত্রা হচ্চে। সেখানকার নায়েবমশায় উত্যোগী। নায়েব-মশায়ের নাম বঙ্কুবিহারী জোয়ারদার। বয়েস পঞ্চাশের ওপর, কিন্তু লম্বা-চওড়া চেহারা, একতাড়া পাকা গোঁফ, বড় বড় ভাঁটার মত চোখ। প্রমথ বিশ্বাস বলে কোন্ জমিদারের এস্টেটের নায়েব। আমাকে বললেন—তোমার নাম কি হে ?

আসল নামটা বললাম না।

—বেশ, বেশ ! তুমি কি করো ?

—আজ্ঞে আমি ভাত রাঁধি।

—ও, তুমি বাজিয়ে টাজিয়ে নও।

—আজ্ঞে না।

সন্ধ্যার আগে আসর হোল। অনেক রাত পর্য্যন্ত পান্না আর নীলি নাচলে। পান্না নাচের ফাঁকে ফাঁকে আমার সঙ্গে এসে কথা বলে। জিজ্ঞেস করলে—কেমন হচ্চে?

—চমৎকার।

—তোমার ভালো লাগচে?

—নিশ্চয়ই।

—তুমি কিন্তু উঠো না। তা হলে আমার নাচ খারাপ হয়ে যাবে। নীলি কি বলচে জানো? বলচে তোমার জন্যেই নাকি আমার নাচ ভাল হচ্চে।

—ও সব বাজে কথা। ভাত রাঁধবো যে।

—না। ছিঃ, ওসব কি কথা?

—তোমরা নেচে গিয়ে তবে খাবে? ওরা চাল ডাল দিয়েচে। মাছ কিনে দিয়েচে। আমি রাঁধবো।

—কক্ষনো না। তোমায় যেতে দেবো না। নীলি আর আমি, রান্না করবো এর পরে।

নায়েবমশায় সামনেই বসে। আমার দিকে দেখি কটমটিয়ে চাইচেন বোধ হল পান্না যে এত কথা আমার সঙ্গে বলচে এটা তিনি পছন্দ করচেন না। আট দশ টাকা প্যালা দিলেন নিজেই রুমালে বেঁধে বেঁধে—শুধু পান্নাকে।

একটু বেশি রাত হলে আমাকে একজন বরকন্দাজ ডেকে বললে—আপনাকে নায়েববাবু ডাকচেন।

আমি গেলাম উঠে। নায়েবমশায় আসরের বাইরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে। আমায় বললেন—এই মেয়েটির নাম কি?

আমি বললাম—পান্না।

—তোমার কেউ হয়?

—না। আমার কে হবে?

নায়েবমশায় দেখি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েচে। আমার চেহারার মধ্যে সে যেন কি খুঁজচে। আমাকে আবার বললে—তুমি এখানে এসেচ রান্না করতে বলছিলে না?

—হুঁ।

—ক'টাকা পাও?

—এই গিয়ে সাত টাকা আর খোরাকী।

—বামুন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাদের জমিদারী কাছারিতে রান্না করবে?

—মাইনে কত দেবেন?

—দশটাকা পাবে আর খোরাকী। কেমন ?

—আচ্ছা, আপনাকে ভেবে বলবো।

—এ বেলাই বলবে তো ? এখুনি বলো। আমি বাসা হতে চা খেয়ে ফিরচি।

—আজ্ঞে হাঁ।

নায়েবের সামনে থেকে চলে এলাম। হাসি পেলেও হাসি চেপে রাখলাম। নায়েব ভেবেচে আমি ওর মতলবের ভেতরে ঢুকতে পারি নি। ও কি চায় আমার কাছে তা অনেকদিন থেকে বুঝেছি। পাচক সংগ্রহে উৎসাহ ও ব্যস্ততা আর কিছুই নয়। ওর আসল মতলবটা ঢাকবার একটা আবরণ মাত্র।

আমার অনুমান মিথ্যে হতে পারে না এ ক্ষেত্রে। একটু পরে কাছারির একজন বরকন্দাজ এসে বললে—চলো, নায়েববাবু ডাকচেন।

গিয়ে দেখি নায়েবমশায় চা খাচ্চেন, কাছারির কোণের ঘরে তক্তপোশের ওপর বসে। ঘরে আর কেউ নেই। আমায় দেখে বললেন—এসো, বসো। চা খাবে ?

—আজ্ঞে, আপনি খান।

—খাও না একটু ! এই আছে, ঢেলে নাও।

নায়েবমশায়ের হৃদ্যতায় আমার কৌতুক বোধ হলেও কোনমতে হাসি চেপে রাখি। নিত্য থেকে লীলায় নেমে দেখি না ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়। সত্যিকার রাঁধুনি বামুন তো নই আমি ! চা খাওয়া শেষ করে নায়েবমশায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখবার জন্য হাত বাড়িয়ে বললাম—দিন আমার হাতে।

নায়েবমশায় সন্তুষ্ট হলেন আমার বিনয়ে। বললেন—না হে, তুমি বামুনের ছেলে, তোমার হাতে এঁটো পেয়ালাটা দেবো কেন ? নাম কি বললে যেন ?

আগে যে নামটা বলেছিলাম, সেটাই বললাম আবার।

—কি, ভেবে দেখলে ? চাকরী করবে ?

—মাইনে কম। আজ্ঞে ওতে—

—দশ টাকা মাইনে, কম হল হে ? যাকৃগে, বারো টাকা দেব দু' মাস পরে। এখন দশ টাকাতে ভর্ত্তি হও। এখানে অনেক সুবিধে আছে হে—জমিদারের কাছারি, হাটে তোলাটা-আসটা, পালপার্ব্বণে প্রজার কাছ থেকে পার্ব্বণী পাবে দু' চার আনা, তা ছাড়া কাছারির রাঁধুনি বামুন, ইজ্জৎ কত ?

অতিকষ্টে হাসি চেপে বললাম—আজ্ঞে, তা আর বলতে—

—রাজী ?

—আজ্ঞে হাঁ, একটা কথা—

—কি ?

—শোবো কোথায় ?

নায়েব অবাক হবার দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—শোবে কোথায় তার মানে ?

—মানে আমি একা ছাড়া কারো সঙ্গে শুতে পারি নে কিনা তাই বলছি।

—বেশ, সেরেস্তায় শুয়ো। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন একটা কথা বলি। তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান লোক দেখচি। পান্না বলে ওই মেয়েটাকে আজ রাতে এই ঘরে পাঠাতে হবে তোমাকে। রাত দু'টোর পর, আসর ভেঙ্গে গেলে। এজন্যে তোমাকে আমি দু'টাকা বকশিশ করবো আলাদা। দেবে এনে?

—আপনি আমায় ভাবনায় ফেলেছেন বাবু। উনি আমার কথা শুনবেন কেন? তাছাড়া আমি ওদের দলের রসুইয়ের বামুন। একথা বলতে গেলে বেয়াদবি হবে না?

—তোমার সে দোর তো আগেই খুলে রেখে দিলাম বাপু। আমরা জমিদারি চালাই, আট-ঘাট বেঁধে কাজ করি। বেয়াদবি বলেই যদি মনে করে, চাকরিতে রাখবে না এই তো? বেশ, কোন ক্ষতি নেই। চাকরি তোমার হবেই কাল এখানে। আরও উপরি দুটো টাকা। তবে পান্নাকে বলবে, ওকেও আমি খুশী করবো। আচ্ছা, ও কত নেবে বলে তোমার মনে হয়?

—আজ্ঞে; ওসব খবর আমি কিছু রাখিনে। উনি আমার মনিব, ওসব কথা ওঁর সঙ্গে আমার কি হয়?

নায়েবমশায়ের মুখে একটি ধূর্ত্ত লালসার ছাপ উগ্র হয়ে ফুটে উঠলো। চোখ টিপে বললেন—তাতে তোমার ক্ষতিটা কি? চাকরি হয়েই গেল। কাকে দিয়ে বলাতে হবে বলো না? নিজে একটু চেষ্টা করে দ্যাখো। যাও, বুঝলে? না যদি সহজ হয় তবে—

এই পর্য্যন্ত বলে জোয়ারদার মশায় চুপ করলেন। একটা হিংস্র পশু-ভাব সে মুখে। আমার মন বললে এ সাপকে নিয়ে আর বেশি খেলিও না, ছোবল বসাবে। পান্নাকে সাবধান করে দিলাম সব কথা খুলে বলে। সে হেসে বললে—ও রকম বিপদে অনেক জায়গায় আমাদের পড়তে হয়েচে। তুমি সঙ্গে রয়েচ—ভয় কি? নীলি দিদিকে বলে দেখচি, ও যায় যাক। যেতে পারে ও, অমন গিয়ে থাকে জানি।

নায়েবকে এসে বললাম। তখনও আসর ভাঙ্গে নি।

তিনি বসে আছেন ছোট্ট কোণের ঘরটাতে। মুখে সেই অধীর লালসার ছাপ! অশান্ত আগ্রহের সুরে জিজ্ঞেস করলেন—কি হলো? এসো ইদিকে।

—সে হোল না।

—কি রকম?

—আপনাকে অন্য মেয়েটি যোগাড় করে দিচ্চি। ওর নাম নীলি, ও আসবে এখন।

—ওসব হবে না। ওকে আমার দরকার নেই। পান্নাকে চাই। দশ টাকার জায়গায় বিশ টাকা দেবো। বলে দিয়ে এসো। না যদি রাজি হয়, তুমি আমায় সাহায্য কর। বরকন্দাজ দিয়ে ধরে এনে কাছারি-ঘরে পুরে ফেলি? পারবে?

—আপনাকে একটা কথা বলি। ও বাজে ধরনের মেয়ে নয়। একটা শেষে কেলেঙ্কারি করে বসবেন? নীলি আসুক ঘরে, মিটে গেল। ওকে ঘাঁটাতে যাবেন না।

এত কথা বললাম—এই জন্যে যে, জোয়ারদার মশায় প্রৌঢ় ব্যক্তি, পান্নার বাবা কিংবা জ্যাঠামশায়ের বয়সী। এ বয়সে ওর অমন লালসার উগ্রতা দেখে লোকটার ওপর অনুকম্পা জেগেচে আমার মনে। আমার দলের লোক, আমি ত সব ছেড়েচি ওই জন্যে। নেশা এমন জিনিস। তেমনি নেশা তো ওরও লাগতে পারে।

জোয়ারদার মশায় নাছোড়বান্দা। ওর ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বেড়ে গিয়েছে। যেই শুনেচে পান্নাকে পাবে না, অমনি পান্নাকে না পেলে আর চলচে না। ওকেই চাই, রাণী চন্দ্রমণিকে না।

আমি ওঁর সব কথা শুনে বললাম—ওর আশা ছাড়ুন।

—কেন? ও কি? অর্ডিনারি একটা খেমটাওয়ালী তো?

—তাই বটে, তবে ও অন্যরকম।

—কি রকম?

—আপনাকে খুলে বলি। আমি মশাই নিতান্ত রাঁধুনি বামুন নই। আমি ডাক্তার। ওর জন্যে সব ছেড়ে এসেছি। ওর দলে থাকি নে, ওর সঙ্গে এসেছি—

নায়েব অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন—তাই আপনার মুখে অনেকক্ষণ থেকে আমি কি একটা দেখে সন্দেহ করেছিলাম। যাক্ মশাই, আপনি কিছু মনে করবেন না। বয়েস কত মশায়ের?

—চল্লিশ।

—এত?

—তাই হবে।

—আপনি এত বয়সে কি করে ওর সঙ্গে—ওর বয়েস তো আঠারোর বেশি হবে না।

হেসে বললাম, কি করে বলবো বলুন। ওর কথা কি কিছু বলা যায়?

—কি ডাক্তার আপনি? পাশ করা?

—এম. বি. পাশ।

—সত্যি বলচেন?

নায়েবমশায় তড়াক করে চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমার দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—মাপ করবেন ডাক্তারবাবু। আমি চিনতে পারি নি। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। একটা কথা বলি, বসুন এখানে। চা খাবেন? ওরে—

—না না, চায়ের দরকার নেই। বলুন কি বলবেন?

—হাত ধরে অনুরোধ করচি—উচ্ছন্ন যাবেন না। ছেড়ে দিন ওকে। ওর আছে কি? একটা বেশ্যা—নাচওয়ালী—

আমি বাধা দিয়ে বললাম—অমন কথা শুনতে আসি নি, ওকে সমালোচনা করবার দরকার কি আপনার? কি বলছিলেন—তাই বলুন?

—জানি, জানি। ও নেশা আমিও জানি মশাই। এ বুড়ো বয়েসেও এখনো নেশা ছাড়ে

না। ওতেই তো মরেছি। আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে বলতে কি ? ও নেশা থাকবে না। ওকে ছেড়ে দিন। প্র্যাকটিশ করতে হয় ঘর দিচ্চি, এখানে প্র্যাকটিশ করুন। সব জোগাড় করে দিচ্চি।

—আচ্ছা, আপনার কথা মনে রইল। যদি কখনো—

—না না, আপনি থাকুন এখানে। এদেশে ডাক্তার নেই। পান্নাকে নিয়েই থাকুন। আমার আপত্তি নেই।

—তা হয় না। সবাই টের পেয়ে গিয়েছে ও নাচওয়ালী। এখানে প্র্যাকটিশ একা হোতে পারে, ওকে নিয়ে হয় না।

—সব হয় মশাই। আমার নাম বঙ্কুবিহারী জোয়ারদার, মনে রাখবেন ডাক্তারবাবু। আপনাদের বাপ-মার আশীর্ব্বাদে—আপনার নামটি কি ?

—না। সেটা বলবো অন্য সময়ে। বুঝতেই পারচেন।

—আপনাকে বলা রইল। যে পথে নেমেচেন, বিপদে পড়লে চিঠি দেবেন। আমি যা করবার করবো ডাক্তারবাবু।

যাবার সময় শেষ রাত্রে নায়েবমশায় নিজে নৌকোয় এসে দাঁড়িয়ে আমাদের জিনিসপত্র তুলবার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন। পান্নার সম্বন্ধে আর কোন কথা মুখেও আনলেন না। আমাকে আর একবার আসতে বললেন, বার বার করে। কার মধ্যে যে কি থাকে !

পান্না নৌকায় বললে—বুড়োটা ক্ষেপেছিল তাহলে ?

—সেটা তোমার দোষ। ওর দোষ নয়।

—কি বললে শেষটাতে ?

নীলি ঝঙ্কার দিয়ে বললে—তুই ক্ষ্যামা দে বাপু। একটু ঘুমুতে দে। নেকু, ওরা কি বলে তুমি জানো না কিনা ? খুকি ! চুপ করে থাক।

পান্না হেসে বললে—নীলিদির রাগ হয়েচে—হাজার হোক—

—আবার ওই কথা ! ঘুমুতে দে। বক্ বক্ করতে হয় তোমরা নৌকোর বাইরে গিয়ে বকো।

নৌকোতে উঠে সকালের হাওয়ায় আমার ঘুম এল।

অনেকক্ষণ পরে দেখি পান্না আমায় ডেকে তুলচে। বেলা অনেক হয়েচে। নৌকো এসে স্টেশনের ঘাটে পৌচে গিয়েচে।

নীলি হেসে বললে—তাহলেই আপনি মুজরোর দলে থেকেচেন ! তিন চার রাত জাগতে হবে অনবরত। ঘুমুতে পারবেন না মোটে, তবেই মুজরো পারা যায়। আমাদের সব অভ্যেস হয়ে গিয়েচে।

গাড়ীতে উঠে নিরিবিলি পেয়ে পান্না আমায় বললে—কত টাকা পেলাম বল তো ?

—কি জানি ?

—তোমায় দেব না কিন্তু—হুঁ হুঁ—

ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে হাসিমুখে ঘাড় দুলিয়ে বলে।

আমিও হেসে বলি—দেখাও না, কেড়ে কি নিচ্চি?

—বিশ্বাস কি?

পান্না একটা রঙীন রুমালের খুঁট খুলে দেখালে একখানা দশটাকার নোট আর খুচরো রুপোর টাকা গোটা বারো, একে একে গুণলে।

আমি বললাম—নীলির ভাগ আছে তো এতে?

—ওর ভাগ ওকে দিয়েচি। এ তো প্যালার টাকা। নীলিকে কেউ প্যালা দ্যায় নি তো।

—দ্যায় নি

—আহা, কবে দ্যায়?

—তার মানে তুমি রূপসী বালিকা, তোমার দিকে সকলের চোখ?

—যাও!

—সত্যি। জানো না কি হয়েছিল কাল? নীলি বলে নি তোমায়?

—না। কি হয়েছিল গো?

—নায়েবের চোখ পড়েছিল তোমার দিকে।

—সে কি রকম?

ওকে সব খুলে বললাম। ও শুনে বললে—কত জায়গায় এ রকম বিপদে পড়তে হয়েচে। তবে তোমাকে নিয়ে এসেছিলুম কেন? সঙ্গে পুরুষ না থাকলে কি আমাদের বেরুনো চলে?

হেসে বললাম—ঢং কোরো না পান্না।

—সে কি?

—সব জায়গায় সতী ছিলে তুমিও? বিশ্বাস তো হয় না।

পান্না গম্ভীর মুখে বললে—না। তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলবো না। ভাবনহাটি তালকোলার জমিদার-বাড়ীতে কি একটা বিয়ে উপলক্ষে আমরা গেলুম মুজরোতে। জমিদারের ভাইপোর বিয়ে। সেই বিয়ের নতুন বর ভাইপো ক্ষেপে উঠলো আমায় দেখে সেই রাত্তিরে। আমায় নৌকোতে করে সারা রাত নিয়ে বেড়ালে।

—বলো কি?

—তারপর শোনো। সেই লোক বলে—আমরা চলো যাই কলকাতায় পালিয়ে, নতুন বৌকে ফেলে। বিয়ে হয়েচে, তখনও বুঝি ফুলশয্যে হয় নি। বলো কত টাকা চাও, বলো কত টাকা চাও,—আমাকে হাতে ধরে পীড়াপীড়ি। কত বোঝাই—শেষে না পেরে বলি হাজার টাকা মাসে নেবো। তখন কাঁদতে লাগলো। পুরুষ মানুষের কান্না দেখে আমার আরও ঘেন্না হয়ে গেল। বলচে, আমার তো নিজের জমিদারি নয়, বাবা কাকা বেঁচে।

হাজার টাকা করে মাসে কোথা থেকে দেবো? তবে নতুন বৌয়ের গায়ের তিন হাজার টাকার গয়না আছে, তুমি যদি রাজী হও আজ শেষ রাত্তিরে সব গয়না চুরি করে আনবো। শুনে তো আমি অবাক। মানুষ আবার এমন হয় নাকি? পুরুষ জাতের ওপর ঘেন্না হয়ে গেল। নতুন বউ, তার গয়না নাকি চুরি করে আনবে বলেচে। আমি সেই যে ফিরে এলাম, আর ওর সঙ্গে দেখা করি নি। বলে, নিজের গলায় নিজে ছুরি দেবে। আমি মনে মনে বলি, তাই দে।

—চলে এলে?

—তার পরের দিনই।

—অত টাকা তোমার হোত।

—অমন টাকার মাথায় মারি সাত ঝাড়ু। একটা নতুন বৌ, ভাল মানুষের মেয়ে, তাকে ঠকিয়ে তার গা খালি করে টাকা রোজগার? সে লোকটা না হয় ক্ষেপেছে, আমি তো আর তাকে দেখে ক্ষেপি নি? আমি অমন কাজ করবো?

পান্নার মুখে একথা শুনে খুব খুশী হোলাম। পান্না যে আবহাওয়ায় মানুষ, যে বংশে ওর জন্ম, তাতে তিন হাজার টাকার লোভ এভাবে ত্যাগ করা কঠিন। ও যদি আমার কাছে মিথ্যে না বলে থাকে তবে নিঃসন্দেহে পান্না উঁচু দরের জীব।

বৌবাজারের বাসায় এসে নীলি চলে গেল। বিকেল বেলা। পান্না কলে কাপড় কেচে গা ধুয়ে এল। সত্যি, রূপসী বটে পান্না। সাবান মেখে স্নান করে ভিজে চুলের রাশ পিঠে ফেলে একখানা বেগুনি রংয়ের ছাপাশাড়ী পরে ও যখন ঘরে ঢুকলো, তখন তালকোলার জমিদারের ভাইপো তো কোন্ ছার, অনেক রাজা মহারাজের মুণ্ডু সে ঘুরিয়ে দিতে পারতো, এ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

পান্না সেই রঙীন রুমালের খুঁট খুলে টাকাগুলো সব মেজেতে পাতলে। বললে—কত টাকা গো? এই দশ, এই পাঁচ—

—থাক, গুনচো কেন?

—তুমি নেবে না?

—এখন রাখো তোমার কাছে।

—খরচপত্তর তুমিই তো করবে।

—আমার বাক্স নেই। তোমার বাক্সে রাখো।

—তাহোলে এক কাজ করো। টাকা নিয়ে বাজারে যাও, দু'টো চায়ের ডিসপেয়ালা, ভালো চা, চিনি এ বেলার জন্য কিছু মাছ আলু পটল আনো। মাছের ঝোল ভাত করি। একখানা পা-পোশ কিনে এনো তো! যত রাজ্যির ধূলো সুদ্ধ ঘরে ঢোক তুমি।

—তা আর বলতে হয় না।

—না, হয় না, তুমি জুতো ঘরে নিয়ে ঢুকো না। পা-পোশ একখানা এনো, ওখানে থাকবে। আর ধুনো এনো, সন্দেবেলা ধুনো দেবো।

—তুমি যে সাধু হয়ে উঠলে দেখচি। আবার ধুনো ?

পান্না বিরক্তমুখে বললে—আহা, কি যে রঙ্গ করো! গা যেন জলে যায় একেবারে। ও মুখ ঘুরিয়ে নাচের ভঙ্গিতে চলে গেল।

কি সুন্দর লাবণ্যময় ভঙ্গি ওর! চোখ ফেরানো যায় না। সত্যি, কোন্ স্বর্গে আমায় রেখেচে ও? ওকে পেয়ে দুনিয়া ভুল হয়ে গিয়েচে আমার। পূর্ব্ব আশ্রমের কথা কিছুই মনে নেই। সুরবালা-টুরবালা কোথায় তলিয়ে গিয়েচে। বাজার করে একটা ছোট পার্কের বেঞ্চির ওপর বসে বসে এই সব ভাবি। এই বেঞ্চিটা আমার প্রিয় ও পরিচিত, অনেকবার ওর কথা ভেবেচি এটাতে বসে।

বাসায় ঢুকতে পান্না বললে—ওগো, আর একবার যেতে হবে বাজারে—

—কেন ?

—দইওয়ালী এসেছিল, তোমার জন্যে দই কিনে রেখেচি। পাকা কলা নিয়ে এসো, খাবে।

আবার পাকা কলা কিনতে বেরুই। এতেও সুখ। আমি কত সচ্ছল অবস্থায় মানুষ, পান্না তার ধারণাও করতে পারবে না। সব ছেড়ে ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দু'এক টাকার বাজার করচি, পায়ে জুতো ছিঁড়ে আসচে, গায়ে মলিন জামা—যে আমি দিনে তিনবার ধুতি পাঞ্জাবী বদলাতুম, তার এই দশা। কিছু না। সংসার অনিত্য। প্রেমই বস্তু। তা এতদিনে পেয়েছি। বস্তুলাভ ঘটেচে এতকাল পরে। আর কিছু চাই না।

দুপুরবেলা পান্না রেঁধে বললে—খাবে কিসে ?

—কেন, শালপাতায় ?

—দোহাই তোমার, তোমার জন্যে অন্ততঃ একখানা থালা কিনে আনো।

—কিছু পয়সা দাও দেখি ?

—কত ?

—অন্ততঃ দশটা টাকা। দুখানা থালা কিনে আনি।

—এখন ? আমার হাতে এঁটো। বাক্সে আছে। চাবি নিয়ে বাক্স খুলতে পারবে ?

আমি হেসে বললাম—না পান্না। আমি নিজেই আনছি কিনে। আমার কাছে আছে।

ওর ধরণ আমার খুব ভালো লাগলো। ও পয়সা দিতে চাইলে, কোনো প্রতিবাদ করলে না। ওর তো খরচ করার কথা নয়, খরচ করার কথা আমার। অথচ ও অকাতরে বাক্স খুলে পয়সা বার করে দিলে কেন ? পান্না অন্য ধরণের মেয়ে, ওকে যতই দেখচি, ওকে অন্য জাতের মেয়ে বলে মনে হচ্চে। ওদের শ্রেণীর অন্য মেয়ের মত নয় ও।

আমি দু'খানা এনামেলের থালা কিনে আনলাম। হাতে বেশি পয়সা নেই। পান্না দেখে হেসেই খুন। আমি শেষে কিনা এনামেলের থালা কিনে আনলাম ? কখনো এ থালায় খেয়েছি আমি ?

—হি-হি-হি—

—অত হাসি কিসের ?

—জব্দ গো জব্দ। বড্ড জব্দ হয়েচ এবার।

—কিসের জব্দ ?

—পয়সা ফুরিয়েচে তো হাতে ? এবার নীলিকে খবর দাও। দু'জনে মুজরো করে আনি। না হোলে খাবে কি লবডংকা ?

পান্না দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল তুলে নাচিয়ে অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে হেসে আবার গড়িয়ে পড়লো।

আমার কি যেন একটা হয়েচে, পান্না যা করে আমার বেশ ভালো লাগে, যে কথাই বলুক বা যে ভঙ্গিই করুক। আমি মুগ্ধ হয়ে ওর হেসে-লুটিয়ে-পড়া তনুলতার দিকে চেয়ে রইলাম। অপূর্ব্ব সুশ্রী মেয়ে পান্না।

আর একটা কথা ভেবে দেখলাম বিকেলে একটা পার্কে নিরিবিলি বসে। আমার হাতে আর অর্থ নেই বা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি এ জিনিসটা পান্নার পক্ষে আদৌ প্রীতিপ্রদ নয়। কিন্তু এটাকে ও অতি সহজভাবেই মেনে নিয়ে তার প্রতিকারও করতে চাইলে। ও নিজে উপার্জ্জন করে এনে খাওয়াবে আমাকে ভেবেচে নাকি ? ও অতি সরল। কিন্তু এই সরলতা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। আমি এর আস্বাদ পেয়ে ধন্য হোলাম।

পান্নাকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারলাম না। কেমন সহজ ভাবে ও আমার নিঃস্বতার বার্ত্তাকে গ্রহণ করলো ? কত সম্ভ্রান্ত ঘরের বিবাহিতা স্ত্রীরা এত সোজাভাবে স্বামীর ব্যাঙ্ক ফেল মারার বার্ত্তাকে পরিপাক করতে পারতো না। পান্নার শালীনতা অন্য রকমের, ও বেশি কখনো পায়নি বলেই বেশি চায় না—তাই কি ? এই অবস্থাটাই বোধ হয় ওর কাছে সহজ।

পান্না আমাকে ভালোবাসে নিশ্চয়ই। ভাল না বাসলে ও এমন কথা বলতে পারতো না। আমার বয়েস হয়েচে, একটি ষোড়শী সুন্দরী কিশোরী আমাকে অমন ভালোবাসবে, এ আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। সত্যি কি পান্না আমাকে ভালোবেসে ফেলেচে ? না, বিশ্বাস করা শক্ত। একবার বিশ্বাস হয়, একবার হয় না।

পার্কের বেঞ্চিটার ও-কোণে একটা চানাচুর-ভাজাওয়ালা এসে বসলো। আমায় বললে—বাবু, দেশলাই আছে ? আমি তাকে দেশলাই দিলাম। চলে যা না কেন বাপু, তা নয়, সে আবার আমার সঙ্গে খোসগল্পে প্রবৃত্ত হয়, এমন ভাব করে তুললে। আমার কি এখন ওই সব বাজে কথা ভাল লাগচে ?

আবার নির্জ্জন হোল পার্কের কোণ। আবার আমি বসে ভাবি।

পান্না আমাকে ভালোবাসে, ভালোবাসে, ভালোবাসে।...

কি এক অদ্ভুত শিহরণ ও উত্তেজনা আমার সর্ব্বদেহে। চুপ করে বসে শুধু ওই কথাটাই ভাবি। শুধু ভেবেই আনন্দ। এত আনন্দ যে আছে চিন্তার মধ্যে, এত পুলক, এত শিহরণ,

এত নেশা, এ কথাই কি আগে জানতাম ? যেন ভাঙ খাওয়ার নেশার মত রঙীন নেশাতে মশগুল হয়ে বসে আছি। জীবনে এরকম নেশা আসে চিন্তা থেকে তাই বা কি আগে জানতাম ?

সুরবালার সঙ্গে এতদিনের ঘরকন্না আমার ব্যর্থ হয়ে গিয়েচে।

ভালোবাসা কি জিনিস, ও আমাকে শেখায় নি।

যদি কখনো না জানতাম এ জিনিস; জীবনের কটা মস্ত বড় রসের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতাম।

সুরবালার চিন্তা আমাকে কখনও নেশা লাগায় নি।

কিন্তু কেন ? সুরবালা সুন্দরা ছিল না, তা নয়। আমাদের গ্রামের বৌদের মধ্যে এখনো সুন্দরী বলে সে গণ্য। এখন তার বয়েস পান্নার ডবল হতে পারে, কিন্তু একসময়ে সেও ষোড়শী কিশোরী ছিল। কিন্নরকণ্ঠী না হোলেও সুরবালার গলার স্বর মিষ্টি। এখনো মিষ্টি। ষোড়শী সুরবালাকে আমি বিবাহ করেছিলাম। কিন্তু কিসের অভাব ছিল তার মধ্যে ? অভাব কিসের ছিল তখন তা বুঝি নি। এখন বুঝতে পারি, পান্নার ভালোবাসা পেয়ে আমার এই যে নেশার মত আনন্দ, এই আনন্দ সে দিতে পারে নি। নেশা ছিল না ওর প্রেমে। ওর ছিল কি না জানি নে, আমার ছিল না। এত যে নেশা হয় তাই জানতাম না, যদি পান্নার সঙ্গে পরিচয় না হোত। এর অস্তিত্বই আমার অজ্ঞাত ছিল।

রাস্তা দিয়ে মেলা লোক যাচ্চে। পার্কে মেলা লোক বেড়াচ্চে। এদের মধ্যে ক'জন লোক এমন ভালোবাসার আনন্দ আস্বাদ করেছে জীবনে ? ওই যে লোকটা ছাতি বগলে যাচ্চে, ও বোধ হয় একজন স্কুল-মাস্টার। ও জানে ভালোবাসার আস্বাদ ? ওর পাশের বাড়ীর কোনো দুরধিগম্য সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে হয়তো ছাদে ছাদে দেখা হয়—না কি ? হয়তো সেই জন্যে ও ছুটে ছুটে যাচ্চে বাসায় ? .

যদি না জানে ওর আস্বাদ, তবে ওরা বড্ড দুর্ভাগা। অমৃতের আস্বাদ পায়নি জীবনে।

ভালোবেসে আনন্দ নয়, ভালোবাসা পেয়ে আনন্দ। এ কোনো আইডিয়ালিস্টিক ব্যাপার নয়, নিছক স্বার্থপর ব্যাপার। একটু আস্বাদ করে আরও আস্বাদ করতে প্রাণ ব্যগ্র হয়ে পড়ে।

বেলা পড়লে উঠে বাসায় ফিরলুম। পান্না কি সত্যিই আছে ? ও স্বপ্ন না তো ? না, পান্না বসে চুল বাঁধচে। ওর সেই তোরঙ্গটা থেকে আয়না বের করেচে, দাঁত দিয়ে চুলের দড়ির প্রান্ত টেনে ধরেচে, বেশ ভঙ্গিটি করে।

চমকে উঠে বললে—কে ?

পেছন ফিরে চাইতে গেল তাড়াতাড়ি।

আমি বললাম—দোর খুলে রেখেচ কেন ? একলা ঘরে থাকো, যদি চোর ঢোকে ? বন্ধ করে রেখো।

ও অপ্রতিভ হয়ে বললে—আচ্ছা।

—চুল বাঁধচো ?

—দেখতে পাচ্চো না? চা খাবে তো?

—নিশ্চয়ই।

—চা-চিনি নিয়ে এসো। কিছুই নেই।

—পয়সা দাও।

—নিয়ে যাও আমার এই পাউডারের কৌটো খুলে। এই যে—

পয়সা নিয়ে নেমে গেলুম।

দিন কতক বেশ আনন্দেই কেটে গেল।

কিন্তু আমার মনে কেমন এক ধরণের অস্বস্তি শুরু হয়েচে, আমার নিজের উপার্জ্জন এক পয়সাও নেই, পান্নার উপার্জ্জনের অর্থ আমাকে হাত পেতে নিতে হচ্চে, না নিয়ে উপায় নেই। আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি, এ ভাবে কতদিন চলবে। ও যা মুজরো করে এনেছিল, তা ফুরিয়ে এল। কলকাতার খরচ। ওর মনে ভবিষ্যতের ভাবনা নেই, বেশ হাসি গল্প গান নিয়ে সুখেই আছে—কিন্তু আমি দেখছি আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পান্নার টাকায় সংসার বেশীদিন চলা সম্ভব হবে কি? আমি সে টাকা বেশীদিন নিতেও পারবো না?

পান্নাকে কথাটা বললাম।

ও বুঝতে চায় না। বললে—তাতে কি? আমার টাকা তোমার নিলে কি হবে?

—মানে নিলে কিছু হবে না। কিন্তু ওতে চলবে না।

—কেন চলবে না? বেশ তো চলচে।

—এর নাম চলা?

বলেই সামলে নিলুম। পান্না সরল মেয়ে, তার জীবন-যাত্রার ধারণাও সরল ও সংক্ষিপ্ত ওর মা ছিলো মুজরোওয়ালী, যা রোজগার করেচে তাতেই সেকালে সংসার চলে গিয়েচে বিলাসিতা বাবুগিরি জানতো না। কোনোরকমে খাওয়া পরা চলে গেলেই খুশী। ওরও জীবন-যাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে যে সহজ ধারণা আছে, আমি তার অপমান করতে চাইনি।

বললাম—ধরো তুমি যদি দু'দিন বসে থাকো, আসরের বায়না না পাও?

—সে তুমি ভেবো না।

—আমাকে বুঝিয়ে বলো কিসে চলবে? খাবো কি দু'জনে?

পান্না হি হি করে হেসে ওঠে। ঘাড় দুলিয়ে বলে—খেতে পেলেই ত তোমার হোল?

আমি চুপ করে রইলাম। ও সংসারের কোনও খবরই রাখে না। কি কথা বলবো এ সম্বন্ধে ওকে?

ও বললে—তুমি কি ভাবচো শুনি?

—ভাবচি আমাকেও টাকা রোজগার করতে হবে।

—বেশ, পার তো করো। আমি কি বারণ করেছি?

—তুমি জান আমি ডাক্তার। আমাকে কোথাও বসে ডাক্তারখানা খুলতে হবে, তবে রোজগার হবে।

—এই বাসার নিচের তলাতে ঘর খালি আছে, ডাক্তারখানা খোলো।

—তুমি ভারি মজার মেয়ে পান্না! অত সোজা বুঝি! টাকা কই, ওষুধপত্র কিনতে হবে, কত কি চাই। টাকা দেবে?

—কত টাকা বলো?

—হাজার খানেক।

—কত?

—আপাততঃ হাজার খানেক।

—উ রে!

পান্না দীর্ঘ শিস দেওয়ার সুরে কথাটা উচ্চারণ করে চুপ করে গেল।

আমি জানি ও অত টাকা কখনো একসঙ্গে দেখে নি। বল্লাম—তুমি ভাবছিলে কত টাকা?

—আমি? আমি ভাবছিলাম পঁচিশ ত্রিশ।

—দিতে?

—আমার হার বাঁধা দাও, দিয়ে টাকা আনো।

—থাক, রেখে দাও।

সেদিন দু'টি ডিস্‌পেনসারিতে গিয়ে চাকরির চেষ্টা করলাম। কোথাও সুবিধে হোল না। বসে বসে অনেকক্ষণ ভাবলাম। একটা নির্জ্জন স্থানে বসে।

কিন্তু আসল কাজ হয়ে পড়লো অন্য রকম।

পান্নাও নাচের আসরে বায়না নিতে লাগলো। আমি ওর সঙ্গে সর্ব্বত্রই যাই, বাইজীর পেছনে সারেঙ্গীওয়ালার মত। পরিচয় দিই দলের রসুইয়ে বামুন বলে, কখনো বলি আমি ওর দূর সম্পর্কের দাদা। এ এক নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা; কত রকমের লোক আছে, কত মতলব নিয়ে লোকে ঘোরে, দেখি, বেশ ভাল লাগে। ওরই রোজগারে সংসার চলে। মাঘ মাসের শেষে কেশবডাঙ্গা বলে বড় একটা গঞ্জের বারোয়ারির আসরে পান্নার সঙ্গে গিয়েছি। বেশ বড় বারোয়ারির আসর, প্রায় হাজার লোক জমেচে আসরে। তার কিছু আগে স্থানীয় এক পল্লীকবির 'ভাব' গান হয়ে গিয়েচে। অনেক লোক জুটেছিল 'ভাব' গান শুনতে। তারা সবাই রয়ে গেল, পান্নার নাচ দেখতে। কিছুক্ষণ নাচ হবার পরে দেখলাম পান্না সকলকে মুগ্ধ করে ফেলেচে। টাকা সিকি দুয়ানির প্যালাবৃষ্টি হচ্চে ওর ওপরে। গঞ্জের বড় বড় ধনী ব্যবসাদার সামনে সার দিয়ে বসে আছে আসরে। সকলেরই দৃষ্টি ওর দিকে।

আমি বসেছিলাম হারমোনিয়ম-বাজিয়ের বাঁ পাশে। আমায় এসে একজন বললে—আপনাকে একটু আসরের বাইরে আসতে হচ্চে—

—কেন?

—ঝড়ুবাবু ডাকচেন।

—কে ঝড়ুবাবু?

—আসুন না বাইরে।

লোকটা আমাকে আসর থেকে কিছুদূরে নিয়ে গেল একটা পুরনো দোতলা বাড়ীর মধ্যে। সেখানে গিয়ে দেখি জনকতক লোক বসে মদ খাচ্চে। মদ খাওয়া আমি ঘৃণা করি। আমি চলে আসতে যাচ্চি ঘরে না ঢুকেই—এমন সময় ওদের মধ্যে একজন বললে—শুনুন মশাই, এদিকে আসুন। আমার সঙ্গের লোকটি বললে—উনিই ঝড়ুবাবু।

ঝড়ুটড়ু আমি মানি নে, অধীর বিরক্তির সঙ্গে বললাম—কি বলচেন?

—আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।

—কি কথা?

—ওই মেয়েটির সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ?

—কেন?

—বলুন না মশাই, আমরা সব বুঝতে পেরেচি।

—ভালোই করেচেন। আমি এখন যাই।

—না না শুনুন। কিছু টাকা রোজগার করবেন?

—বুঝলাম না আপনাদের কথা।

আমি কিন্তু বুঝতে পেরেচি ওরা কি বলবে। আমি বাইরে যাবার জন্যে দরজার কাছে আসতেই একজন ছুটে এসে আমার সামনে হাত জোড় করে বললে—বেয়াদবি মাপ করবেন।

মদের বোতলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—চলে নিশ্চয়ই?

আমি রাগের সুরে বললাম—না।

—বেশ, বসুন না? কত টাকা চাই বলুন, রাগ করচেন কেন?

ঝড়ুবাবু লোকটি মোটামত, মদ খেয়ে ওর চোখ লাল হয়ে উঠেচে, গলার সুর জড়িয়ে এসেচে। একটা মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ছিল। আমার দিকে চেয়ে বললে—কুড়ি টাকা নেবেন? পঁচিশ? ওই মেয়েটিকে চাই।

আমার হাসি পেল ওর কথা শুনে। ও আমাদের ভেবেচে কি?

আমি কি একটা বলতে যাচ্চি, আমাকে যে সঙ্গে করে এনেছিল সে বললে—ইনি পল্লীকবি ঝড়ু মল্লিক। ঝড়ু মল্লিকের 'ভাব' শোনেন নি?

আর একজন পার্শ্বচর লোক বললে—এ জেলার বিখ্যাত লোক। অনেক পয়সা রোজগার। দশে মানে, দশে চেনে।

আমি ভাল করে লোকটার দিকে চেয়ে দেখলাম। এতক্ষণ ওর দিকে তেমন করে চাইনি, ভেবেছিলাম এই গঞ্জের পেটমোটা ব্যবসাদার। এবার আমার মনে হোল লোকটা সরল প্রকৃতির দিলদরিয়া মেজাজের কবিই বটে।

আমি নমস্কার করে বললাম—আপনিই সেই পল্লীকবি?

ঝড়ু মল্লিক হেসে বললে—সবাই বলে তাই। এসো ভাই বসো এখানে। কিছু মনে করো না।

—আপনার কথা আমি শুনেচি।

—এসো বসো। এ চলে ?

—আজ্ঞে না, ওসব খাইনে।

ঝড়ু মল্লিক পার্শ্বচরের দিকে চেয়ে বললে—যাও হে, তোমরা একটু বাইরে যাও—আমি ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলি। সবাই চলে গেল। আমার কাছে ঘেঁষে বসে নীচু স্বরে বললে—তোমার স্ত্রী ?

—না।

—সে আমি বুঝেচি। কি সম্পর্ক তাও বুঝলাম। আমি একটা কথা জানতে চাই। তুমি ভাই এর মধ্যে কেন ?

—তার মানে ?

—তার মানে তুমি ভদ্রলোক। আমি মানুষ চিনি। এর সঙ্গ ছেড়ে দাও। আমি ভুক্তভোগী, বড় কষ্ট পেয়েচি দাদা। কি করতে ?

—ডাক্তারি।

—সত্যি ? কি ডাক্তারি ?

—এম. বি. পাশ ডাক্তার।

ঝড়ু মল্লিক সম্ভ্রমের মুখে বলে উঠলো—বসো, ভালো হয়ে বসো। নাম জিজ্ঞেস করতে পারি ? না থাক, বলতে হবে না। এখানে কতদিন ?

—তা মাস ছ' সাত হয়ে গেল।

—বড় কষ্ট পাবে। আমিই বা তোমাকে কি উপদেশ দিচ্চি ! আমি নিজে কি কম ভোগা ভুগেচি ! এখনো চোখের নেশা কাটে নি। মেয়েটির নাম কি ?

—পান্না।

—বেশ দেখতে। খুব ভালো দেখতে। আমি ওকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েচি। অমন মেয়ে এ রকম খেমটার আসরে বড় একটা দেখা যায় না। আচ্ছা, আমি তোমাকে কিছু বলবো না আর ও নিয়ে। তুমি এখন ছাড়তে পারবে না তাও জানি। ও বড় কঠিন নেশা, নাগপাশ রে দাদা। বিষম হাবুডুবু খেয়েছি ও নিয়ে। নইলে আজ ঝড়ু মল্লিক সোনার ইট দিয়ে কোঠা গাঁথতে পারতো। এ কি রকম মেয়ে ? পয়সাখোর ?

—না, তার উল্টো। বরং রোজগার করে ও, আমি বসে বসে খাই। পয়সাখোর মেয়ে ও নয়।

মোটামুটি ঝড়ু মল্লিককে সব কথা বললাম। লোকটাকে আমার ভাল লেগেছিল, লোকটা কবি, এতেই আমি ওকে অন্য চোখে দেখেচি। নইলে এত কথা আমি ওকে বলতাম না।

ঝড়ু মল্লিকের নেশা যেন কেটে গিয়েচে। সব শুনে বললে—এ নিয়ে আমার বেশ ভাবগান তৈরি হয়। আসলে কি জানো ভায়া, ভাবেরই জগৎ। যার মধ্যে ভাবের অভাব,

তাকে বলি পশু। এই যে তুমি, তুমি লোকটি কম নয়, নমস্য। যদি বল কেন, তবে বলি। ডাক্তারি ছেড়ে, ঘরবাড়ী ছেড়ে, স্ত্রী পুত্র ছেড়ে ওই এক ষোলো সতেরো বছরের মেয়ের পেছনে পেছনে কেন ঘুরে বেড়াচ্চ তুমি? সর্ব্বস্ব ছেড়ে ওর জন্যে? সবাই কি পারে? তোমার মধ্যে বস্তু আছে। ভায়া, এসব সবাই বুঝবে না।

আমি নিজের কথা খুব কমই ভেবেছি এ ক'মাস। চুপ করে রইলাম।

ঝড়ু বললে—এ জন্মে এই, আসচে জন্মে এই ভাব দিয়ে তাঁকে পাবে?

—তাঁকে কাকে?

—ভগবানকে?

উত্তরটা যেন তিনি প্রশ্ন করবার সুরে বললেন। আমার বেশ লাগছিল ওর কথা, শুনতে লাগলাম। কবি কিনা, বেশ কথা বলতে পারে। তবে বর্ত্তমানে ভগবানের সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই, এই যা কথা।

ঝড়ু আবার বললে—হ্যাঁ ভায়া, মিথ্যে বলচি নে। এই সর্ব্বস্বত্যাগের অভ্যেস ভাবের খাতিরে, এ বড় কম অভ্যেস নয়, পান্না তোমাকে শেখালে। ও না থাকলে শিখতে পেতে না। অন্য লোকে বলবে তোমাকে বোকা, নির্ব্বোধ, খারাপ, অসৎ চরিত্র বলবে তোমায়।

আমি বললাম—বলবে কি বলচো, গ্রামের লোক এতদিন বলতে শুরু করেচে।

—কিন্তু আমার কাছে ও কথা নয়। আমি ভাবের লোক, আমি তোমাকেও অন্য চোখে দেখবো। তুমি ভাবের খাতিরে ত্যাগ করে এসেচ সর্ব্বস্ব; তুমি সাধারণ লোক নও, জন্তু মানুষের চেয়ে অনেক বড়। খাঁটি মানুষ ক'টা? জন্তু মানুষই বেশি। পায়ের ধুলো দাও ভায়া—ভাব আছে তোমার মধ্যে—

কথা শেষ না করেই ঝড়ু মদের ঝোঁকে কি ভাবের ঝোঁকে জানিনে, আমার পায়ের ধুলো নিতে এল ঝুঁকে পড়ে। আমি পা সরিয়ে নিয়ে তখনকার মত কবির কাছ থেকে চলে এলাম। মাতালের কাছে বেশীক্ষণ বসে থাকা ভালো নয় দেখচি।

ঝড়ু মল্লিকের কাছ থেকে চলে তো এলাম, কিন্তু ওর কথা আমার মনে লাগলো। নেশায় পড়ে গিয়েছি কথাটা ঠিকই, আমিও তা এক এক সময় বুঝতে পারি।

কিন্তু ঝড়ু মল্লিক কবি যখন, তখন জানে এ নেশার মধ্যে কী গভীর আনন্দ! ছাড়া কি যায়? ছাড়া যায় না।

পান্না সেদিন নাচের আসরের পর এসে ঘুমিয়ে পড়েছে, অনেক রাত—বাইরে চাঁদ উঠেছে, শন্ শন্ করে হাওয়া বইচে—আমি বাইরের বারান্দায় শুয়ে ছিলাম—কিন্তু ও বলেছিল আমার কাছে এসে শোবে রাত্তিরে, নয়তো নতুন জায়গা ভয় ভয় করবে। নীলি এবার আসে নি, ও একাই মুজরো করতে এসেচে। ভয় ওর করতেই পারে, তাই রাত্রে আমি ঘরের মধ্যেই এলাম।

পান্না অঘোরে ঘুমুচ্ছে, ওর গলায় সোনার হার। মেয়েমানুষ সত্যিই বড় অসহায়। যে কেউ ওর গলা থেকে হার ছিনিয়ে খুন করে রেখে যেতে পারে এ সব বিদেশ-বিভুঁয়ে। আর ওর যখন এ-ই উপজীবিকা, বাইরে না গিয়ে তখন ওর উপায় নেই। আমি ওকে ফেলে অনায়াসে পালাতে পারি, আমার মহাভিনিষ্ক্রমণ এই মুহূর্ত্তেই সংঘটিত হতে পারে—কিন্তু তা আমি যাবো না। আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে চলে এসেচে, একে আমি অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে পারি ?

পান্না আমার পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে উঠলো। জড়িত স্বরে বললে—কে ?

—আমি।

—শোও নি ?

—না। আমি তোমার গলার হার চুরি করবো ভাবছিলাম।

—সত্যি ?

—আমি মিথ্যে বলচি ?

—বোসো এখানে। হাঁগো, তুমি তা পারো ?

—কেন পারবো না। পুরুষ মানুষ সব পারে !

—তোমার মত পুরুষ মানুষে পারে না। শোনো, একবার কি হয়েছিল আমার ছেলেবেলায়। শশীমুখী পিসি ছিল আমাদের পাড়ায়। পরমা সুন্দরী ছিল সে—আমার একটু একটু মনে আছে। তার সঙ্গে অনেক দিন থেকে রামবাবু বলে একটা লোক থাকতো। তার ঘরেই থাকতো, মদ খেতো, বাজার থেকে হিংয়ের কচুরি আনতো। একদিন রাত্রে, সেদিন সেই কালী পূজোয়, আমার বেশ মনে আছে—শশীমুখী পিসিকে খুন করে তার সর্ব্বস্ব নিয়ে সেই রামবাবু পালিয়ে গেল। সকালে উঠে ঘরের মধ্যে রক্তগঙ্গা।

—ধরা পড়েছিল ?

—না। কত খোঁজ করা হয়েছিল, কোন সন্ধান নাকি পাওয়া গেল না।—তারপর শোনো না। ঘরে একটা ক্লকঘড়ি ছিল, তার মধ্যে শশীপিসি জড়োয়ার হার রাখতো। রামবাবু সেটা জানতো না—তার পরদিন সেই হার বেরুলো ঘড়ির মধ্যে থেকে, পুলিশে নিয়ে গেল। কার জিনিস কে খেল ! আমাদের জীবনই এইরকম—বুক কাঁপে সব সময়। কখন আছি, কখন নেই। যত পাজী বদমাইস লোক নিয়ে আমাদের চলতে হয়, ভালো লোক ক'টা আসে আমাদের বাড়ী ? বুঝতেই পারচো তো।

—অর্থাৎ আমি একজন পাজী লোক ?

—ছি, তোমাকে কি বলচি ? আমি মানুষ চিনি। তোমার কাছে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ কোনো ভয় থাকে না।

—আমায় বিশ্বাস হয় ?

—বিশ্বাস হয় কি না বলতে পারি নে। তবে তুমি যদি খুন করেও ফেলো, মনে দুঃখ না নিয়েই মরবো। তোমার ছুরি বুকে বিঁধবার সময় ভয় হবে না এতটুকু।

—আচ্ছা, তুমি এখন ঘুমোও, রাত অনেক হলো। আবার কাল তো সকাল সকাল নাচের আসর।

—ঘুমুই আর তুমি আমাকে মেরে ফেলো গলা টিপে, না?

—তা ইচ্ছে হয় তো গলা টিপে মারবো। ঘুমোও।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি পান্না তখনও অঘোরে ঘুমুচ্চে। আমি উঠে বাইরে গেলাম। একটা কদম গাছ ডালপালা বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সকালের রোদ বাঁকাভাবে গাছটার উপর পড়েচে। গাছটার দৃশ্য আমার মনে এমন এক অপূর্ব্ব ভাব জাগালো যে আমি প্রায় সেখানে বসে পড়লাম। কি যে আনন্দ মনে, আমার এত বৎসরের অভিজ্ঞতায় কখনো আস্বাদ করি নি। আজ আমি পথের ফকির, পসারওয়ালা 'ডাক্তার' হয়ে খেমটাওয়ালীর সারেঙ্গী নিয়ে বেড়াচ্ছি—কিন্তু আমার মনে কোন কষ্ট নেই, কোন খেদ নেই।

ঝড়ু মল্লিক ভাবওয়ালা যে পুরনো দোতলা বাড়িতে থাকে, সেটা একটা পুকুরপাড়ে। সারা রাত ভাল করে ঘুম হয় নি, পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখি ঝড়ু ভাবওয়ালা পুকুরের ওপারে নাইচে।

আমায় দেখে বললে—ডাক্তারবাবু—

—কি বলুন?

—চা খেয়েছেন সকালে? আসুন দয়া করে আমার আস্তানায়।

—চলুন যাচ্চি।

লোকটা আমার জন্য খাবার আনিয়েচে বাজার থেকে। খুব খাতির করে বসালে। লোকটাকে আমারও বড় ভালো লেগেছে, এমন দিলদরিয়া ধরণের লোক হঠাৎ বড় দেখা যায় না। সবিনয়ে আমার অনুমতি প্রার্থনা করে (যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না) একটু মদও সে নিজের চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে। এক চুমুকে চাটুকু খেয়ে নিয়ে আমায় বললে—চলবে?

—না। আপনি খান—

—তুমি ভাই নতুন ধরনের মানুষ। আমরা ভাবওয়ালা কিনা, ধরতে পারি। তোমায় নিয়ে ভাব লিখবো কিনা, একটু দেখে নিচ্চি। তুমি বড় ডাক্তার ছিলে, আজ ভাবের জন্যে সারেঙ্গীওয়ালা সেজেচ—

—তা বলতে পারেন—

—আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। কিছু মনে কোরো না। মা লক্ষ্মী বর্ত্তমান?

—হুঁ।

—কোথায়?

—দেশের বাড়িতে আছেন।

ঝড়ু একটু চুপ করে থেকে বললে—তাই তো! ও কাজটা যে আমার তেমন ভালো লাগচে না। মা লক্ষ্মীকে যে কষ্ট দেওয়া হচ্চে! ওটা ভেবে ছাখো নি বোধ হয় ভায়া।

নতুন নেশার মাথায় মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—তোমার দোষই বা কি? আমারও ওইরকম হয়েছিল ভায়া। তবে আমার স্ত্রী নেই, ঘর খালি, হাওয়া বইচে হু হু করে। কাল তোমায় একবার বলেছিলাম যে তুমি স্ত্রীপুত্র ছেড়ে বেড়াচ্চ পান্নার পেছনে, কিন্তু রাত্রে ভাবলাম মা লক্ষ্মী তো নাও থাকতে পারেন! তাই জিজ্ঞেস করলাম। আমার ব্যাপার শুনবে? আজ ঝড়ু সোনার ইট দিয়ে বাড়ী গাঁথতো, তোমাকে বললাম যে—

ঝড়ু একটা লম্বা গল্প ফাঁদলে।

জায়গাটার নাম সোনামুখী, সেখানে বড় আসরে ভাব গাইতে গিয়েছিল ঝড়ু। একজন অগ্রদানী বামুনের বাড়ীতে ওর থাকবার বাসা দেওয়া হয়। বাড়ীতে ছিল সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী, দুই মেয়ে আর এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ। এই বধূটির বয়স তখন কুড়ি একুশ, পরমা সুন্দরী —অন্ততঃ ঝড়ুর চোখে। অনেক রাত্রে ভাবের আসর থেকে ফিরে এলে এই মেয়েটিই তার খাবার নিয়ে আসতো বাইরের ঘরে। ঝড়ু তার দিকে ভাল করে চাইতো না। ঝড়ু ভদ্রলোক, অমন অনেক গেরস্ত বাড়ী তাকে বাসা নিয়ে থাকতে হয় কাজের খাতিরে দেশে বিদেশে। গেরস্ত মেয়েরা ভাত বেড়ে দিয়েচে সামনে, কখনো উঁচু চোখে চায় নি।

—সেদিন মেয়েটি ডালের বাটি সামনে ঠেলে দিতে গিয়ে আমার হাতে হাত ঠেকলো। বুঝলে? আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—আহা! মেয়েটি বললে—গরম? আমি বললাম—না, সে কথা বলি নি। হঠাৎ আপনার হাতে হাত লাগলো, সেজন্যে আমি বড় দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না। ডাল গরম নয়, ঠিকই আছে।

—মেয়েটি বললে—আপনি চমৎকার ভাব তৈরী করেন—

—আমি বললাম—আপনার ভালো লেগেচে?

—মেয়েটি পঞ্চমুখে সুখ্যাতি করতে লাগলো আমার গানের। এমন নাকি সে কোথাও শোনে নি। রোজ সে আসরে গিয়ে আমার মুখের দিকে অপলক চোখে নাকি চেয়ে থাকে। তারপর বললে, সে নিজেও গান বাঁধে। আমি চমকে উঠলাম। একজন কবি আর একজন কবি পেলে মনে করে অন্য সব জন্তু-মানুষের মধ্যে এ আমার সগোত্র। তাকে বড় ভাল লাগে। আমি সেই মুহূর্ত্তে মেয়েটিকে অন্য চোখে দেখলাম। বললাম—কৈ, কি গান? দেখাবেন আমায়? সে লজ্জার হাসি হেসে বললে—সে আপনাকে দেখাবার মত নয়।

—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখালে। সে দিন নয়, পরের দিন দুপুরবেলা। বাইরের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করচি, বৌটি এসে বললে—ঘুমিয়েচেন? সেই গান দেখবেন নাকি?

—আমি বললাম—আসুন, আসুন। দেখি—

—মেয়েটি একখানা খাতা আমার সামনে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

—আমি বসে বসে সব গানগুলো মন দিয়ে পড়লাম। বেশ চমৎকার ভাব আছে কোনো কোনো গানের মধ্যে। আসলে কি জানেন, মেয়েমানুষের লেখা, যা লিখেচে তাই যেন অসাধারণ বলে মনে হতে লাগলো। আমার মনের রঙে রঙীন হয়ে উঠলো ওর লেখা।

—আধঘণ্টা পরে মেয়েটি আবার ফিরে এল।

—আবার বললে—ঘুমুচ্চেন ?

—না ঘুমুই নি। আসুন—

—দেখলেন ?

—হ্যাঁ সব দেখেচি। ভাল লেগেচে। আপনার বেশ ক্ষমতা আছে।

—হ্যাঁ—ছাই !

—কেমন একটা অদ্ভুত টানা টানা মধুর ভঙ্গিমার সুরে 'ছাই' কথাটা ও উচ্চারণ করলে। কি মিষ্টি সুর। আমি ওর মুখের দিকে ক্ষণিকের জন্যে চাইলাম। চোখোচোখি হয়ে যেতেই চোখ নামিয়ে নিলাম। তখনও আমি ভদ্রলোক। কিন্তু বেশীদিন আর ভদ্রতা রাখতে পারলাম না। সে আমার দুর্ব্বলতা। লম্বা গল্প করবার সময় এখন নেই। এক মাসের মধ্যে তাকে নিয়ে পথে বেরুলাম।

—বলেন কি—

—আর কি বলি।

—তারপর ?

—তারপর আর কি। তাকে নিয়ে চলে গেলাম নবদ্বীপ। পতিততারণ জায়গা। বহু পতিত তরে যাচ্চে। জলের মত পয়সা খরচ হতে লাগলো। তাকে নিয়ে উন্মত্ত, ভাব গাইতে যেতে মনে থাকে না—

—বলুন, বলুন—

আমি নিজের দলের লোক পেয়ে গিয়েছি যেন এতদিন পরে। কি মিষ্টি গল্প। আমার মনের যে অবস্থা, তাতে অন্য গল্প ভাল লাগতো না। লাগতো এই ধরনের গল্প। আমার মন যে স্তরে আছে, তার ওপরের স্তরের কথা যে যতই বলুক, সে জিনিস আমি নেবো কোথা থেকে ? আমার মনের স্তরে ঝড়ু মল্লিক ভাবওয়ালা আমার সতীর্থ।

ঝড়ু আমাকে একটা বিড়ি দিতে এলো। আমি বললাম—আমি খাই নে, ধন্যবাদ।

ও বিস্ময়ের সুরে বললে—তুমি কি রকম হে ডাক্তার ? মদ খাও না, সিগারেট খাও না, তবে এ দলে নেমেচ কেন ? নাঃ, তুমি দেখছি বড় ছেলেমানুষ। বয়েস কত ? চল্লিশ ? আমার উনপঞ্চাশ। এ পথের রস সবে বুঝতে আরম্ভ করেচ। এর পর বুঝতে পারবে। রসের আস্বাদ যে না জানে, সে মানুষ নয়। রসে আবার স্তর আছে হে, এসব ক্রমে বুঝবে। এই রসই আবার বড় রসে পৌঁছে দেবার ক্ষমতা রাখে—আমি যে ক'বছর তাকে নিয়ে ঘুরেছিলাম, সেই ক'বছর ভাবের পদ আমার মনে আসতো যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। দিন নেই, রাত নেই, সব সময় ভাবের পদ মনে আসচে, গান বাঁধছি সব সময়, আর দুনিয়া কি রঙীন ! সে ক'বছর কি চোখেই দেখতাম দুনিয়াকে। আকাশ এ আকাশ নয়, গাছপালা এ গাছপালা নয়—আউশ চালের ভাত আর ভিজে ভাত খেয়ে মনে হোত যেন শটীর পায়েস—

—আহা, বেশ লাগচে। বলুন তারপর কি হল—

—পরের ব্যাপার খুব সংক্ষেপ। সে দেশ বেড়াতে চাইলে, আমিও দেখালাম। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, পরের গলগ্রহ হয়ে পড়েছিল, কখনো কিছু দেখে নি। আমি না দেখালে ওকে দেখাবে কে?

—আপনাকে বেশ ভালবাসতেন তো?

—খুব। মেকি জিনিস আমাদের চোখে ধরা পড়ে যায়। তার ভালবাসা না পেলে কি আর নেশা জমতো রে ভায়া?

—তারপর দেশ বেড়ালেন?

—হ্যাঁ। কালনা গিয়েচি, মধুমতী নদীতে নৌকা চড়ে কালীগঞ্জের বাজারে, বারোয়ারির আসরে গিয়েচি—ওদিকে বসিরহাট, টাকী—হাসানাবাদ—জ্যোৎস্নারাতে টাকীর বাবুদের বাগানবাড়ীতে দু'জনে বেড়িয়েচি। তার মনে কোন দুঃখু রাখি নি। কলকাতায় নিয়ে যাবো, সব ঠিকঠাক—এমন সময় ভায়া, আঁসমালির বাজারে গেলাম গান গাইতে। ওকে নিয়ে গেলাম। সেখানে হাটে বড় বান মাছ কিনলাম এক জোড়া, রাত্রে সেই মাছ খেয়ে দুজনেরই সকালে ভেদবমি। অনেক কষ্টে আমি বেঁচে উঠলাম, সে দুপুরের পরে মারা গেল। সে কখন গিয়েচে, আমি তা জানি না, আমার তখন জ্ঞান নেই। মানে আমার নিজেরই যাবার কথা তা আমার রোগ-বালাই নিয়ে সে চলে গেল—বড্ড ভালবাসতো কিনা?

ঝড়ু ভাবওয়ালার চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে উঠলো। আমি আর কোন কথা বললাম না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পরে ঝড়ু বোধ হয় একটু সামলে নিয়ে বললে—পান্নাকে দেখে তার কথা মনে পড়লো, অবিকল ওর মত দেখতে—তাই আমি বলি তোমাকে—কিছু মনে কোরো না ভায়া—

—এখন কি একাই আছেন? ক'বছর আগের কথা তিনি মারা গিয়েছেন?

—ন' বছর যাচ্ছে। না, একা নেই। একা থাকতে পারে আমাদের মত লোক? মিথ্যে সাধুগিরি দেখিয়ে আর কি হবে। আছে একজন, তবে তার মত নয়। দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। আর ধরো এখন আমাদের বয়েসও তো হয়েচে? এই বয়েসে আর কি আশা করতে পারি?

বেলা প্রায় দশটা। আমি ঝড়ু মল্লিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় এসে দেখি পান্না কুটনো কুটচে, সেখানে দু'টি মেয়ে বসে আছে ওরই বয়সী। আমায় দেখে মেয়ে দু'টি উঠে চলে গেল। পান্না বললে—বোষ্টমের মেয়ে ওরা, এখানেই বাড়ী। আমি কীর্ত্তন গাই কিনা জিজ্ঞেস করছিল।

—কেন, ঘেমটা ছেড়ে ঢপের দল বাঁধবে নাকি?

—তা নয়, মেয়ে দুটোর ইচ্ছে নাচ গান শেখে। তা আমি বলে দিইচি, গেরস্ত বাড়ীর মেয়েদের এখানে যাতায়াত না করাই ভালো। আমরা উচ্ছন্ন গিয়েচি বলে কি সবাই যাবে?

—খুব ভালো করেচ। আচ্ছা, তোমার মনে হয় তুমি উচ্ছন্ন গিয়েচ?

—বোসো এখানে। মাঝে মাঝে গেরস্ত বাড়ীর বৌ-ঝি গঙ্গাস্নান করতে য়েতো, দেখে হিংসে হোত। এখন আমার যেন আর সে রকমটা হয় না!

—না হওয়ার কারণ কী?

পান্না আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ হেসে মুখ নিচু করলে। বললে—চা খাবে না? খাও নি তো সকালে। না, সে তোমাকে বলা হবে না। শুনে কি হবে? চা চড়াবো? খাবার আনিয়ে রেখেচি দিই?

—না, আমি ঝড়ু ভাবওয়ালার বাসায় চা খাবার খেয়ে এলাম। তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে। সেইখানেই এতক্ষণ ছিলাম।

—ওমা, দ্যাখো দিকি? আমি কি করে জানবো, আমি তোমার জন্যে গরম জিলিপি আর কচুরি আনিয়ে বসে আছি। খাও খাও—

—তুমিও খাও নি তো? সে আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি যখন দেখলে এত বেলা হয়ে যাচ্চে, তোমার ভাবা উচিত ছিল আমার চা খাওয়া বাকি নেই। তুমি খাবারও খাও নি, চাও খাও নি নিশ্চয়ই? ছি, নাও চড়াও চা, আমিও খাবো।

ঝড়ু মল্লিক ভাবওয়ালার ওখানে সন্ধ্যায় আমার নিমন্ত্রণ। পান্নাকেও নিয়ে যেতে বলেছিল।

পান্নাকে বললাম সে কথা, কিন্তু ও যেতে চাইলে না। বললে—মেয়েমানুষের যেখানে সেখানে যেতে নেই পুরুষের সঙ্গে। তুমি যাও—

হেসে বললাম—এত আবার শিখলে কোথায় পান্না?

—কেন, আমি কি মেয়েমানুষ নই?

—নিশ্চয়ই।

—আমাদের এ সব শিখতে হয় না। এমনি বুঝি।

—বেশ ভাল কথা। যেও না।

—খাবার আমার জন্যে আনবে?

—যদি দেয়।

পান্না হাসতে লাগলো। তখন ও চা ও খাবার খাচ্চে। হাসতে হাসতে বললে—বললাম বলে যেন তুমি সত্যি সত্যি আবার তাদের কাছে খাবার চেয়ে বোসো না—

ঝড়ু মল্লিক বসে আছে ফরাস বিছানো তক্তপোশে। লোকটা শৌখিন মেজাজের। আমায় দেখে বললে—এসো, ভায়া, বোসো। একটা কথা কাল ভাবছিলাম। আমার ভাবের দলে তোমরা দু'জনেই কেন এসো না। বেশ হয় তা হোলে। আমি ভাবের গান লিখবো, তোমার উনি গাইবেন। পছন্দ হয়? আধাআধি বখরা।

—কিসের আধাআধি?

—বায়নার। যা যেখানে পাবো, তার আধাআধি।

—আমি এর কিছুই জানি নে। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

—পয়সার জন্তে বলচি নে ভায়া। তোমাদের বড় ভালো লেগেচে—ওই যে বললাম—ভাব। ওই ভাবেই মরেছি। নয়তো বলছিলাম না সেদিন, ঝড়ু মল্লিক সোনার ইট দিয়ে বাড়ী করতে পারতো। পয়সার লালসা আমার নেই।

খাবার অনেক রকম যোগাড় করেছে ঝড়ু। দু'জনের উপযুক্ত খাবার। পান্না কেন এলো না এজন্তে বার বার দুঃখ করতে লাগলো খেতে বসে। ও নাকি আমাদের প্রণয়ের ব্যাপার নিয়ে ভাব গান বাঁধবে, আসরে আসরে গাইবে। বললে—ভাই, লজ্জা মান ভয় তিন থাকতে নয়। নেমে পড় ভায়া, আসরে নামতে দোষ কি?

ঝড়ু মল্লিক অসম্ভব রকমের কম খায় দেখলাম। ওর পাশে খেতে বসলে রীতিমত অপ্রতিভ হতে হয়। খাওয়ার আয়োজন করেছিল প্রচুর, দু তিন রকমের মাছ, মাংস, ঘি-ভাত, ডিমের ডালনা, দই, সন্দেশ। ঝড়ু কিন্তু খেল দু'এক হাতা ভাত ও দু টুকরো মাছ ভাজা, একটু দই ও একটা সন্দেশ। সে যা খেলে তা একজন শিশুর খোরাক। আমি বললাম—এত কম খান কেন আপনি?

—আমি গান বাঁধি, বেশী খেলে মন থবু-থবু অলস হয়ে পড়ে। কম খেলে থাকি ভালো। মাছ মাংস আমি কম খাই, তুমি আজ খাবে বলে মাছ মাংস রান্না হয়েচে, নয়তো আমি নিরামিষ খাই।

—মদ খান তো এদিকে।

—ওটা কি জানো ভায়া, না খেলে গান বাঁধবার নেশা জমে না। ছাড়তে পারি কই?

—আমার ইচ্ছে করে আপনার মত দেশ-বিদেশে গান গেয়ে বেড়াই! তবে না পারি বাঁধতে গান, না আছে গানের গলা।

—এর মত জিনিস আর কিছু নেই রে ভায়া। অনেক কিছু করে দেখলাম—কিন্তু সব চেয়ে বড় আনন্দ পেলাম এই আসরে গান গেয়ে বেড়িয়ে। পয়সাকে পয়সা, মানকে মান। সেই জন্যই তো বললাম—এসো আমার সঙ্গে।

—আমি তো জানেন ডাক্তার মানুষ। আপনাদের মত কবি নই। কোনো ক্ষমতা তো নেই ওদিকে। আমাকে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে বিপদে পড়ে যাবেন। তার চেয়ে আমার ডাক্তারির একটা সুবিধে করে দিন না?

—সে জায়গা আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু তোমার ওঁকে নিয়ে কি করবে? ছোট্ট সমাজে ঘোঁট পাকাবে, তখন দেশ ছাড়তে হবে। বড় শহরে গিয়ে বোসো।

—হাতে পয়সা নেই। ডিস্‌পেনসারি করতে হলে এক গাদা টাকা দরকার।

—টাকা আমি যদি দিই? না থাক, এখন কোনো কথা বলো না। ভেবে চিন্তে জবাব দেবে। ওই যে ভাবেই মরেচে ঝড়ু মল্লিক, নইলে সোনার ইট দিয়ে—

পান্না দেখি খেতে বসেচে। রান্না করেচে নিজেই। একটা বাটিতে শুধু ডাল আর কিছুই খাবার নেই। আমি এত রকম ভালমন্দ খেয়ে এলাম, আর ও শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাবে?

—শুধু ডাল দিয়ে খাচ্চো কেন পান্না ?

—না, আর কাঁকরোল ভাতে।

—মাছ মাংস পেলে না ?

—তুমি খাবে না, কে ওসব হাঙ্গামা করে। মেয়েমানুষের খাবার লোভ করতে নেই, জানো ?

—লোভের কথা হচ্চে না। মানুষকে খেতে তো হবে, খাটচো এতো—না খেলে শরীর টিকবে ?

পান্না হেসে বললে—তোমাকে আর অত টিকটিক করতে হবে না খাওয়া নিয়ে। পুরুষ মানুষের অন্য কাজ আছে, তাই দেখো গে।

—ঝড়ু ভাবওয়ালা কি বলছিল জানো। বলছিল, আমার সঙ্গে এসে যোগ দাও। চলো একটা দল বেঁধে গান গেয়ে বেড়াই।

—আমিও যাবো ?

—তুমি না হলে তো চলবেই না। তোমাকে নাচতে হবে, ঝড়ুর গান গাইতে হবে। যাবে ?

—না। কি দরকার ? আমি একা কি কম পয়সা রোজগার করতে পারি ? নাচের দলে যোগ দিয়ে পরের অধীন হয়ে থাকার কি গরজ ?

—ঝড়ু বলছিল—ও টাকা দেবে আমার ডিস্‌পেনসারি খুলতে।

—ওতেও যেও না। পরের অধীন হয়ে থাকা।

—তবে কি করে চলবে ?

—তুমি নির্ভাবনায় বসে খাও। আমি থাকতে তোমার ভাতের অভাব হতে দেবো না। তুমি যদি চুপ করেও বসে থাকো তাহলে আমি চালিয়ে যাবো। আমার আয় কত জানো ?

—কত ?

—যদি ঠিক-মত বায়না হয়, খাটি, তবে মাসে নব্বুই টাকা থেকে একশো টাকা। তোমার ভাবনা কি ? তোমার বাবুগিরির জুতো আমি কিনে দেবো, কাঁচি ধুতি আমি কিনে দেবো—

কাঁকরোল ভাতে দিয়ে ভাত খেতে খেতে পান্না ওর আয় আর ঐশ্বর্য্যের কথা যে ভাবে বর্ণনা করলে তা আমার খুব ভালো লাগলো। ওর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই দেখচি। কাকে আয় বলে—ও কিছু জানে না। একটা অপারেশন কেসে আমি আশি টাকা রোজগার করেছি একটিমাত্র বিকেল বেলাতে। পান্না আমায় ওর আয় দেখাতে আসে। আমার হাসি পায়। আসলে বয়েস ওর কম বলেও বটে আর সামান্যভাবেই ওদের জীবন কেটে এসেচে বলেও বটে, বেশী রোজগার কাকে বলে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই ওর। এর আগেও তা আমি লক্ষ্য করেছি। পান্না হাসতে হাসতে বলেচে—বাবুর এক জোড়া ভালো

জুতো চাই বুঝি? চলো এবার কলকাতায় গিয়ে জুতো কিনে দেবো। কাল সতের টাকা প্যালা পেয়েছি আসরে, জানো? ভাবনা কি আমাদের? হি-হি—

ও দেখচি খাঁটি আর্টিস্ট্ মানুষ। ঝড়ু ভাবওয়ালা আর ও একই শ্রেণীর। পান্নাকে এবার যেন ভাল করে বুঝলাম। পান্না সেই ধরণের মেয়ে, যে ভাবের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। সংসারের ধার ধারে না, বেশী খোঁজ-খবরও না। যা আসে, তাতেই মহা খুশী। ঝড়ু মল্লিকের মত পুরুষ আর ওর মত মেয়েকে সাধারণ লোকের পর্য্যায়ে ফেলাই চলে না। আমার তো ওদের মত ভাব নিয়ে থাকলে চলবে না, আমি খাঁটি বাস্তববাদী। পান্না যা-ই বলুক, আমাকে ওর কথায় কান দিলে চলবে না।

কেশবডাঙ্গার বারোয়ারির আসরে পান্নার নাচ আরও দু'দিন হোল। ওর নাম রটে গেল চারি ধারে। সবাই ওর নাচ দেখতে চায়। আমায় বারোয়ারি কমিটির লোকেরা ডাক দিলে। একজন ব্যবসাদারের গদিতে ওদের মিটিং বসেচে। আমায় ওরা বললে—ও ঠাকুর মশাই, আপনাদের কর্ত্রীকে বলুন আরও দু'দিন এখানে ওঁর নাচ হবে—একটু কম করে নিতে হবে। সবাই ধরেচে তাই আমাদের নাচ বেশী দিতে হচ্চে। বারোয়ারি ফণ্ডে টাকা নেই।

—কত বলুন?

—ত্রিশ টাকা দু'দিনে।

—আচ্ছা, জিজ্ঞেস করে আসি।

—আপনি যদি করে দিতে পারেন, আপনি দু'টাকা পাবেন।

—আচ্ছা।

হায়রে! আমার হাসি পেল। দু' টাকা। আমার কম্পাউণ্ডার ঘা ধুতে দু'টাকা ফি চার্জ করতো। পান্নাকে আর কি বলবো, আমি যা করবো তাই হবে। কিন্তু এদের সামনে জানানো উচিত নয় সেটা। আমাকে ওরা দলের রসুইয়ে-বামুন বলে জানে, তাই ভালো।

একজন বললে—তা হোলে আপনি চট করে জিজ্ঞেস করে আসুন।

আমি বাইরে আসতেই একজন লোক বললে—একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। আপনাদের কর্ত্রীকে যদি আমরা দু'তিন জনে আমাদের বাগানবাড়ীতে নেমন্তন্ন করি, উনি যাবেন?

—বাগানবাড়ী আছে নাকি আবার এখানে?

—এখানে নয়। এখান থেকে নৌকো করে যেতে হয় এক ভাঁটির পথ—খোড়গাছির সাঁতরা বাবুদের কাছারি বাড়ী। সেখানকার নায়েব মুরলীধর পাকড়াশী কাল আসরে ছিলেন। তিনি বলে পাঠিয়েছেন। উনি কি নেন?

—তা আমাকে এ কথা বলচেন কেন? আমি তো রসুইয়ে বামুন। উনি কি নেবেন না নেবেন সে কথা ওঁকে জিজ্ঞেস করলেই ভাল হয়।

—আপনি যা বললেন ঠিকই, তবে কি জানেন আমাদের সাহস হয় না। কলকাতার

মেয়েছেলে, আমরা হচ্ছি পাড়াগাঁয়ের লোক, কথা বলতেই সাহসে কুলোয় না। আপনি যদি করে দিতে পারেন, পাঁচ টাকা পাবেন। নায়েববাবু বলে দিয়েচেন।

—আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি এসে বলচি।

পান্নাকে গিয়ে সব কথা খুলে বললাম। পান্না হেসেই খুন। বললে—চলো বাপু, এখান থেকে আমরা চলে যাই। আমায় বুঝি নীলি পেয়েছে এরা? আর তোমায় বলি, তোমার রাগ হয় না এ সব কথা শুনে? তুমি কি রকম লোক বাপু? বারোয়ারিতে নাচের বায়না, দু'দিন বেশী হয় হোক, কিন্তু এ সব কি কথা? ছিঃ—

—নাচের বায়না ত্রিশ টাকাতেই রাজি তো?

—সে তুমি যা হয় করবে। আমি কি বুঝি?

—চল্লিশ বলবো?

—বেশী দেয় ভালো।

আমি ফিরে দেখি সাঁতরাবাবুদের নায়েবমশায়ের চর সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েচে। তাকে বললাম—হোল না মশাই।

—কেন, কেন? কি হোল?

—উনি কারো বাগানবাড়ীতে যান না। ভালো ঘরের মেয়ে।

—তাই নাকি?

—মশাই আমি সব জানি! ওঁর স্বামী আছেন, একজন বড় ডাক্তার। নাচ টাচ উনি শখ করে করেন। সে ধরনের মেয়ে নন।

লোকটা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আমার কথা বিশ্বাস করলে কিনা জানি নে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে চলে গেল। বারোয়ারির কমিটির লোকেরা বললে—কি হোল?

—হোল না মশাই।

—কেন? কি হোল বলুন না?

—চল্লিশ টাকার কমে কর্ত্রী রাজী হবেন না।

—তাই দেবো, তবে আপনার টাকা পাবেন না। ত্রিশ টাকায় রাজি করালে আপনাকে কিছু দিলেও গায়ে লাগতো না আমাদের।

—না দেন, না দেবেন! আমি চেষ্টা করে করিয়ে তো দিলাম।

কে একজন ওদের মধ্যে বললে—দাও, ঠাকুর মশাইকে কিছু দিয়ে দাও হে—বেচারি আমাদের জন্যে খেটেচে তো—

ওরা আমাকে একটা আধুলি দিলে। পান্নাকে এনে দেখিয়ে বললাম—আমার রোজগার। তোমার জন্যে পেলাম।

পান্না খুশী হয়ে বললে—আমি আরও তোমার রোজগারের পথ করিয়ে দেবো দেখো—

হায় পান্না! এত সরলা বলেই তোমায় আমি ছাড়তে পারি নে।

বললাম—সত্যি ?

—নিশ্চয়ই। কিন্তু হ্যাগো একটা কথা বলি—তুমি নিজে রোজগারের কথা ভাবো কেন ? ও কথা তোলো কেন ? তুমি বার বার ওই কথা আজ ক'দিন ধ'রে বলচো কেন ? তুমি কি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও ?

ওর গলার সুরে আবেগ ও উৎকণ্ঠার সুস্পষ্ট প্রকাশ আমাকে অবাক করে দিলে। পান্না শুধু সুন্দরী নারী নয়, অদ্ভুত ধরণের রহস্যময়ী, দয়াময়ী, প্রেমময়ী। নারীর মধ্যে এমন আমি ক'টিই বা দেখেচি। আমি হেসে চুপ করে রইলাম।

ও আবার বললে—হ্যাঁ গো, চুপ করে রইলে কেন ? বল না গো—

—আমি তো বলি নি।

—তবে ও রকম কথা বলচো কেন আজ ক'দিন থেকে ?

পান্না কুমড়ো কুটচে দা দিয়ে। যেখানে যা লোকে দেয়, এখানে কেউ বঁটি দেয় নি ওকে। আমি সেদিকে চাইতেই ও হেসে ফেললে।

বললে—কি করি বলো—

—বাসার বঁটিখানা সঙ্গে করে আনলে না কেন ?

—হ্যাঁ, একটা ঘর-সংসার আনি সঙ্গে। ফাঁকি দিলে চলবে না বলো, আমি কি তোমাকে কষ্টে রেখেছি ? সুখে রাখতে পারচি নে ? হ্যাঁ গা, সত্যি করে বলো। আমি আরও পয়সা রোজগারের চেষ্টা করবো।

—তুমি তা ভাবো কেন পান্না ? আমিও তো এ ভাবতে পারি আমার রোজগারে তোমাকে সুখী রাখবো ?

—কেন তা তুমি করতে যাবে ? আমি কি সাতপাকের বৌ তোমার ?

—তার মানে ?

—সেখানে তোমাকে সংসার ঘাড়ে নিতেই হবে। এখানে তা নয়। এখানে আমি করবো। তুমি ও সব নিয়ে মাথা ঘামিও না লক্ষ্মীটি। বোলো যখন যা দরকার, আমি চেষ্টা করবো যুগিয়ে দিতে। আমার মাসিক আয় কত বলো দিকি ? আশি নব্বুই কি এক শো টাকা। দু'টো প্রাণীর রাজার হালে চলে যাবে। নীলি কত পায় জানো ? আমার সঙ্গে তো খাটতো। আমার আদ্ধেক রোজগার ওর। মুজরোর বায়নার আদ্ধেক, আসরের প্যালা যে যা পাবে, ওর ভাগ নেই। আমার প্যালা বেশী, ও বিশেষ পেতো না। কিন্তু কলকাতা শহরে ওরা দুই বোন বুড়ো মা—চালাচ্চে তো এক রকম ভালোই। আমাকে বলে, তোমার এত রোজগার তুমি গহনা করলে না দু'খানা। আমি বলি আমার গহনাতে লোভ নেই, তোরা করগে যা। নাচটা আরো ভালো করে শেখবার ইচ্ছে। ভাল পশ্চিমে বাইজীর কাছে সাকরেদী করতে ইচ্ছে হয়। গহনা-টহনার খেয়াল নেই আমার। তুমি ভেবো না, তোমাকে সুখে রেখে দেবো।

ওকে নিয়ে কলকাতা আসবার দিনটা নৌকোতে ও ট্রেনে ওর কি আমোদ। ছেলে-মানুষের মত খুশী। বললে—এবার ক্যাশ ভাঙো। খুব মান রেখেছে কি বল?

—তা তো বটে।

—মোট কত টাকা হয়েচে বলো তো।

—সাতষট্টি টাকা স'দশ আনা।

—আর প্যালা?

—সে তুমি জানো।

—একুশ টাকা।

আমার একটু দুষ্টুমি করবার লোভ হোল।

বললাম—সাঁতরা বাবুদের নায়েবের কথা শুনলে আরও অনেক বেশি হোত—

পান্না শুনে মারমুখী হয়ে বললে—ঠিক মাথা কুটবো তোমার পায়ে, অমন কথা যদি বলবে। আমি তেমন নই। ও সব করুক গে নীলি। ছিঃ—

রাণাঘাটে গাড়ী বদলানোর সময় বললে—একটা ফর্দ্দ করো—কলকাতার বাসায় জিনিস-পত্র কিনতে হবে—

—কি জিনিস?

—কি জিনিস আছে? মাদুরের ওপর তো শুয়ে থাকা—

—আর?

—চায়ের ভালো বাসন তুমি কিনে আনবে ভালো দেখে। ফাটা পেয়ালায় চা খেয়ে তোমার অরুচি হয়ে গেল। আর একজোড়া জুতো নেবে না?

ওকে আনন্দ দেবার জন্যে বললাম—নেবো না? ভালো দেখে একজোড়া নেবো কিন্তু—

—হি-হি—জুতোর নাম শুনে অমনি লোভ হয়েছে। পুরুষ মানুষের ব্যাপার আমি সব জানি।

—কি জানো?

—জুতোর ওপর বড্ড লোভ—

—নাকি?

—আমি যেন জানি নে আর কি?

কলকাতায় পৌছে তিনচার দিনের মধ্যে যতদূর সম্ভব জিনিসপত্র কেনা-কাটা করা গেল। একজোড়া জুতো কেনবার সময় ও আমার সঙ্গে যেতে চাইলে। আমি সঙ্গে নিয়ে গেলাম না। ওর কষ্টার্জ্জিত টাকায় দামী জুতো কিনতে চাই নে। কিন্তু ও সঙ্গে থাকলে তাই ঠিক কেনাবে। সস্তা দামের একজোড়া খোলা জুতো নিয়ে এসে বললাম—চমৎকার জুতো—এগারো টাকা দাম, তবে আমার এক জানাশুনো লোকের দোকান—

—কত নিলে?

—এই ধরো পাঁচ টাকা—

—মোটে ?

—জুতো জোড়া ছাখো না, কি জিনিস। আমার জানা শুনো লোক তাই দিয়েছে।

উল্‌টো ধরনের কথা বললাম। এরকম কথা বলা উচিত তখন, যখন ব্যয়-বাহুল্য নিয়ে কর্ত্রী অনুযোগ করেচেন। পান্না বলে—পছন্দ হয়েচে ? পরো তো একবার।

—এখন থাক।

—আমি দেখি, পায় দাও না ? পাম্প শু একজোড়া কিনলে না কেন ?

—ও আমি পছন্দ করি না।

—তোমায় মানাতো ভালো।

—এর পরে কিনে দিও— এখন থাক—

—তোমায় সিল্কের জামা কিনে দেব একটা।

—বাঃ চমৎকার। কবে দেবে ?

আমার যে খুব আগ্রহ হচ্ছে, এটা দেখানোই ঠিক। নয় তো ও মনে কষ্ট পাবে।

পান্না হেসে বললে—বড্ড লোভ হচ্ছে, নয় ? আমি জানি, জানি—

—কি জানো ?

—তোমরা কি চাও, আমি সব জানি—

—নিশ্চয়। দিও কিনে ঠিক কিন্তু—

বাড়ীতে তোরঙ্গ বোঝাই আমার কাপড় চোপড়ের কথা মনে পড়লো। সুরবালার যা কাপড় চোপড় আছে, পান্নার তার সিকিও নেই। আমার পয়সা নেই আজ, নাহলে পান্নাকে মনের মতন সাজাতাম। ও বেচারির কিছুই নেই। আসরে মুজরো করবার কাপড় খানতিনেক আছে। আর আছে কতকগুলো গিল্‌টি সোনার গহনা। ওর মায়ের দেওয়া এক খানা বেনারসী শাড়ী আছে ওর বাক্সে, কিন্তু সেখানা কখনো পরতে দেখিনি।

মাস তিন চার কেটে গেল।

একদিন বাজার করে বাসায় ফিরে দেখি গুরুতর কাণ্ড। দু তিনটি পুলিশের লোক বাড়ীতে। পান্না দেখি ঘরের এক কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাপার কি ? পুলিসের লোকরাই বললে। আমায় এখুনি থানায় যেতে হবে। পান্না নাবালিকা, আমি ওকে ওর মায়ের কাছ থেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

পান্নার মা থানায় জানিয়েছিল। এতদিন ধরে পুলিশে খুঁজে নাকি বের করেছে।

এ আবার কি হাঙ্গামায় পড়া গেল।

পান্না বললে, সে নিজের ইচ্ছায় চলে এসেছে। কোনো কথা টিকলো না। পুলিশে বললে, যদি পান্না সহজে তাদের সঙ্গে ওর মায়ের কাছে ফিরে যেতে রাজি হয়, তবে আমাকে ওরা রেহাই দেবে। ওরা আমাকেই কথাটা বলতে বললে পান্নাকে।

পান্না কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই আছে।

আমি গিয়ে বললাম—পান্না শুনচো সব? কি করবে বলো, ফিরে যাও লক্ষ্মীটি—

পান্না আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। কথা বললে না।

আবার বললাম—পুলিশের লোক বেশী সময় দিতে চাইচে না। জবাব দাও। আমার কথা শোনো বাড়ী যাও—

—কেন যাবো?

—নইলে ওরা ছাড়বে না। তুমি নাবালিকা। আমার সঙ্গে নিজের ইচ্ছায় আসতে পারো না ওরা বলছে।

—তাহ'লে ওরা তোমাকে কিছু বলবে না?

—আমায় বলুক, তার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। তোমাকে হায়রানি না করে।

—আমি যাবো, ওদের বলো।

পান্নার মুখ থেকে একথা যেমন বেরুলো, আমি যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, সত্যি বলচি। এ আমি কখনো আশা করি নি। কেন ও যেতে চাইলো এত সহজে? আমি কখনো ভাবি নি ও একথা বলবে।

আমার গলা থেকে কি যেন একটা নেমে বুক পর্যন্ত খালি হয়ে গেল। ভয়ানক হতাশায় এমনতর দৈহিক অনুভূতি হয় আমি জানি।

আমি ওর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বললাম—বেশ, বেশ তাই বলি—

—কোথায় নিয়ে যাবে ওরা?

—তোমার মায়ের কাছে।

পুলিশের লোকেরা আমার কথা শুনে গাড়ী ডাকলো, ওর জিনিসপত্র গাড়ীতে তুলে দিলাম, কি-ই বা ছিল! গোটা দুই তোরঙ্গ। নতুন কেনা চায়ের বাসন ওর জিনিসের সঙ্গেই গাড়ীতে তুলে দিলাম। বড় আশা করেছিলাম যাবার সময় যখন আসবে ও কখনো যেতে চাইবে না ভীষণ কাঁদবে।

পান্না নিঃশব্দে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

একবার কেবল আমার দিকে একটু একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখে নিলো। তারপর তাড়াতাড়ি খুব হালকা সুরে বললে—চলি।

যেন কিছুই না। পাশের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে, সন্ধ্যের সময় ফিরে আসবে।

চলে গেল পান্না। সত্যিই চলে গেল।

একটা পুলিশের লোক আমায় বললে—মশায়, কি করেন!

রাগের সুরে বললাম—কেন?

—না, তাই বলচি। বলচি, মশায়, এবার পেত্নী ঘাড় থেকে নামলো; বুঝে চলুন। আমরা পুলিশের লোক মশায়। কত রকম দেখলাম, তবু যে যাবার সময় মায়াকান্না কাঁদলো না, এই বাহবা দিচ্ছি। কতদিন ছিল আপনার কাছে?

—সে খোঁজে আপনার কি দরকার?

বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরালাম অন্ত দিকে। পুলিশের লোকজন চলে গেল।

আমি কতক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম সামনের জানলাটার দিকে তাকিয়ে।

আমার ভেতরে যেন কিছু নেই, আমি নিজেই নেই।

উঃ, পান্না সত্যি চলে গেল? স্বেচ্ছায় চলে গেল?

যাকগে। প্রলয় মন্থন করে আমি জয়লাভ করবো। ঘর ভাঙুক, দীপ নিবুক, ঘট গড়াগড়ি যাক। ও সব মেয়ের ওই চরিত্র। কি বোকামি করেছি আমি এতদিন।

সামনের দোকান থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে এলুম। চা করতে পারতাম, সবই আছে, কিন্তু পেয়ালা পিরিচ নেই, সেগুলো তুলে দিইচি পান্নার গাড়ীতে। ওরই জন্যে শখ করে কেনা, ওকেই দিলুম। পুরুষ মানুষের প্রেম অত ঠুন্‌কো নয়, ত'ার শক্ত দৃঢ় ভিত্তি আছে। মরুক গে। ও ভাবনাতেই আমার দরকার কি?

যাবার সময় একবার বলে গেল না, বেলা হয়েছে, বাজার করে আনলে ভাত খেও। অথচ—

যাক্—ও চিন্তা চুলোয়।

হোটেল থেকে ভাত খেয়ে এলাম। বাজার থেকে বেছে বেছে মাগুর মাছ কিনে নিয়ে এসেছিলাম ছু'জনে খাবো বলে। সেগুলো মরে কাঠ হয়ে গেল। তারপর দেখি বেড়ালে খাচ্চে।

পাশের বাড়ীর শশিপদ সেকরা আমায় ডেকে বললে—ঠাকুর মশায়, তামাক খাবেন?

নাঃ।

—বলি, বাড়ীতে পুলিশ এসেছিল কেন? .

—তোমার দেখচি কৌতুহল বেশী।

—রাগ করবেন না ঠাকুর মশাই। আমিও ভালো লোকের ছেলে। অনেক কিছু বুঝি। বলুন না আমারে।

—ও চলে গেল।

—মা ঠাকরুন?

তারপর শশিপদ সেকরা একটু নিচুস্বরে বললে—সেজন্য মন খারাপ করবেন না আপনি। ওসব অমনি হয়।

—কি হয়?

—ওই রকম ছেড়ে চলে যায়। ও সব মায়াবিনী।

—তুমি এর কি জানো?

—আমি অনেক কিছু জানি। মানুষ ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে। কিন্তু আমি মশায় ঠেকে শিখেছিলাম। সে গল্প একদিন করবো।…খাওয়া দাওয়া কি করলেন? হোটেলে? আহা বড্ড কষ্ট গেল। আমায় যদি আগে বলতেন! এখন কি করবেন?

—কি করি ভাবচি।

—উনি কি আবার আসবেন বলে মনে হয়?

—জানি নে।

—রঁাধতে পারেন?

—না।

—তা হোলে তো মুশকিল। আমার বাড়ী যে খাবেন না, তাহ'লে আমিই তো ব্যবস্থা করতাম। আমার বাড়ীও যশোর জেলায়। দেশের লোক আপনার।

—বেশ বেশ।

সারাদিন পথে ঘুরে ঘুরে কাটলো এক রকম। রাত্রে অনেক দেরি করে বাসায় এলুম। কালও বেড়িয়ে ফিরে এলে পান্না বলেছিল,—একদিন চলো আমরা খড়দ যাবো। মায়ের সঙ্গে একবার ফুলদোল দেখতে গিয়েছিলাম জানলে? বড্ড ভাল লেগেছিল। যাবে একদিন?

আমি বলেছিলাম, চল, সামনের শনিবার।

ও হেসে বলেছিল—আমাদের আবার শনিবার আর রবিবার। তুমি কি আপিসে চাকরি করো!

কিছু না, শশিপদ সেকরা ঠিক বলেচে? ওরা মায়াবিনী। রাত্রে ঘুমুতে গেলে ঘুম হয় না। হঠাৎ দেখি যে আমি কাঁদচি। সত্যিই কাঁদচি। জীবনের সব কিছু যেন চলে গিয়েছে। আর কোনো আমার ভরসা নেই। কোনো অবলম্বন পর্য্যন্ত নেই জীবনের। পান্না এত নিষ্ঠুর হতে পারলে? চলেই গেলে! আচ্ছা, ও কি আমার ওপর রাগ করে, অভিমান করে চলে গেল?

আমি ঘুম ছেড়ে উঠে ভাবতে বসলাম। যদি কেউ আমাকে ওর মনের খবর এনে দিতে পারতো, যদি বলে দিতে পারতো ও অভিমান করে গিয়েছে, আমি তাকে অন্তর থেকে আশীর্ব্বাদ করতাম। আমি নিঃস্ব, দেওয়ার কিছুই নেই আমার আজ—নইলে অনেক টাকা দিতাম ওই সংবাদ-বাহককে।

কিন্তু খবর কেউ না-ই বা দিল?

আমি ভেবে দেখলে বুঝতে পারবো নিশ্চয়।

আবার কখন শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছি ভাবতে ভাবতে।

স্বপ্ন দেখেছি পান্না এসে বলছে—এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম, ওঠো চা করচি, খাও। বা রে—

ধড়মড় করে ঠেলে উঠলাম। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস যেন ফেললাম; ঘুমঘোর জড়িত মন যেন আনন্দে নেচে উঠলো তাহ'লে কিছুই হয় নি, পান্না যায় নি কোথাও। মিথ্যা স্বপ্ন ওর যাওয়াটা।

মূঢ়ের মত শূন্য গৃহের চারিদিকে চাইলাম। কপোতী নীড় ছেড়ে পালিয়েছে। কেউ নেই।

ঘুমিয়ে বেশ ছিলাম। ঘুম ভাঙলেই যেন পাষাণ ভার চাপলো বুকে। সারাদিন এ পাষাণের বোঝা বুক থেকে কেউ নামাতে পারবে না।

এই রকম বিভ্রান্তের মত যে ক'টা দিন কাটলো তার হিসেব রাখিনি।

দিন আসে যায়, রাত্রে ঘুমুই, আর কিছু মনে থাকে না।

একা ঘরে শুয়ে কান্না আসে। বুক-ভাঙা কান্না।

দিনমানে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়ে ভুলে থাকি। কিন্তু রাত্রে একেবারে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয় শূন্য ঘরে।

আশ্চর্য্যের কথা একটা। পান্না টাকাকড়ি একটাও নিয়ে যায় নি। আমার বালিসের তলায় রেখে দিয়েছে। বোধ হয় তাড়াতাড়িতে ভুলে গিয়েচে।

এই খবর পাবা জন্যে মরে যাচ্চি। কে দেবে এ সংবাদ?

এ কদিন বসে বসে ভাবলুম। কি আশ্চর্য্য আমার মনের এই তীব্র, তীক্ষ্ণ, উগ্র, অতি ব্যগ্র মনোভাব! এমন মন আমার মধ্যে ছিল তা কখনো আমি জানতে পারি নি। এ মন কোথায় এতদিন ঘুমিয়ে ছিল আমারই মধ্যে, সুরবালা এ ঘুম ভাঙাতে পারে নি—ভাঙিয়েচে পান্নার সোনার কাঠি।

এ মন আমাকে একদণ্ড সুস্থির থাকতে দেয় না। সর্ব্বদা পান্নার কথা ভাবায়। সব সময়, প্রতিটি মুহূর্ত্তে। যে যাকে ভালবাসে, সে তার কথা ছাড়া ভাবতে পারে না। ভাববার সামর্থ্য তার থাকে না। আগে বুঝতাম না এ সব কথা। এ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, মন নিয়ে এ কারবার তখন আমার ছিল না। দিন রাত, চন্দ্র সূর্য, সকাল বিকেল, ইহকাল-পরকাল ভাল-মন্দ—সব গিয়ে সেই এক বিন্দুতে মিশচে—পান্না। যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, তাঁদের নাকি এমন দশা হয় শুনেচি। ঈশ্বরের বিষয় ছাড়া ভাবতে পারেন না, ঈশ্বরের কথা ছাড়া কইতে পারেন না। ঈশ্বরের বিরহে চৈতন্যদেব নাকি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে যেতেন। বিরহের এ অনুভূতি ভগবান যাকে আস্বাদ করান, সে ভিন্ন করতে পারে না। বিশেষ অবস্থায় পড়তে হয়। সুরবালা বাপের বাড়ী গেলে সে বিরহদশা আসে না। একেবারে হারিয়েচি, এই ভাব আসা চাই। সুরবালা তো কত বার বাপের বাড়ী গিয়েছে, এ দশা কি হয়েচে আমার জীবনে কখনো? তাই বলছিলাম, এখন বুঝছি ঈশ্বরভক্তদের যে তীব্র প্রেমের কথা শুনেচি বা পড়েচি—তা কবি-কল্পনা বা অতিরঞ্জিত নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আমার চেয়ে হয় তো আরো বেশি সত্য।

মনের ব্যাপারই। মনের ঠিক অবস্থায় না পড়লে কিছুতেই অন্যের মনের সেই অবস্থা সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা যায় না। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝচি যা, আগে এই সব কথা বললে বিশ্বাস করতাম না। বিশ্বাস হত না। এসব জিনিস অনুমানের ব্যাপার নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যাপার। আগে থেকে বললে কে বিশ্বাস করবে? পোড় খাওয়া না হোলে পোড়ার জ্বালা কে ধারণা করবে? সাধ্য কি?

ঠিক এই সময় বৌবাজার দিয়ে শেয়ালদ'এর দিকে যাচ্ছি একদিন, উদ্দেশ্য বৈঠকখানার মোড় থেকে এক মালা নারকোল কেনা, হঠাৎ রাস্তার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালাম! সনাতনদা যাচ্ছে ফুটপাতের কোল ঘেঁষে লালবাজার মুখে। সনাতনদাও আমাকে দেখতে পেয়েচে। নইলে আমি পাশ কাটাতুম। আমার পরনে ময়লা জামা, ধুতিও মলিন। পায়ে পান্নার টাকায় কেনা সেই পাঁচটাকা দামের খেলো জুতো জোড়া।

সনাতনদা এগিয়ে এল আমার দিকে। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইতে চাইতে এল। যেন বিশ্বাস করতে পারচে না যে আমি।

বলি—কি সনাতনদা যে!

ও বিস্ময়ের সুরে বললে—তুমি!

—হ্যাঁ। ভালো আছো?

সনাতনদা একবার আমার আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে নিলে। কি দেখলে জানি নে, আমার হাসি পেল।—কি দেখচ সনাতনদা?...ও যেন অবাক-মত হয়ে গিয়েচে।

সনাতনদা এসে আমার হাত ধরলে। আর একবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। বললে —এসো, চলো কোথাও গিয়ে বসি, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। চলো একটু ফাঁকা জায়গায়।

বললাম—সুরবালা ভালো আছে? ছেলেপিলেরা?

—চলো। বলচি সব কথা। একটা চায়ের দোকানে নিরিবিলি বসা যাক্—

—চায়ের দোকানে নয়, নেবুতলার ছোট্ট পার্কটায় চলো—

দম্পতি

চুয়াডাঙ্গা যাইবার বড় রাস্তার দু'পাশে দুইখানি গ্রাম--দক্ষিণ-পাড়া ও উত্তর-পাড়া। দক্ষিণ-পাড়ায় মাত্র সাত-আট ঘর ব্রাহ্মণের বাস, আর বনিয়াদী কায়স্থ বসু-পরিবার এ-গ্রামের জমিদার। উত্তর-পাড়ার বাসিন্দারা বিভিন্ন জাতির। ইঁহাদের জমিদারও কায়স্থ। উপাধি—বসু। উভয় ঘরই পরস্পরের জ্ঞাতি। বসুগণ গ্রামের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের কাহারও মধ্যে সদ্ভাব নাই। রেষারেষি ও মনোমালিন্য লাগিয়াই আছে।

দক্ষিণ-পাড়ার নীচে 'কুসুম বাম্‌নীর দ' নামে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন জলাশয়ের ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া উভয়-ঘরের মধ্যে আজ প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। বড়-তরফের সত্যনারায়ণ বসু একদিন সকালে লোকজন লইয়া সেখানে মাছ ধরিতে গিয়া দেখিলেন, ছোট-তরফের গদাধর বসু অপর পাড়ে তাঁহার পূর্ব্বেই আসিয়া, জেলে নামাইয়া মাছ ধরিতেছেন। সত্যনারায়ণ বসু কৈফিয়ৎ চাহিলেন – তিনি বর্ত্তমানে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া গদাধরের এমন আচরণের হেতু কি? গদাধর তদুত্তরে যাহা বলিলেন, সত্যনারায়ণ বসুর পক্ষে তা সম্মানজনক নয়। কথার মধ্যে একটা শ্লেষ ছিল, সত্যনারায়ণ বসুর বড় ছেলে কলিকাতায় লেখাপড়া করিতে যাইয়া বকিয়া গিয়াছিল—তাহার শখের দেনা মিটাইতে সত্যনারায়ণকে সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয় কোবালা করিয়া, চুয়াডাঙ্গায় কুণ্ডুদের গদি হইতে প্রায় হাজার দুই টাকা সংগ্রহ করিতে হয়।

বসু-বংশের এই শৌখীন ছেলেটির কথা ঘুরাইয়া গদাধর এমনভাবে বলিলেন যাহাতে সত্যনারায়ণের মনে বড় বাজিল। দুজনের মধ্যে সেই হইতে মনোমালিন্যের সূত্রপাত;—তারপর উভয়-তরফে ছোটবড় মামলা-মোকদ্দমা, এমন কি, ছোট-খাটো দাঙ্গা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখাদেখি অনেকদিন হইতে বন্ধ।

গদাধর বসুর বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চেহারা, রং শ্যামবর্ণ, তবে বসু-বংশের দৈহিক ধারা অনুযায়ী বেশ দীর্ঘাকৃতি। ম্যালেরিয়ায় বছরের মধ্যে ছ'মাস ভুগিলেও গদাধরের শরীরে খাটিবার শক্তি যথেষ্ট। উভয়-তরফের মধ্যে তাঁহারই অবস্থা ভালো। আশপাশের গ্রাম হইতে সুবিধা দরে পাট কিনিয়া মাড়োয়ারী মহাজনদের নিকট বেচিয়া হাতে বেশ দু'পয়সা করিয়াছেন। এই গ্রামেরই বাহিরের মাঠে তাঁহার টিনের চালাওয়ালা প্রকাণ্ড আড়ত। গ্রামের বাহিরে মাঠে আড়ত করিবার হেতু এই যে, আড়তটি যে-স্থানে, সেটি দুটি বড় রাস্তার সংযোগস্থল। একটি চুয়াডাঙ্গা যাইবার ডিস্ট্রিক বোর্ডের বড় রাস্তা, অপরটি লোকাল বোর্ডের কাঁচা রাস্তা, সেটি বাণপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। চুয়াডাঙ্গা ও কৃষ্ণনগরগামী পাটের গাড়ী এখান দিয়াই যায়—পথের ধারে গাড়ী ধরিয়া পাট নামাইয়া লইবেন—এই উদ্দেশ্যেই এই উভয়-রাস্তার সংযোগস্থলে আড়ত-ঘর তৈরী।

গদাধর বসু বৎসরে বিস্তর পয়সা রোজগার করেন—অর্থাৎ কলিকাতার হিসাবে বিস্তর না হইলেও পাড়াগাঁ হিসাবে দেখিতে গেলে, বৎসরে পাঁচ-ছ' হাজার টাকা নিট্ মুনাফা সিন্দুকজাত করার সৌভাগ্য যাহার ঘটে—প্রতিবেশি-মহলে সে ঈর্ষার ও সম্ভ্রমের পাত্র।

গদাধরের প্রকাণ্ড পৈতৃক বাড়ী বট-অশ্বত্থ গাছ গজাইয়া, খিলান ফাটিয়া, কার্নিশ ভাঙিয়া

নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেকালের অনেক জানালা-দরজায় চাঁচের বেড়া বাঁধিয়া আবরু রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত। তবু সেই বাড়ীতেই গদাধর পুত্র-পরিবার লইয়া চিরকাল বাস করিয়া আসিতেছেন। টাকা হাতে থাকা সত্ত্বেও গদাধর বাড়ী মেরামত করেন না কেন, বা নিজের পছন্দমত নতুন ছোট-বাড়ী আলাদা করিয়া তৈরী করেন না কেন ইত্যাদি প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক; বিশেষতঃ যাঁহারা বাহিরের দিক হইতে জিনিসটা দেখিবেন। ইহার কারণ আর যাহাই হউক, গদাধরের কৃপণতা যে নয়—ইহা নিশ্চিত। কারণ, গদাধর আদৌ কৃপণ নহেন। প্রতি বৎসর তিনি জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গোৎসব ও কালীপূজা করিয়া গ্রামের শূদ্র-ভদ্র তাবৎ লোককে ভোজন করাইয়া থাকেন—গরীবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণও করেন, সম্প্রতি 'কুসুম বামনীর দ'র উত্তরপাড়ে একটি বাঁধানো স্নানের ঘাট করিয়া দিয়াছেন—তাহাতে মিত্র-পক্ষর মতে প্রায় তিনশত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে—তবে শত্রুপক্ষ বলে মেজ-তরফ নির্ব্বংশ হইয়া যাওয়ায় উভয় ঘরের সুবিধা হইয়াছে—ভিটার পুরাতন ইটগুলি সত্যনারায়ণ ও গদাধর মিলিয়া দশহাত বাড়াইয়া লুঠ চালাইতেছে। বিনামূল্যে সংগৃহীত পুরাতন ইটের গাঁথুনি বাঁধা-ঘাটে আর কত খরচ পড়িবে?…ইত্যাদি।

যাক্, এসব বাজে কথা।

আসল কথা, গদাধর গ্রামের মধ্যে একজন সঙ্গতিশালী ও সাহসী লোক। একবার গদাধরের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল। গদাধর হাঁকডাক করিয়া লোকজন জড় করিয়া, নিজে রামদা হাতে লইয়া হৈ-হৈ শব্দে গ্রাম মাতাইয়া ছুটিয়া ছিলেন, কিন্তু ডাকাতদের টিকিও দেখা যায় নাই।

একদিন গদাধর আড়তে বসিয়া কাজকর্ম্ম দেখিতেছেন, কাছে পুরাতন মুহুরী ভড় মহাশয় বসিয়া কাগজপত্র লিখিতেছেন, আজ গদাধরের মনটা খুব প্রসন্ন, কারণ, এইমাত্র কলিকাতার মহাজন বেলেঘাটার আড়ত হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছে যে, তাঁহার পূর্ব্বের পাটের চালানে মণ-পিছু মোটা লাভ দাঁড়াইবে।

গদাধর মুহুরীকে বলিলেন—ভড়মশায়, চালানটা মিলিয়ে দেখলেন একবার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সাড়ে-সাত আনা খরিদ-দরের ওপর টাকায় দু'পয়সা আড়তদাড়ি, আর গাড়ীভাড়া দু'আনা এই ধরুন আট আনা—দশ আনা…

—ওরা বিক্রি করেচে কততে?

—সাড়ে-চোদ্দ—ওদের আড়তদারি বাদ দিন টাকায় এক আনা…

—ওইটে বেশী হচ্চে ভড়মশায়। সিঙ্গিমশায়দের একটা চিঠি লিখে দিন, আড়তদারিটার সম্বন্ধে…

—বাবু, ও-নিয়ে আরবারে কত লেখালেখি হলো জানেন তো? ওরা ওর কমে রাজী হবে না—আমরাও অন্য-কোনো আড়তে দিয়ে বিশ্বাস করতে পারবো না। সব দিক বিবেচনা ক'রে দেখলে বাবু ও-আড়তদারি আমাদের না দিয়ে উপায় নেই। ওদের চটালে কাজ চলবে না। পুজোর সময় দেখলেন তো?

—বাদ দিন ও-কথা। কত মণের চালান ?

—সাড়ে-পাঁচশো আর খুচরো সাতাশি…

বাহির হইতে আড়তের কয়াল নিধু সা আসিয়া বলিল—মুহুরীমশায়, কাঁটা ধরাবো ? মাল নামচে গাড়ী থেকে।

ভড় মহাশয় বলিলেন—ক'গাড়ী ?

দু'গাড়ী, এলো-পাট—কালকের খরিদ।

—ভিজে আছে ?

—তা তো দ্যাখলাম না—আসুন না একবার বাইরে।

গদাধর ধমক দিয়া কহিলেন—মুহুরীমশায়ের না গেলে, ভিজে কি শুক্‌নো পাট দেখে নেওয়া যায় না ? দেখে নাওগে না—কচি খোকা সাজচো যে দিন-দিন !

নিধু সা কাঁচা কয়াল নয়, কয়ালী কাজে আজ ত্রিশ বছর নিযুক্ত থাকিয়া মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিল। কাঁটায় মাল উঠাইবার আগে মালের অবস্থা যাচাই করাইয়া লওয়ার কাজটা আড়তের কোনো বড় কর্ম্মচারীর দ্বারা না করাইলে ভবিষ্যতে ইহা লইয়া অনেক কথা উঠিতে পারে—এমন কি, একবার দেখাইয়া লইলে. পরে বিক্রেতার সহিত যোগসাজশে মণ-মণ ভিজা পাট কাঁটায় তুলিলেও আর কোনো দায়িত্ব থাকে না—তাহাও সে জানে। বাবুরা ইহার পর আর তাহাকে দোষ দিতে পারিবে না। তবুও সে গদাধরের কথার প্রতি সমীহ করিয়া বিনীত-ভাবে বলিল—তা যা বলেন বাবু, তবে মুহুরীবাবু পাট চেনেন ভালো, তাই বলছিলাম।

গদাধর বলিলেন—মুহুরীমশায় পাট চেনে, আর তুমি চেন না ? আর এত পাট চেনা-চেনির কি কথাই-বা হলো ? হাত দিয়ে দেখ্‌লে বোঝা যায় না, পাট ভিজে কি শুক্‌নো ?

নিধু কয়াল দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল।

মুহুরীর দিকে চাহিয়া গদাধর বলিলেন—ভড়মশায়, নিধেটা দিন-দিন বড় বেয়াদব হয়ে উঠচে—মুখোমুখি তর্ক করে।

ভড় মহাশয় তাহার উত্তরে মৃদু হাস্য করিলেন মাত্র, কোন কথা বলিলেন না। ইহার কারণ, গদাধরের চণ্ডালের মত রাগে ইন্ধন যোগাইলে, এখুনি চটিয়া লাল হইয়া নিধু কয়ালকে বরখাস্তও করিতে পারেন তিনি। কিন্তু ভড় মহাশয় জানেন, নিধু সা চোর বটে, তবে সত্যই কয়ালী কাজে ঝুনা লোক—গেলে অমনটি হঠাৎ জুটানো কঠিন।

সন্ধ্যা হইয়া গেল।

এই সময় কে একজন বাইরে কাহাকে বলিতেছে শোনা গেল—না, এখন দেখা হবে না, যাও এখন।

গদাধর হাঁকিয়া বলিলেন—কে রে ?

নিধু কয়ালের গলার উত্তর শোনা গেল—কে একজন সন্নিসি ফকির, বাবু।

কথার শেষ ভালো করিয়া হইতে-না-হইতে একজন পাঞ্জাবী-সাধু ঘরে ঢুকিল—হলদে

পাগড়ী পরা, হাতে বই—সে-ধরণের সাধুর মূর্তির সঙ্গে পরিচয় সকলেরই আছে আমাদের। ইহারা সাধারণতঃ রামেশ্বর তীর্থে যাইবার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া বাংলাদেশে আসিয়া গৃহস্থের ঘরে ঘরে হাত দেখিয়া বেড়ায় ও প্রবাল, পাকা-হরিতকী, দুর্লভ ধরণের শালগ্রাম ইত্যাদি প্রত্যেক ভক্তকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া, পাথেয় ও খোরাকী বাবদ পাঁচ টাকার কম লয় না।

গদাধর বলিলেন—কি বাবাজী? কাঁহাসে আস্‌তা হ্যায়?

সাধু হাসিয়া বলিল—কলকত্তা—কালিমায়ীকি থান সে। হাত দেখলাও।

—বোসো বাবাজি।

গদাধর হাত প্রসারিত করিয়া দিলেন—সাধু বলিল—অঙ্গুঠি উতার লেও—

মুহুরী বলিলেন—আংটি খুলে নিতে বলছে হাত থেকে।

গদাধর তখুনি সোনার আংটিটি খুলিয়া হাতের আঙুল প্রসারিত করিয়া সাধুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

সাধু বলিল—চাঁদি ইয়ানে সোনা হাত মে রাখ্‌সো? হাত্‌মে চাঁদি রাক্‌খো! নেই তো হাত কেইসে দেখেগা?

এ-কথা শুনিয়া বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া হাতে রাখিয়া গদাধর সাধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সাধু হাতখানা ভালো করিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—তেরা বহুৎ বুরা দিন আতা—ইন্‌সাল ইয়ানে দুসর্ সাল-সে বহুৎ কুছ্ গড়বড় হো যায়গা।

গদাধর ভালো হিন্দী না বুঝিলেও মোটামুটি জিনিসটা বুঝিলেন। কিন্তু তিনি আবার একটু নাস্তিক-ধরণের লোক ছিলেন, কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখা যাক্।

সাধু বলিল—কেয়া?

—কিছু না··বল্‌তা হায়, বেশ।

সাধু বলিল—কুছ যাগ করনে হোগা। পরমাত্মাকা কৃপা-সে আচ্ছা হো যায়গা—করোগে?

—ওসব এখন হোগাটোগা নেই বাবাজি, আবি যাও।

—তেরা খুশি!

বলিয়া খপ্ করিয়া হাতের টাকাটি তুলিয়া লইয়া বেমালুম ঝুলির মধ্যে পুরিয়া সাধু বলিল—আচ্ছা, রাম-রাম বাবু।

গদাধর একটু অবাক হইয়া বলিলেন—টাকাটা নিলে যে?

—দাচ্ছিনা তো চাহিয়ে্ বেটা। নেহি দচ্ছিনা দেনে-সে কোই কাম আচ্ছা নেহি বন্‌তা!

সাধু আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গদাধর বেকুবের মত বসিয়া রহিলেন।

ভড় মহাশয় বলিলেন—টাকাটা দিব্যি কেমন নিয়ে গেল !

গদাধর রাগত স্বরে বলিলেন—সব জোচ্চোর ! সাধু না হাতী ! একটা টাকার ঘায়ে জল দিয়ে গেল বিকেলবেলা ! আরও বলে কি না, তোমার খারাপ হবে।

দু-একজন বলিল—তাই বললে নাকি বাবু ?

—শুনলে না, কি বললে ? তাই তো বললে !

তারপর ও-প্রসঙ্গ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টায় গদাধর মুহুরীর দিকে চাহিয়া জোরগলায় বলিলেন—তারপর ভড়মশায়, বেলেঘাটার গদিতে একখানা চিঠি মুসোবিদে ক'রে ফেলুন চট্‌ ক'রে !

—কি লিখবো ?

—ওই আড়তদারির কথাটা নিয়ে প্রথমে লিখুন—হারাধন সিঙ্গিকেই চিঠিখানা লিখুন, যে, নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং, আপনাদের এত নম্বর চালান যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে—আপনারা এতবার লেখালেখি সত্ত্বেও টাকায় এক আনা করিয়া আড়তদারি বজায় রাখিয়াছেন দেখিয়া—

এইসময় গদাধরের পত্তনী মৌজা সুন্দরপুরের একটি প্রজা ঝুড়িতে কয়েকটি ছোট-বড় কপি আনিয়া গদির আসনে নামাইতে, চিঠিলেখানো বন্ধ করিয়া গদাধর তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কিরে রতিকান্ত ? ভালো আছিস্‌ ? এতে কি ?

—আজ্ঞে, কয়েকখানি কপি আপনার জন্যি এনেলাম—এবার দশ কাঠা জমিতে কপি হয়েছে, তা বিষ্টির অবানে সে বাড়তি পারলো না বাবু। তার ওপর নেগেচে কাঁচকুমুরে পোকা—পাতা কেটে-কেটে ফ্যালায় রোজ সকালে-বিকালে এত-এত—

রতিকান্ত হাত দিয়া কীট দ্বারা কর্ত্তিত পাতার পরিমাণ দেখাইল।

গদাধর বলিলেন—না, তা ফুল মন্দ হয় নি তো বাপু, বেশ ফুল বেঁধেচে। যা বাড়ীতে দিয়ে এসে একটু গুড়-জল খেয়ে আয় গে বাড়ী থেকে।

ভড় মহাশয় বলিলেন—তারপর আর কি লিখবো বাবু ?

—আজ থাক ভড়মশায়। সন্দে হয়ে এলো। আমার একটু কাজ আছে মুখুয্যে-বাড়ী। রতিকান্ত, আয় আমার সঙ্গে—ভড়মশায়, কপি একটা রাখুন।

—না, না বাবু, আপনার বাড়ীতে থাক্‌—আমি আবার কেন—

—তাতে কি ? আমরা কত খাবো ? রতিকান্ত, দাও একখানা ভালো দেখে ফুল নামিয়ে। নিয়ে যান না !

রতিকান্তকে লইয়া চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে গদাধর বলিলেন—ক্যাশটা তা'হলে আপনি নিয়ে যাবেন সঙ্গে ক'রে ? না, আমি নিয়ে যাবো ?

—তাহ'লে বাবু আর-একটু বসতে হয়। ক্যাশ বন্ধ করি এবার, মিলিয়ে দিই।

—বসি।

—বাবু, ওবেলা ও আট আনা হাওলাতে কার নামে লিখবো ?

—ও যা হয় করুন, ঢুলি-খরচ ব'লে লিখুন না? ঢোল শহরৎ তো করতেই হবে—আজ না হয় কাল!

—আর, এবেলার এই এক টাকা?

—কোন্ এক টাকা?

—এই যে সাধু নিয়ে গেল?

—ও! ওটা আমার নামে খরচ লিখুন। ব্যাটা আচ্ছা ধাপ্পাবাজি ক'রে টাকাটা নিয়ে গেল!

—ওইজন্তেই আংটি খুলতে বলেছিল বাপু, এইবার বোঝা যাচ্ছে।

সেই তো। কারণ, সোনা তো আংটিতে রয়েচে, আবার চাঁদি কি হবে যদি বলি? আঙ্টি তো আর আঙুল থেকে টেনে খুলে নিয়ে সটকান্ দেওয়া যায় না! ডাকাত একেবারে! এদের কথা সব মিথ্যে!

কথাগুলো গদাধর যেরূপ জোর দিয়া বলিলেন, তাহাতে মনে হইল, তিনি তাঁহার বোকামির জন্য নিজে যেমন লজ্জিত হইয়াছেন, সাধু সম্বন্ধে ভড় মহাশয়ের নিকট হইতেও কটূক্তি শুনিতে পাইলে যেন কিছুটা আশ্বস্ত হন। ভড় মহাশয় কিন্তু দেবদ্বিজে অসাধারণ ভক্তিমান বৃদ্ধ ব্যক্তি। মনিবের মন যোগাইবার জন্যও তিনি সাধুর প্রতি অবিশ্বাসসূচক কোন কথা বলিতে রাজী নন্। সুতরাং তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে গদাধর বাড়ী ফিরিলেন।

স্ত্রী অনঙ্গমোহিনী রান্নাঘরে ছিল, স্বামীর সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—আজ সকাল-সকাল যে? কি ভাগ্যি!

—কাজ মিটে গেল তাই এলাম! একটু চা খাওয়াবে?

—ভাতটা চড়েছে—নামিয়ে ক'রে দিচ্ছি।

—তুমি রাঁধচো নাকি?

—হ্যাঁ। আজ তো পিসিমার সন্দের পর থেকেই ভীষণ জ্বর এসেচে। তিনি উঠতেই পারেন না, তা রাঁধবেন কি?

—তাইতো। কাল একবার ডাক্তার ডাকি—প্রায়ই তো ওঁর জ্বর হোতে লাগলো...

—উনি ডাক্তারি-ওষুধ তো খাবেন না—ডাক্তার ডাকিয়ে কি করবে?

—তুমিই বা ক'দিন এরকম রাঁধবে?

—তা ব'লে কি হবে? যে ক'দিন পারি। বাড়ীর লোক কি না খেয়ে থাকবে?

গদাধর আর কোনো কথা না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন—কিছুক্ষণ পরে চাকর তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। এই চাকরটির ইতিহাস বেশ নতুন ধরণের। ইহার নাম—গৈবি। বাড়ী—নেপাল। গদাধরের বাবার আমলে একদিন সে এ-গ্রামে আসিয়া ইহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করে। সে আজ সতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা। সেই হইতেই গৈবি এখানে থাকে এবং কথাবার্ত্তায় সে পুরা বাঙালী। তাহাকে বর্ত্তমানে নেপালী বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই।

গদাধর বলিলেন—গৈবি, কাল একবার শরৎ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। পিসিমার জ্বর হয়েচে! বড্ড ভুগচেন, এবার নিয়ে বার-পাঁচেক জ্বরে পড়লেন।

গৈবি বলিল—পিসিমা কারো কথা শুনবে না বাবু! আমি বলি, তুমি পুকুরে ছেন কোরবে না, করলেই তোমায় জ্বরে ধরবে। তা, কারো কথা শুনবার লোক নয়। এখন যে জ্বরটি হলো, এখন কে ভুগবে? হ্যাঁ!

—ঠিক। তুই কাল সকালেই যাবি ডাক্তারের কাছে।

—সকালে কেনো, এখুন বল্লে এখুনই যেতে পারি—হ্যাঁ!

—না, থাক্, এখন যেতে হবে না। তুই যা।

—বাবু, ভাল কথা—এক সাধুবাবাজি আপনার আড়তে গিয়েছিলো?

—হ্যাঁ গিয়েছিল। কেন বল্‌তো?

—ও তো এখানে আগে এলো। বলে, বাবু কোথায়? বাবুর সাথে ভেট্ করবো। আমি ব'লে দিলাম, বাবু আড়তে আছে—সত্য গিয়েছিলো ঠিক তাহোলে?

—তা আর যাবে না? একটা টাকার ঘাড়ে জল দিয়ে গেল!

—এক টাকা! কি হলো বাবু?

—হবে আবার কি? ফাঁকি দিয়ে জোর ক'রে নিয়ে গেলে যা হয়!

এই সময় অনঙ্গ চায়েরবাটি হাতে করিয়া ঢুকিতে-ঢুকিতে বলিল—কে গা? কে দিলে ফাঁকি?

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ঠকবার মজা কি জানো? যে ঠকে সে তো ঠকেই—আবার উপরন্তু পাঁচজনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে প্রাণ যায়!

অনঙ্গ অভিমানের সুরে বলিল—বেশ, তাহ'লে দিও না কৈফিয়ৎ। কে চায় শুনতে?

—না, না, শোনো।

—শুনি তো আমার বড় দিব্যি!

—না যদি শোনাই, তবে আমারও অতি-বড় দিব্যি।

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—বলো, কি হলো শুনি?

গদাধর সাধুর ব্যাপার বলিলেন। অনঙ্গ শুনিয়া কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল, পরে কি ভাবিয়া বলিল—তুমি যদি সাধুকে বাড়িতে আনতে তো বেশ হতো।

—কেন?

—আমার হাতটা দেখাতাম।

—তোমার হাত কি দেখবে আবার? দিব্যি তো আছো।

—দেখালে দোষ কি?

—ওরা কি জানে? আমার বিশ্বাস হয় না।

—তুমি নাস্তিক ব'লে সবাই তো নাস্তিক নয়!

—কি দেখাবে? আয়ু?

—তাও দেখাতাম বৈকি। দেখাতাম, তোমার আগে মরি কি না—

—এ শখ কেন ?

—এ-শখ কেন, যদি মেয়েমানুষ হতে, তবে বুঝতে।

—যখন তা হই নি তখন আপসোস ক'রে লাভ নেই। এখন চা-টা খাবে ? জুড়িয়ে যে জল হয়ে গেল !

বলিয়া গদাধর চায়ের পেয়ালা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিলেন।

স্বামীর কথায় চা-টুকু শেষ করিয়া অনঙ্গ ঘরের বাইরে যাইবার উপক্রম করিতেই গদাধর বলিলেন—একটু দাঁড়াও না ছাই।

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—বসলে চলে ? রান্না-বান্না সবই বাকী।

—তা হোক, বোসো একটু।

অনঙ্গ স্বামীর সংস্পর্শ হইতে বেশ-কিছু দূরে বসিয়া বলিল—এই বসলাম।

অর্থাৎ সে এখন শুচি-বস্ত্র পরিয়া রান্না করিতেছে—নাস্তিক গদাধরের আড়ত-বেড়ানো কাপড় পরনে, সে এখন স্বামীর সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁয়ি করিতে রাজি নয়।

গদাধর মুচকি হাসিয়া বলিলেন—ছুঁয়ে দিই ?

—তাহ'লে থাকলো হাঁড়ি উনুনে চড়ানো—সে হাঁড়ি আর নামবে না।

—ভালোই তো। কারো খাওয়া হবে না।

—কারো খাওয়ার জন্যে আমার দায় পড়েচে ভাববার। ছেলেমেয়েরা কষ্ট পাবে না খেয়ে সেটাই ভাবনার কথা।

—ও, বেশ।

আমার কাছে পষ্ট কথা—পষ্ট কথার কষ্ট নেই।

—সে তো বটেই।

অনঙ্গ হাসিতে লাগিল। তাহার বয়স এই সাতাশ- আটাশ—প্রথম যৌবনের রূপ-লাবণ্য কবে ঝরিয়া গেলেও অনঙ্গ এখনও রূপসী। এখনও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। রং যে খুব ফর্সা তা নয়, উজ্জ্বল শ্যাম বললেই ভালো হয়, কিন্তু অনঙ্গর মুখের গড়নের মধ্যে এমন একটা আলগা চটক আছে, চোখ এমন টানা-টানা, ভুরি দুটি এমন সরু ও কালো, ঠোঁট এমন পাতলা, বাহু দুটির গড়ন এমন নিটোল, মাথার চুলের রাশ এমন ঘন ও ঠাস্-বুনানো, হাসি এমন মিষ্ট যে, মনে হয়, সাজিয়া-গুজিয়া মুখে স্নো-পাউডার মাখিয়া বেড়াইলে এখনও অনঙ্গ অনেকের মুণ্ড ঘুরাইয়া দিতে পারে !

নারীর আদিম শক্তি ইহার মধ্যে যেন এখনও নির্ব্বাপিত আগ্নেয়-গিরির গর্ভে সুপ্ত-অগ্নির মতই বিরাজমান।

গদাধর বলিলেন—সাধু আজ আমার হাত দেখে কি বলেচে জানো ?

—কি গা ?

—আমার নাকি শীগগির খুব খারাপ সময় হবে।

অনঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—ওমা, সে কি গো !

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—তাই তো বললে!

—আচ্ছা, তোমার সব-তাতে হাসি আমার ভালো লাগে না! তুমি যেমন কিছু জানো না, বোঝো না—সবাই তো তোমার মত নয়! কি-কি বললে সাধুবাবা শুনি?

—ওই তো বললাম।

—সত্যি, এই কথা বলেচে?

—হ্যাঁ, ভড়মশায় জানে, জিজ্ঞেস্ কোরো।

—ওমা, শুনে যে হাত-পা আসচে না!

—হ্যাঃ—তুমি রেখে দাও। ভণ্ড সাধু সব কোথাকার, ওদের আবার কথার ঠিক!

অনঙ্গ ঝাঁঝের সহিত বলিল—ওই তো তোমার দোষ। কাকে কি চটিয়েচো, কি ব'লে গিয়েচে। ওরা সব করতে পারে, তা জানো? ওদের নামে অমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে আছে? ওই দোষেই তোমার ভুগতে হবে, দেখচি! সাধুকে কিছু দাওনি?

গদাধর হাসিয়া উঠিয়া হাতে চাঁদি-বসানো এবং সাধুর টাকা তুলিয়া লওয়ার বর্ণনা করলেন।

অনঙ্গ বলিল—হেসো না। যাক্, তবুও কিছু দক্ষিণা-প্রণামী পেয়ে গিয়েচেন তো তিনি! আমার এখানে আগে এসেছিলেন—তখন যদি জানতাম, আমি ভাল ক'রে সেবা ভোগ দিতাম—মনটা খুশী ক'রে দিতাম বাবার…ওঁরা সব পারেন।

বলিয়া অনঙ্গ হাত জোড় করিয়া কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিল।

গদাধরের দোষ এই, স্ত্রীর কাছে গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারে না। অনঙ্গর কাণ্ড দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখা গদাধরের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা হাসি চাপিতে গিয়া শেষকালে ফল ভালো হইল না—ঘরের মধ্যে মনে হইল যেন একটা হাসির বোমা বুঝি-বা ফাটিয়া পড়িল!

অনঙ্গ রাগে ফরফর করিতে-করিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

গদাধরের তখন আর-এক পেয়ালা হইলে মন্দ হইত না—কিন্তু স্ত্রীকে চটাইয়াছেন, সে-আশা বর্ত্তমানে নির্ম্মূল।

তিনি ডাকিলেন—গৈবি…

গৈবি বাহির-বাড়ী হইতে উত্তর দিল—যাই বাবু।

—ওরে, শোন এদিকে, একটু তামাক দে—আর একবার দেখে আয়, কলকাতা থেকে নির্ম্মলবাবু এসেচে কিনা…মুখুয্যেবাড়ীর।

—এখনি যাবো, বাবু?

—তামাক দিয়ে তারপর গিয়ে দেখে আয়। যদি আসে তো ডেকে নিয়ে আস্বি!

এই সময় অনঙ্গ আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কেন, নির্ম্মলবাবুকে ডাকচো কেন, শুনি?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

—দরকার আছে। নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে তোমাকে মিশতে দেবো না আমি।

—আমি কি ছেলেমানুষ?

—ছেলে-বুড়োর কথা নয়। সে এসে কেবল টাকা ধার করে আর দেয় না। গাঁয়ের সকলের কাছেই নিয়েছে, এমন কি মিনির বাপের কাছ থেকেও সাতটা টাকা নিয়ে গিয়েচে। তোমার কাছ থেকে তো অনেক টাকাই নিয়েছে। কিছু দিয়েচে?

—দিক না-দিক, তোমার সে-সব খোঁজে দরকার কি? তুমি মেয়েমানুষ—বাইরের সব কথায় থেকো না, বলচি!

নির্ম্মলের ব্যাপার লইয়া সেদিন ভড়মশায় আড়তেও গদাধরকে দু'একটা কথা বলিয়াছিল।

গদাধর জেদী লোক—যাহাকে লইয়া ঘরে-বাহিরে তাঁর উৎপীড়ন, তাহাকে তিনি কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না—করিবেনও না। আসলে নির্ম্মল মুখুয্যে এ-গ্রামের ৺হরি গাঙ্গুলির জামাই। শ্বশুরকুল নির্ম্মূল হওয়াতে বর্ত্তমানে শ্বশুরের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখল করিতেছে। লোকটি সর্ব্বদাই অভাবগ্রস্ত, এ-কথাও ঠিক—কারণ, আয়ের অনুপাতে তাহার ব্যয় বেশি।

নির্ম্মল মুখুয্যে আসিয়া বাহির হইতে হাঁকিল—গদাধর, আছো না কি হে! আসবো?

গদাধর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অনঙ্গ বলিল—উত্তর দাও তো দেখিয়ে দেবো মজা!

গদাধর হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—তোমার সব তাতেই ভয়! জবাব দিলে আমাকে খেয়ে ফেলবে না তো!

দৃঢ় চাপা-কণ্ঠে অনঙ্গ বলিল—না।

—ভদ্রলোকের ছেলে বাড়ীতে এসেছে…

—আসুক।

ইহাদের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল মুখুয্যে একেবারে ঘরের দোরের কাছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

—কি গো বৌ-ঠাকরুণ, আমাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে যে—রাগ করলে না কি গরীবদের ওপর?

অনঙ্গ নির্ম্মলের কথার ভাবে হাসিয়া বলিল—কেন, রাগ করবো কেন?

—কাজ দেখেই লোক লোকের বিচার করে—তোমার কাজ দেখেই বলচি।

—না, রাগ করি নি।

—শুনে মনটা জুড়ুলো।

—থাক্, আর ঠাট্টায় কাজ নেই!

—এটা ঠাট্টা হলো বৌ-ঠাকরুণ? যাক্, এখন কি খাওয়াবে খাওয়াও তো সন্দেবেলা…

—সন্দেবেলা মানে, রাত্তিরে!

—রাত এক বলে না। এর নাম—সন্দে।

—কি আর খাওয়াবো? ঘরে কি-বা আছে! আচ্ছা বসুন, দেখি।

গদাধর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন! দু'জনের মধ্যে একটা মিটমাট হইতে দেখিয়া

নির্মলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি মনে ক'রে, এখন বলো ? তোমার সঙ্গে অনেক কাল দেখা নেই।

—ব্যস্ত ছিলাম ভাই, আমাদের খেটে খেতে হয়।

—আমাদেরও উঠোনে পয়সা ছড়ানো থাকে না—খুঁজে নিতে হয়।

—আমাদের যে খুঁজলেও মেলে না, সেই হয়েচে মুসকিল !

—সন্ধেবেলাটা বড় কাজ প'ড়ে গিয়েচে আজকাল, নইলে তোমার ওদিকে যেতাম।

—আমারও তাই। নইলে আগেতো প্রায়ই আসতাম।

—ভাখো ভাই নির্মল, একটা কথা তোমায় বলি। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে তোমার তো লোক আছে—আমায় কিছু কাজ পাইয়ে দাও না ?

—নিজের কাজ ফেলে আবার পরের কাজ করতে যাবে কেন ? তাছাড়া ওতে বড় ঝঞ্ঝাট।

—ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে আর কি—টাকা রোজগার নিয়ে বিষয়। ওতে আমার অসুবিধে হবে না। তুমি চেষ্টা করো না ?

নির্মল কিছু ভাবিয়া বলিল—কিছু টাকা গোড়ায় ছাড়তে পারবে ?

—কি রকম ?

—তোমার কাছে আর ঢাকাঢাকি কি ? কিছু টাকা পান খাওয়াতে হবে, এই···বোঝো তো সব।

—কত ?

—সে তোমায় বলবো। আন্দাজ, শ' পাঁচেক—কিছু বেশীও হতে পারে।

গদাধর সাগ্রহে বলিলেন—তুমি ভাখো ভাই নির্মল। এ-টাকা আমি দেবো—তবে আমার আবার পুষিয়ে যাওয়া চাই তো! .বুঝলে না, ঘর থেকে তো আর দেবো না !

—আমি সব বুঝি। সে হয়ে যাবে। যেমন দান, তেমনি দক্ষিণে।

—কবে আমায় জানাবে ? ওরা কিন্তু টেণ্ডার কল্ করেচে—পনেরোই তারিখের পরে আর টেণ্ডার নেবে না।

—তাহলে কাল আমি একবার যাই—গিয়ে দেখে আসি। কি বলো ?

—বেশ ভাই, তাই যাও। যাতে হয় বুঝলে তো ? তোমাকে আর বেশি কি বলবো ?

এই সময় অনঙ্গমোহিনী ছু'খানি রেকাবিতে লুচি, আলুভাজা ও হালুয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া ছু'জনের সামনে রেকাবি ছুটি রাখিল।

নির্মল হাসিমুখে বলিল—এই তো ! এতেই তো আমি বৌ-ঠাকরুণকে বলি—চোখ পালটাতে নাপালটাতে এত খাবার তৈরী হয়ে গেল !···তা,এত লুচি কেন আমার রেকাবিতে।

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—খান, ও ক'খানা আপনি পারবেন এখন খেতে। চা খাবেন তো?

—তা এক পেয়ালা হলে মন্দ হয় না।

স্বামীর দিকে চাহিয়া অনঙ্গ বলিল—তোমার কিন্তু ছু' পেয়ালা হয়ে গিয়েচে। তোমাকে আর দেবো না।

গদাধর বিমর্ষ ভাবে বলিলেন—তা যা হয় করো। তবে না হয় আধ পেয়ালা দিও।
—কিছু না—সিকি পেয়ালাও না। রাত্রে তারপর ঘুম হবে না—মনে নেই?
অনঙ্গ মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মল বলিল—টাকাটার তাহলে যোগাড় ক'রে রেখো।

—শ'-পাঁচেক তো? ও আর কি যোগাড় করবো, গদির ক্যাশ থেকে নিলেই হবে।

—নিজনামে হাওলাত লিখে।

—তাহলে কাল একবার যাই, কি বলো?

—হ্যাঁ যাবে বই কি—নিশ্চয় যাবে।

অনঙ্গ চা লইয়া আসিল। গদাধরের জন্য আনে নাই, শুধু নির্ম্মলের জন্য। গদাধর জানেন তাঁহার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খুঁটিনাটি লইয়া স্ত্রী বড়ই নির্ম্মম—এখানে হাজার চাহিলেও চা মিলিবে না। সুতরাং তিনি এ-বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। নির্ম্মল বলিল—চলো বৌ-ঠাকরুণ, একদিন সবাই মিলে আড়ংঘাটায় 'যুগলকিশোর' দেখে আসি।

—বেশ তো, চলুন না।

গদাধর বলিলেন—সে এখন কেন? জষ্টি মাসে দেখতে হয় তো।—

যুগল দেখিলে জ্যৈষ্ঠ মাসে
পতিসহ থাকে স্বর্গবাসে।

স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—অতএব তোমার যদি আমার সঙ্গে স্বর্গবাসে মন থাকে, তাহলে—

অনঙ্গ সলজ্জ মুখে বলিল—যাও, সব-তাতেই তোমার ইয়ে! আমরা এখুনি যাবো—চলো না। পরে আবার জষ্টি মাসে গেলেই হবে। আমি কখনো দেখিনি—জষ্টি মাস পর্য্যন্ত বাঁচি কি মরি!

নির্ম্মল বলিল ও আবার কি অলুক্ষুণে কথা! মরবেন কেন ছাই! বালাই···ষাট্···

অনঙ্গ হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল।

নির্ম্মল বলিল—আমিও ভাই এবার চলি, কাজ আছে, একবার শিবুর মায়ের কাছে যাবো। বুড়ী আজ ক'দিন ধ'রে রোজ ডেকে পাঠাচ্চে, তার ছেলের সন্ধান ক'রে দিতে হবে। দেখি গিয়ে।

—ভালো কথা, তার আর কোনো সন্ধান পাও নি?

—সন্ধান আর কি পাবো? কলকাতাতেই আছে, চাকরি খুঁজতে গিয়েচে। দুদিন পরে এসে হাজির হবে। এক্ষেত্রে যা হয়। মামার তাড়ায় আর বকুনিতে দেশ ছেড়ে পালিয়েচে। যেমন মামা, তেমনি মামি।—এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্!

—মাঝে প'ড়ে শিবুর মা'র হয়েচে বিষম দায়। ভাইয়ের বাড়ী প'ড়ে থাকে, সহায় সম্পত্তি নেই—এই বয়সে যায়ই বা কোথায়? তার ওপর ছেলেটির ওই ব্যাপার!

—আচ্ছা, তাহলে আসি ভাই!

—দাঁড়াও, দাঁড়াও।

দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া গদাধর নির্ম্মলের হাতে তিনটি টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

—এ আবার কেন, এ আবার কেন? বলিতে বলিতে নির্মল টাকা ক'টি ট্যাঁকে গুঁজিয়া চলিয়া গেল—গায়ে সে জামা দিয়া আসে নাই—মাত্র গেঞ্জি গায়ে আসিয়াছিল।

গদাধর বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেখিলেন, অনঙ্গ তখনও বসিয়া বসিয়া একরাশ লুচি ভাজিতেছে। একটু বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—এ কি গো, এত লুচির ঘটা কেন আজ বলো তো?

—কেন আর, আমি খাবো। আমার খেতে নেই? এ সংসারে শুধু খেটেই মরবো, ভালো মন্দ খাবো না?

—না, আজ এত কেন—তাই বলচি।

অনঙ্গ টানিয়া-টানিয়া বলিল—তুমি খাবে, আমি খাবো, ভড়-মশায় খাবেন,—সবাইকে যে নেমন্তন্ন করেচি আজ, জানো না?

বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমুখে চাহিতেই গদাধর বুঝিলেন, স্ত্রীর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। স্ত্রীর এই বিশেষ ভঙ্গিটি তিনি আজ তেরো বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছেন—কৌতুক করিয়া মিথ্যা বলিবার পরে ভঙ্গিটি করিয়াই অনঙ্গ নিজের মিথ্যা নিজে ধরাইয়া আসিতেছে চিরকাল—অথচ খুব সম্ভব সে নিজে তাহা বুঝিতে পারে না।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ভালোই তো। আমি কি বারণ করেচি?

—না গো না। আজ শিবুর মাকে রাত্রে এখানে খেতে বলেচি। আহা, বুড়ীর বড় কষ্ট! ছেলেটা অম্নি হলো, ভাই-বউয়ের যা মুখ-ঝংকার! ক্ষুরে নমস্কার, বাবা! বুড়ীকে দাঁতে পিষতে শুধু বাকি রেখেচে! না দেয় দুটো ভালো ক'রে খেতে, না দেয় পরনে এক-খানা ভালো কাপড়—কি ক'রে যে মানুষ অমন পারে!

—তা বেশ, ভালো, ভালো। খাওয়াও না। আমায় আগে বললে না কেন? এক-দিনের জন্যে যখন খাওয়াবে, তখন একটু ভালো করেই খাওয়াতে হয়। রাধানগর থেকে সন্দেশ মিষ্টি আনিয়ে দিতাম—হলো-বা একটু দই···

—দই ঘরে পেতেচি। খাসা দই হয়েছে। খেও একটু—পাতে দেবো এখন। মিষ্টি তো পেলাম না—নারকোলের সঙ্গে ক্ষীর মিশিয়ে সন্দেশ করবো, ভাবচি।

—এখনও করবে, ভাবচো? কত রাত্রে বুড়ীকে খেতে দেবে?

—সব তো হয়ে গেল। লুচি ক'খানা ভাজা হয়ে গেলেই নারকোল কুরে বেটে সন্দেশ চড়িয়ে দেবো। ক্ষীর করে রেখেচি—ওগো, আমায় একটু কপ্‌পুর আনিয়ে দাও না!

—এখন কি কপ্‌পুর পাওয়া যাবে? আগে থেকে সব বলো না কেন? এ কি কলকাতা শহর? রাধানগর ভিন্ন জিনিস মেলে? দেখি, বিশুর দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েচে কিনা। যদি পাওয়া যায়, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গদাধরের পৈতৃক-আমলের ছোট একখানি তালুক ছিল। সেখানে ইহাদের একটি কাছারিঘর ও বহুকালের পুরানো গোমস্তা বিদ্যমান।

বেশ শীত পড়িয়াছে—একদিন গদাধর স্ত্রীকে একখানা চিঠি দেখাইয়া বলিলেন—ওগো, আজ সকাল-সকাল রান্না করে ফেল তো—আমপাড়া-ঢবঢবির গোমস্তা পত্র লিখেচে। কিছু আদায়-তশিল দেখে আসি।

অনঙ্গ পছন্দ করে না, স্বামী কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকে। কথা শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কতদিন থাকবে?

—তা ধরো যে ক'দিন লাগে। দিন-ছ'সাত হবে বোধ হচ্চে।

—এত দিন তো কোনোকালে থাকো না। আমপাড়া-ঢবঢবি শুনেচি অতি অজ-পাড়াগাঁ। খাবে-দাবে কি? থাকবে কোথায়?

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—সে ভাবনা তোমার চেয়ে আমার কম নয়, কারণ আমি সেখানে থাকবো। আমাদের সেখানে কাছাড়িবাড়ী আছে, ভাবনা কি? গাঙ্গুলিমশাই বহুকালের গোমস্তা। সব ঠিক ক'রে রাখবেন।

অনঙ্গ চিন্তিত মুখে বলিল—এই সেদিন অমন সর্দ্দি-কাশি গেল, এখনো তেমন সেরে ওঠো নি। ভারি তোমাদের কাছারিঘর! টিনের বেড়া, খড়ের ছাউনি। গল্‌গল্‌ করে হিম আসে। কি ক'রে কাটাবে, তাই ভাবচি। এখন না গেলেই নয়?

—কি ক'রে না গিয়ে পারা যায়? পৌষ-কিস্তির সময় এসে পড়লো, যেতেই হবে।

—আজই কেন? কাল যেও।

—যখন যেতেই হবে, তখন আজ আর কাল ক'রে কি লাভ? বরং যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়···

—আমায় নিয়ে চলো।

গদাধর বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—তোমাকে! ঢবঢবির কাছারি-বাড়িতে? সে জায়গা কেমন তুমি জানো না, তাই বলচো। পুরুষমানুষে থাকতে পারে—মেয়েমানুষ থাকবে কোথায়? একখানা মোটে ঘর। সে হয় কি ক'রে।

—অতদিন লাগিও না, দু'তিন দিনের মধ্যে এসো তবে।

—কাজ শেষ হ'লে আমি কি সেখানে ব'সে থাকবো? চলে আসবো।

গদাধর বেলা দুইটার পরে গরুরগাড়ী যোগে আমপাড়া রওনা হইলেন। ছ'সাত ক্রোশ পথ—মাঠ ও বিলের ধার দিয়া রাস্তা—ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার দিকে বেশ শীত করিতে লাগিল।

গদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—সামনে তো কাপাসডাঙ্গা, তারপর নদী পেরুবি কি ক'রে? জল কত?

—জল নেই। হেঁটে পার হওয়া যায়।

নদীর ধারে ছোট্ট দোকান। অনঙ্গ পাঁচ ছ'দিনের মত চাল, ডাল, মশলা, তেল, ঘি কিছুই দিতে বাকী রাখে নাই—তবু ও গদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—দেখ্‌তো, সোনা-

মুগের ডাল আছে কি না দোকানে?

জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া গাড়োয়ান জানাইল, ডাল নাই।

—তবে দেখ্, ভালো তামাক আছে?

জানা গেল, তামাক আছে—তবে চাষী লোকের উপযুক্ত। ভদ্রলোক সে তামাক খাইতে পারিবে না।

গদাধর বিরক্ত-মুখে বলিলেন—পার হ দেখি—সাবধানে গাড়ী নামা নদীতে। আমি কি নেমে যাবো?

—নামবেন কেন বাবু? গাড়ীতে ব'সে থাকুন। ভয় নেই।

গাড়ী পার হইয়া ওপারে গেল। লম্বা শিশু-গাছের সারি···তলা দিয়া রাস্তা।

অন্ধকার নামিয়া আসিল। গদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—হুঁশিয়ার হয়ে চল্, এ পথ ভালো নয়।

গাড়োয়ান পিছন ফিরিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই আবার সামনের দিকে মুখ ফিরাইয়া গরুর লেজ মলিতে-মলিতে বলিল—কোন্ ভয়ডার কথা বলচেন বাবু? ভূতির, না মানুষির?

—ভূতটুত নয় রে বাপু। মানুষের ভয়ই বড় ভয়।

—কোনো ডর করবেন না বাবু—সে-সব এদানি আর নেই।

—তুই তো সব জানিস্! আর-বছর চত্তির মাসে এ-পথে রাধানগরের সাতকড়ি বসাককে খুন করে, মনে নেই?

গাড়োয়ান চুপ করিয়া রহিল। তাহাতে গদাধর যেন বেশি ভয় পাইলেন, বলিলেন—কি, কথা বলচিস্ নে যে বড়?

—কথাডা মনে পড়েচে, বাবু।

—তবে? হুঁশিয়ার হয়ে চল্।

—চলুন বাবু, যা কপালে থাকবার, হবে!

—বুঝলাম। নে, একটু তামাক সাজ দিকি। চকমকি আছে, সোলা আছে, নে···

সত্যই ঘোর অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। গদাধরের হাতে টাকাকড়ি নাই সত্য—কিন্তু সোনার আংটি আছে, বোতাম আছে—সামান্য দশ-বারো টাকা নগদও আছে। পল্লীগ্রামে লুটেরা-ডাকাতের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ইহার অপেক্ষা অনেক কম অর্থের জন্তও তাহারা মানুষ খুন করিয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে।

গাড়োয়ানটা কথা বলে না কেন? গদাধর বলিলেন—কি রে, জাল্লি?

—আজ্ঞে বাবু, সোলা ভিজে!

—তোর মুণ্ডু। দে, আমার কাছে দে দিকি।

গদাধরের আসল উদ্দেশ্য তামাক খাওয়া নয়, কথাবার্ত্তায় ও হাতের কাজ লইয়া ভয়ের চিন্তা ভুলিয়া অন্যমনস্ক থাকা। তামাক ধরাইয়া নিজে খাইয়া গাড়োয়ানকে কলিকা দিবার

সময় যেন তাঁহার মনে হইল রাস্তার পাশেই গাছের সারির মধ্যে সাদামত কি নড়িতেছে।

গাড়োয়ানকে ডাকিয়া চুপি-চুপি বলিলেন—কি রে গাছের পাশে?

গাড়োয়ান ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল—ও কিছু না বাবু। আপনি ভয় পাবেন না—এ-পথে গাড়ী চালিয়ে চালিয়ে বুড়ো হয়ে মরতি গ্যালাম, ভয়-ভীত কিছু নেই বাবু। শুয়ে পড়ুন ছইয়ের ভেতর।

কিন্তু গাড়োয়ানের কথায় গদাধরের ভয় গেল না। তিনি ছইয়ের ফাঁক দিয়া একবার এদিক, একবার ওদিক দেখিতে-দেখিতে দূর হইতে সোনামুড়ির ডোমপাড়ার আলো দেখিলেন। আর ভয় নাই, সোনামুড়িতে লোকজনের বাস আছে—মধ্যে একটা বড় মাঠ—তারপরই ঢবঢবির বিল চোখে পড়িবে।

সোনামুড়ি গ্রামে ঢুকিতেই দেখা গেল, তাঁহার কাছারির পিয়াদা মানিক শেখ লণ্ঠন হাতে আসিতেছে তাঁহাদের আগাইয়া লইতে।

মানিক সেলাম করিয়া বলিল—বাবু আসচেন?

—হ্যাঁ রে…গোমস্তামশায় কোথায়?

—কাছারিতে ব'সে আছেন। বাবুর খাওয়ার যোগাড় করতি পাঠালেন মোরে—দুধের বন্দোবস্ত করতি এয়েলাম ডোমপাড়ায়।

—চ গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে।

কাছারি পৌছিয়া গাড়ী রাখা হইল। গদাধর নামিয়া কাছারির মধ্যে ঢুকিতেই গোমস্তা গাঙ্গুলিমশায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—আসুন বাবু, আসুন! আপনার জন্যে সন্দে থেকে ব'সে আছি। এই আসেন, এই আসেন! বড্ড দেরি হয়ে গেল বাবুর। খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ক'রে রেখেচি।

—নমস্কার গাঙ্গুলিমশায়। ভালো আছেন?

—কল্যাণ হোক। বসুন। ওরে, বাবুর হাত-পা ধোয়ার জল এনে দে বাইরে।

গদাধর হাত-মুখ ধুইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া আদায়পত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন।

রাত বেশি হইল, নিকটেই ব্রাহ্মণপাড়ায় গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ী হইতে খাবার আসিল। আহারাদি সারিয়া শুইবার সময় গদাধর বলিলেন—রাত্রে এখানে মানিক শেখকে থাকতে বলুন গাঙ্গুলিমশায়। একা থাকা, মাঠের মধ্যে কাছারি…

গাঙ্গুলিমশায় হাসিয়া বলিলেন—কোনো ভয়-ভীত নেই এখানে। মানিকও থাকবে-এখন—আপনি নিশ্চিন্দি হয়ে শুয়ে পড়ুন।

গদাধর গৃহস্থ মানুষ। নিজের বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র শুইতে খুব বেশি অভ্যস্ত নহেন, তাঁহার কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। এ-ধরণের ঘরে মানুষ শুইতে পারে? টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়া হিম আসিতেছে দস্তুরমত। অনঙ্গ কাছে নাই। ছেলে-মেয়ের কথা মনে পড়িয়া বিশেষ করিয়া কষ্ট হইতে লাগিল! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এপাশ ওপাশ করিবার পরে গভীর রাত্রে তন্দ্রাবেশ হইল। শেষরাত্রে আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কোথায় শুইয়া আছেন?

ঢবঢবির কাছারিবাড়ীতে। কেমন একটু ভয়-ভয় হইল। ডাকিলেন—মানিক, ও মানিক···

মানিক সম্ভবতঃ গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সাড়া পাওয়া গেল না।

গদাধর আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ভোর হইলে গদাধর উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া কাছারিতে বসিলেন। প্রজাপত্র আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ একটা পাঁঠা, কেহ-বা গোটাকতক ডিম, কেহ বড় একটা লাউ প্রভৃতি আনিয়াছে জমিদারবাবুকে ভেট্ দিতে—নানাবিধ জিনিসপত্রে কাছারি-ঘর ভরিয়া গেল—তার মধ্যে তরি-তরকারিই বেশি। বেলা এগারোটার মধ্যে প্রায় সাতশত টাকা আদায় হইল।

গাঙ্গুলিমশায় বলিলেন—বাবু আপনি এসেছেন ব'লে এই আদায়টা হলো। নইলে এ টাকা আদায় হতে একমাস লাগতো। আপনাদের নামে যা হবে, আমার হাজার-বার তাগাদাতেও তা হবে না।

—আজ বাড়ী ফিরতে পারি তো?

—আরও ক'দিন থাকুন। হাজার-তিনেক টাকা এবার আদায় হয়ে যাবে। প্রজার অবস্থা এবার ভালো।

গদাধর প্রমাদ গণিলেন। একটা রাত যে-কষ্টে কাটাইয়াছেন প্রবাসে, আরও কয়েক রাত কাটাইতে হইলেই তো তিনি গিয়াছেন। এমন ঘরে বেশি দিন বাস করা যায়? বিশেষ এই শীতকালে? গদাধরের পিতাঠাকুর বৎসরে দু'বার করিয়া এখানে তাগাদায় আসিতেন—তিনি এই বছর-পাঁচেক পরলোকগত হইয়াছেন—ইহার মধ্যে গদাধর আসিয়াছেন বছর-দুই পূর্ব্বে একবার, আর একবার এই এখন। গোমস্তা পত্র লিখিয়া আসিতে পীড়াপীড়ি না করিলে তিনি বড়-একটা এখানে আসিতে চাহেন না। আরামে মানুষ হইয়াছেন, এমন ধরণের কষ্ট তাঁহার সহ্য হয় না!

আরও তিন দিন কাটাইয়া প্রায় দেড় হাজার টাকা আদায় হইল। গাঙ্গুলি-মশায় খুব খুশী। কাছারিতে একদিন ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন। মাতব্বর প্রজারা জমিদারের নিমন্ত্রণে কাছারিবাড়ী আসিয়া পাত পাড়িয়া খাইয়া গেল। গদাধর নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের খাওয়ানোর তদারক করিতে লাগিলেন।

সব মিটিয়া গেলে গদাধর গাঙ্গুলি-মশায়কে ডাকিয়া বলিলেন—তাহলে আমার যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন এবার।

—আজ হয় না বাবু, আজ রাত্রে আমার বাড়ী সত্যনারায়ণ পূজো—আপনাকে একবার সেখানে যেতে হবে।

—বেশ, তবে কাল সকালেই গাড়ীর ব্যবস্থা রাখবেন।

—কাল আপনি যাবেন, সঙ্গে আমিও যাবো। অতগুলো টাকা নিয়ে আপনাকে একলা যেতে দেবো না, বাবু।

সন্ধ্যার পরে গাঙ্গুলি-মশায়ের বাড়ী বেশ-সমারোহের সহিত সত্যনারায়ণের পূজা হইল।

গ্রামের সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ শেষ করিয়া গাঙ্গুলি-মশায় উঠানে গ্রাম্য তর্জ্জা-দলের আসর পাতিয়া দিলেন। ঘুমে চোখ ভাঙিয়া আসা সত্ত্বেও গদাধরকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত বসিয়া তর্জ্জা শুনিতে হইল—পাঁচ টাকা বকশিশও করিতে হইল—জমিদারী চাল বজায় রাখিতে।

সকালে রওনা হইয়া গদাধর বেলা দশটার মধ্যে বাড়ী পৌছিয়া গেলেন। পাঁচ দিন মাত্র বাহিরে ছিলেন—যেন কতকাল বাড়ী ছাড়িয়াছেন, যেন কতকাল দেখেন নাই স্ত্রী-পুত্রকে। ছোট ছেলে টিপুকে দেখিয়া কাছে বসাইয়া আদর করিয়া তবে মনে হইল, নিজের বাড়ীতেই আসিয়াছেন বটে—কতকাল পরে যেন।

অনঙ্গ আসিয়া বলিল—এতদিন থাকতে হবে ব'লে গেলে না তো! ভালো ছিলে? আমি কাল-পরশু কেবল ঘর-বার করেচি,—এই তুমি আসছো···এই তুমি আসচো! তা, একটা খবরও তো দিতে হয়!

দুজনে কেহ কখনও কাহাকে ফেলিয়া দীর্ঘদিন থাকে নাই, থাকিতে অভ্যস্ত নয়—নিতান্ত ঘরকোণা গৃহস্থ বলিয়া—পাঁচ দিনের অদর্শন ইহাদের পরস্পরের পক্ষে পাঁচ মাসের সমান!

অনঙ্গ এই পাঁচ দিনের সমস্ত খুঁটিনাটি খবর জিজ্ঞাসা করিতে বসিল। সেখানে কি-রকম খাওয়া-দাওয়া, কে রাঁধিল, থাকার জায়গায় সুবিধা কেমন—ইত্যাদি। গদাধরও সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন এই পাঁচ দিনের ব্যাপার—যেন তিনি কাশ্মীর ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া ফিরিলেন!

অনঙ্গ বলিল—ক'দিন ভালো খাওয়া-দাওয়া হয় নি, আজ কি খাবে, বলো?

—যা হয় হবে, আগে একটু চা।

—এত বেলায়? সেখান থেকে চা খেয়ে বেরোও নি—গা ছুঁয়ে বলো তো!

—ওই অমনি এক পেয়ালা।

—এখন আর চা খায় না।

—ওই তোমার দোষ। গরুর গাড়ীতে এলাম শরীর ব্যথা ক'রে,—একটু গরম চা না হোলে···

—আচ্ছা, তবে আধ-পেয়ালা দেবো, তার বেশি কক্ষনো পাবে না।

গদাধর এ-কথা বলিলেন না যে, গত পাঁচ-দিন কাছারি বাড়ীতে মনের সাধ মিটাইয়া এবেলা চার পেয়ালা, ওবেলা চার পেয়ালা প্রতিদিন চালাইয়াছেন! আজও সকালে আসিবার আগে দুটি পেয়ালা উজাড় করিয়া তবে গাড়িতে উঠিয়াছিলেন।

অনঙ্গ চা আনিয়া দিয়া বলিল—নির্ম্মল তোমায় খুঁজে-খুঁজে হয়রান্।

—কেন?

—তা আমায় বলে নি, রোজ এসে বলে—বৌদি, আজ এ খাওয়াও, বৌদি, আজ ও খাওয়াও—বিরক্ত করেচে!

—তাতে কি হয়েছে! বন্ধুলোক—খাবে না? আদর ক'রে কেউ খেতে চাইলে…

—সে আমি জানি গো, জানি। তোমার বন্ধু খেতে পায় নি, তা নয়। আমি তেমন বাপের মেয়ে নই। খেতে চেয়ে কেউ পায় না, এমন কখনো হয় নি আমার কাছে।

—সে কথা যাক্। এখন আমাকে কি খেতে দেবে, বলো?

—অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—এখন বলবো না, খেতে ব'সে দেখবে!

—কি, শুনি না?

—পিঠে-পুলি, পায়েস।

—খুবভালো—সেখানেব'সে-ব'সে ভাবতাম,শীতকালে, একদিনপিঠে মুখেওঠেনি এখনও।

—যত খুশী খেও-এখন।

স্ত্রীর সেবা-যত্নের হাত ভালো। অনঙ্গ কাছে বসিয়া স্বামীকে যত্ন করিয়া খাওয়াইল—পান সাজিয়া ডিবায় আনিয়া বিছানার পাশে রাখিয়া বলিল—ঘুমোও একটু। গাড়ীতে আসতে বড্ড কষ্ট হয়েচে, না?

গদাধর আদর বাড়াইবার জন্য বলিলেন—পিঠটায় যা ব্যথা হয়েচে—একেবারে শিরদাঁড়ায়। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে…

অনঙ্গ ব্যস্ত হয়ে বলিল—এতক্ষণ বলো নি? দাঁড়াও, তেল গরম করে আনি।

—এখন থাক্। ঘুমিয়ে উঠি, তারপর।

—আমি যাই, মশারি ফেলে দিয়ে আসি। মাছি লাগবে।

গদাধরের ঘুম ভাঙিল বৈকালের দিকে। সত্যই গায়ে ব্যথা হইয়াছে বটে, তিনি যে স্ত্রী-কে নিতান্ত মিথ্যা বলিয়াছেন—এখন দেখা যাইতেছে, তাহা নয়। সেদিন সন্ধ্যার দিকে গদাধরের জ্বর আসিল। রাত্রে কিছু খাইলেন না—অনঙ্গ ডাক্তার ডাকাইল। কুইনাইনের ব্যবস্থা হইল। কারণ, ডাক্তারের মতে এটা খাঁটি ম্যালেরিয়া-জ্বর ছাড়া আর কিছু নয়!

পরদিন সকালে নির্ম্মল দেখা করিতে আসিল। অনঙ্গ তখন সেখানে ছিল না, গদাধর বলিলেন—ওদিকে কিছু হলো?

—এবার কিছু টাকা ছাড়ো…হয়েছে একরকম।

—কত—

—তা আমি অনেক কষ্টে শ'পাঁচেক দাঁড় করিয়েছি।

—কাজ কেমন পাওয়া যাবে? টেণ্ডার পাঠিয়ে দিয়েচি।

—হাজার পাঁচ-ছয় টাকার কাজ হবে, মনে হচ্ছে!

—তাহ'লে একরকম পোষাতে পারে। তবে একটা কথা, তোমার বৌদিদি যেন না টের পায়!

নির্ম্মল ধূর্ত্তের হাসি হাসিয়া বলিল—আমি এত কাঁচা ছেলে, তুমি ভেব না। কাক-পক্ষীতে জানতে পারবে না।

—কাল বিকেলের দিকে এসো। টাকা যোগাড় ক'রে রেখে দেবো।

দুই

মাসখানেক কাটিয়া গেল।

একদিন গদিতে গদাধর উপস্থিত আছেন, ভড়মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজ তো সব বিলি হয়ে গেল বাবু, আজ আমার শালার কাছে খবর পেয়েচি। আপনার কিছু হয়েচে ?

—হয়েচে, তবে খুব বেশি নয়। হাজার-দুই টাকার কাজ পাওয়া গিয়েচে।

—যাহয় তবু কিছু আসবে-এখন।

গদাধর অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—তা তো বটেই।

ইতিপূর্ব্বেই তিনি মনে-মনে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন—এ-কাজে তাঁহার বিশেষ কোনো লাভ হইবে না। পাঁচশত টাকা ঘুষ দিয়াও নির্ম্মল ইহার বেশি কাজ যোগাড় করিতে পারে নাই—সে যত বলিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক কাজও পাওয়া যায় নাই।

নির্ম্মল নিজেও সেজন্য খুব লজ্জিত। কথাটা অবশ্য গদাধর কাহাকেও বলেন নাই—নির্ম্মল বন্ধুলোক, সে যদি চেষ্টা করিয়াও কাজ না পাইয়া থাকে তবে তাহার আর দোষ কি ?

কিন্তু চতুর ভড়মহাশয় একদিন কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবু, একটা কথা বলবো,ভাবচি। যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি, বলুন ?

—নির্ম্মলবাবুকে কি কিছু টাকা দিয়েছিলেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজের জন্যে ?

—না, কে বললে ?

—আমি এমনি জিগ্যেস্ করচি বাবু। তা'হলে কথাটা সত্যি নয় ? যাক্, তবে আর ও-কথার দরকার নেই।

গদাধর চাহেন না, ইহা লইয়া নির্ম্মলকে কেহ কিছু বলে। এ কথা শুনিলে অনেকে অনেক রকম কথা বলিবে, তিনি জানেন—সুতরাং এ-বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। ভড়মহাশয়ও নিজের হিসাবের খাতায় মনোনিবেশ করিলেন।

গদাধর অভাবগ্রস্ত লোক হইলে হয়তো এ-সব কথায় তাঁহার খট্‌কা লাগিত। কিন্তু ঈশ্বর-ইচ্ছায় এই পল্লীগ্রামে বসিয়া তাঁহার মাসে চার-পাঁচশো টাকা আয়। পল্লীগ্রামের পক্ষে এ-আয় কম নয়। সংসারে খরচও এমন কিছু বেশি নয়—কিছু দান-ধ্যানও আছে। টাকার যে মূল্য অপরে দিয়া থাকে, গদাধরের কাছে টাকার হয়তো তত মূল্য নাই !

অনঙ্গ একদিন বলিল—আচ্ছা, এবার আমাদের বাসন্তীপূজাটা করলে হয় না ?

—গদাধর বলিলেন—তোমার ইচ্ছা হয় তো করি।

—আমার কেন ? তোমার ইচ্ছে নেই ?

—পূজা-আচ্ছা বিষয়ে তুমি যা বলো। আমি একটু অন্যরকম, জানোই তো।

—পুজো হোক্‌, আর কাঙালী-ভোজন করানো যাক্‌, কি বলো?

—তাতে আমার অমত নেই।

—ভালো কারিগর এনে ঠাকুর গড়াও···কেষ্টনগরের কারিগর আনালে কেমন হয়?

—তুমি যা বলো! বলেচি তো, ও-বিষয়ে আমি কোনো কথা বলবো না।

গদাধর জানেন, স্ত্রীর ঝোঁক আছে এদিকে। লোককে খাওয়াইতে-মাখাইতে সে ভালোবাসে। এ-পর্যন্ত তাঁহাদের বাড়ী অতিথি আসিয়া ফেরে নাই—যত বেলাতেই আসুক না কেন, অনঙ্গ অনেক সময় মুখের ভাত অতিথিকে খাওয়াইয়া, মুড়ি খাইয়া একবেলা কাটাইয়াছে। কারণ অত বেলায় কে আবার রান্নার হাঙ্গামা করে? এ-সব বিষয়ে গদাধর কোন কথা বলিতেন না। স্ত্রী যা করে, করুক।

অনেকদিন আগের কথা।

অনঙ্গ তখন ছেলেমানুষ—সবে নববধূ-রূপে এ-বাড়ীতে পা দিয়াছে। একদিন কোথা হইতে দুটি ভিক্ষুক আসিয়া অন্ন প্রার্থনা করিল। বেলা তখন দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গদাধরের মা বলিয়া পাঠাইলেন, এমন অসময়ে এখানে কিছু হইবে না।

অনঙ্গ শাশুড়ীকে বলিল—মা, একটা কথা বলবো?

—কি বৌমা?

—আমার ভাত এখনও রয়েচে। মাথাটা বড্ড ধরেচে, আমি আর এবেলা খাবো না, ভাবচি। ওই ভাত ওদেরকেই দিয়ে দিন না?

বধূর এ-কথায় শাশুড়ী কিন্তু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন,—ও আবার কি কথা বৌমা? মুখের ভাত ধ'রে দিতে হবে কোন্ জগন্নাথ-ক্ষেত্তরের পাণ্ডা আমার এসেচেন! রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে। এবেলা না খাও, ওবেলা খাবে, ঢেকে রাখো, মিটে গেল।

কিন্তু অনঙ্গ পুনরায় বিনীতভাবে বলিল—তা হোক না, আপনার পায়ে পড়ি। ওদের দিয়ে দিই। আমার খিদে নেই—সত্যি।

শাশুড়ী অগত্যা বধূর কথামত কার্য্য করিলেন।

গদাধর অনঙ্গকে এ-সব বিষয়ে কখনো বাধা দেন নাই, তবে অতিরিক্ত উৎসাহও কখনো দেন নাই—তাহাও ঠিক। নিজে তিনি ব্যবসায়ী লোক, অর্থাগম ছাড়া অন্য-কিছু বড় বোঝেন না—আগে-আগে পড়াশুনার বাতিক ছিল, কারণ গদিয়ান ব্যবসাদার হইলেও তিনি গোয়াড়ি কলেজ হইতে আই. এ. পাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি টাকা উপার্জ্জনের নেশায় জীবনের অন্য সব বাতিক ধামা-চাপা পড়িয়াছে।

অনঙ্গ নিজেও বড়-ঘরের মেয়ে। তাহার পিতা নফরচন্দ্র মিত্র একসময়ে রাধানগর পরগণার মধ্যে বড় তালুকদার ছিলেন। ভূসিমালের ব্যবসা করিয়াও বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন—কিন্তু শেষের দিকে বড় ছেলেটি উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির হইয়া নানারকম বদখেয়ালে টাকা নষ্ট করিতে থাকে, বৃদ্ধও মনের দুঃখে শয্যাগত হইয়া পড়েন। ক্রমে একদিকের অঙ্গ

পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যায়। গত বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অনঙ্গ তাহার এই দাদাকে খুব ভালবাসিত। নানারকমে তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াও শেষ-পর্য্যন্ত কিছুই হইল না—তাই সে এখন মনের দুঃখে বাপের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। তাহার দাদাও ভগ্নীপতির গৃহে কালে-ভদ্রে পদার্পণ করে।

গদাধর বোঝেন ব্যবসা, পয়সা উড়াইবার মানুষ তিনি নহেন! কোনো প্রকার শৌখিনতাও নাই তাঁহার। এমন কি, হাতে পয়সা থাকা সত্ত্বেও বাড়ী-ঘর কেন সারাইতেছেন না—ইহা লইয়া ঘরে-পরে বিস্তর অনুযোগ সহ্য করিয়াও তিনি অটল। তাঁর নিজের মত এই যে, চলিয়া যখন যাইতেছে, তখন এই অজ পাড়াগাঁয়ে ঘর-বাড়ীর পিছনে কতকগুলা টাকা ব্যয় করিয়া লাভ নাই!

একদিন তাঁহার এক আত্মীয় কী কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ী-ঘর দেখিয়া বলিল—গদাধর, বাড়ী-ঘর এমন অবস্থায় রেখেচো কেন?

—কেন বলো তো?

—জানালা নেই—চট টাঙিয়ে রেখেচো, দেওয়াল প'ড়ে গিয়েচে, দরমার বেড়া—তোমার মত অবস্থার লোকে কি এরকম করে?

—তুমি কি বলো?

—ভালো ক'রে বাড়ী করো, পুজোর দালান দাও, বৈঠকখানা ভালো ক'রে করো—তবে তো জমিদারের বাড়ী মানাবে।

—হ্যাঃ, পাগল তুমি! কতকগুলো টাকা এখানে পুঁতে রাখি!

—তা, বাস করতে গেলে করতে হয় বইকি। এতে লোকে বলে কি?

—যা বলে বলুকগে। তুমিই ভেবে ছাখো না ভাই, এই বাজারে কতকগুলো টাকা খরচ ক'রে এখানে ওসব ধুমধামের কি দরকার আছে?

—এই বাড়ীতে চিরকাল বাস করবে? পৈতৃক-বাড়ী ভালো ক'রে তৈরি করো—দশ-জনের মধ্যে একজন হয়ে বাস করো।

—এখানে আর বড় বাড়ী ক'রে কি হবে? চলে তো যাচ্ছে। সে টাকা ব্যবসায়ে ফেললে কাজ দেবে। ইট গেড়ে টাকা খরচ করা আমার ইচ্ছে নয়।

তবে গদাধরের একটা শৌখিনতা আছে এক বিষয়ে। পায়রা পুষিতে তিনি খুব ভালো-বাসেন—ছাদে বাঁশ চিরিয়া পায়রার জায়গা করিয়া রাখিয়াছেন—নোটন পায়রা, ঝোটন পায়রা, তিলে খেড়ি, গিরেবাজ—শাদা, রাঙা, সবুজ সব রংয়ের পায়রার দিন রাত ডানার ঝাপট, উড়ন্ত পালকের রাশি ও অবিশ্রান্ত বক্‌বকম্ শব্দে গদাধরের ভাঙা অট্টালিকার কার্নিশ, থামের মাথা ও ছাদ জমাইয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার বিশ্বাস, পায়রা যেখানে, লক্ষ্মী সেখানে বাঁধা!

পায়রার শখে বছরে কিছু টাকা খরচ হইয়াও যায়। পায়রার প্রধান দালাল নির্ম্মল—সে কলিকাতা হইতে ভালো পায়রার সন্ধান মাঝে-মাঝে আনিয়া, টাকা লইয়া গিয়া কিনিয়া

আনে। অনঙ্গ এজন্য নির্ম্মলের উপর সন্তুষ্ট নয়। সে পায়রার কিছু বোঝে না, ভাবে, নির্ম্মল ফাঁকি দিয়া স্বামীর নিকট হইতে টাকা আদায় করে।

দুপুরের দিকে অনঙ্গ স্বামীর কাছে বসিয়া বলিল—তুমি আজকাল আমার সঙ্গে কথাও বলো না…

—কে বলেচে, বলিনে?

—দেখতেই পাচ্চি। কাছে বসলে বিরক্ত হও!

—ওটা বাজে কথা। আসল কথাটা বলো, কি? মতলবটা কি?

—আমাকে পঞ্চাশটি টাকা দাও।

—অনেকক্ষণ বুঝেছি, এইরকম একটা কিছু হবে।

—দেবে?

—কি হবে, শুনি?

—তা বলবো না।

গদাধর হাসিয়া স্ত্রীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন—তবে যদি আমিও বলি, দেবো না?

অনঙ্গ ডান হাতে ঘুষি পাকাইয়া তক্তপোশের উপর কিল মারিয়া বলিল—আলবৎ দিতেই হবে।

—কখন দরকার?

—আজই। এক জায়গায় পাঠাবো।

গদাধর বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—পাঠাবে? কোথায় পাঠাবে?

অনঙ্গ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও বিমর্ষভাবে বলিল…দাদার কাছে।

গদাধর আর কোনো কথা কহিলেন না। শুধু বলিলেন—আচ্ছা, গদিতে গিয়ে পাঠিয়ে দেবো-এখন।

তাঁহার এই বড় শালাটি মানুষ নয়, টাকা ওড়াইতে ওস্তাদ। বাপের অতবড় বিষয়টা নষ্ট করিয়া ফেলিল এই করিয়া। ছোট বোনের কাছে মাঝে মাঝে হয়তো অভাব জানায়—স্নেহময়ী অনঙ্গ মাঝে-মাঝে কিছু দেয় দাদাকে—ইহা লইয়া গদাধর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করিতে চান না।

কিন্তু একদিন এমন একটি ব্যাপার ঘটিল, যাহা গদাধর কখনো কল্পনা করেন নাই! বৈকালের দিকে ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি গদির দিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে একখানি গরুর গাড়ী তাঁহার বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া, পিছনে ফিরিয়া সেখানার দিকে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ী তাঁর বাড়ীর সামনে থামিল। দূর হইতে তিনি বেশ দেখিতে পাইলেন—একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিল—পুরুষটিকে তাঁহার বড় শালা বলিয়া বোধ হইল—কিন্তু স্ত্রীলোকটি কে? বড় শালা তো বিপত্নীক আজ বছর-দুই…ও-বয়সের

অন্য কোনো মেয়েও তো শ্বশুরবাড়ীতে নাই।

গদাধর একবার ভাবিলেন, বাড়ীতে গিয়া দেখিবেন নাকি? পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া গদির দিকে চলিলেন। দরকার নাই ওসব হাঙ্গামার মধ্যে এখন যাওয়ার। গদিতে গিয়াই লোক দিয়া পঞ্চাশটি টাকা স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

গদির কাজ শেষ হইতে এক রাত হইয়া গেল। গদাধর বাড়ী ফিরিবার পথে ভাবিলেন, যদি শালাটি বাড়িতে থাকে, তবে তো মুশকিল! বড় শালাটি তাঁহার মধ্যে মধ্যে আসে বটে, কিন্তু গদাধরের সঙ্গে তার তত সদ্ভাব নাই। থাকিলেও আতিথ্যের খাতিরে কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে—কিন্তু তিনি সেটা অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তার চেয়ে নির্ম্মলের বাড়ী বেড়াইয়া একটু রাত করিয়া ফেরা ভালো।

নির্ম্মল বলিল—কি ভাই, বড় ভাগ্যি যে আমার বাড়ী তুমি এসেছো!

—একটু দাবা খেলবে?

—খেলো। চা খাবে?

—নিশ্চয়ই। চা খাবো না কি-রকম?

নির্ম্মলের অবস্থা ভালো নয়। পাঁচিল-ঘেরা উঠানের তিনদিকে তিনখানি খড়ের ঘর, একখানি ছোট রান্নাঘর—পিছনদিকে পাতকুয়া ও গোয়াল। ঘরের আসবাবপত্রের অবস্থা হীন, তক্তপোশের উপর ময়লা কাঁথাপাতা বিছানা। এতখানি রাত হইয়া গিয়াছে অথচ এখনও বিছানা কেহ পাট করিয়া পাতে নাই—সকালবেলার দিকে যে লেপখানা উল্টাইয়া ফেলিয়া বিছানা ছাড়িয়া লোক উঠিয়া গিয়াছে—সেখানা এত রাত পর্য্যন্ত সেই একই অবস্থায় পড়িয়া। ইহাতে আরও মনে হয়, বাড়ীর মেয়েরা, বিশেষ গৃহকর্ত্রী অগোছালো।

গদাধরকে সেই তক্তপোশেরই একপাশে বসিতে হইল।

নির্ম্মল বলিল—ওহে, একটা কথা শুনেচো? মঙ্গলগঞ্জের কুঠী-বাড়ী বিক্রি হচ্ছে!

—কোথায় শুনলে!

—রাধানগর থেকে লোক গিয়েছিল আজ কোর্টের কাজে—সেখানে কার মুখে শুনেচে।

—বেচবে কে?

—মালিকের ছেলে স্বয়ং। কিনে রাখো না, বাড়ীখানা!

—হ্যাঃ! আমি অত বড় বাড়ী কিনে কি করবো। তার ওপর পুরানো বাড়ী। একবার ভাঙতে শুরু হ'লে, সারাতে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যাবে! লোক নেই, জন নেই—নির্জ্জন জায়গায় বাড়ী। ভূতের ভয়ে দিনমানেই গা ছম্‌ছম্ করবে।

—আরে, না না—নদীর ওপর অমন খোলা আলো-বাতাসওয়ালা চমৎকার জায়গা। কিনে রাখো। সস্তায় হবে। আমার লোক আছে।

—কি রকম?

—মালিকের ছেলের সঙ্গে আমার মামাতো-ভাই শচীনের খুব আলাপ। তাকে দিয়ে ধরতে পারি।

—কত টাকায় হতে পারে, মনে হয়?

—তা এখন কি ক'রে বলবো? তুমি যদি বলো, তবে জিগ্যেস্ করি।

এই সময় নির্ম্মলের স্ত্রী সুধা চা ও বাটিতে তেল-মাখা মুড়ি লইয়া আসিল। গদাধর বলিলেন —এই যে সুধা বৌঠাক্রুণ, আজকাল আমাদের বাড়ীর দিকে যাও-টাও না তো?

সুধা একসময়ে হয়তো দেখিতে মন্দ ছিল না—বর্ত্তমানে সংসারের অনটনে ও খাটা-খাটুনিতে, তার উপর বৎসরে-বৎসরে সন্তান প্রসবের ফলে যৌবনের লাবণ্য ঝরিয়া গিয়া দেহের গড়ন পাক্‌সিটে ও মুখশ্রী প্রৌঢ়ার মত দেখিতে হইয়াছে—যদিও সুধার বয়স এই ত্রিশ। সুধা হাসিয়া বলিল—কখন যাই বলুন? সংসারের কাজ নিয়ে সকাল থেকে সন্দে পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলতে পারিনে! শাশুড়ী মরে গিয়ে অবধি দেখবার লোক নেই আর কেউ। আপনার বন্ধুটি তো উঁকি মেরে দেখেন না, সংসারের কেউ বাঁচলো না মলো! এত রাত হয়ে গেল—এখনও রান্না-চড়াতে পারি নি, বিছানা গোছ করতে পারিনি! আপনি এই বিছানাতেই বসেচেন! আমার কেমন লজ্জা করচে।

—না, না, তাতে কি, বেশ আছি।

—মুড়ি এনেছি, কিন্তু আপনার জন্যে নয়—ওঁর জন্যে। আপনি কি তেলমাখা মুড়ি খাবেন?

—কেন খাবো না? আমি কি নবাব খান্‌জা খাঁ এলাম নাকি? বৌ-ঠাকরুণ দেখছি হাসালে!

—তা নয়, একদিন মুড়ি খাইয়ে শরীর খারাপ করিয়ে দিলে, অনঙ্গ-দি আমায় ব'কে রসাতল করবে!

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—দোহাই বৌ-ঠাকরুণ, তাকে আর যাই বলো বলবে—কিন্তু এই চা খাওয়ানোর কথাটা যেন কক্‌খনো তার কানে না যায়, দেখো। তাহ'লে তোমারও একদিন—আমারও একদিন!

আরো ঘণ্টাখানেক দাবা খেলিবার পরে গদাধর বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ীর চারিধারে বাঁশবনের অন্ধকারে ভালো পথ দেখা যায় না। বাড়ী ঢুকিবার পথে সেই গরুর গাড়ীখানা দেখিতে পাইলেন না।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলেন, অনঙ্গ বসিয়া-বসিয়া সেলাই করিতেছে—ঘরে কেহ নাই গদাধর বলিলেন—রান্না হয়ে গিয়েচে?

অনঙ্গ মুখ তুলিয়া বলিল—এসো। অত রাত?

—নির্ম্মলের বাড়ী দাবা খেলতে গিয়েছিলুম।

—হাত-মুখ ধোবার জল আছে বাইরে, দোরটা বন্ধ ক'রে দাও। বড্ড শীত।

গদাধর আড়চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার অনাহূত অতিথির চিহ্নও নাই কোনো দিকে! তবে কি চলিয়া গেল? কিংবা বোধহয় পাশের ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু বস্ত্র পরিবর্ত্তনের অছিলায় পাশের ঘরে গিয়া, সেখানেও কাহাকে দেখিলেন না।

অনঙ্গ ডাকিল—খাবে এসো।

গদাধর এ-সন্দ ও-সন্দ করিতে-করিতে খাইয়া গেলেন। নিজ হইতে তিনি কোনো কথা তুলিলেন না, বা অনঙ্গও কিছু বলিল না। আহারাদি শেষ করিয়া গদাধর শয্যায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ব্যাপারখানা কি? বড় শালা কাহাকে লইয়া বাড়ীতে আসিল…সে গেলই-বা কোথায়…তাহার আসিবার উদ্দেশ্যই-বা কি…অনঙ্গ কিছু বলে না কেন?

সে রাত্রি এমনি কাটিয়া গেল।

পরদিন গদাধর চা খাইতে বসিয়াছেন সকালে, অনঙ্গ সামনে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—ওগো, একটা কাজ ক'রে ফেলেচি—বকবে না, বলো?

—কি?

—আগে বলো, বকবে না?

—তা কখনো হয়? যদি মানুষ-খুন করে থাকো, তবে বকবো না কি-রকম?

—সে-সব নয়। কাল দাদা এসেছিল, তার একশো টাকার নাকি বড্ড দরকার! তোমাকে লুকিয়ে দিতে বলে। আমি তোমাকে লুকিয়ে কখনো কোনো কাজ করেচি কি? এ-টাকাটা আমি দিয়েছি কিন্তু।

—খুব অন্যায় কাজ করেচো। এ-টাকা সেই পঞ্চাশ টাকা বাদে?

—হ্যাঁ—না—হ্যাঁ, তা বাদেই!

গদাধর আশ্চর্য হইয়া গেলেন। পঞ্চাশ টাকা তিনি স্বেচ্ছায় দিয়ে গেলেন, ইহাই যথেষ্ট। আবার তাহা বাদে আরও একশো টাকা লোকটা ঠকাইয়া আদায় করিয়া লইয়া গেল! তিনি গরুরগাড়ী হইতে শালাকে নামিতে দেখিয়া তখনই ফিরিয়া আসিলে পারিতেন—তাহা হইলে এই একশো টাকা আক্কেল-সেলামি দিতে হইত না। বলিলেন—সে গুণ্ডাটা একা ছিল?

—ও আবার কি-ধরণের কথা দাদার ওপর? অমন বলতে নেই, ছিঃ! হাজার হোক, আমার দাদা, তোমার গুরুজন। আমাদের আছে, আত্মীয়-স্বজনের বিপদে-আপদে হাত পেতে যদি কেউ চায়, দিতে দোষ নেই। দাদার সম্বন্ধে অমন বলতে আছে? তার বুঝ সে বুঝবে—আমরা ছোট হতে যাই কেন?

গদাধর আরও রাগিয়া বলিলেন—টাকা আমার গুণ্ডাবদমাইশদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্যে হয় নি তো? কেন বলবো না, একশোবার বলবো। এ কেমন অত্যাচার, শুনি? আছে বলেই ভগ্নিপতির কাছ থেকে তার সিন্দুক ভেঙে টাকা নিয়ে যাবে?

—সিন্দুক ভেঙে তো নেয় নি—কেন মিছে চেঁচামেচি করচো!

—আমি এসব পছন্দ করি নে। সৎকাজে টাকা ব্যয় করতে পারা যায়—তা ব'লে এই সব জুয়োচোর আর গুণ্ডাকে…

—আবার ওই সব কথা দাদাকে? ছি, অমন বলতে নেই। টাকা গেল-গেল, তবু তো লোকের কাছে ছোট হলাম না।

—এ আবার কেমন বড় হওয়া ? তোমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিয়ে গেল টাকাটা ! আমি থাকলে…

—যাক্, আর কোনো খারাপ কথা মুখ দিয়ে বার কোরো না ! হাজার হোক, আমার দাদা… ।

—একা ছিল ?

—কেন ?

—বলো না ।

—সে কথা বললে আরও রাগ করবে । সঙ্গে কে একজন মাগী ছিল, আমি তাকে চিনিনে । আমার মনে হলো, ভালো নয় । আমি তাকে ঘরে-দোরে ঢুকতে দিই নি । অমন ধরণের মেয়েমানুষ দেখলে আমার গা ঘিন্-ঘিন্ করে । সে বাইরে এসেছিল । ভদ্রতার খাতিরে চা আর খাবার পাঠিয়ে দিলাম—বাইরে ব'সে খেলে ।

—কোত্থেকে তাকে জোটালে তোমার দাদা ?

—কি ক'রে জানবো ? তবে আমার মনে হলো, টাকাটা ওই মাগীকেই দিতে হবে দাদার । ভাবে তাই মনে হলো । দাদা দেনদার, মাগী পাওনাদার—দাদার মুখ দেখে মনে হলো, টাকা না দিলে তাকে অপমান হতে হবে ।

—ওসব ঢং অনেক দেখেচি ! ছি-ছি, আমার বাড়ীতে এই সব কাণ্ড ! আর তুমি কি না…

—লক্ষীটি, রাগ কোরো না । আমার কি দোষ, বলো ? আমি কি ওদের ডেকে আনতে গিয়েছি ? আমি তাই দেখে দাদাকে এখানে থাকতে খেতে পর্য্যন্ত অনুরোধ করি নি ! টাকা পেয়ে চ'লে গেল, আমি মুখে একবারও বলি নি যে, রাতটা থাকো ! আমার গা-কেমন করছিল, সত্যি বলচি, মাগীটাকে দেখে !

—যাক্, খুব হয়েচে । আর কোনোদিন যেন তোমার ওই দাদাটিকে…

—আচ্ছা সে হবে । তুমি কিন্তু কোনো খারাপ কথা মুখ দিয়ে বার কোরো না, পায়ে পড়ি । চুপ ক'রে থাকো ।

গদাধর আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন ।

এক সপ্তাহের মধ্যে মঙ্গলগঞ্জের কুঠী সম্বন্ধে নির্ম্মল কয়েকবার তাগাদা করাতে একদিন তিনি নৌকাযোগে কুঠীবাড়ী দেখিতে গেলেন— সঙ্গে রহিল নির্ম্মল । নৌকাপথে দুই ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা কুঠীবাড়ীর ঘাটে গিয়া পৌছিলেন । সে-কালের আমলের বড় নীলকুঠী—ঘাট হইতে উঠিয়া দু'ধারে ঝাউ গাছের সারি, মস্ত বাঁধানো চাতাল—বাঁ-ধারে সারি সারি আস্তাবল ও চাকর-বাকরদের ঘর । খুব বড়-বড় দরজা জানলা । ঘর-দোরের অন্ত নাই । ঘোড়দৌড়ের মাঠের মত সুবিস্তীর্ণ ছাদে উঠিলে অনেকদূর পর্য্যন্ত নদী, মাঠ, গ্রাম সব নজরে পড়ে ।

দেখিয়া-শুনিয়া গদাধর বলিলেন—জায়গা খুব চমৎকার বইকি ।

—দেখলে তো ?

—সে-বিষয় কোনা ভুল নেই যে, পাঁচ হাজারের পক্ষে বাড়ী খুব সস্তা।

—এর দরজা জানলা যা আছে, তারই দাম আজকালকার বাজারে দেড় হাজার টাকার ওপর—তা ছাড়া কড়ি বরগা, লোহার থাম, এসব ধ'রে···

—সবই বুঝলুম, কিন্তু এখানে কোনো গ্রাম নেই নিকটে, হাট নেই, বাজার নেই—এখানে বাস করবে কে ? এত ঘর-দোর যে, গোলকধাঁধার মত ঢুকলে সহজে বেরুনো যায় না—এখানে কি আমাদের মত ছোট গেরস্ত বাস করতে পারে ? দাসদাসী চাই, দারোয়ান-সইস চাই, চারিদিকে জমজমাট চাই, তবে এখানে বাস করা চলে। নীলকুঠীর সাহেবদের চলেছে—তা ব'লে কি আমার চলে, না, তোমার চলে ?

নির্ম্মল যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—তাহ'লে—নেবে না ?

—তুমিই বুঝে দেখ না। নিয়ে আমার সুবিধে নেই। ভাড়াও চলবে না এখানে।

—তবু একটা সম্পত্তি হয়ে থাকতো !

—নামেই সম্পত্তি। যে-সম্পত্তি থেকে কিছু আসবার সম্পর্ক নেই, সে আবার সম্পত্তি, রেখে দাও তুমি।

কুঠীবাড়ী হইতে ফিরিবার পথে নির্ম্মল এমন একটা কথা বলিল, যাহা গদাধরের খুব ভালো লাগিল। অনেক বাজে কথার মধ্যে নির্ম্মল এবার এই একটা কাজের কথা বলিয়াছে বটে !

গদাধরের কি একটা কথার উত্তরে নির্ম্মল বলিল—ব্যবসা তাহ'লে কলকাতায় উঠিয়ে নিয়ে চলো, সেখানে বাড়ী করো। ভাড়া হবে—থাকাও চলবে।

কোন্ সময়ে কি কথায় কি হয়, কিছু বলা যায় না। নির্ম্মল হয়তো কথাটা বিদ্রূপের ছলেই বলিল ; কিন্তু গদাধরের প্রাণে লাগিল কথাটা। গদাধর নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, মঙ্গলগঞ্জের কুঠীবাড়ী একগাদা টাকা দিয়া কিনিতে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার এ-কথা বোঝা উচিত ছিল যে, এখানে টাকা ঢালা আর টাকা জলে ফেলা সমান। কিন্তু, কলকাতায় অনায়াসেই বাড়ীও করা যায়···ব্যবসাও ফাঁদা যায়। এখানে এই ম্যালেরিয়া জ্বরে বারোমাস কষ্ট পাওয়া—একটা আমোদ নেই, দুটো কথা বলবার লোক নেই ··তার চেয়ে কলকাতায় যাওয়া ভালো। সেখানে ব্যবসা ফাঁদলে দু'পয়সা সত্যিকার রোজগার হয়।

নির্ম্মল বলিল—তাহ'লে কুঠীবাড়ী ছেড়ে দিলে তো ?

—হ্যাঁ, এ একেবারে নিশ্চয়।

সারাপথ নির্ম্মল ক্ষুণ্ণমনে ফিরিল।

বাড়ী ফিরিলে অনঙ্গ আগ্রহের সুরে বলিল—হ্যাঁ গো, হলো ? কি-রকম দেখলে কুঠীবাড়ী ?

—বাড়ী খুব ভালো। তবে সে কিনে কোনো লাভ নেই। মস্ত বাড়ী, কাছে লোক

নেই, জন নেই। আর সে অনেক ঘর-দোর, আমরা এই ক'টি প্রাণী সে-বাড়ীতে টিম্-টিম্ করবো—লোক-সশকর, চাকর-বাকর নিয়ে যদি সেখানে বাস করা যায়, তবেই থাকা চলে।

অনঙ্গ বলিল—সেখানে বাস করবার জন্যই ও বাড়ী কিনছিলে নাকি? তা কি ক'রে হয়? এখানে সব ছেড়ে কোথায় মঙ্গলগঞ্জে বাস করতে যাবো! এমন বুদ্ধি না হ'লে কি আর ব্যবসাদার? আমি ভেবেচি, কুঠীবাড়ী সস্তায় কিনে রাখবে! তা ভালোই হয়েচে, তোমার যখন মত হয় নি, দরকার নেই।

গদাধর ভাবিয়া-চিন্তিয়া কথা বলেন! হঠাৎ কোনো কাজ করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নয়। রাত্রে তিনি স্ত্রীকে কলিকাতায় যাওয়ার কথাটা বলিলেন।

অনঙ্গ বিস্ময়ের সুরে বলিল—কলকাতায় যাবে। এসব ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় সুবিধে হবে?

—কেন হবে না? ব্যবসা সেখানে ভালো জমবে।

—বাসও করবে সেখানে?

—এখানে বাড়ীসুদ্ধ ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরচি, বছরে তিনচার মাস সবাই ভুগে মরি। ছেলেদের লেখাপড়া শেখা, মানুষের মত মানুষ হবার সুবিধা, আমার মনে হয়, সেই ভালো। কাল আমি কলকাতায় ওদের আড়তে চিঠি লিখি, তারপর দু'এক দিনের মধ্যে নিজে গিয়ে একবার দেখে আসি।

—যা ভালো বোঝো, করো। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো?

—কি?

—এ গ্রামের বাস ছেড়ে আমাদের কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। বাপ-পিতেমোর আমলের বাস এখানে…

—বাপ-পিতেমোর ভিটে আঁকড়ে থাকলে চলবে না তো! সবদিকে সুবিধে দেখতে হবে। এখানে টাকা থাকলেও, খাটাবার সুবিধে নেই। ছেলেরা বড় হলে ওদের লেখাপড়া শেখানো—তাছাড়া অন্যরকম অসুবিধেও আছে। আমার মনে লেগেচে নির্ম্মলের কথাটা। সেই প্রথমে এ কথা তোলে।

—নির্ম্মল-ঠাকুরপোর সব কথা শুনো না—এ আমি তোমায় অনেকদিন ব'লে দিয়েচি। বড্ড ওর পরামর্শে তুমি চলো।

—কই আর শুনলুম, তা'হলে তো ওর কথায় কুঠীবাড়ীই কিনে ফেলতুম। মিথ্যে অপবাদ দিও না, বলচি।

অনঙ্গ হাসিয়া ফেলিল।

বছর কাটিয়া গিয়া বৈশাখ মাস পড়িল।

বছরের শেষে পাট ও তিসির দরুণ হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, প্রায় নিট্ দু'হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। ভড়মহাশয় হিসাব করিয়া মনিবকে লাভের অঙ্কটা বলিয়া দিলেন।

আড়তে একদিন কর্মচারীদের বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হইল।

অনঙ্গ বলিল—একদিন গ্রামের বিধবাদের ভালো ক'রে খাওয়ানো আমার ইচ্ছে—কি বলো ?

গদাধর খুশী হইয়া বলিলেন—ভালোই তো। দাও না খাইয়ে। কি-কি লাগবে, বলো ?

সে-কার্য্য বেশ সুচারুরূপেই নিষ্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ-বিধবা যাঁরা তাঁরা গদাধরের বাড়িতে খাইবেন না—অন্যত্র তাঁহাদের জন্য জিনিসপত্র দেওয়া হইল—তাঁহারা নিজেরা রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইবেন। বাকী সকলের জন্য অনঙ্গ নিজের বাড়ীতেই ব্যবস্থা করিল।

সেই রাত্রেই গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—সব ঠিক ক'রে ফেলি, বলো—তুমি কথা দাও।

অনঙ্গ বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি ঠিক করবে ? কি কথা ?

—এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে আড়ত খুলি। ছাখো, এবারকার লাভের অঙ্ক দেখে আমার মনে হচ্ছে, এই আমাদের ঠিক সময়! সামনে আমাদের ভালো দিন আসচে। পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে থাকলে ছোট হয়ে থাকতে হবে। কলকাতায় যেতেই হবে।

—আচ্ছা, এ পরামর্শ কে দিলে বলো তো সত্যি করে ?

—অবিশ্যি নির্ম্মল বলছিল, তাছাড়া আমারও ইচ্ছে।

—তুমি যা ভালো বোঝো করবে, এতে আমার বলবার কিছু নেই—কিন্তু গাঁ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে চ'লে যাবে, তাই বলছিলুম! এই ছাখো না কেন, আজ সব এ-পাড়ার ও-পাড়ার বিধবারা এখানে খেলেন, কি খুশীই সব হ'লেন খেয়ে! ধরো ওই মাস্তীর মা, খেতে পায় না—স্বামী গিয়ে পর্য্যন্ত দুর্দ্দশার একশেষ। তার পাতে গরম-গরম লুচি দিয়ে আমার যেন মনে হলো, এমন আনন্দ তুমি আমায় হাজার থিয়েটার যাত্রা দেখালেও পেতুম না! আহা, কি খুশী হলো খেয়ে! দেখে যেন চোখে জল আসে। এদের ছেড়ে যাবো—কোথায় যাবো, সেখানে গিয়ে কিভাবে থাকবো, তাই কেবল ভাবচি!

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—নতুন কাজ করতে গেলে, সাহস করতে হয় মনে, নইলে কি হয় ? এতে ভাবনার কিছু নেই। আমি একটা ছোট-খাটো বাড়ীর সন্ধান পেয়েছি, বায়না ক'রে ফেলি, তুমি কি বলো ?

—যা তোমার মনে হয়। যদি বোঝো, তাতে সুবিধে হবে, তাই করো।

পরদিন নির্ম্মলকে কলকাতায় গিয়া বাড়ী বায়না করানোর জন্য গদাধর পাঠাইয়া দিলেন এবং বৈশাখ মাসের শেষে এখান হইতে কলিকাতায় যাওয়ার সব ঠিকঠাক হইয়া গেল।

ভড়মহাশয় একদিন বলিলেন—বাবু, একটা কথা বলবো ?

—কি বলুন ?

—আমার এতদিনের চাকরিটা গেল ?

—কেন, গেল কি-রকম ?

—এখানে আড়ত রাখবেন না তো ?

—তা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু আপনি তো কলকাতায় যাবেন।

—ঐখানে আমায় মাপ করতে হবে বাবু। কলকাতায় গিয়ে আমি থাকতে পারবো না। অভ্যেসই নেই বাবু—মাঝে মাঝে আপনার কাজে বেলেঘাটা-আড়তে যাই—চ'লে আসতে পারলে যেন বাঁচি!

—কেন বলুন তো ভড়মশায়?

—ওখানে বড় শব্দ দিন-রাত। আমার জন্মে অভ্যেস নেই বাবু, অত শব্দের মধ্যে থাকা। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, ওখানে থাকা কি আমাদের পোষায়? আমার বেয়াদবি মাপ করবেন বাবু, সে আমার দ্বারা হবে না।

নির্মল আসিয়া একদিন বলিল,—ওহে তাহ'লে দু-খানা লরি ক'রে মালপত্র ক্রমশঃ পাঠাই কলকাতায়।

গদাধর বলিলেন—কিন্তু তোমার বৌ-ঠাকরুণ বলচেন, এখানে কিছু জিনিস থাক। এ-বাড়ীর বাস একেবারে উঠিয়ে দিচ্ছিনে তো আর! মাঝে মাঝে আসবো-যাবো···

—সে তো রাখতেই হবে। তবে সামান্য কিছু রাখো এখানে। জিনিসপত্র এখানে থাকলে দেখবার লোকের অভাবে নষ্ট হবে বইতো নয়!

—তাই বলছিল তোমার বৌ-ঠাকরুণ। এখানেও পৈতৃক বাড়ী বজায় রাখা আমারও মত।

শুভদিন দেখিয়া সকলে কলিকাতায় রওনা হইলেন। নির্মল সঙ্গে গেল। ঠিক হইল, ভড়মহাশয় আপাততঃ কয়েক মাসের জন্য কলিকাতার আড়তে থাকিয়া কাজকর্ম গুছাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিবেন—তবে উপস্থিত নয়। মাসখানেক পরে আড়তের কাজ অল্প একটু চালু হইলে তার পর।

তিন

লালবিহারী সা রোডে ছোট্ট দোতলা বাড়ী। চারখানা ঘর, এ-বাদে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার-ঘর আছে।

গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—বাড়ী কেমন হয়েছে?

—ভালোই তো। কত টাকায় হলো?

—সাড়ে দশ হাজার টাকা। বন্ধক ছিল—খালাস করতে আরও দু'হাজার লেগেছে।

—এত টাকা বাড়ীর পেছনে এখন খরচ না করলেই পারতে।

—কিন্তু কলকাতায় বাড়ী···একটা সম্পত্তি হয়ে রইলো, তা ভুলে যেও না।

—আমি মেয়েমানুষ কি বুঝি, বলো? তুমি যা বোঝো, তাই ভালো।

গদাধরের আড়তের কাজও এখন ভালো চলে নাই।

ভড়মহাশয় পুরানো লোক,—তিনি একদিন বলিলেন—এখানে কাজ দাঁড়াবে ভালো বাবু।

ভড়মহাশয়কে গদাধর বিশ্বাস করিতেন খুব বেশি, তাঁর কথার উপর নির্ভর করিতেন অনেকখানি। উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—দাঁড়াবে ব'লে আপনার মনে হয় ভড়মশায়?

—আমার কথাটা ধরেই রাখুন বাবু—চুল পাকিয়ে ফেললাম এই কাজ ক'রে। মুখপাতেই জিনিস বোঝা যায়, মুখপাত দেখা দিয়েচে ভালো।

—আপনি বললে অনেকটা ভরসা পাই।

—আমি আপনাকে বাজে-কথা বলবো না বাবু।

কলিকাতায় আসিয়া অনঙ্গ খুব আনন্দে দিনকতক কালীঘাট ইত্যাদি দেখিয়া কাটাইল—দক্ষিণেশ্বরে দু'দিন মন্দির দর্শন ও গঙ্গাস্নান করিল—দূর সম্পর্কের কে এক পিসতুতো ভাই ছিল এখানে, তাহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহার স্ত্রীর সঙ্গে কি-একটা পাতাইয়া আসিল···বৌবাজারের দোকান হইতে আসবাবপত্র আনাইয়া মনের মত করিয়া ঘর সাজাইল।

ছেলে দুটিকে কাছের এক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল; বাড়ীতে পড়ানোর জন্ম মাস্টার রাখা—এক কথায় ভালো করিয়াই এখানে সংসার পাতিয়া বসা হইল।

একদিন নির্ম্মল আসিয়া আড়তে দেখা করিল। প্রায় মাসখানেক দেখাই হয় নাই তার সঙ্গে। গদাধর খুশী হইয়া বলিলেন—আরে এসো, নির্ম্মল! দেশ থেকে এলে এখন? খবর ভালো?

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি অনেকদিন, তাই এলাম একবার।

—খুব ভলো করেচো। যাও, বাড়ীতে যাও—তোমার বৌ-ঠাকরুণ আছেন, গিয়ে ততক্ষণ চা-টা খাওগে, আমি আসচি।

নির্ম্মল নীচু-গলায় বলিল—কিন্তু তোমার কাছে এসেছিলাম আর-এক কাজে। আমার কিছু টাকার বড়ো প্রয়োজন, ভাই।

—কেন, হঠাৎ টাকার কি প্রয়োজন হলো?

—বাকি খাজনার দায়ে পৈতৃক জমি বিক্রি হতে বসেচে—দেখাবো এখন সব তোমায়।

—কত টাকা?

—শ'তিনেক।

—কবে চাই?

—আজই দাও। তোমাকে হ্যাণ্ডনোট দেবো তার বদলে।

—কিছুই দিতে হবে না তোমায়। যখন সুবিধে হবে, দিয়ে দিও।

নির্ম্মল যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। করিবারই কথা। সে-দিনটা গদাধরের বাড়ীতে থাকিয়া আহারাদি করিয়া সন্ধ্যাবেলা বলিল—চলো গদাই, তোমাকে বায়োস্কোপ

দেখিয়ে আনি।

গদাধর বিশেষ শৌখীন-প্রকৃতির লোক নহেন। এতদিন কলিকাতায় আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও এক দিনের জন্ম কোনো আমোদ-প্রমোদের দিকে যান নাই—নিজের আড়তে কাজকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। নির্ম্মলের পীড়াপীড়িতে সেদিন সন্ধ্যাবেলাটা বায়োস্কোপ দেখিতে গেলেন। 'প্রতিদান' বলিয়া একটা বাংলা ছবি···গদাধরের মন্দ লাগিল না। অনেকদিন তিনি থিয়েটার বা বায়োস্কোপ দেখেন নাই, বাংলা ছবি এমন চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সন্ধানই তিনি রাখেন না।

বায়োস্কোপ হইতে বাহির হইয়া নির্ম্মল বলিল—চা খাবে?

—তা মন্দ হয় না।

—চলো, কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ী, তোমায় আলাপ করিয়ে দিই।

মিনিট-পাঁচেক-রাস্তা-দূরে একটা গলির মোড়ে বেশ বড় একখানা বাড়ীর সামনে গিয়া নির্ম্মল বলিল—দাঁড়াও, আমি আসচি।

কিছুক্ষণ পরে একটি সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে নির্ম্মল ফিরিয়া আসিল। হাসিয়া বলিল—এই যে, আলাপ করিয়ে দিই, এঁরই নাম গদাধর বসু, বাড়ী—

গদাধর অবাক হইয়া চাহিয়া বলিলেন—আরে শচীন যে! তুমি এখানে?

—এসো ভাই, এসো।··নির্ম্মল আমাকে বললে, 'কে এসেচে ছাখো!' তুমি যে দয়া ক'রে এসেচো···আমি ভাবলুম না-জানি কে? তা তুমি! সত্যি?

—এটা কাদের বাড়ী?

—আরে, এসোই না! অনেকদিন দেখাশুনা নেই—সব কথা শুনি।

সম্পর্কে শচীন তাঁহার জ্যাঠতুতো ভাই,—অর্থাৎ বড়-তরফের সত্যনারায়ণ বসুর বড় ছেলে—আর বারে 'কুসুম-বামনীর দ'র ভাগবাঁটোয়ারার সময় ইহারই উদ্দেশে শ্লেষ করিয়া কথা বলিয়াছিলেন গদাধর। শচীন বকিয়া গিয়াছে, এ-কথা গ্রামের সকলেই জানিত—তবে গদাধর শুনিয়াছিলেন, আজ-কাল সে ভালো হইয়াছে—কলিকাতায় থাকিয়া কি চাকুরি করে।

গদাধর বলিলেন—নির্ম্মলের সঙ্গে তোমার দেখাশুনো হয় নাকি?

শচীন হাসিয়া বলিল—কেন হবে না? তুমি তো আর দেশের লোকের খোঁজ নাও না। শুনলুম, বাড়ী করেচ কলকাতায়···

—হ্যাঃ, সে আবার বাড়ী! কোনো রকমে ওই মাথা গোঁজবার জায়গা···

—বৌদিদিকে এনেচো নাকি?

—অনেকদিন।

—আমাদের তো আর যেতে বললে না একদিন! সন্ধানই কি রাখো!

—আমি কি ক'রে সন্ধান রাখি, বলো? নির্ম্মল নিয়ে এলো তাই তোমাকে চক্ষে দেখলুম এই এতকাল পরে। তুমি তো গ্রামছাড়া আজ তিন বছরের ওপর।

শচীনের সঙ্গে গদাধর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন। বাহিরের ঘর পার হইয়া ছোট একটি হলঘর। হলঘরের চারিপাশে কামরা—সামনে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। একটা বড় ক্লক-ঘড়ি হলের একপাশে টিক্‌টিক্‌ করিতেছে, কাঠের টবে বড়-বড় পামগাছ। শচীন উহাদের লইয়া দোতলার সিঁড়িতে উঠিতে-উঠিতে ডাক দিল—ও শোভা, কাদের নিয়ে এলুম, দেখ। শচীনের ডাকে একটি মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইল, তার পরনে সাদাসিদে কালোপাড় ধুতি, অগোছালো চুলের রাশ পিঠের উপরে পড়িয়াছে, মুখে-চোখে মৃদু কৌতুহল। মুখে সে কোনো কথা বলিল না। ত্রিশের বেশি বয়স কোনোমতেই নয়—খুব রোগা নয়, দোহারা গড়ন—রং খুব ফর্সা।

শচীন বলিল—বলো তো শোভারাণী, কে এসেচে ?

মেয়েটি বলিল—কি ক'রে জানবো !

আশ্চর্য্য এই যে, মেয়েটি কাহাকেও অভ্যর্থনাসূচক একটা কথা বলিল না বটে, তবু তাহাকে অভদ্র বলিয়া মনে হইল না গদাধরের। এমন মুখশ্রী তিনি কোথায় যেন দেখিয়াছেন! দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, বেশ চমৎকার মুখ! কিন্তু কোথায় দেখিয়াছিলেন কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না।

সকলে উপরে উঠিলেন। বারান্দায় বেতের চেয়ার খানকতক গোল করিয়া পাতা—মাঝখানে একটা বেতের টেবিল। সেখানে শচীন তাঁহাদের বসাইয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—ইনি শ্রীযুক্ত গদাধর চন্দ্র বসু, আমার খুড়তুতো ভাই—আমাদের বয়স একই, দু-এক মাসের ছোট-বড়। মার্চ্চেন্ট। গাঁয়ে পাশাপাশি বাড়ী।

গদাধর অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিলেন। নির্ম্মল ও শচীন এ কোথায় তাহাকে আনিল ? শচীনের কোনো আত্মীয়ের বাড়ী হইবে হয়তো! মেয়েটি কে ? গৃহস্থ-বাড়ীর মেয়ে কি সকলের সামনে এভাবে ডাক দিলে বাহির হইয়া আসে ? তিনি নিজের গ্রামে তো দেখেন নাই—তবে কলিকাতার ব্যাপারই আলাদা।

শচীন বলিল—পরিচয় করিয়ে দিই এঁর সঙ্গে—ইনি প্রখ্যাতনামা 'স্টার'—শোভারাণী মিত্র—নাম শোনো নি ?

নির্ম্মল বলিল—এইমাত্র দেখে এলে, 'প্রতিদান' ফিল্ম, সেই ফিল্মের কমলা!

গদাধর এতক্ষণ পরে বুঝিলেন। সেইজন্যই তাঁহার মনে হইতেছিল, মেয়েটির মুখ বড় পরিচিত—কোথায় যেন দেখিয়াছেন! মেয়েটি 'ফিল্ম-স্টার' শোভারাণী মিত্র—'প্রতিদান' ফিল্মে যে কমলা সাজিয়াছে! গদাধর ব্যবসায়ী মানুষ, ফিল্ম-স্টারদের নামের সঙ্গে তাঁর খুব পরিচয় নাই, তবে এবার কলিকাতায় আসিয়া অবধি বাড়ীর দেওয়ালে পাঁচিলে যততত্র প্রতিদান ছবির বিজ্ঞাপন এবং সেই সঙ্গে বড়-বড় অক্ষরে শোভারাণী মিত্রের নাম গদাধর দেখিয়াছেন বটে!

গদাধর একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন—তাঁহারা গেঁয়ো লোক, ফিল্ম-স্টারদের সঙ্গে কথা বলিবার কি উপযুক্ত! নির্ম্মলের কাণ্ড দেখ, তাঁহাকে কোথায় লইয়া আসিল!

সঙ্গে-সঙ্গে কৌতূহল হইল খুব। ফিল্ম-স্টাররা কি-ভাবে কথা বলে, কেমন চলে, কি খায়, কি করে—সাধারণ লোকে ইহার কিছুই জানে না। তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তিনি সে সুযোগ পাইয়াছেন। গিয়া অনঙ্গকে গল্প করিবার একটা জিনিস পাইলেন বটে। অনঙ্গ শুনিয়া অবাক হইয়া যাইবে।

মেয়েটি এবার বেতের টেবিলের ওপারে দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিল—কোনো কথা বলিল না।

নির্ম্মল বলিল—বসুন মিস্ মিত্র।

মেয়েটি উদাসীন ভাবে বলিল—হ্যাঁ, বসি! আপনাদের বন্ধু চা খান তো? ও রসি···রসি!

গদাধর বলিতে গেলেন, তিনি এখন আর চা খাইবেন না—কিন্তু সঙ্কোচে পড়িয়া কথা বলিতে পারিলেন না। মেয়েটির আহ্বানে একটি ছোকরা চাকর আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। মেয়েটি বলিল—ওরে রসি, চা—এক, দুই, তিন পেয়ালা।

হাসিয়া নির্ম্মল বলিল,—কেন, চার পেয়ালা নয় কেন?

মেয়েটি বলিল—আমি একবারের বেশি চা খাইনে তো। আমার হয়ে গিয়েচে বিকেলে।

কর্ত্তৃত্বের এমন দৃঢ় গাম্ভীর্য্যের সুরে কথা বাহির হইয়া আসিল মেয়েটির মুখ হইতে, যে, তাহার প্রতিবাদে আর কোনো কথা বলা চলে না। অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল এবং নিজের হাতে দু'খানি প্লেটে কেক্, বিস্কুট, কমলালেবু ও সন্দেশ আনিয়া বেতের গোল টেবিলটিতে রাখিয়া বলিল—একটু খেয়ে নিন!

শচীন বলিল—আমার?

মেয়েটির মুখে হাসি কম—আধ-গম্ভীর মুখেই বলিল—দু-বার হয়ে গিয়েচে। আর হবে না।

নির্ম্মল বলিল—এই আমরা ভাগ করে নিচ্চ···এসো শচীন।

নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া মেয়েটি বলিল—না, ভাগ করতে হবে না, আপনারা খেয়ে নিন—চা আনি।

গদাধর ভাবিলেন, এ-ধরণের মেয়ে তিনি কখনো দেখেন নাই। বিনয়ে গলিয়া পড়ে না, অথচ কেমন ভদ্রতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান! কিন্তু শচীনের উপর এতটা আধিপত্য কেন? বোধহয় অনেক দিনের আলাপ—বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। সে-ক্ষেত্রে এরকম হওয়া সম্ভব, স্বাভাবিক বটে।

সেই ছোকরা চাকরটি চা আনিয়া দিল—ট্রে'র উপর বসানো তিনটি পেয়ালা—মেয়েটি নিজের হাতে ট্রে হইতে উঠাইয়া পেয়ালাগুলি টেবিলে সাজাইয়া দিল—আগে গদাধরের সামনে, তারপরে নির্ম্মলের ও সবশেষে শচীনের সামনে।

গদাধরকে বলিল—চিনিটা দেখুন তো? আমি দু'চামচ ক'রে দিতে বলি সব পেয়ালায়—

যদি কেউ বেশি খান, আবার দেওয়া ভালো।

গদাধর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, মেয়েটির ডাগর চোখের পূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর। কি সুন্দর মুখশ্রী, অপূর্ব্ব লাবণ্যভরা ভঙ্গি ঠোঁটের নীচের অংশে। গদাধরের সারা দেহ নিজের অজ্ঞাতে শিহরিয়া উঠিল। নামজাদা অভিনেত্রী শোভারাণী মিত্র…তাঁহাকে—গদাধর বসুকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছে! বিশ্বাস করা শক্ত!

গদাধর তখনই চোখ নামাইয়া লইলেন। বেশীক্ষণ মেয়েটির মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। ছবিতে এইমাত্র যাহাকে দেখিয়া আসিলেন—সেই নির্য্যাতিতা মহীয়সী বধূ কমলা রক্তমাংসের জীবন্ত দেহ লইয়া, তাহার অপূর্ব্ব মুখশ্রী লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে… তাঁহাকেই…গদাধর বসুকে! বলিতেছে—আপনার চায়ে কি চিনি কম হয়েচে?

এমন ঘটনা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও তিনি কল্পনা করিতে পারিতেন না!

অথচ চিনি আদৌ ঠিক ছিল না। চিনির অভাবে চা তেতো বিস্বাদ। চায়ে চার চামচের কম চিনি তিনি কখনো খান না বাড়ীতে। ইহা লইয়া অনঙ্গ তাঁহাকে কত ক্ষেপাইত— 'তোমার তো চা খাওয়া নয়, চিনির শরবৎ খাওয়া! চিনির রসে কাপের সঙ্গে ডিসের সঙ্গে এঁটে জড়িয়ে যাবে, তবে হবে তোমার ঠিকমত চিনি।"

কিন্তু এ তো আর অনঙ্গ নয়! এখানে সমীহ করিয়া চলিতে হইবে বৈ কি!

শচীন বলিল—তোমরা এদিকে গিয়েছিলে কোথায়?

হাসিয়া নির্ম্মল বলিল—আমরা এইমাত্তর 'প্রতিদান' দেখে ফিরলুম।

—কেমন লাগলো?

—বেশ লেগেচে—বিশেষ ক'রে এঁর পার্ট—ওঃ!

মেয়েটি গদাধরের দিকে চাহিয়া সরাসরিভাবে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কেমন লাগলো?

গদাধর সঙ্কুচিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন ধরণের সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য ঘটা দূরের কথা—এর আগে এমন মহিলা তিনি চক্ষেও দেখেন নাই! শিক্ষিতা নিশ্চয়, কারণ, ওই ছবির মধ্যে এঁর মুখে যে সব বড়-বড় কথা আছে, যেমন সব গান ইনি গাহিয়াছেন, যেমন ইঁহার চমৎকার উচ্চারণের ভঙ্গি, কথা বলিবার কায়দা, হাত-পা নাড়ার ধরণ ইত্যাদি দেখা গিয়াছে—শিক্ষিত না হইলে অমনটি করা যায় না। গদাধর পল্লীগ্রামে বাস করেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন।

তিনি বলিলেন—খুব ভালো লেগেছে। ওই যে নির্ম্মল বললে, আপনার পার্ট—ওরকম আর দেখিনি।

—কোন্ জায়গাটা আপনার সব চেয়ে ভালো লেগেছে বলুন তো? দেখি, আপনারা বাইরে থেকে আসেন, আপনাদের মনে আমাদের অভিনয়ের এফেক্টটা কেমন হয়, সেটা জানা খুব দরকার আমাদের।

শচীন অভিমানের সুরে বলিল—কেন, আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি? আমাদের মতের কোনো দাম…

—সেজন্যে নয়। আপনারা সর্ব্বদা দেখচেন আর এঁরা গ্রামে থাকেন, আজ এসেচেন—কাল চ'লে যাবেন। এঁদের মতের দাম অন্যরকম।

গদাধর আরও লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, না না, আমাদের আবার মত! তবে আমার খুব ভালো লেগেচে, যখন আপনাকে—মানে, কমলাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো—আপনার সেই গানখানা গাছতলার পুকুর-পাড়ে স্বামীর ঘরের দিকে চোখ রেখে—ওঃ, সেই সময় চোখের জল রাখা যায় না! আরও বিশেষ ক'রে ওই জায়গাটা ভালো লাগে—ওইখানটাতেই আপনার পরনের শাড়ী · আপনার চোখের ভঙ্গি··· কেমন একটা অসহায় ভাব···সব মিলিয়ে মনে হয়, সত্যিই পাড়াগাঁয়ের শাশুড়ীর অত্যাচারে ঘরছাড়া হয়েচে, এমন একটি বৌকে চোখের সামনে দেখচি! বায়োস্কোপে দেখচি, মনে থাকে না। ওখানে আপনি নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেচেন!

শচীন উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, ইয়ার্কির সুরে বলিল—বারে আমাদের গদাই, তোমার মধ্যে এত ছিল, তা তো জানিনে—একেবারে 'আনন্দ বাজার'-এর 'ফিল্‌ম্-ক্রিটিক' হয়ে উঠলে যে বাবা!

মেয়েটি একমনে আগ্রহের সঙ্গে গদাধরের কথা শুনিতেছিল—শচীনের দিকে গম্ভীর মুখে চাহিয়া ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে বলিল—কি ও? উনি প্রাণ থেকে কথা বলচেন···আমি বুঝেচি উনি কি বলচেন। আপনার মত হালকা মেজাজের লোক কি সবাই?

মুখ ম্লান করিয়া শচীন আগেকার সুরের জের টানিয়া বলিল—বেশ, বেশ, ভালো হ'লেই ভালো। আমার কোনো কথা বলবার দরকার কি? ব'লে যাও হে···

গদাধর সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া রহিলেন, কোনো কথা বলিলেন না।

মেয়েটি আবার গদাধরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—হ্যাঁ, বলুন, কি বলছিলেন···

গদাধর বিনীত ও লজ্জিত-হাস্যে বলিলেন—আজ্ঞে, ওই। আমাদের মত লোকের আর বেশি কি বলবার আছে, বলুন? তবে শেষ-দিকটাতে, যেখানে কমলা কাশীর ঘাটে আবার স্বামীর দেখা পেলো, ও জায়গাটা আরও বিশেষ ক'রে ভালো লেগেচে।

—আর ওই যে কি বললেন···

—মানে, কমলার পরনের কাপড় ঠিক একেবারে পাড়াগাঁয়ের ওই ধরণের গেরস্ত-ঘরের উপযুক্ত—বাহুল্য নেই এতটুকু!

আনন্দে ও গর্ব্বের সুরে হাত নাড়িয়া মেয়েটি বলিয়া উঠিল—দেখুন, ওই কাপড় আমি জোর ক'রে ম্যানেজারকে ব'লে আমদানি করি স্টুডিওতে। আমি বলি, স্বামী তো ছেড়ে দিয়েছে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এমন ধরণের পাড়া-গাঁয়ের মেয়ের পরনে জমকালো রঙীন্ ব্লাউজ বা শাড়ী থাকলে ছবি ঝুলে যাবে। এজন্যে আমায় দস্তুরমত ফাইট্ করতে হয়েচে, জানেন শচীনবাবু? আর দেখুন, ইনি পাড়াগাঁ থেকে আসচেন—ইনি যতটা জানেন এ-সম্বন্ধে···

সায় দিবার সুরে নির্ম্মল বলিল—তা তো বটেই!

শচীন বলিল—যাক, ওসব নিয়ে তর্কের দরকার নেই, শোভা, একটা গান শুনিয়ে দাও ওকে!

গদাধর পূর্ব্ববৎ বিনীতভাবেই বলিল—তা যদি উনি দয়া ক'রে শুনিয়ে দেন…

মেয়েটি কিন্তু এতটুকু ভদ্রতা না রাখিয়াই তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—হ্যাঁ, যখন-তখন গান করলেই কি হয়? শচীনবাবু যেন দিন দিন কি হয়ে উঠচেন!

গদাধর নির্ব্বোধ নন, তিনি লক্ষ্য করিলেন, শচীন মেয়েটির এ-কথার উপর আর কোনো কথা বলিতে সাহস করিল না, যেন একটু দমিয়া গেল। এবার কি মনে করিয়া গদাধর সাহস দেখাইলেন। তিনি ব্যবসাদার মানুষ, পড়্তি-বাজারে চড়াদামের মাল বায়না করিয়া অনেকবার লাভ করিয়াছেন—তিনি জানেন, জীবনে অনেক সময় দুঃসাহসের জয় হয়। সুতরাং তিনি আগেকার নিতান্ত বিনয়ের ভাব ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত দৃঢ় অনুরোধের সুরে বলিলেন—আপনি হয়তো মেজাজ ভালো হ'লে গান গাইবেন, কিন্তু আমি আর তা শুনতে পাবো না। শচীনের কথা এবারটা রাখুন দয়া করে—একটা গান শুনিয়ে দিন।

পাকা ও অভিজ্ঞ ব্যবসাদার গদাধর ভুল চাল চালেন নাই। মেয়েটি আগেকার চেয়ে নরম ও সদয় সুরে বলিল—আপনি শুনতে চান সত্যি? শুনুন তবে।

ঘরের একপাশে বড় টেবিল-হারমোনিয়ম। মেয়েটি টুলে বসিয়া ডালা খুলিয়া, পিছনদিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিল…কি শুনবেন? হিন্দি? না, ফিল্মের গান?

গদাধর কৃতার্থ হইয়া বলিলেন—কমলার সেই গানখানা করুন দয়া ক'রে। সেই যখন বাড়ী ছেড়ে…

মেয়েটি এক-মনে গানটি গাহিল। গানের মধ্যে—আকাশ, বেদনাভরা বীণাধ্বনি, রুদ্র, জ্যোৎস্না, পথ-চলা প্রভৃতি অনেক সুমিষ্ট কথা ছিল এবং আরও অনেক ধোঁয়া-ধোঁয়া ধরণের শব্দ যার অর্থ পাটের আড়তদার গদাধর ঠিকমত অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তবু তিনি তন্ময় হইয়া গানটি শুনিলেন—ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল? এই মাত্র ছায়াছবিতে যে নির্য্যাতিতা বধূটিকে দেখিয়া আসিলেন, সেই মেয়েটিই রক্তমাংসের দেহে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া গান গাহিতেছে!

গান শেষ হইলে গদাধর উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—চমৎকার! চমৎকার!

নির্ম্মল বলিল—বাস্তবিক! যাকে বলে, ফার্স্ট ক্লাস!

শচীন কোনো কথা বলিল না।

মেয়েটি হারমোনিয়মের ডালা সশব্দে বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিল, কিন্তু গান সম্বন্ধে একটি কথা বলিল না। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে ভালো করিয়াই জানে, সে যাহা গাহিবে, তাহা ভালো হইবেই—এ বিষয়ে কতকগুলি সঙ্গীত-সম্বন্ধে অজ্ঞ, অর্ব্বাচীন ব্যক্তির মত জিজ্ঞাসা করিয়া মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করিতে সে চায় না।

গদাধর হঠাৎ দেখিলেন, কথাবার্ত্তার মধ্যে কখন রাত্রি হইয়া ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—তিনি এতক্ষণ খেয়াল করেন নাই।

এইবার যাওয়া উচিত—আর কতক্ষণ এখানে থাকিবেন ? মেয়েটি কিছু মনে করিতে পারে ! কিন্তু বিদায় লইবার উদ্যোগ করিতেই শচীন বলিল—আহা ব'সো না হে, একসঙ্গে যাবো—আমিও তো এখানে থাকবো না।

গদাধর বলিলেন—না, আমার থাকলে চলবে না, অনেক কাজ বাকী। রাত হয়ে যাচ্ছে।

নির্ম্মলও বলিল—আর-একটু থাকো। আমিও যাবো।

উহাদের বসাইয়া রাখিয়া মেয়েটি পাশের ঘরে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিকে চাঁপা রংয়ের জর্জ্জেট পরিয়া, মুখে হাল্‌কা-ভাবে পাউডারের ছোপ দিয়া, উঁচু-গোড়ালির জুতো পায়ে ঘরে ঢুকিয়া সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—এবার চলুন সবাই বেরুনো যাক্।

শচীন বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—কোথায় যাবে আবার, সেজেগুজে এলে হঠাৎ ?

—সব কথা কি আপনাকে বলতে হবে ?

—না, তবু জিগ্যেস করচি। দোষ আছে কিছু ?

—স্টুডিওতে পার্টি আছে সাড়ে-আটটায়।

—তুমি এখন সেই টালিগঞ্জে যাবে, এই রাত্রে ?

—যাবো।

অগত্যা সকলে উঠিল। শচীনের মুখ দেখিয়া বেশ মনে হইল, সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এ-স্থান ত্যাগ করিতেছে। মেয়েটি আগে-আগে, আর সকলে পিছনে চলিল। বারান্দায় যাইবার বা সিঁড়ি দিয়া নামিবার পথে মেয়েটি কাহারও সহিত একটি কথা বলিল না—রাণীর মত গর্ব্বে কাঠের সিঁড়ির উপর জুতার উঁচু গোড়ালির খট্‌-খট্ শব্দ করিতে-করিতে চঞ্চলা হরিণীর মত ক্ষিপ্রপদে নামিয়ে গেল—কেবল অতি মৃদু সুমিষ্ট একটি সুবাস বারান্দা ও সিঁড়ির বাতাসে মিশিয়া তাহার গমনপথ নির্দ্দেশ করিল মাত্র।

গদাধর বাড়ী ফিরিয়া সে-রাত্রে হিসাবের খাতা দেখিলেন প্রায় রাত বারোটা পর্য্যন্ত। কিন্তু অনঙ্গ যখন কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া ঘরে ঢুকিল, তখন কি জানি কেন, শোভারাণী মিত্র ফিল্‌ম্‌-স্টারের যে গল্পটা জমাইয়া বলিবেন ভাবিয়াছিলেন—সেটা কিছুতেই জিহ্বাগ্রে আনিতে পারিলেন না।

এই কথাটা গদাধর পর-জীবনে অনেকবার ভাবিয়াছিলেন। যে-গল্প অনঙ্গর কাছে করিবার জন্য কতক্ষণ হইতে তাঁহার মন আকুলি-বিকুলি করিতেছিল—এত-বড় মুখরোচক ও জমকালো ধরণের একটা গল্প,—অথচ কেন সেদিন সে-কথা স্ত্রীর কাছে বলিতে পারিলেন না ?

কি ছিল ইহার মধ্যে ?

সেদিন হয়তো কিছুই ছিল না, কিংবা হয়তো ছিল ! গদাধর ভালো বুঝিতে পারিতেন না !

অনঙ্গ বলিল—আজ কি শোবে, না, খাতাপত্র নিয়ে ব'সে থাকবে? রাত ক'টা, খেয়াল আছে?

গদাধর হঠাৎ অনঙ্গর দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন। অনঙ্গও মেয়েমানুষ—দেখিতেও মন্দ নয়—কিন্তু কি ঠকাই ঠকিয়াছেন এতদিন! সত্যিকার মেয়ে বলিতে যা বোঝায়, তা তিনি এতদিন দেখেন নাই। আজই অন্যত্র তাহা দেখিয়া আসিলেন এইমাত্র।

বলিলেন—এই যাই।

—আজ তো খেলেও না কিছু! শরীর ভালো আছে তো?

অনঙ্গ সুকণ্ঠী নয়। গলার স্বর আরও মোলায়েম হইলেও ক্ষতি ছিল না। মেয়েদের কণ্ঠস্বর মিষ্টি হইলেই ভালো মানায়—কিন্তু সব জিনিসের মধ্যেই আসল আছে, আবার মেকি আছে।

মশারি গুঁজিতে গুঁজিতে অনঙ্গ বলিল—আজ কোথাও গিয়েছিলে নাকি? রাত ক'রে ফিরলে যে!

—হ্যাঁ, ওই বায়োস্কোপ দেখে এলুম কিনা!

অনঙ্গ অভিমানের সুরে বলিল—তা যাবে বৈকি। আমায় নিয়ে গেলে না তো! কি দেখলে?

—একটা বাংলা ছবি···সে আর একদিন দেখো।

অনঙ্গ আবদারের সুরে বলিল—কি ছবি, বলো না? বলো না গো গল্পটা!

সেই পুরানো অনঙ্গ। বহুদিনের সুপরিচিত সেই আবদারের সুর। কতবার কত গল্প এই স্ত্রীর সঙ্গে···রাত একটা-দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকা গল্প করিতে করিতে! কিন্তু গদাধর বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলেন, আজ অনঙ্গর সঙ্গে গল্পগুজব করিবার উৎসাহ যেন তিনি নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছেন না!

খাতাপত্র মুড়িয়া ঈষৎ নীরস-কণ্ঠে গদাধর বলিলেন—কি এমন গল্প! বাজে!

—হোক বাজে,—কি দেখলে···বলো না···লক্ষ্মীটি।

—বড় খাটুনি গিয়েচে আজ, কথা বলতে পারচি নে।

অনঙ্গ ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—তা পারবে কেন? খাতাপত্র ঘাঁটবার সময় খাটুনি হয় না।···লক্ষ্মীটি, বলো না, কি দেখলে?

—কাল সকালে শুনলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না! সত্যি, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

অনঙ্গ রাগ করিল বটে, সঙ্গে-সঙ্গে বিস্মিতও হইল। স্বামীর এমন ব্যবহার যে ঠিক নূতন, তাহা নহে। ঝগড়াও কতবার হইয়া গিয়াছে দু-জনের মধ্যে—কিন্তু সে ঝগড়ার মধ্যে সত্যিকার ঔদাসীন্য বা তিক্ততা ছিল না। আজ গদাধর ঝগড়ার কথা কিছু বলিতেছেন না—খুব সাধারণ কথাই! অথচ তার নারীচিত্ত যেন বুঝিল, ওই সামান্য সাধারণ অতি-তুচ্ছ প্রত্যাখানের পিছনে অনেকখানি ঔদাসীন্য এবং তিক্ততা বিদ্যমান।

অনঙ্গ চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

গদাধর কিন্তু শুইয়া-শুইয়া,—ফিল্ম-অভিনেত্রী শোভারাণীর ভাবনা ভাবিতেছিলেন, এ-কথা বলিলে তাঁহার উপর ঘোর অবিচার করা হইবে। সত্যিই তিনি এক-আধবার ছাড়া তার কথা ভাবেন নাই। মেয়েদের কথা বেশিক্ষণ ধরিয়া ভাবিবার মত মন গদাধরের নয়! তিনি ভাবিতেছিলেন অন্য কথা।

তিনি ভাবিতেছিলেন—জীবনটা তাঁর বৃথায় গেল! মেকি লইয়া কাটাইলেন, আসল নারী কি বস্তু, তাহা কোনো দিন চিনিলেন না। আর একটি ছবি অন্ধকারে আধ-ঘুমের মধ্যেও বার-বার তাঁর চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল…

নির্য্যাতিতা সুন্দরী বধূ কমলা শ্বশুরবাড়ী হইতে বিতাড়িতা হইয়া থরথর-কম্পিত দেহে পুকুরপাড়ে একদৃষ্টে স্বামীর ঘরের জানালার দিকে চাহিয়া আছে।…

চার

দিন-দুই পরে গদাধরকে দেশের আড়তের কাজে যাইতে হইবে, ভড়মহাশয়ও সঙ্গে যাইবেন। অনঙ্গ স্বামীকে বলিল, সেও সঙ্গে যাইবে। গদাধর বলিলেন, চলো, ভালো কথাই তো। ছেলেরাও যাবে—গিয়ে স্কুল কামাই হবে, উপায় নাই। তোমায় কিন্তু ছেলেদের নিয়ে একলা থাকতে হবে ক'দিন। পারবে তো?

—কেন, তুমি কোথায় থাকবে?

—আমি যাচ্ছি মোকামে পাটের সন্ধানে। নারানপুর, আশুগঞ্জ, ঝিকরগাছা—এসব জায়গা ঘুরতে হবে। পাঁচশো গাঁট সাদা পাট অর্ডার দিয়েছে ডগলাস জুট মিল। এদিকে মাল নেই বাজারে—যা আছে, দরে পোষাচ্ছে না,—আমি দেখিগে যাই এখন মোকামে-মোকামে ঘুরে। মাথায় এখন আগুন জ্বলছে, বাড়ী ব'সে থাকবার সময় আছে?

—বাড়ীতে মোটে আসবে না?

—সেই মঙ্গলবারের দিকে যদি আসা ঘটে—তার আগে নয়।

অনঙ্গ যাইতে চাহিল না। শুধু ছেলেদের লইয়া একা সে দেশের বাড়ীতে গিয়া কি করিবে? স্বামী থাকিলে ভালো লাগিত। স্বামীকে ছাড়িয়া থাকা তার অভ্যাস নাই—বিবাহ হইয়া পর্য্যন্ত কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে নাই—একা থাকিতে অনঙ্গর মন হু-হু করে। ছেলেদের লইয়া মনের শূন্যতা পূর্ণ হইতে চায় না।

ভড়মহাশয়কে লইয়া গদাধর চলিয়া গেলেন। বিভিন্ন মোকামে ঘুরিয়া সমস্ত পাটের যোগাড় করিতে সারাদিন লাগিয়া গেল। ফিরিবার পথে একবার গ্রামের বাড়ীতে গেলেন। ব্যবসায়-সংক্রান্ত কিছু খাতাপত্র এখানে পূবের ঘরের আলমারীতে ছিল। ক-মাস দেশ-ছাড়া—ইহার মধ্যেই বাড়ীর উঠানে চিড়চিড়ে ও আমরুল গাছের জঙ্গল বাঁধিয়া গিয়াছে, ছাদের-কার্নিসে বনমূলার চারা দেখা দিয়াছে, ঘরের মধ্যে চামচিকার দল বাসা বাঁধিয়াছে।

গ্রামের একটি বোষ্টমের মেয়েকে মাঝে-মাঝে ঘর-বাড়ী দেখিতে ও ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার রাখিতে বলিয়াছিলেন—প্রতি মাসে দুটি করিয়া টাকা এজন্য সে পাইবে, এ ব্যবস্থা ছিল—অথচ দেখা যাইতেছে সে কিছুই করে নাই।

ভড়মহাশয় বলিলেন—সে বিন্দি বোষ্টুমি তো একবারও ইদিকে আসেনি ব'লে মনে হচ্চে বাবু, তাকে একবার ডেকে পাঠাই। এই ও-মাসেও তার টাকা মণিঅর্ডার ক'রে পাঠানো হয়েছে! ধর্ম্ম আর নেই দেখচি কলিকালে! পয়সা নিবি অথচ কাজ করবি নে!

সন্ধান লইয়া জানা গেল, বিন্দি বোষ্টুমি আজ কয়দিন হইল ভিন্-গাঁয়ে তাহার মেয়ের বাড়ী গিয়াচে। পাশের বাড়ীর সিধু ভট্টাচার্য্যির মেয়ে হৈম আসিয়া বলিল—মা ব'লে পাঠালেন, আপনি কি এখন চা খাবেন কাকা?

—এই যে, হৈম মা, ভালো আছো? তোমাদের বাড়ীর সব ভালো? বাবা কোথায়?

—হ্যাঁ, সব একরকম ভালো। বাবা বাড়ী নেই। কাকীমাকে আনলেন না কেন?

—এ তো মা, আড়তের কাজে একদিনের জন্যে আসা। আজই এখুনি চ'লে যাবো।

—তা হবে না। মা বলেচে, আপনি আর ভড়-জ্যাঠা এবেলা আমাদের বাড়ী না খেয়ে যেতে পাবেন না। মা ভাত চড়িয়েচে। আমায় ব'লে দিলে—তোর কাকা চা খাবে কিনা জিগ্যেস ক'রে আয়।

—তা যাও মা, নিয়ে এসোগে।

বৈকালে তিনটার ট্রেনে কলিকাতা যাওয়ার কথা—দুপুরে সিধু ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দু'জনে খাইতে গেলেন। হৈমর মা হাসিমুখে বলিল—কি ঠাকুরপো, এখন শহুরে হয়ে প'ড়ে আমাদের ভুলে গেল নাকি? বাড়ীটা যে জঙ্গল হয়ে গেল—ওর একটা ব্যবস্থা করো! অনঙ্গকে নিয়ে এলে না কেন?

—আনবো কি বৌদি, একবেলার জন্য আসা! তাও এখানে আসবো ব'লে আসিনি, ঝিকরগাছায় এসেছিলাম আড়তের কাজে। সে আসতে চেয়েছিল!

—এবার একদিন নিয়ে এসো ঠাকুরপো। কতদিন দেখিনি, দেখতে ইচ্ছে করে।

—তার চেয়ে আপনি কেন চলুন না বৌদিদি, শহর ঘুরে আসবেন, দেখা-শোনাও হবে?

—আমাদের সে ভাগ্যি যদি হবে, তবে হাঁড়ি ঠেলবে কে দু'বেলা? ওকথা বাদ ছাও তুমি—যেমন অদেষ্ট করে এসেছিলাম, তেমনি তো হবে। তবে একবার কালীঘাটে গিয়ে মা'কে দর্শন করার ইচ্ছে আছে। বোশেখ মাসের দিকে, দেখি কতদূর কি হয়!

—আমায় বলবেন, আমি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো, আমার ওখানে গিয়ে পায়ের ধুলো দেবেন।

বৈকালের ট্রেনে দুজনে কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামীকে দেখিয়া অনঙ্গ বড় খুশী হইল। কাছে বসিয়া চা ও খাবার খাওয়াইতে-খাওয়াইতে বলিল—উঃ, তুমি আলো মা—কি

কষ্ট গিয়েছে যে! গ্রামে হয়, তবুও এক কথা! এ ধরো, নিজের বাড়ী হলেও বিদেশ—এখানে মন ছট্‌ফট্‌ করে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমাকে একদিন শচীন ঠাকুরপো খুঁজতে এসেছিল—কি একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েচে।

—কই, কি চিঠি, দেখি?

অনঙ্গ একখানা খামের চিঠি আনিয়া স্বামীর হাতে দিল। গদাধর চা খাইতে খাইতে খাম খুলিয়া পড়িলেন। লেখা আছে—তোমার দেখা পেলাম না এসে। শুনলাম নাকি আড়তের কাজে বার হয়েচো। দেশ থেকে বাবা চিঠি লিখেছেন, তাঁর শরীর অসুস্থ—একবার দেশে যেতে হবে। একটা কথা, শোভারাণী তোমার কথা সেদিন জিগ্যেস করছিল—সময় পেলে একদিন এসো না? আমার ওখানে এসো, আমি নিয়ে যাবো। নির্ম্মল এখনও কোন্নগর থেকে ফেরে নি। সে একটা গুরুতর কাজ ক'রে গিয়েচে, সেজন্যে শোভারাণীর সঙ্গে একবার তোমার দেখা করা জরুরী দরকার। এলে সব কথা বলবো। সেইজন্যেই শোভা তোমার খোঁজ করেচে।

চিঠি পড়িয়া গদাধর বিস্মিত হইলেন। শচীন কখনো তাহার বাড়ী আসে না, আসার রেওয়াজ নাই। সে আসিয়া এমন একখানি জরুরী চিঠি দিয়া গেল! নির্ম্মল কি করিয়াছে? শোভারাণী মস্ত-বড় অভিনেত্রী—তাঁর সঙ্গে নির্ম্মলের কি সম্বন্ধ? তাহাকেই-বা তাঁহার নিজের দরকার—ব্যাপার কি?

স্বামীর মুখ দেখিয়া অনঙ্গ কৌতুহলের সহিত বলিল—কি চিঠি গা?

—য়্যাঁ চিঠি! হ্যাঁ, ও একটা···

—কোনো খারাপ খবর নয় তো?

—নাঃ। এ অন্য চিঠি।···আচ্ছা, আমি চলে গেলে নির্ম্মল এখানে এসেছিল আর?

—একদিন এসেছিল বটে। কেন বলো তো? তার কিছু হয়েচে নাকি?

—না, সে-সব নয়। সে বাড়ী যায় নি কিনা···

—সুধাদের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

—না, আমার সময় কোথায়? কখন যাই ও-পাড়ায় সুধাদের বাড়ী?

—খেলে কোথায়?

—সিধুদা'দের বাড়ী। হৈম এসে ডেকে নিয়ে গেল।

গদাধরের কিন্তু এসব কথা ভালো লাগিতেছিল না। কি এমন ঘটিল, যাহার জন্য শোভারাণী খোঁজ করিয়াছেন! নির্ম্মল গ্রামে ফিরে নাই, অথচ তিনদিনের মধ্যেই তাহার ফিরিবার কথা।

শোভারাণীই বা তাহার খোঁজ করিলেন কেন? তাহার সহিত এসব ব্যাপারের সম্পর্ক কি?

গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—ক'টা বাজলো দেখ তো?

—এই তো দেখে এলাম সাতটা বাজে। কেন, এখন আবার বেরুবে নাকি?

—এক জায়গায় যেতে হবে এখুনি। আড়তের কাজ—ফিরতে দেরি হতে পারে।

আড়তের কাজ শুনিয়া অনঙ্গ আপত্তি করিল না—নহিলে ক্লান্ত স্বামীকে সে কিছুতেই এখনি আবার বাহিরে যাইতে দিত না।

গদাধর প্রথমে শচীনের বাসায় আসিয়া শুনিলেন, সে বাহির হইয়া গিয়াছে, কখন আসিবে, ঠিক নাই। গদাধর ঘড়ি দেখিলেন, আটটা বাজে। একা এত রাত্রে শোভারাণীর বাড়ী যাওয়া কি উচিত হইবে? অথচ নির্ম্মল কি এমন গুরুতর কাজ করিয়াছে, তাহা না জানিলেও তো তাহার স্বস্তি নাই।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া গদাধর একাই শোভারাণীর বাড়ী যাইবেন স্থির করিলেন। বাড়ীর নম্বর তিনি সেদিন দেখিয়াছেন,—নিশ্চয় বাহির করিতে কষ্ট হইবে না।

বাড়ীর যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বুকের মধ্যে ভীষণ ঢিপ্-ঢিপ্ করিতে সুরু করিল, জিভ যেন শুকাইয়া আসিতেছে, কান দিয়া ঝাল বাহির হইতেছে—বুকের ভিতরে তোলপাড় কিছুতে শান্ত হয় না! এমন তো কখনো হয় নাই! গদাধর খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা ভীত হইয়া উঠিলেন।

অনেকখানি আসিয়া ঠিক করিলেন, থাক্ আজ, সেখানে শচীনের সঙ্গে যাওয়াই ভালো। মহিলাদের সঙ্গে তেমন করিয়া আলাপ করা তাঁহার অভ্যাস নাই, কখনো করেন নাই—বড় বাধো-বাধো ঠেকে। তাছাড়া তিনি যদি কিছু মনে করেন?

কিন্তু গদাধর ফিরিতে পারিলেন না। উত্তেজনা ও ভয়ের পিছনে মনের গভীর গহনে একটা আনন্দের ও কৌতূহলের নেশা—সেটা চাপিয়া রাখা অসম্ভব।

বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিয়া গদাধর খানিকক্ষণ বন্ধ-দরজার সামনে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন। কড়া নাড়িবেন কি নাড়িবেন না? চলিয়া যাওয়াই বোধহয় ভালো! একবার চলিয়া যাইতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং মরীয়া হইয়া সজোরে কড়া নাড়া দিলেন। প্রথম দু'একবার নাড়াতে কেহ সাড়া দিল না। মিনিট তিন-চার পরে ছোকরা চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল—কাকে চান আপনি?

গদাধর বলিলেন—মিস্ শোভারাণী মিত্র আছেন?

তাঁহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

চাকর বলিল—হ্যাঁ, আছেন। আপনার কি দরকার?

—আমার বিশেষ দরকার আছে, একবার দেখা করবো।

—কি নাম বলবো?

—বলো, গদাধরবাবু,—শচীনের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন।

একটু পরে চাকর আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল—চলুন ওপরে।

উপরের হল-ঘর পার হইয়া সেদিনের সেই কামরাতে চাকর তাঁহাকে লইয়া গেল। গদাধর গিয়া দেখিলেন, শোভা একটা ঈজিচেয়ারে শুইয়া কি বই পড়িতেছে—পাশে টিপয়ের উপর পেয়ালা ও ডিস, বোধহয় এইমাত্র চা-পান শেষ করিয়াছে।

গদাধর ঢুকিতেই শোভা ঈজিচেয়ার হইতে আধ-ওঠা অবস্থায় বলিল—আসুন গদাধর-বাবু আসুন।

—আজ্ঞে, নমস্কার।

—নমস্কার। বসুন।

গদাধর বসিলেন। শোভারাণী পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কথা নাই। আন্দাজ পাঁচ-মিনিট পরে শোভা হাতের বইখানি পাশের টিপয়ে রাখিতে গিয়া সেখানে চায়ের পেয়ালা দেখিয়া বিরক্তির স্বরে বলিল—আঃ, এগুলো ফেলে রেখেচে এখনো! ওরে, ও গোবিন্দ!

গদাধর আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—এই এলাম। শচীন একখানা চিঠি লিখে রেখে এসেছিল আমার বাড়ীতে। আপনার সঙ্গে দেখা করা দরকার নাকি, নির্ম্মলের জন্যে—তাই।

এতক্ষণ পরে শোভার মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। সে বলিল—নির্ম্মলবাবুর কথা ছেড়ে দিন। আপনি কি নির্ম্মলবাবুর বিশেষ বন্ধু?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি ওর বাল্যবন্ধু।

—নির্ম্মলবাবুর অবস্থা ভালো নয় বোধহয়?

—সেইরকমই বটে। কিন্তু সে কি করেচে, বলুন তো? আমি কিছু বুঝতে পারচি নে।

—সে-কথা আপনাকে ব'লে শুধু মনে কষ্ট দেওয়া! স্টুডিওর একটা চেক্ ভাঙাতে দিয়েছিলাম—দুশো টাকার চেক্—তারপর থেকে আর দেখা নেই! আপনি যেদিন এখানে এসেছিলেন, তার পরের দিন। শুনেচি, কোন্নগরে আছে—চিঠি লিখেও শচীনবাবু উত্তর পায় না। অথচ আমার এদিকে টাকার দরকার।

গদাধর বুঝিলেন, শচীন যাহা গুরুতর ব্যাপার বলিতেছে—তাহা এমন গুরুতর নয়! নির্ম্মল মাঝে-মাঝে এমন করিয়া থাকে। তাঁহার চেক্ ভাঙাইতে গিয়াও সে এমন করিয়াছে। তবে তিনি বাল্যবন্ধু—তাঁহার বেলা যাহা করা চলে, সব ক্ষেত্রে তাহা করা উচিত? নির্ম্মলটার বুদ্ধিশুদ্ধি যে কবে হইবে!

তিনি বলিলেন—তাই তো, ভারি অন্যায় দেখচি তার। আমার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে আচ্ছা ক'রে ধমকে দেবো।

—হ্যাঁ, দেবেন তো—দেওয়াই উচিত।

মৃদু উদাসীন কণ্ঠস্বর শোভার। রাগ বা ঝাঁঝ তো নাই-ই—এমন কি, এতটুকু উদ্বেগের রেশ পর্যন্ত নাই! গদাধর মুগ্ধ হইলেন। এক্ষেত্রে তাঁহাকে সামনে পাইয়া চেঁচামেচি করা এবং টাকার একটা কিনারা হওয়া সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রদর্শন, পরামর্শ আহ্বান করা ইত্যাদিই স্বাভাবিক। পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে ইহা অপেক্ষা অনেক তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া ভীষণ চীৎকার ও রাগারাগি করিতে দেখিয়া আসিতেছেন তিনি আজীবন। কিন্তু দুশো টাকার ক্ষতি সহ্য করিয়াও এমন নিরুদ্বেগ শান্ত ভাব তিনি কখনো দেখেন নাই,—না মেয়েদের মধ্যে, না পুরুষদের মধ্যে।

গদাধর একটি সাহসের কাজ করিলেন। বিনীতভাবে বলিলেন—একটা কথা বলি—কিছু মনে করবেন না।

শোভা বলিল—কি, বলুন ?

—আপনার টাকার দরকার বলছিলেন,…ও টাকাটা আমি কাল সকালেই আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্চি। নির্ম্মলের কাছ থেকে চেকের টাকা আমি আদায় ক'রে নেবো। •

—আপনি ? না, না, আপনি কেন দেবেন ?

—আজ্ঞে তা হোক। আপনি যদি কিছু মনে না করেন…

শোভা আর কোনো তর্ক না করিয়া বেশ নির্ব্বিকার-কণ্ঠে বলিল—বেশ, দেবেন।

গদাধর কৃতার্থ হইয়া গেলেন যেন। বলিলেন—কাল সকালে কি থাকবেন ?

—আমি এগারোটা পর্য্যন্ত আছি।

—তাহ'লে আমি নিজেই ওটা নিয়ে আসবো।

—আপনি আবার কষ্ট ক'রে আসবেন কেন—কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন না হয়।

গদাধর দেখিলেন, এ জায়গায় অন্য কাহাকেও চেক্ দিয়া পাঠানো চলিবে না—নতুবা ভড়মহাশয়কে পাঠাইয়া দিলে চলিত। ভড়মহাশয় বা অন্য কেহ মুখে কিছু না বলিলেও, নানারকম সন্দেহ করিতে পারে—কথাটা পাঁচ-কান হওয়াও বিচিত্র নয় সে-অবস্থায়। সুতরাং তিনি বলিলেন—তাতে কি, কষ্ট করবার কি আছে এর মধ্যে ! আমি নিজেই আসবো-এখন।

—কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন ?

—আজ্ঞে, লালবিহারী শা রোড, মানিকতলা।

—নির্ম্মলবাবুকে চিনলেন কি ক'রে ?

—আমার গাঁয়ের লোক…এক গাঁয়ে বাড়ী।

গদাধরের অত্যন্ত কৌতূহল হইল, শোভারাণীর সঙ্গে নির্ম্মলের কি ভাবে পরিচয় হইল জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ আবার দু'জনেই চুপ। গদাধর অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন, এবার বোধ হয় যাওয়া ভালো—বেশিক্ষণ থাকা হয়তো বেয়াদপি হইবে। কিন্তু হঠাৎ ওঠেনই বা কি বলিয়া !

শোভাই হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চা খাবেন ?

গদাধর জানাইলেন, এখন তিনি চায়ের জন্য কষ্ট দিতে রাজী নন্—এইমাত্র খাইয়া আসিলেন, শোভারাণী আবার চুপ করিল।

কিছুক্ষণ উসখুস্ করিয়া গদাধর বলিলেন—তাহলে আমি এবার যাই,—রাত হয়ে গেল।

শোভা বলিল—আচ্ছা,—আসুন তবে।

গদাধর উঠিলেন, এবার শোভা এমন একটি ব্যাপার করিল, তার মত গর্ব্বিতা মেয়ের নিকট গদাধর যাহা প্রত্যাশা করেন নাই—শোভা ঈজিচেয়ার হইতে উঠিয়া সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত তাঁহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। গদাধর সমস্ত দেহে এক অপূর্ব আনন্দের শিহরণ অনুভব করিলেন। নেশার মত সেটা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল সারা পথ ! গদাধরের পক্ষে এ

অনুভূতি এত নূতন যে, তিনি নিজের এই পরিবর্ত্তনে কেমন ভীত হইয়া পড়িলেন!

স্বামীকে সিঁড়িতে উঠিতে দেখিয়া অনঙ্গ বলিল—বাপরে! এত দেরি করবে তা তো ব'লে গেলে না—আমি ব'সে-ব'সে ভাবচি।

—ভাবার কি দরকার আছে? ছেলেমানুষ তো নই যে, পথ হারিয়ে যাবো!

হঠাৎ সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি যেন ধাক্কা খাইয়া চুরমার হইয়া গেল। সাধারণ মানুষের মতই দৈনন্দিন একঘেয়েমি ও বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে গদাধর খাইতে বসিলেন।

পরদিন সকালে আটটার পরে গদাধর শোভারাণীর বাড়ী গিয়া কড়া নাড়িলেন। ছোকরা চাকরটি দরজা খুলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং উপরে লইয়া গিয়া বারান্দার বেতের চেয়ারে বসাইয়া বলিল—মাইজি নাইবার ঘরে—আপনি বসুন।

একটু পরে ভিজে এলো-চুলের রাশি পিঠে ফেলিয়া সদ্যস্নাতা শোভা সিমলের সাদা শাড়ী পরিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এই যে, এসেচেন! নমস্কার! খুব সকালেই এসে পড়েচেন। বসুন, আমি আসচি।

শোভা পাশের ঘরে ঢুকিয়া দুখানা মাসিকপত্র, একখানা লেটারপ্যাড্ ও একটা ফাউন্টেন পেন লইয়া ঈজিচেয়ারটিতে আসিয়া বসিল এবং চেয়ারের চওড়া হাতলের উপর সেগুলি রাখিয়া গদাধরের দিকে চাহিয়া বলিল—তারপর?

তার মুখও অন্যান্য দিনের মত উদাসীন অপ্রসন্ন নয়। বেশ প্রফুল্ল। এমন কি, ঈষৎ মৃদু হাসিও যেন কখনো অধরপ্রান্তে আসিতেছে, কখনও মিলাইয়া যাইতেছে!

গদাধর পকেট হইতে চেক-বই বাহির করিতে-করিতে বলিলেন—সেই চেক্‌খানা…

শোভা হাসিমুখে বলিলেন—বসুন, চা খান, আমি এখনও চা খাই নি। স্নান না ক'রে কিছু খাই না। আপনার তাড়া নেই তো?

—আজ্ঞে না, তাড়া নেই। চা কিন্তু একবার খেয়ে—

—সেটা উচিত হয় নি। এখানে যখন সকালে আসছেন। কোনো আপত্তি নেই তো?

গদাধর তটস্থ হইয়া বলিলেন—আজ্ঞে না, আপত্তি কি?

শোভা বলিল—ওরে, নিয়ে আয়, ও লালচাঁদ!

গদাধর দেখিলেন, এ অন্য-একজন চাকর। শোভারাণীর অবস্থা তাহা হইলে বেশ ভালো। তিন জন চাকর আছে, ঝিও একটা ঘুরিতেছে—ঠাকুর নিশ্চয়ই আছে। 'স্টার'-অভিনেত্রী শোভারাণী নিশ্চয় নিজের হাতে রান্না করেন না!

লালচাঁদ ট্রেতে দু-পেয়ালা চা, আর দুখানা প্লেটে ডিমভাজা, টোস্ট্ ও দুটি করিয়া কলা লইয়া দুটি টিপয়ে সাজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শোভা বলিল—নুন দেয় নি দেখচি। আপনাকেও দেয় নি? আঃ, এদের নিয়ে—ও লালচাঁদ!

—আপনি তো অনেক বেলায় চা খান! এখন ন'টা বাজে।

—আমি? হ্যাঁ, তাই হয়। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়, প্রায় সাড়ে-সাতটা—এক-একদিন তার বেশিও হয়। স্টুডিওতে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাজ হচ্চে আজকাল—রাত এগারোটা হয় এক-একদিন ফিরতে।

গদাধর স্টুডিও কি ব্যাপার ভালো জানিতেন না, কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, সেখানে কি হয়? ছবি তৈরী হয় বুঝি?

শোভা বিস্ময়ের সহিত বলিল—আপনি জানেন না? দেখেন নি কখনো? টালিগঞ্জের ওদিকে কখনো—ও!··

—আজ্ঞে, আমরা হলাম গিয়ে পল্লীগ্রামের লোক, আড়তদারি ব্যবসা নিয়েই দিন কেটে যায়। সত্যি কথা বলতে, কখনই-বা সময় পাবো, আর কখনই-বা সেই টালিগঞ্জে গিয়ে স্টুডিও—

হাসিয়া শোভা বলিল—তা তো বটেই। বেশ, চলুন না একদিন—আমার গাড়ীতে যাবেন আমার সঙ্গে, স্টুডিও দেখে আসবেন।

গদাধর কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, আমার গাড়ী! মানে? তাহা হইলে মোটরও আছে। গদাধর যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহা নয়, এ মেয়েটির অবস্থা হয়তো তাঁহার অপেক্ষাও ভালো। কলিকাতার লোককে বাহিরে দেখিয়া চেনা যায় না। তিনি এতদিন পাটের ব্যবসা করিয়া পাটের কেঁসো খাইয়া মরিলেন, মোটর গাড়ীর মুখ দেখিতে পাইলেন না। অথচ মেয়েটি এই অল্পবয়সে—দেখ একবার! বিনীতভাবে তিনি উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, তা গেলেই হয়, আপনি যদি—তা বরং একদিন···

—আর এক পেয়ালা চা?

—আজ্ঞে না, আর···

—আমার কিন্তু দু'পেয়ালার কমে হয় না। সারাদিনের মধ্যে দশ-বারো বার হয়ে যায়—স্টুডিওতে তো খালি চা আর খালি চা—নাহলে পারিনে, হাঁপিয়ে পড়ি—যেমন পরিশ্রম, তেমনি গরম—

চাকর এক পেয়ালা চা আনিয়া শোভার পাশের টিপয়ে রাখিয়া তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিল। শোভা তাহাকে বলিল—না, এখন যা—আপনি সত্যিই নেবেন না আর-এক—

—আজ্ঞে না, আমার শরীর খারাপ হয় বেশি চা খেলে। তেমন অভ্যেস নেই তো!

—আপনার শরীর দেখে মনে হয় বোধহয় ম্যালেরিয়া হয় মাঝে-মাঝে?

—আগে হয়ে গিয়েচে, এখন কলকাতায় আর হয় না।

—বাড়ী করেচেন তো এখানে? বেশ, এখানেই থাকুন। শচীনবাবু আপনার ভাই হয় সম্পর্কে? ও জানেন, আমাদের স্টুডিওতে কাজ করে। আমার সঙ্গে আজ দেখা হবে-এখন—বলবো আপনার কথা।

—শচীন স্টুডিওতে কাজ করে, তা তো জানতুম না।

—জানতেন না নাকি? বেশ। সেই নিয়েই তো আমার সঙ্গে জানাশোনা হ'লো—এখানে আসে যায় মাঝে মাঝে। আমার গানগুলো একবার সুর দিয়ে ওর সঙ্গে সেট্ ক'রে নিই।

শচীন বাজাইতে পারে, গদাধর আগেই জানিতেন—সখের যাত্রার দলে বাঁশি বাজাইয়া বেড়াইয়া লেখাপড়া শিখিল না, কখনো বিষয়-আশয় দেখাশুনা করিল না। সে যে কলিকাতায় আসিয়া এত-বড় 'বাজিয়ে' হইয়া উঠিয়াছে, ফিল্ম্ তোলার স্টুডিওতে চাকরি করে—এত খবর তিনি রাখিতেন না। শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন।

চা পান শেষ হইলে গদাধর দু'এক কথার পর পুনরায় চেক্-বই বাহির করিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—তাহ'লে ক্রশ চেক্ দেবো কি? আপনার পুরো নামটা—

—ও চেক্‌খানা? ও আপনাকে দিতে হবে না।

গদাধর এমন বিস্মিত হইলেন যে, তাঁহার মনে হইল, তিনি কথার অর্থ ঠিক বুঝিতেছেন না। শোভার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন,—না, মানে আমি বলচি, আপনার নামটা চেকে লিখে ক্রস্ ক'রে দেব কিনা?

শোভা এবার বেশ ভাল ভাবেই হাসিল। মৃদুহাসি নয়, সত্যিকার আমোদ আর কৌতুকের হাসি। গদাধর মুগ্ধ হইয়া গেলেন সেই অতি অল্প দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যেই। হাসিলে, যে সব মেয়ে যথার্থ সুন্দরী, তাদের চোখে-মুখে কি সৌন্দর্য ও মোহ ফুটিয়া উঠে—গদাধর পাটের বস্তা ওজন করিয়া মোকামে মোকামে ঘুরিয়া কাল কাটাইয়াছেন এতদিন—কখনো দেখেন নাই!

হাসিতে-হাসিতে শোভা বলিল—আপনি ভারি মজার লোক—বেশ লাগে আপনাকে—শুনতে পেলেন না, কি বলচি? ও চেক্ দিতে হবে না আপনাকে।

—কেন বলুন তো?

—আপনার বন্ধু নিয়ে গেল টাকা আমার কাছ থেকে ঠকিয়ে—আপনি কেন দণ্ড দেবেন? গেল, যাক্‌গে, আমারই গেল।

—না না, তা কখনও হয়? আমার তো বন্ধু, ও অভাবী লোক, ঠিক যে ঠকিয়ে নিয়েছে, তা নয়। ও টাকা আমি আদায় করবো। নিন্ আমার কাছ থেকে—আপনার পুরো নামটা—

শোভার মুখশ্রী ও চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত সদয় হইয়া আসিয়াছে—সে গর্বিত ও উদাসভাব আর ওর মুখে-চোখে নাই। দুই হাত অদ্ভুত নাচের ভঙ্গিতে সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া সে বলিল—না, আমি বলচি, কেন দুশো টাকা মিথ্যে দণ্ড দেবেন? যদি আদায় করতে পারি, আমিই করবো। আমি ফিল্মে কাজ করি। অনেক লোকের সঙ্গে মিশি রোজ—মানুষ চিনি। আপনার বন্ধুটি আপনার মত ভালমানুষ লোককে কখনো টাকা শোধ করবে না—কিন্তু আমার কাছে করবে। চেক্-বইটা পকেটে ফেলুন।

গদাধর চুপ করিয়া রহিলেন, আর কিছু বলা ভদ্রতা-সঙ্গত হইবে না হয়তো। জোর করিয়া কাহাকেও টাকা গছাইতে আসেন নাই তিনি।

শোভা বলিল—কিছু মনে করেন নি তো?

—আজ্ঞে না, এর মধ্যে মনে করার কি আছে? তবে…

—শচীনবাবুকে কিছু বলবার থাকে তো বলুন—স্টুডিওতে দেখা হবে।

—আমি এখানে এসেছিলুম এই কথাই বলবেন, তাছাড়া আর কি! তাহ'লে আমি উঠি আজ। নমস্কার।

গদাধর সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়, এবারও শোভা সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা দিয়া বাহির হইবার সময় গদাধর দৈবাৎ একবার উপরের দিকে চাহিতেই শোভার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। গদাধর ভদ্রলোক, লজ্জিত হইলেন। অমনভাবে চাওয়া উচিত হয় নাই। কি উনি মনে করিলেন?

মেয়েটি অদ্ভুত! কাল বলিয়া দিল টাকা আনিতে, অথচ আজ কিছুতেই লইতে চাহিল না। টাকা এভাবে কে ফিরাইয়া দেয় আজকালকার বাজারে? বিশেষ তিনি যখন যাচিয়াই দিতে গিয়াছিলেন!

সেদিন সারাদিন আড়তের কাজকর্মের ফাঁকে মেয়েটির মুখ কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না। সেই সদ্যস্নাতা মূর্ত্তি, হাসি-হাসি সুন্দর মুখ, দয়ার্দ্র ডাগর চোখ দুটি! ছবির সেই বধূ—কমলা!

বৈকালে চা ও লুচি খাইতে দিয়া অনঙ্গ বলিল—হ্যাঁ গো, নির্ম্মল ঠাকুরপো কোথায়?

—কেন? কি হয়েছে বলো তো?

—সুধা আমায় একখানা চিঠি লিখেচে—তাতে সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েচে, লিখেচে, নির্ম্মল-ঠাকুরপোর কোনো পাত্তা নেই—এতদিন দেশ থেকে এসেচে…

—কি ক'রে বলবো, বলো? ওসব কথার কি উত্তর দেবো? সে তো আমায় বলে যায়নি?

স্বামীর বিরক্তির সুর অনঙ্গ লক্ষ্য করিল। আজকাল যেন কি হইয়াছে, কথা বলিলে সব সময় রাগ-রাগ ভাব! কলিকাতায় আসিয়া এই কিছুদিন হইল এরূপ হইয়াছে স্বামীর। আগে সে কখনো এমন দেখে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নরম-সুরে সে জিজ্ঞাসা করিল—আজ রাত্রে কি খাবে?

গদাধর স্পষ্টই বিরক্ত হইলেন। এসব জাতীয় মেয়েদের মুখে অন্য কোন কথা নাই—কেবল খাওয়া আর খাওয়া! কি কথাই-বা জানা আছে যে বলিবে? উত্তর দিলেন—সে হলো রাতের কথা—যা হয় হবে-এখন, তা নিয়ে এখন মাথাব্যথা কিসের?

অনঙ্গ এবার রাগ করিল; বলিল—সব-তাতেই অমন খিঁচিয়ে ওঠো কেন আজকাল, বলো তো? মিষ্টি কথায় উত্তর দিতে ভুলে গেলে নাকি? এমন তো ছিলে না দেশে! কি হয়েচে আজকাল তোমার?

গদাধর এ-কথার উত্তর দিলেন না। সংসার হঠাৎ তাঁহার কাছে নিতান্ত বিস্বাদ মনে হইল। অনঙ্গ আধ-ময়লা একখানা শাড়ী পরিয়া আছে, মাথার চুল এখনও বাঁধে নাই, কেমন যেন আগোছালো ভাব—তাছাড়া ওর মুখ দেখিলেই মনে হয়, এই বয়সে বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে যেন!

কিসের জন্য তিনি এসব করিয়া মরিতেছেন? কাহার জন্য পাটের দালালি আর দুপুরের রোদে-রোদে মোকামে-মোকামে ঘুরিয়া পাটের কেনা-বেচা। সত্যিকার জীবনের আমোদ কি তিনি একদিনও পাইয়াছেন? পুরুষমানুষের মন যা চায় নারীর কাছে—অনঙ্গ কেন, কোনো মেয়ের কাছেই কি এতদিন তা পাইয়াছেন? জীবনে তিনি কি দেখিলেন, কি-বা পাইলেন! এই কলতলায় এঁটো বাসনের স্তূপ, ওই আধময়লা ভিজে-কাপড়ের রাশি, ওই কয়লা-কাঠের গাদা, আলু-বেগুনের চুবড়িটা—এই সংসার? এই জীবন? ইহাই তিনি চিরকাল দেখিবেন ও জানিবেন?

শচীনকে গ্রামের লোকে নিন্দা করে, কিন্তু শচীন তাঁহার চেয়ে ভালো। সে জীবনকে ভোগ করিয়াছে। তিনি কি করিয়াছেন? কিছুই করেন নাই!

অনঙ্গ বলিল—বড় ঠাণ্ডা পড়েচে, আজ আর কোথাও বেরিও না সন্ধ্যের পর।

—সন্ধ্যের এখন অনেক দেরি। আড়তের কাজ মেটে নি, সেখানে যেতে হবে এখুনি।

—কখন আসবে?

—তা কি ক'রে বলি? কাজ মিটে গেলেই আসবো।

—ভড়মশায় কি রাত্রে এখানে খাবেন?

—কেন, সে খাচ্চে কোথায়? ওবেলা আসে নি?

—আজ দুদিন তো আসেন না। একটু জিগ্যেস্ কোরো তো। দুদিন ভাত রান্না রইলো, অথচ লোক এলো না! আর তুমিও দেরি কোরো না।

কথা শেষ করিয়াই অনঙ্গ আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল—সত্যি, আমার ওপর তুমি রাগ করো নি? আজ তুমি সকাল-সকাল এসো। গাঁয়ে গেলে, কি-রকম দেখলে না-দেখলে কিছুই শুনি নি। শুনবো-এখন। এসো সকাল-সকাল—কেমন তো?

গদাধর আড়তে যাইবার পথে ভাবিলেন—কি বিশ্রী জীবন! একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। আর ভালো লাগে না এ।

সেই রাত্রেই সন্ধ্যার পরে গদাধর শোভারাণীর বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়িলেন। চাকর আসিয়া বলিল—কে?

—মিস্ মিত্র আছেন?

—মাইজি স্টুডিও থেকে ফেরেননি।

—কখন আসেন?

—আজ সকাল-সকাল আসবেন ব'লে গিয়েছেন—এই আটটা…

—ও! আচ্ছা, থাক, তবে।

—কিছু বলতে হবে, বাবু?

—না—আচ্ছা—না, থাক্। আমি অন্য একসময় বরং···

বলিতে-বলিতে দরজার সামনে শোভারাণীর মোটর আসিয়া দাঁড়াইল এবং মোটরের দরজা খুলিয়া নামিয়া গদাধরকে দেখিয়া শোভা বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনি এখন? কি বলুন তো?

গদাধর হঠাৎ যেন সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইয়া গেলেন। কেন এখানে আসিয়াছেন, তাহার কি উত্তর দিবেন? নিজেই কি তাহা ভালো বুঝিয়াছেন? বোঝেন নাই। কিন্তু তিনি কোনো-কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শোভা অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলিল—আসুন, চলুন ওপরে। আপনি যে-রকম মানুষ, তাতে পাটের আড়তদার হওয়া উচিত ছিল না, উচিত ছিল কবি হওয়া। আসুন।

এইদিন হইতে গদাধর আড়ত হইতে সন্ধ্যার পরে প্রায়ই দেরিতে বাড়ী ফিরিতে লাগিলেন। অনঙ্গ প্রথম-প্রথম কত বকিত, রাগ করিত, এত রাত হইবার কারণ কি—শরীর খারাপ হইলে টাকায় কি হইবে? এত পরিশ্রম শরীরে সইবে কেন? ইত্যাদি। গদাধর প্রায়ই কোনো উত্তর দিতেন না। যখন দিতেন, তখন নিতান্তই সংক্ষেপে। কি যে তার অর্থ, তেমন পরিষ্কার হইত না। বাড়ী ফিরিয়া গদাধর সব দিন খাইতেনও না, না খাইয়া শুইয়া পড়িতেন। অনঙ্গ নিজেদের শোবার ঘরে খাবার আনিয়া যত্ন করিয়া জাল দিয়া ঢাকা দিয়া, জাগিয়া বসিয়া থাকে, স্বামী কখন আসিয়া কড়া নাড়িবেন—কারো সাড়া না পাইলে রাগ করিয়া বসিবেন হয়তো!

শীত চলিয়া গেল। ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ।

এবার পাটের কাজে বেশ লাভ হইয়াছে—গদাধর সেদিন কথায় কথায় প্রকাশ করিয়াছেন স্ত্রীর কাছে।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি। অনঙ্গ বাড়িতে সত্যনারায়ণের ব্যবস্থা করিয়াছেন—পূজা হইবার পরে আড়তের লোকজন খাওয়ানো হইবে, আশেপাশের দু'চারজন প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আড়তের কর্ম্মচারীদের বসাইয়া লুচি খাওয়ানো হইবে, বাকী সকলকে সত্যনারায়ণের প্রসাদ ও ফলমূল মিষ্টান্ন ইত্যাদি দ্বারা জলযোগ করানো হইবে।

অনঙ্গ সারাদিন উপবাস করিয়া আছে, স্বামী ফিরিলে পূজা আরম্ভ হইবে এবং তাহার পর সকলকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। পাশের গলিতে সিধুর মা নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বিধবা খোলার ঘর ভাড়া লইয়া বাস করেন, তাঁহার একটি মাত্র ছেলে সামান্য মাহিনার চাকরি করে। অনঙ্গ তাঁহাকে এবেলা খাইতে বলিয়াছে, তিনি আসিয়া পূজার নৈবেদ্য ইত্যাদি গুছাইয়া দিয়াছেন—অনঙ্গ তাঁহাকে একটু অনুরোধ করিয়াছিল সন্ধ্যার পরে একটু জলযোগ করিতে,

তিনি বলিয়াছেন—এখন কেন মা, পুজো-আচ্চা হয়ে যাক্, বিধবা মানুষ, একেবারে সকলের শেষে যাহয় কিছু মুখে দেবো। তুমি রাজ-রাণী হও ভাই, তোমার বড্ড দয়া গরীবের ওপরে! আমার ছেলে তো মাসিমা বলতে অজ্ঞান।

সন্ধার পরে পূজা আরম্ভ হইল। লোকজন একে-একে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকেরাও আসিলেন। এখনও গদাধর আসেন নাই—তিনি আসিলেই নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো শুরু হইবে।

অনঙ্গ আজ খুব ব্যস্ত। নিজে সে রান্নার তদারক করিয়াছে বৈকাল হইতে। সব দিকে চোখ রাখিয়া চলিতে হইয়াছে, যাহাতে কেহ কোন ত্রুটি না ধরে। পূজা শেষ হইয়া রাত পড়িল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, গৃহস্বামী এখনও আসেন নাই! দু'একজন তাগাদাও দিলেন, তাঁহাদের সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিতে হইবে, কাজ আছে অন্যত্র।

হরিয়া চাকরকে ডাকিয়া অনঙ্গ বলিল—দ্যাখ তো, আড়ত থেকে কেউ এসেচে?

হরিয়া বাহিরের ঘর দেখিয়া আসিয়া বলিল—চার পাচজন এসেচে মাইজি। তবে ভড়-মশায় আসেন নি এখনো।

সিধুর মাকে ডাকিয়া অনঙ্গ বলিল—কি করবো দিদি, সব খেতে বসিয়ে দিই, কি বলেন? উনি বোধ হয় কাজে আটকে পড়েছেন। ভড়মশায় যখন আসেন নি—তখন দু'জনে কাজ শেষ ক'রে চাবি দিয়ে একসঙ্গে আসবেন। এদের বসিয়ে রেখে কি হবে?

সিধুর মা বলিলেন—তাই বসিয়ে দাও। আমি সব দিয়ে আসচি গিয়ে—আমায় সাজিয়ে দাও।

বাহিরের লোক সব প্রসাদ খাইয়া চলিয়া গেল। আড়তের লোকদের খাওয়াইতে বসানো হইল না, গদাধর ও ভড়মশায়ের অপেক্ষায়। রাত ক্রমে দশটা বাজিল। তখন আর কাহাকেও অভুক্ত রাখিলে ভালো দেখায় না, সিধুর মার পরামর্শে তাহাদেরও বসাইয়া দেওয়া হইল।

তাহাদের খাওয়া শেষ হইল, রাত তখন প্রায় এগারোটা, পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না রাত্রি—গ্যাস ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় বাধা ঠেলিয়াও এখানে-ওখানে স্ব-মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এমন সময় ভড়মশায় আসিলেন—একা।

অনঙ্গ ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া ভড়মশায়কে বলিল—উনি কই? এত দেরি কেন আপনাদের?

ভড়মশায় বলিলেন—আমি হাটখোলায় তাগাদায় বেরিয়েছি ন'টার আগে। উনি তো তখুনি বেরুলেন—আমি ভাবচি এতক্ষণ বুঝি এসেছেন।

ভড়মশায়ের গলার স্বর গম্ভীর। তিনি কি একটা যেন চাপিতে চেষ্টা করিতেছেন।

অনঙ্গ ব্যস্ত ও ভীতকণ্ঠে বলিলেন—তাহ'লে উনি কোথায় গেলেন, তাঁর খবরটা একবার নিন্—সঙ্গে টাকাকড়ি ছিল নাকি?

ভড়মশায় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—না, সে-সব ছিল না। ভয় নেই কিছু। নইলে কি আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকি বৌমা? তিনি হারিয়েও যান নি বা অন্য কোনো কিছু না।

অনঙ্গ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—যাক্, তবুও বাঁচা গেল। কাজে গিয়ে থাকেন, আসবেন-এখন—তার জন্যে ভাবনা নেই, কিন্তু এত রাত হয়ে গেল, বাড়ীতে একটা কাজ, তাই বলচি।

ভড়মশায় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—একটা কথা মা, বলি তবে। ভেবেছিলাম, বলবো না—কিন্তু না বলেও তো পারিনে।

অনঙ্গ ভড়মশায়ের মুখের ভাবে ভীত হইয়া বলিল—কেন, কি হয়েচে? কি কথা?

—আমি বলেচি, এ-কথা যেন বাবুর কানে না ওঠে। আপনাকে মেয়ের মত দেখি, তেরো বছরের মেয়ে যখন প্রথম ঘর করতে এলেন, তখন থেকে দেখে আসচি, কথাটা না বলেও পারিনে। উনি আর সে বাবু নেই। এখন কোথায় গিয়ে যে রাত পর্য্যন্ত থাকেন, সকাল-সকাল আড়ত থেকে বেরিয়ে যান -সন্দের আগেই চলে যান এক-একদিন। তারপর শুধু তাই নয়, এ-সব কথা না বললে, বলবেই-বা কে, আমি হচ্চি পুরোনো লোক···এক-কলমে আজ পঁচিশ বছর আপনাদের আড়তে কাজ করচি আপনার শ্বশুরের আমল থেকে। আজ-কাল ব্যাঙ্কের টাকা-কড়িরও উনি গোলমাল করচেন। সেদিন একটা একহাজার টাকার চেক্ ভাঙাতে গেলেন নিজে—কিন্তু খাতায় জমা করলেন না। নিজের নামে হাওলাত-খাতে লেখালেন। এই ক'মাসের মধ্যে প্রায় সাড়ে ছ'হাজার টাকা হাওলাত লিখেচেন নিজের নামে। এসব ঘোর অব্যবস্থা। উনি যেন কি হয়েচেন, সে বাবু আর নেই—এখন কথা বলতে গেলেই খিঁচিয়ে ওঠেন, তাই সাহস ক'রে কিছু বলতেও পারি নে।

অনঙ্গ পাংশুমুখে সব শুনিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভড়মশায় বলিলেন—আমার মনে হয় বৌমা, আমাদের সেই গাঁয়েই আমরা ছিলাম ভালো। বেশী টাকার লোভে কলকাতা এসে ভালো করি নি।

অনঙ্গ উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বলিল—এখন উপায় কি বলুন ভড়মশায়—যা হবার হয়েচে, সে-কথা ছেড়ে দিন।

—আমি তলায়-তলায় সন্ধান নিচ্চি। এখনও ঠিক বুঝতে পারি নি, উনি কোথায় যান, কি করেন! তবে লক্ষণ ভালো নয় সেই দিনই বুঝেচি, যেদিন বড়-তরফের শচীনবাবু ওর সঙ্গে মিশেচে। শচীন আর মাঝে-মাঝে আসে নির্ম্মল।

—তবেই হয়েচে! আপনি ভালো ক'রে সন্ধান নিন্ ভড়মশায়—আমার এ কলকাতা শহরে কেউ আপনার জন নেই—এক আপনি ছাড়া। আপনি নিজে বুঝে-সুঝে ব্যবস্থা করুন। আমিও দেখচি ক'মাস ধ'রে উনি অনেক রাত্রে বাড়ী আসেন, আমি কাউকে সে কথা বলি নি। তা আমি ভাবি, আড়তের কাজ বেড়েচে, তাই বুঝি রাত হয়। মেয়েমানুষ কি বুঝি বলুন? আসুন, আপনি আর কতক্ষণ ব'সে থাকবেন, খেয়ে নেবেন চলুন। ভগবান যা করবেন, তার ওপর হাত নেই—অদেষ্টে যা আছে, ও আর ভেবে কি করবো!

চোখের জলে অনঙ্গ কথা শেষ করিতে পারিল না।

ঠিক সেই রাত্রে বাগমারী রোড ছাড়াইয়া খাল-ধারের বাগান বাড়ীতে জলসা বসিয়াছে। গদাধর সেখানে আটকাইয়া পড়িয়াছেন। এই কয় মাসের মধ্যেই শচীনের মধ্যস্থতায় আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে গদাধরের আলাপ হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে কথা কহিয়া গদাধরের মন ভরিয়া ওঠে। মনে হয়, এত কাল গ্রামে পাটের বস্তা লইয়া কি করিয়াই না দিন কাটাইয়াছেন! যৌবনের দিনগুলো একেবারে নষ্ট হইয়াছে!

এখানে এই বিলাসের জগতে ইহারা মায়া-বিভ্রম জাগাইয়া তোলে। মনে হয় ব্যবসায় যদি করিতে হয় তো এই ফিল্মের ব্যবসায়! কতকগুলো ম্যানেজার, গোমস্তা সরকার, দারোয়ান কুলির কোনো সংস্রব নাই—এমন সব কিশোরী…তাহাদের সঙ্গে আলাপ, গানের ঝর্ণাধারা…এমন অন্তরঙ্গতা করিতে জানে, মনে হয়, পৃথিবী যেন মায়াপুরী হইয়া ওঠে! ওই শচীন খুব আল্‌গাভাবে কানে মন্ত্র দেয়—পাটের কারবার তো করেচো—পয়সা পিটছো খুবই। চালু কারবার—পাকা মুহুরি গোমস্তা আছে—সে-কাজ তারা অনায়াসে দেখতে পারে—আমি বলি কি ফিল্মের ব্যবসায় যদি নেমে যাও—এ ব্যবসায় সারা পৃথিবী কি-টাকাটা অনায়াসে রোজগার করছে! এ কারবারে লোকসানের কোনো ভয় নাই, শুধু লাভ আর লাভ! তাছাড়া এই সব মেয়ে—তোমাকে একেবারে—

শচীন ওস্তাদ মানুষ…মানুষ চরাইয়া খায়। জানে, কোন্ টোপে কোন্ মানুষকে গাঁথা যায়।…শচীন বলে—কিছু না, সামান্য পুঁজি ফেলো—নিজে গ্যাঁট্ হইয়া সেখানে বসিয়া থাকো। দিনের কাজের হিসাব রাখো। স্টুডিও ভাড়া পাওয়া যায়—ফিল্মের রোল ধারে যত চাও—গাঁট হইতে কিছু টাকা ছাড়ো—ছবির তিন-ভাগ চার-ভাগ তোলা হইবামাত্র—ডিষ্ট্রিবিউটর আসিয়া কম্‌সে-কম্ আগাম ষাট-সত্তর হাজার টাকা নিজের তহবিল হইতে বার করিয়া দিবে,—তার পাঁচ গুণ টাকা আদায় হইয়া আসিবে—ছবি তৈয়ার হইলে সে ছবি ঘুরিবে সারা বাঙলা মুল্লুকে—তার হিন্দী করো, হোল ইণ্ডিয়া। একখানা ছবির বাঙলা-হিন্দী দু-ভার্সনে এক বছরে নিট লাভ বিশ-পঁচিশ লাখ হইবে। দু-চারিটা দৃষ্টান্তও শচীন দিল—ঐ সব কোম্পানির মালিক ফিল্ম কোম্পানির অফিসে কেরানীগিরি করিত দেড়শো-দুশো টাকা মাহিনায়। এদিকে নজর রাখিয়া চলিত—ফস করিয়া মাড়োয়ারি ক্যাপিটালিস্ট ধরিয়া আজ অত বড় কোম্পানির মালিক! মোটর ছাড়া পথ চলে না—কি প্রকাণ্ড বাড়ী করিয়াছে আলিপুরে! টাকার কুমীর বনিয়াছে! কি মান, কি ইজ্জৎ ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়াছে…নিরেট ছেলে একবার বিলাত ঘুরিয়া আসিলেই—ব্যস্!

গদাধর শোনেন। গদাধরের মনে হয়, কারবার—ব্যবসা—লাভ—শুধু তা নয়, এমন মধুর সংসর্গ! নাচ-গান…হাসি-গল্প…এ সবের সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না…! সেদিন শোভারাণী একটা গান গাহিতেছিল…সে গানের কটি লাইন তাঁহার কানে-মনে সবসময়ে বাজিতেছে—

বসন্ত চলে গেল হায় রে,—
চেয়েও দেখিনি তার পানে।

গদাধরের কেবলি মনে হয়—ও গান তাঁহারি মনের কথা। জীবনের কতখানি কাটিয়া গেল…পৃথিবীতে এমন রূপ-রস-গন্ধ—তার কোনো পরিচয় তিনি পাইলেন না!

এখনো…এখনো যদি কিছু পান।

আজ এ আসরে শচীন তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে।—বলিয়াছে, ফিল্মের সকলে আসিবে।—সকলের সঙ্গে আলাপ করো—মেলামেশা করো—ভালো করিয়া দেখো, শুধু ব্যবসার দিক দিয়া। শচীনের সঙ্গে কত বার কত স্টুডিওয় তিনি গিয়াছেন।

আরো কজন ফিল্ম স্টারের সঙ্গে গদাধরের আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। তাহাদের সকলকেই কত ভালো লাগে! তাহারা যেন অন্য লোকের জীব! গান আর সুর দিয়া তৈরী!

তাহারা সকলেই আছে। দোল-পূর্ণিমার রাত। বারোমাস খাটিয়া একটা দিন আমোদ না করিলে চলে? এখানে আজ স্টুডিওর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আনন্দ-সম্মেলন। আজ রাত্রে এইখানেই গদাধরের ফিল্ম স্টুডিও খুলিবার কথাবার্ত্তা হইবে, ঠিক আছে।

বাগানটা বেশ বড়। বনেদী বহুকালের পুরানো প্রমোদ-কানন। মাঝখানে যে বাড়ী আছে—সেটা দোতলা। অনেকগুলি ঘর ওপরে নীচে, মেঝে মার্ব্বেল পাথরে বাঁধানো। দেওয়ালে বিবর্ণপ্রায় বড় বড় অয়েলপেন্টিং—অধিকাংশই নগ্ন নারী-মূর্ত্তির ছবি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কোনো বিলাসী ধনীব্যক্তি শখ করিয়া বাগান-বাড়ী করাইয়া থাকিবেন! সে অতীত ঐশ্বর্য্য ও শৌখীনতার চিহ্ন এর প্রতি ইষ্টকখণ্ডে। বাগান-বাড়ীর একটা ঘর তালাবন্ধ। তার মধ্যে অনেক পুরানো বাসনপত্র, ঝাড়, কার্পেট, কৌচ, কেদারা, আয়না প্রভৃতি গাদা করা। প্রবাদ এই, সেই ঘরে মাঝে-মাঝে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ৺আনন্দনারায়ণ ঘোষকে চোগাচাপকান ও শামলা পরিয়া একতাড়া কাগজ হাতে ঘুরিতে-ফিরিতে দেখা গিয়াছে। সেকালের বিখ্যাত এটর্নি আনন্দনারায়ণ ঘোষের নাম এখনও অনেকে জানেন।

পুকুর-ধারে শচীন বসিয়া ছিল—পাশে গদাধর এবং রেখা বলিয়া একটি মেয়ে।

রেখা বলিতেছিল—আমাদের স্টুডিওতে আপনি রোজ বলেন যাবো,—যাবো—কৈ, একদিনও গেলেন না তো!

গদাধর হঠাৎ জড়িতস্বরে বলিলেন—আড়ত থেকে বেরোই আর তোমাদের স্টুডিও বন্ধ হয়ে যায়—যাই কখন বলো, রেখা?

—না, আমার পার্টটা না দেখলে আপনি আমায় নেবেন কি ক'রে?

—আরে, তোমায় এমনিই নিয়ে নেবো, পার্ট দেখতে হবে না। চমৎকার চেহারা তোমার, তোমায় বাদ দিলে কি ক'রে হবে?

—সুষমা দিদিকেও নিতে হবে।

—নেবো। তুমি যাকে যাকে বলবে, তাদের সবাইকে নেবো।

—সুষমা দিদির মত গান কেউ গাইতে পারবে না, দেখলেন তো সেদিন, রুক্মিণীর গানে কেমন জমালে?

—চমৎকার গান—অমন শুনি নি।

শচীন পাশ হইতে বলিল—তুমি যা শোনো, সব চমৎকার! গানের তুমি কি বোঝো হে? আজ সুষমার গান শুনো-এখন, বুঝতে পারবে। সত্যি, ওকে বাদ দিয়ে ছবির কাজ চলবে না। একটু বেশি মাইনে চাইচে, তা দিয়েও রাখতে হবে। নীলা, দীপ্তি ··ওদেরও ছাখো—এখানে ডাক দাও না সব—মিনি, সুবালা, বড় হেনা, ছোট হেনা ··

গদাধর ব্যস্তভাবে বলিলেন—না, না, এখানে ডেকে কি হবে? থাক্ সব, আমি যাচ্চি।

পাঁচ

বাগানের বাড়ীটার সামনেই পুকুর। পুকুরের ওপারে কলমের আমগাছ অনেকগুলি—ওদিকের অংশটা তারের জাল দিয়া ঘেরা। কারণ, এখন আমের বউলের গুটির সময় আসিতেছে—ইজারাদার ঘিরিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কলমবাগান ও পুকুরের মাঝখানে এখনও বেশ ভালো-ভালো গোলাপ হয়। এখানে বাঁধানো চবুতারায় একটা দল ভিড় করিয়া বসিয়া গল্পগুজব ও হল্লা করিতেছে।

শচীন বলিল—অঘোরবাবুকে তাহ'লে ডাকি। আজ দোল-পূর্ণিমা, শুভ দিন—একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল! যেমন কথা আছে।

—অঘোরবাবু এসেচেন?

—এই তো মোটরের শব্দ হলো,—এলেন বোধহয়। স্টুডিওর মোটর আনতে গিয়েছিল কিনা!

—বেশ, ক'রে ফেল সব ব্যবস্থা।

প্রায় পঞ্চাশ বছরের এক শৌখীন প্রৌঢ় লোক, রঙ শ্যামবর্ণ, বেঁটে, একহারা চেহারা—মাথার চুলে এই বয়সেও ব্রিলেণ্টাইন্ মাখানো, মুখে সিগারেট—আসিয়া ঘাটের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—এই যে, সব এখানে।

শচীন ও গদাধর দু'জনে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আসুন, আসুন। অঘোরবাবু, আপনার কথা হচ্ছিল।

রেখার দিকে চাহিয়া অঘোরবাবু বলিলেন—তাই তো, আমাদের একটা কথা ছিল। না হয় চলুন ওদিকে।

রেখা অভিমানের সুরে বলিল—বললেই হয় যে, উঠে যাও, অমন ক'রে ভণিতা করবার

কি অধিকার আপনার আছে মশাই ?

হাসিয়া অঘোরবাবু বলিলেন—না রেখা বিবি, অধিকার কিছু নেই, জানি ! এখন লক্ষ্মীটি হয়ে দু'পা একটু কষ্ট ক'রে এগিয়ে গিয়ে, ওই চাতালে ব'সে যারা ফূর্তি করচে, ওখানে যাও না। আমরা একটু পাতলা হয়ে বসি।

রেখা রাগ করিয়া বলিল—অমন রেখা-বিবি, রেখা-বিবি বলবেন না বলচি। ও কেমন কথা ! না, আমি অমন সব ধরণের কথা ভালবাসি নে।

রেখা উঠিয়া ফড়ফড় করিয়া চলিয়া গেল।

অঘোরবাবু বলিলেন—তারপর, আপনি তো এই আছেন দেখচি। একটা ব্যবস্থা তাহলে হয়ে যাক্। আজ শুভদিন—দোলযাত্রা—পূর্ণিমা তিথি।

শচীন বলিল—আর এদিকে পূর্ণিমের চাঁদের ভিড়ও লেগে গিয়েচে ঘোষেদের বাগান-বাড়ীতে—আমার মত যদি নাও তবে···

অঘোরবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—অহো, তোমার সব-তাতে ঠাট্টা আর ইয়ার্কি ভালো লাগে না। শোন না, কি কথা হচ্চে।

গদাধর বলিলেন—আপনি হিসেবটা করেচে মোটামুটি ?

—হ্যাঁ, এখন এগার হাজার আন্দাজ বার করতে হবে আপনাকে। সব হিসেব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজ চেক-বই এনেচেন ? পাঁচ হাজার আজই দরকার। বাগানটার লিজ রেজিষ্ট্রি হবে সোমবারে—সেলামীর টাকা আর এক বছরের ভাড়া আজ জমা দিতেই হবে। অনেকখানি জমি আছে—স্টুডিওর উপযুক্ত জায়গা বটে ! আর একটা কাজ করতে হবে আজ—সব মেয়েদের আজ কিছু কিছু বায়না দিয়ে হাতে রাখা চাই। এই ধরুন, রেখা আছে, খুব ভাল নাচ অর্গানাইজ করে। ওকে রাখতে হবে। তারপর ধরুন সুষমা—ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ফিল্ম স্টুডিওতে এখনও কাজ করে, ওকে আগে আটকাতে হবে। একবার ওদের সব ডাকিয়ে এনে যার-যার নাচ-গান দেখে-শুনে নেবেন নাকি ?

শচীন বলিল—না, না, সেটা ভালো হয় না। ওরা সবাই নামজাদা আর্টিস্ট—ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কাজ করচে, কেউ-বা করেচে—ওদের নাম কে না জানে ? এই ধরুন, সুষমা···

অঘোরবাবু আঙুলে টাকা বাজাইবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—আরে রেখে দাও আর্টিস্ট—সবাই আর্টিস্ট ! আমিই কি কম আর্টিস্ট ? টাকা খরচ করতে হবে যেখানে, সব বাজিয়ে নেবো—এই রকম ক'রে বাজিয়ে নেবো। আমি বুঝি, কাজ। এই অঘোরনাথ হালদার সাতটা ফিল্ম কোম্পানি এই হাতে গড়েচে, আবার এই হাতে ভেঙেচে। ও কাজ আর আমায় তুমি শিখিও না।

গদাধর বলিলেন—যাক্, ওসব বাজে কথায় কান দেবেন না। আপনি যা ভালো বুঝবেন, করুন। কত টাকা চাই এখন বলুন ?

—তাহ'লে ওদের সব ডাকি। পৃথক্-পৃথক্ কন্ট্রাক্ট হোক্—সোমবার সব রেজিষ্ট্রি হবে—লিজের সেলামী দু'হাজার আর ভাড়া পাঁচশো—এ টাকাটি আলাদা ক'রে রেখে

বাকি ওদের দিয়ে দেবো।

—ওদের টাকা এখন দিতে হবে কেন? কণ্ট্রাক্ট রেজিস্ট্রি হবার সময় টাকা দিলেই চলবে।

—না, না, এ তো বায়না। অঘোর হালদার অত কাঁচা কাজ করে না স্যর।

—বেশ।

রেখার ডাক পড়িল পুকুর-ঘাটে। অঘোরবাবু বলিলেন—রেখা বিবি, লেখাপড়া জানো তো? ফর্ম সই করতে হবে এখুনি।

—আবার রেখা বিবি?

—বেশ, কি ব'লে ডাকতে হবে, শিখিয়ে দাও না হয়!

—কেন, রেখা দেবী…পোস্টারে লেখা থাকে দেখেন নি কখনো? রেখা বিবি বললে আমি জবাব দিই নে।

বলিয়া রেখা নাক উঁচু করিয়া গর্ব্বিতভাবে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া চমৎকারভাবে সপ্রমাণ করিল যে, সে একজন সুনিপুণ অভিনেত্রী—যদিও ভঙ্গিটা বিলিতি ছবির অভিনেত্রীদের হুবহু নকল।

অঘোরবাবু বলিলেন—এখানে সই করো, বেশ স্পষ্ট ক'রে লেখো—

রেখা নিজের ব্লাউজের বুকের দিকটা হইতে ছোট একটা ফাউণ্টেন পেন বাহির করিতেই অঘোরবাবু বলিয়া উঠিলেন—আরে, বলো কি! তোমার আবার ফাউণ্টেন পেন বেরুলো কোথা থেকে…য়্যাঁ! তুমি দেখচি কলেজের মেয়ে কি ইস্কুলের মাস্টারনী বনে গেলে! বলি, কালি-কলমের সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক, জিজ্ঞেস্ করি? টাকাটা লেখো, টাকা!

—কত টাকা? যথেষ্ট অপমান তো করলেন।

—মাছের মায়ের পুত্র-শোক! অপমান কিসের মধ্যে দেখলে? সত্তর টাকার মধ্যে বায়না আজ পাঁচ টাকা।

রেখা রাগ করিয়া কলম বন্ধ করিয়া বলিল—পাঁচ টাকা? চাই না, দিতে হবে না। পাঁচ টাকা এ্যাডভান্স্ নিয়ে যারা কাজ করে, তারা এক্স্ট্রা ভিড়ের সিনে প্লে করে—আর্টিস্ট নয়। আমাদের অপমান করবেন না।

—কত চাও রেখা দেবী, শুনি?

—অর্দ্ধেক—পঁয়ত্রিশ টাকা—থার্টি-ফাইভ্ রুপিজ্।

—থাক্ থাক্, আর ইংরিজি বলতে হবে না। দিচ্চি আমি, তাই দিচ্চি। আমাদের একটু নাচ দেখাবে তো? লেখো টাকাটা।

—পরে হবে-এখন।

—এখনই হবে, ক্যাপিটালিস্ট দেখতে চাচ্ছেন—ওঁর ইচ্ছে এখানে সকলের বড়।

রেখা দ্বিরুক্তি না করিয়াই পেশাদার নর্ত্তকীর সহজ ও বহুবার-অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পুকুর-ঘাটের চাওড়া চাতালের উপর আধুনিক প্রাচ্য-নৃত্য শুরু করিল। রেখা কৃশাঙ্গী মেয়ে। নাচের উপযুক্ত দেহের গড়ন বটে—জ্যোৎস্না রাত্রে নৃত্যরতা তরুণীর বিভিন্ন লাস্যভঙ্গি দেখিয়া গদাধর

ভাবিলেন—টাকা সার্থক হয় এই ব্যবসায়। খরচ করেও সুখ, লাভ যদি পাই তাতেও সুখ! যে বয়সের যা—আমার বয়েস তো চলে যায় নি এ-সবের!

অল্প একটু বিশ্রাম করিয়া রেখা বলিল—কথাকলি দেখবেন? সেবার এম্পায়ারে এসেছিলেন সত্যভামা দেবী—মাদ্রাজী মেয়ে, অমন কথাকলি আর কখনো···কি পোজ্‌ এক-একখানা! আমরা স্টুডিও সুদ্ধু নাচিয়ের দল এম্পায়ারে দেখতে গিয়েছিলুম কোম্পানির খরচে। দেখবেন?

—তুমি একবার দেখেই অমনি শিখে নিলে?

—কেন নেবো না—আমরা আর্টিস্ট্‌ লোক!

—আচ্ছা, থাক্‌ এখন কথাকলি। সুষমা দেবী কই? তাঁকে ডেকে ফর্মটা সই ক'রে নেওয়া দরকার।

ডাক দিতে সুষমা আসিল। দেখিতে ভালো নয়, দোহারা চেহারা—গলার স্বর বেশ মিষ্ট। বেশি কথা বলে না, তবে সে আসিয়া সমস্ত জিনিসটা একটা তামাশার ভাবে গ্রহণ করিল।

অঘোরবাবু বলিলেন—টাকাটা লিখুন আগে—চল্লিশ টাকা।

সুষমা কোনো কথা না বলিয়া নাম সই করিয়া চেক্‌ লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অঘোরবাবু বলিলেন—উঁহু, গান গাইতে হবে একটা—

সুষমা হাসিয়া বলিল—সে কি? এখন কখনো গান হতে পারে?

—ক্যাপিটালিস্ট বলচেন,—ওঁর কথা রাখতে হবে। গান করুন একটা।

গদাধর মোলায়েম ভাবে বলিলেন—না, না, থাক্‌। উনি নামকরা গায়িকা—সবাই জানে। ওঁকে আর গান গাইতে হবে না। ও নিয়ম সকলের জন্যে নয়।

রেখা কাছেই ছিল, সে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—নিয়মটা তবে কি আমার মত বাজে লোকদের জন্যে তৈরী? এ তো রীতিমত অপমানের কথা। না, এ কখনো···

ইহাদের কি করিয়া চালাইতে হয়, অঘোরবাবু জানেন। তিনি রেখার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া বলিলেন—রেখা বি—মানে দেবী, চটো কেন? গান আমরা সর্ব্বদা গ্রামোফোনে শুনচি, রেডিওতে শুনচি। কলকতায় তো গান শোনবার অভাব নেই—কিন্তু নাচ আমরা সর্ব্বদা দেখি নে—তোমার মত আর্টিস্টের নাচ দেখার একটা লোভও তো আছে—বুঝলে না?

গদাধরের বেশ লাগিতেছিল। বাড়িতে থাকিলে এতক্ষণ তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—নয়তো বসিয়া গদির হিসাবপত্র দেখিতেছেন। এ তবু পাঁচজনের মুখ দেখিয়া আনন্দে আছেন—বিশেষ করিয়া এমন সঙ্গ, এমন একটা রাত! একবার তাঁহার মনে হইল, অনঙ্গ আজ একটু সকাল-সকাল ফিরিতে বলিয়াছিল, বাড়ীতে যেন কি পূজা হইবে। তা তিনি গিয়া কি করিবেন? ভড়মশায় আছে, নিতাই আছে—দু'জন চাকর আছে—তাহারাই সব দেখাশুনা করিতে পারিবে এখন। তাঁহার অত গরজ নাই।

একে-একে অনেকগুলি মেয়ের কণ্ট্রাক্ট-ফর্ম সই করা হইয়া গেল। তাহারা পুকুরের সামনের পাড়ে—যেখানে সাবেক কালের গোলাপবাগ, সেদিক হইতে আসে—আসিয়া সই করিয়া আবার গোলাপবাগে ফিরিয়া যায়—যেন একগাছি ফুলের মালা ঢল হইয়া গিয়াছে—এক-একটি করিয়া ফুল সরিয়া-সরিয়া স্থতার এদিক হইতে ওদিকে নাচের ভঙ্গিতে চলিতেছে…

গদাধর কি একটা ইঙ্গিত করিলেন একজন চাকরকে।

অঘোরবাবু বলিলেন—এখন আর না স্যর, যদি আমায় মাপ করেন। কাজের সময় ইয়ে ওটা বেশি না খাওয়াই ভালো।—হ্যাঁ, আর-একটা কথা স্যর—যদি বেয়াদবি হয়, মাপ করবেন। আপনি ক্যাপিটালিস্ট, মালিক—একটু রাশভারি হয়ে চলবেন ওদের সামনে। ওরা কি জানেন, 'নাই' যদি দিয়েচেন, তবে একেবারে মাথায় উঠেচে! ধমকে রাখুন, ঠিক থাকবে। 'নাই' ওদের কখনো দিতে নেই। ওই রেখা…আপনার সামনে অত-সব কথা বলতে সাহস করবে কেন? আমি এর আগে ছিলাম বেঙ্গল ন্যাশনাল ফিল্ম-এ—ক্যাপিটালিস্ট ছিল দেবীচাঁদ গোঠে, ভাটিয়া মার্চেণ্ট। ক্রোড়পতি। গোঠে যখন স্টুডিওতে ঢুকতো—তার গাড়ীর আওয়াজ পেলে সব থরহরি লেগে যেতো। ওই শোভা মিত্তিরের মত—নাম শুনেচেন তো? অমন দরের বড় আর্টিস্টও গোঠেজির সামনে ভালো ক'রে চোখ তুলে কথা বলতে সাহস করতো না। শোভারাণী মিত্তিরের কাছে রেখা-টেখা এরা সব কি? শোভা এখন এদের এই কোম্পানিতে কাজ করে শুনচি।

গদাধর চুপ করিয়া শুনিলেন।

চাকর আসিয়া এই সময় জানাইল, খাবার জায়গা হইয়াছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—সব ডেকে নিয়ে যা। আমি আর ইনি এখন না—পরে হবে।

চাকর বলিল—জী আচ্ছা।

অঘোরবাবু বলিলেন—এখন খেতে বসলে, ওদের সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে হবে—সেটা ঠিক হবে না মশাই। নিজের চাল বজায় রেখে, নিজেকে তফাৎ রেখে চলতে হবে, তবে ওরা মানবে, ভয় করবে।

গোলাপবাগের মধ্যে যে দলটি ছিল, তাহারা হল্লা করিতে-করিতে খাইতে গেল। রাত দেড়টার কম নয়। একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, চাঁদের আলোয় বাগানের পুরানো চাতাল, হাতভাঙা পরীর মূর্ত্তি, হাতলখসা লোহার বেঞ্চি, শুকনো ফোয়ারা ইত্যাদি এক অদ্ভুত ছন্নছাড়া শ্রী ধারণ করিয়াছে। এ এমন একটা জগৎ, সেখানে যে-কোনো অসম্ভব ঘটনা যেন যে-কোন মুহূর্ত্তে ঘটিতে পারে! এখন হঠাৎ যদি চোগা-চাপকান-পরা শামলা মাথায় ৺আনন্দনারায়ণ ঘোষ মহাশয় একতাড়া কাগজ হাতে, তাঁহার উনবিংশ শতাব্দীর গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া ওই হাতভাঙা পরীর মূর্ত্তিটার আড়াল হইতে ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসেন—তবে যেন কেহই বিস্মিত হইবে না।

গদাধর বলিলেন—আর কত টাকা লাগবে?

—আরও দু'হাজার তো কালই চাই—মজুত রাখবেন স্যর; তাহলে আপনার হলো

এগারো হাজার।

—আমার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়?

—আপনার গদিতে।

—না। আমার গদিতে এখন যাবার দরকার নেই। এ ব্যাপারটা একটু প্রাইভেট রাখতে চাই।

—তাহলে ওই দু'হাজারের চেক্‌টা!…

—কাল আমায় ফোন্ করবেন—ব'লে দেবো, কোথায় গিয়ে নিতে হবে।

—যে আজ্ঞে, স্যর। আপনি যেমন আদেশ দেবেন, সেইভাবে কাজ হবে। আমার কাছে কোনো গোলমাল পাবেন না কাজের, আপনি টাকা ফেলবেন, আমি গ'ড়ে তুলবো। এই আমার কাজ—এজন্যে আপনি আমায় মাইনে দেবেন, শেয়ার দেবেন—আপনি কাজ দেখে নেবেন। আমায় তো এমনি খাটাচ্চেন না আপনি?

চাকর আসিয়া বলিল—আসেন বাবুজী, আপনাদের চৌকা লাগানো হয়েছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—কোথায় রে?

—হল-ঘরের পাশের কামরামে।

– চলুন তবে স্যর, রাত অনেক হলো, খেয়ে আসা যাক্। তবে একটা কথা বলি। আপনি এদের অনেককে ভাঙিয়ে নিচ্চেন, এদের স্টুডিওর লোকেরা যেন না জানতে পারে। আজ তো ওদেরই পার্টি—শচীনবাবুকে বলবেন কথাটা গোপন রাখতে।

—না, কে জানবে? শচীন খেতে গিয়েছে…এলেই ব'লে দেবো।

রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গদাধর দেখিলেন, এখন আর বাড়ী যাওয়া চলে না। গদিতে গিয়া অবশ্য শুইতে পারিতেন, সেও এখন সম্ভব নয়। ভড়মশায় গদিতে রাত্রে থাকে… সে কি মনে করিবে?

সুতরাং বাকি রাতটুকু অঘোরবাবুর সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতে হইবে।

অঘোরবাবুও দেখা গেল গল্প পাইলে আর কিছুই চান না…কিংবা হয়তো তাঁহারও বাড়ী ফিরিবার উপায় নাই এখন।

সকাল হইয়া গেল।

গদাধর বাগানের পুকুরে স্নান সারিয়া চা-পান করিয়া একটু সুস্থ হইলেন। স্টুডিওর অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল শেষরাত্রের দিকে সব চলিয়া গিয়াছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—তবে আমি যাই স্যর, বাড়ী গিয়ে একটু ঘুমোবো।

—চলুন, আমিও যাবো। শচীনকে দেখচি নে, সে বোধহয় রাত্রে চলে গিয়েছে।

গদাধর বাগান-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু নিজের বাড়ী বা গদিতে না ফিরিয়া, শোভারাণীর বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন। শোভা সবে স্নান সারিয়া, চা পানের উদ্যোগ করিতেছে, গদাধরকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আপনি কি মনে ক'রে? এত সকালে?

গদাধর আগের মত লাজুক ও নিরীহ পল্লীগ্রামের গৃহস্থটি আর এখন নাই। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি প্রথমেই শোভার কথার কোনো উত্তর না দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। কোনোদিকে কেহ নাই। তখন স্বর নীচু করিয়া তিনি বলিলেন—আমায় দেখে রাগ করেচো, না খুশী হয়েচো শোভা ?

মুখ ঘুরাইয়া শোভা বলিল—ওসব ধ্যানের কথা এখন থাক্। আমার নষ্ট করবার মত সময় নেই হাতে···কোনো কাজ আছে ?

গদাধর হাসি-হাসি মুখে বলিলেন···না কোনো কাজ নয়, তোমায় দেখতে এলাম।

—হয়েছে, থাক্।

—রাগ কিসের ?

—রাগের কথা তো বলিনি—সোজা কথাই বলচি।

এইসময় ভৃত্য শুধু শোভার জন্য চা ও খাবার আনিয়া, টি-পয় আগাইয়া শোভার ঈজি-চেয়ারের পাশে বসাইয়া দিল। শোভা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—বাবুর কই ?

—আপনি তো বললেন না, মাইজি !

—যত সব উল্লুক হয়েচো ! বলতে হবে কি ? দেখতে পাচ্চো না ?

গদাধর ব্যস্ত হইয়া বলিতে গেলেন—আহা, থাক্, থাক্, আমার না হয়—আমি আর এখন চা খাবো না শোভা।

শোভা নিস্পৃহ-কণ্ঠে বলিল—তবে থাক্। সত্যিই খাবেন না ?

—না, না—আমি—এখন থাক্।

শোভা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজেই চা পান শুরু করিয়া দিল।

গদাধর গলা ঝাড়িয়া বলিলেন—কাল সব কণ্টাক্ট হয়ে গেল শোভা। আমার অনুরোধ, তোমায় আমার কোম্পানিতে আসতে হবে—কাল রেখা আর সুষমা কণ্ট্রাক্ট করলে।

শোভা চায়ে চুমুক দিতে যাইয়া, চায়ের পেয়ালা অর্দ্ধপথে ধরিয়া, গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কোথায় হলো ?

—কাল রাত্রে, ঘোষেদের বাগান-বাড়ীতে।

—অঘোরবাবু ছিল ?

—হ্যাঁ, সেই তো সব যোগাড় করচে।

শোভা আর কোনো কথা না বলিয়া নিঃশব্দে চা খাইয়া চলিল—উদাসীন, নিস্পৃহভাবে। কোনো বিষয়ে অযথা কৌতুহল দেখানো যেন তাহার স্বভাব নয় ! চা শেষ করিয়া সে পাশের ঘরে কোথায় অল্পক্ষণের জন্য উঠিয়া গেল, যাইবার সময় গদাধরকে কিছু বলিয়াও গেল না। পুনরায় যখন ফিরিল, তখন হাতে দু'খানা গ্রামোফোনের রেকর্ড। একখানা গদাধরের হাতে দিতে-দিতে বলিল—এই দেখুন, আমার গান বেরিয়েচে, এইচ. এম. ভি—কাল এনেচি।

গদাধর পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন—তাই তো। বেশ ভালো গান ?

—শুনবেন নাকি ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা মন্দ কি। বাজাও না।

শোভা রেকর্ডখানা গদাধরের হাত হইতে লইয়া পাশের ঘরে বড় ক্যাবিনেট্ গ্রামোফোনে চড়াইয়া দিয়া আসিল। গদাধর গানের বিশেষ-কিছু বোঝেন না, ভদ্রতার খাতিরে একমনে শুনিবার ভান করিয়া বসিয়া রহিলেন। রেকর্ড শেষ হইলে মুখে কৃত্রিম উৎসাহের ভাব আনিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ, ভারি চমৎকার। ওখানাও দাও, শুনি।

শোভা কিন্তু নিজে একবারও জিজ্ঞাসা করিল না, গান কি-রকম হইয়াছে। বোধহয় গদাধরের নিন্দা বা সুখ্যাতির উপর সে কোনো আস্থা রাখে না। রেকর্ড বাজানো শেষ হইয়া গেল। শোভা একবার ঘড়ির দিকে চাহিল। গদাধর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন। এইবার বোধহয় শোভা উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, দশটা প্রায় বাজে। অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে বলিতে হইল—আচ্ছা, আমি তাহ'লে আসি।

—আসুন।

—আমার কথার কোনো উত্তর দিলে না তো ?

—কি কথা, বুঝলাম না।

—আমার ফিল্ম্ কোম্পানিতে কণ্ট্রাক্ট করার।

শোভা গম্ভীর মুখে বলিল—আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করুন, এ-কথা আমি আপনাকে বলচি নে। তবুও কণ্ট্রাক্ট করার আগে আমায় বললে পারতেন। আপনার টাকা গেল, তাতে আমার কিছুই নয়। আপনার টাকা আপনি খরচ করবেন, তাতে আমার কি বলার থাকতে পারে ! কিন্তু আপনি যে-কাজ জানেন না, সে-কাজে না নামাই আপনার উচিত ছিল। অবিশ্যি আমি এমনি বললাম। আপনাকে বাধাও দিচ্ছি নে, বা বারণও করচি নে। আপনার বিবেচনা আপনি করবেন।

—তোমার কি মনে হয়, এ-ব্যবসা লাভের হবে না ?

—আমার কিছুই মনে হয় না। আমায় জড়াচ্চেন কেন এ-কথায় ?

—না, বললে কিনা কথাটা, তাই বলচি।

—আমার যা মনে হয়, তা আপনাকে আমি বললাম। ফিল্ম্ কোম্পানি খুলে সকলে যে লাভবান হয়, লক্ষপতি হয়, তা নয় বলেই ধারণা। অঘোরবাবু অবিশ্যি দু-তিনটে ফিল্ম্ কোম্পানিতে ছিলেন, কাজ বোঝেন—তবে অনেস্ট কিনা জানি না। আপনি করেন অন্য ব্যবসা, এর মধ্যে আপনি না নামলেই ভালো করতেন !

—তুমি বড় নিরুৎসাহ ক'রে দাও কেন লোককে ! নামচি একটা শুভ কাজে—তুমি আসবে কিনা বলো।

—দোহাই আপনার গদাধরবাবু, আমি কিছু নিরুৎসাহ করি নি। আপনি দমবেন না। তবে আমার কথা যদি বলেন, আমার আসা হবে না।

—এই উত্তর শোনবার জন্যে আজ সকালে তোমার এখানে এসেছিলাম আমি? মনে বড় কষ্ট দিলে শোভা। আমার বড় আশা ছিল, তোমাকে আমি পাবোই।

শোভা রাগের সুরে বলিল—আপনি পাটের ব্যবসা ক'রে এসেছেন, অন্য ব্যবসার কথা আপনি কি বোঝেন যে যা-তা বলতে আসেন? প্রথম আমি তো ইচ্ছে করলেই যেতে পারি নে—এদের স্টুডিওতে আমার এখনও এক-বছরের কণ্ট্রাক্ট রয়েছে। তাছাড়া আমি একটা নিশ্চিত জিনিস ছেড়ে অনিশ্চিতের পেছনে ছুটবো, এত বোকা আমায় ঠাউরেচেন?

—আমার কোম্পানি অনিশ্চিত?

—তা না তো কি? আপনি ও-কাজ বোঝেন না। পরের হাতে খেলতে হবে আপনাকে। এক ব্যবসায় টাকা রোজগার ক'রে অন্য এক ব্যবসাতে ঢালচেন—কারো সঙ্গে পরামর্শ করেন নি। ওতে আমার যেতে সাহস হয় না—এক কথায় বললাম।

—আচ্ছা, আমি যদি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতাম, কি পরামর্শ দিতে?

—সে-কথার দরকার নেই। কারো কথার মধ্যে আমি কখনো থাকি নে গদাধরবাবু, আমায় মাপ করবেন। বিশেষ ক'রে এর মধ্যে রেখা, সুষমা রয়েচে—ওরা সকলেই আমার বন্ধুলোক, এক স্টুডিওতে কাজ করেচি অনেক দিন। অঘোরবাবুকে আমি কাকাবাবু ব'লে ডাকি। উনিও আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। অতএব আমি এ কথার মধ্যে থাকবো না।

—তা হচ্চে না, আমার কথার উত্তর দাও—তুমি কি পরামর্শ দিতে?

শোভা ধমকের সুরে বলিল—ফের আবার ওই কথা! ওর উত্তর আমার কাছে নেই। আচ্ছা, আমাকে কেন আপনি এর মধ্যে জড়াতে চান, বলতে পারেন? আমি কারো কথায় কখনো থাকি নে। তবুও আমি কখনও আপনাকে এ-পরামর্শ দিতাম না।

—দিতে না?

—না। ব্যস, আপনি এখন আসুন। আমি এক্ষুনি উঠবো, অনেক কাজ আছে আমার।

গদাধর কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন।

ছয়

ইহার দুইদিন পরে ভড়মশায় গদিতে বসিয়া কাজ করিতেছেন, গদাধর বলিলেন—তেরো তারিখে একটা চেক্ ডিউ আছে ভড়মশায়, ছ'হাজার টাকা জমা দিতে হবে ব্যাঙ্কে।

ভড়মশায় মনিবের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—ছ'হাজার টাকা এই ক'দিনের মধ্যে? টাকা তো মোকামে আটকে আছে—এখন এত টাকা এই ক'দিনের মধ্যে কোথায় পাওয়া যাবে বাবু?

—তা হবে না! চেষ্টা দেখুন, পথ হাত্‌ড়ান।

—অত টাকার চেক্ কাকে দিলেন বাবু?

অন্য কর্ম্মচারী হইলে মনিবকে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিত না হয়তো—কিন্তু ভড়মশায় পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, ঘরের লোকের মত—তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র অধিকার। কথাটা এড়াইবার ভঙ্গিতে গদাধর বলিলেন—ও আছে একটা—ইয়ে—তাহ'লে কি করবেন বলুন তো?

ভড়মশায় চিন্তিত-মুখে বলিলেন—দেখি, কি করতে পারি। বুঝতে পারচি নে!

কিন্তু কয়দিন নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ভড়মশায় বারো তারিখে মনিবকে কথাটা জানাইলেন। মোকামে টাকা আবদ্ধ আছে, এ-কদিনের মধ্যে কাঁচা মাল বেচিয়া টাকা যোগাড় করা সম্ভব নয়। তিনটি মিলের পাটের মোটা অর্ডার কণ্ট্রাক্ট করা আছে, তিন মোকাম হইতে সেই অর্ডার-মাফিক পাট ক্রয় চলিতেছে—সে টাকা অন্যক্ষেত্রে ঘুরাইয়া আনিতে গেলে, মিলে সময়মত পাট দেওয়া যায় না।

গদাধর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। চেক্ ব্যাঙ্ক হইতে ফিরিয়া গেলে লজ্জার সীমা থাকিবে না। অবশ্য অন্য কোনো গদি হইতে টাকাটা ধার করা চলিত—কিন্তু তাহাতে মান থাকে না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া গদাধর সেদিন রাত ন'টার পরে শোভার বাড়ী গেলেন। এদিকে ভড়মশায় চিন্তাকুল মুখে আছেন দেখিয়া খাইবার সময় অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে ভড়মশায়? মুখ ভার-ভার কেন?

—না, কিছু না।

—বলুন না কি হয়েচে—বাড়ীর সব ভালো তো?

—না, সে-সব কিছু না। একটা ব্যাপার ঘটেচে—আপনাকে না ব'লে থাকাও ঠিক না। বাবু কোথায় আগাম চেক্ দিয়েচেন মোটা টাকার। ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে নয়, তাহ'লে আমার অজানা থাকতো না। তাহ'লে উনি কোথায় এ-টাকা খরচ করচেন? কথাটা আপনাকে জানানো আমার দরকার। তবে আমি বলেচি, এ-কথা যেন বলবেন না বাবুকে।

অনঙ্গ চিন্তিত-মুখে বলিল—তাই তো ভড়মশায়, আমি কিছু ভাবগতিক তো বুঝচি নে—মেয়ে-মানুষ কি করবো বলুন? কিন্তু ওঁর ভাব যে কত বদ্‌লেচে সে আপনাকে কি বলি! বড় ভাবনায় পড়েচি ভড়মশায়। আপনাকে বলব একদিন পরে! উনি আজ-কাল রাতে প্রায়ই বাড়ী আসেন না। দোল-পুন্নিমের দিন দেখলেনই তো!

—হ্যাঁ, সে-কথা বাবুকে জিগ্যেস করেছিলেন?

—করেছিলাম। বললেন, ব্যবসার কাজ ছিল। আজকাল আমার ওপর রাগ-রাগ ভাব—সব-সময় কথা বলতে সাহস পাই নে। উনি কেমন যেন বদলে গিয়েচেন—কখনো তো উনি এরকম ছিলেন না! এখন ভাবচি, আমাদের কলকাতায় না এলেই ভালো ছিল। বেশ ছিলাম দেশে। কালীঘাটের মা-কালীর কাছে মানত করেচি, জোড়া পাঁটা দিয়ে পুজো দেবো—ওঁর মতি-গতি যেন ভালো হয়ে ওঠে। বড় ভাবনায় আছি। আর কার কাছে কি

বলবো বলুন, এখানে আমার কে আছে এক আপনি ছাড়া !

অনঙ্গ আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিল।

ভড়মশায় চিন্তিত-মুখে বলিলেন—তাই তো, আমাকে বললেন মা—ভালো হলো। এত কথা তো আমি কিছুই জানতাম না। এখন বুঝতে পারচি নে কি করা যায়। আমারও তো যাবার সময় হলো।

অনঙ্গ বলিল—আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না ভড়মশায়। কলকাতায় আপনার যত অসুবিধাই হোক, ওঁকে এ-অবস্থায় ফেলে আপনি যেতে পাবেন না। আমার আর কেউ নেই ভড়মশায়—কে ওঁকে দেখে ! এখানে ওই শচীন ঠাকুরপো হয়েচে ওঁর শনি। আর ওই নির্ম্মল—ওদের সঙ্গে মিশেই এ-রকম হয়েচেন—আমাকে এ-আথান্তরে ফেলে আপনি চলে যাবেন না।

—আচ্ছা বৌ-ঠাকরুণ, এ-সব কথা আর কারো কাছে আপনি বলবেন না। আমি না হয় এখন দেশে না যাবো—আপনি কাঁদবেন না। চোখের জল মুছে ফেলুন—সতীলক্ষ্মী আপনি, হাতে ক'রে বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেচি—মেয়ের মত দেখি। আপনাদের ফেলে গেলে ধর্ম্মে সইবে না। দেখি, কি হয়—অত ভাববেন না।

ভড়মশায় বিদায় লইলেন।

গদাধর শোভার বাড়ী গিয়া শুনিলেন, সে এই মাত্র স্টুডিও হইতে ফিরিয়া খাইতে বসিয়াছে। সুতরাং তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে শোভা ঢুকিয়া একটা প্লেটে গোটাকয়েক সাজা পান গদাধরের সামনে টিপয়ে রাখিয়া, তাহা হইতে একটা পান তুলিয়া মুখে দিল। কোনো কথা বলিল না।

গদাধর বলিলেন—বোসো শোভা, তোমার কাছে একটা কাজে এসেছিলাম।

শোভা নিজের ইজিচেয়ারটাতে বসিয়া বলিল—কাজ কি, তা তো বুঝতে পেরেচি, তার উত্তরও দিয়েচি সেদিন।

—সে কাজ নয় শোভা। বড় বিপদে প'ড়ে এসেচি তোমার কাছে। একজনকে চেক দিয়েচি ছ'হাজার টাকার—কাল ব্যাঙ্কে চেক দাখিল ক'রে ভাঙাবার তারিখ—অথচ টাকা নেই ব্যাঙ্কে। কালই ছ'হাজার টাকা বেলা দশটার সময় জমা দিতে হবে—অথচ আমার হাতে নেই টাকা ! সব টাকা মোকামে আবদ্ধ। এখন কি করি—কাল মান যায়, তাই তোমার কাছে এসেচি !

শোভা বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমি কি করবো ?

—টাকাটা এক মাসের জন্য ধার দাও—আমি হ্যাণ্ডনোট দিচ্চি—মোকাম থেকে টাকা এলে শোধ ক'রে দেবো। এই উপকারটা কর আমার। বড় বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেচি।

শোভা বলিল—আমি তো হ্যাণ্ডনোটের ব্যবসা করি নে—মহাজনী কারবারও নেই

আমার। আমার কাছে এসেছেন টাকা ধার নিতে, বেশ মজার লোক তো আপনি! আপনার কলকাতায় বাড়ী আছে, মটগেজ রাখলে যে-কোন জায়গা থেকে ধার পাবেন। ব্যাঙ্ক থেকেই তো ওভারড্রাফ্‌ট্‌ নিতে পারেন!

গদাধর দুঃখিতভাবে বলিলেন—সে-সব করা তো চলে, কিন্তু তাতে বাজারে ক্রেডিট থাকে না ব্যবসাদারের। ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফ্‌ট্‌ নেওয়া চলবে না—বাড়ী বন্ধক দেওয়াও নয়। আছে অনঙ্গর গহনা, তা কি এখন বিক্রি করতে যাবো?

শোভা নিস্পৃহ ভাবে বলিল—কিন্তু আমি সেজন্যে দায়ী নই। আমার কাছে কেন এসেছেন? আপনার বোঝা উচিত ছিল আমার কাছে আসবার আগে, যে, আমি পোদ্দার নই, টাকা ধারের ব্যবসাও করি নে।

—তা হোক, তুমি দাও, ও-টাকাটা তোমার আছে খুবই। আমার বড় উপকার করা হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিল। শোভা কিছুতেই টাকা দিবে না, গদাধরও নাছোড়বান্দা। অবশেষে বহু অনুনয়-বিনয়ের পরে শোভা চার হাজার টাকা দিতে মিমরাজিগোছের হইল—বাকি টাকা দিতে সে পারিবে না, স্পষ্ট বলিল—গদাধর অন্য যেখান হইতে পারেন, সে টাকা যোগাড় করুন—

গদাধর বলিলেন—তবে চেক্‌খানা লিখে ফেল—আমি হ্যাণ্ডনোট্‌ লিখি—সুদ কত লিখবো?

—সাড়ে বারো পার্সেণ্ট।

—ওটা সাড়ে-নয় ক'রে নাও। তুমি তো আর সুদখোর মহাজন নও? উপকার করবার জন্যে তো দিচ্চো—সুদের লোভে দিচ্চো না তো!

—টাকা ধার দিচ্চি যখন, তখন ন্যায্য সুদ নেবো না তো কি! উপকার করচি, কে আপনাকে বলেচে? কারো উপকার করার গরজ নেই আমার। সাড়ে-বারো পার্সেণ্টের কমে পারবো না। ওর চেয়েও বেশি সুদ অপরে নেয়।

গদাধর অগত্যা সেই হিসাবেই হ্যাণ্ডনোট্‌ লিখিয়া, চেক লইয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রে অনঙ্গ স্বামীকে বলিল,—হ্যাগা, একটা কথা বলবো, শুনবে?

—কি?

—তোমার টাকার দরকার হয়েচে বলচেন ভড়মশায়, কত টাকার দরকার?

—কেন?

—বলো না, কত টাকার?

—দু'হাজার টাকার—দেবে?

—আমার গহনা বাঁধা দাও—নয় তো বিক্রি করো। নয় তো আর টাকা কোথা থেকে পাবে! কিন্তু এত টাকা তোমার দরকার হলো কিসের?

—সে-কথা এখন বলবো না। তবে জেনে রেখো যে, ব্যবসার জন্যেই দরকার। ভড়মশায় জানেন না সে-কথা।

—দেখ, আমি মেয়েমানুষ—কিই-বা বুঝি? কিন্তু আমার মনে হয়, ভড়মশায়কে না জানিয়ে তুমি কোনো ব্যবসাতে নেমো না—অন্ততঃ পরামর্শ কোরো তাঁর সঙ্গে।—পাকা লোক—আর আমাদের বড় হিতৈষী—আমায় না হয় নাই বললে, কিন্তু ওঁকে জানিও।

—এ নতুন ব্যবসা। ভড়মশায় সেকেলে লোক—উনি এর কিছুই বোঝেন না। থাক্, এখন কোনো পরামর্শ করবার সময় নেই কারো সঙ্গে—যথাসময়ে জানতে পারবে। তুমি এখন খেতে দেবে, না, বক্‌বক্ করবে?

ধমক খাইয়া অনঙ্গ আর কোনো কথা না বলিয়া স্বামীর ভাত বাড়িতে গেল। স্বামীর চোখে ভালোবাসার দৃষ্টি সে আর বহুদিন হইতেই দেখে না—আগে-আগে রাগের কথা বলিলেও স্বামীর চোখে থাকিত প্রেম ও স্নেহের দৃষ্টি—এখন ভালো কথা বলিবার সময়েও সে দৃষ্টির হদিস পাওয়া যায় না। অনঙ্গ যেন স্বামীর মন হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। কেন এমন হইল, কিছুতেই সে ভাবিয়া পায় না।

পরের মাসে অবস্থা যেন আরও খারাপ হইয়া আসিল। গদাধর প্রায় শেষরাত্রের দিকে বাড়ী ফেরেন, অনঙ্গ সন্দেহ করিতে লাগিল। গদাধর মাঝে-মাঝে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফেরেন না! আসিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়েন, কারো সঙ্গে কথা বলেন না—বিছানা হইতে উঠিতে দশটা বাজিয়া যায়। গদির কাজও নিয়মমত দেখাশুনা করেন না। ভড়মশায় ইহা লইয়া দু-একবার বলিয়াও বিশেষ কোনো ফল লাভ করিলেন না।

শ্রাবণ মাসের দিকে হঠাৎ একদিন গদাধর ব্যস্তসমস্ত ভাবে বাড়ী আসিয়া বলিলেন—আমি একবার বাইরে যাচ্ছি, হয়তো কিছু দেরি হতে পারে ফিরতে—খরচপত্র গদি থেকে আনিয়ে নিও—ভড়মশায়কে বোলো, যদি কখনো দরকার হয়।

অনঙ্গ উৎকণ্ঠিত-দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—কোথায় যাবে? ক'দিনের জন্তে —এমন হঠাৎ···

—আছে, আছে, দরকার আছে। দরকার না থাকলে কি বলচি!

—তা তো বুঝলাম—কিন্তু বলতে দোষ কি, বলেই যাও না। তুমি আজকাল আমার কাছে কথা লুকোও—এতে আমার বড় কষ্ট হয়। আমি তোমাকে কখনো বারণ করিনি বা বাধা দিইনি,—তবে আমায় বললে দোষ কি?

—হবে, সে পরে হবে। মেয়েমানুষের কানে সব কথা তুলতে নেই।

অনঙ্গ স্বামীর মেজাজ বুঝিত। বেশি রাগারাগি করিলে তিনি রাগ করিয়া না খাইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবেন। আজকালই যে এমন হইয়াছে তাহা নয়—চিরকাল অনঙ্গ এইরকম দেখিয়া আসিতেছে। তবে পূর্ব্বে অনঙ্গ ইহাতে তত ভয় পাইত না—এখন ভরসাহারা হইয়া পড়িয়াছে—স্বামীর উপর সে-জোর যেন সে ক্রমশঃ হারাইতেছে।

গদাধর একমাসের মধ্যে বাড়ী আসিলেন না, ভড়মশায়কে ব্যবসাসংক্রান্ত চিঠি দিতেন—

তাহা হইতে জানা গেল, জয়ন্তী-পাহাড়ে ভোটান ঘাট নামক স্থানে তিনি আছেন। অনঙ্গ চিঠি দিল খুব শীঘ্র ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিয়া। গদাধর লিখিলেন, এখন তিনি কাজে ব্যস্ত, শেষ না করিয়া যাইতে পারিবেন না। অনঙ্গ কাঁদিয়া-কাটিয়া আকুল হইল।

একদিন পথে হঠাৎ শচীনের সঙ্গে ভড়মশায়ের দেখা। ভড়মশায় শচীনকে গদাধরের ব্যাপার সব বলিলেন।

শচীন বলিল—তা আপনারা এত ভাবচেন কেন? সে কোথায় গিয়েচে আমি জানি।

—কোথায় বলুন—বলতেই হবে। আপনার বৌদিদি ভেবে আকুল হয়েচেন—জানেন তো বলুন।

—আমার কাছে শুনেচেন, তা বলবেন না। সে তার কোম্পানির সঙ্গে শুটিংএ গিয়েচে জয়ন্তী-পাহাড়ে। পাহাড় ও বনের দৃশ্য তুলতে হবে—ভোটান ঘাটে শুটিং হচ্চে।

—সে কি, বুঝলাম না তো! শুটিং কি ব্যাপার?

—আরে, ফিল্ম্ তৈরী হচ্চে মশাই—ফিল্ম্ তৈরী হচ্চে। গদাধর ফিল্ম্ কোম্পানি খুলেচে —অনেক টাকা ঢেলেচে—নিজের আছে, আর একজন অংশীদার আছে। তাই ওরা গিয়েচে ওখানে—কিছু ভাববেন না। আমার কাছে শুনেচেন বলবেন না কিন্তু।

ভড়মশায় শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। মনিব পাটের গদির ক্যাশ ভাঙিয়া ছবি তৈরির ব্যবসায় লাগিয়াছেন, এ ভালো লক্ষণ নয়। সে নাকি যত নটী লইয়া কারবার, তাহাতে মানুষের চরিত্র ভালো থাকে না, থাকিতে পারে না কখনও! বৌ-ঠাকরুণ সতীলক্ষ্মী, এখন দেখা যাইতেছে, তাঁহার আশঙ্কা তবে নিতান্ত অমূলক নয়!

অনঙ্গকে তিনি এ-কথা কিছু জানাইলেন না।

আরও দুই মাস আড়াই মাস কাটিয়া গেল, গদাধর ফিরিলেন না, এদিকে একদিন গদির ঠিকানায় গদাধরের নামে এক পত্র আসিল। মনিবের নামের পত্র ভড়মশায় খুলিতেন—খুলিয়া দেখিলেন, শোভারাণী মিত্র বলিয়া কে একটি মেয়ে তাহার পাওনা চার হাজার টাকার জন্য কড়া তাগাদা দিয়াছে! ভড়মশায় বড়ই বিপদে পড়িলেন—কে এ মেয়েটি—মনিব তাহার নিকট এত টাকা ধার করিতেই-বা গেলেন কেন—এ-সব কথার কোনো মীমাংসাই ভড়মশায় করিতে পারিলেন না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া ঠিক করিলেন, মেয়েটির সঙ্গে নিজেই একবার দেখা করিবেন।

চিঠিতে ঠিকানা লেখা ছিল, ভড়মশায় একদিন ভয়ে-ভয়ে গিয়া দরজায় কড়া নাড়িলেন। চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়াই বলিল—ও, তুমি আড়তের লোক?

ভড়মশায় বলিলেন—হ্যাঁ।

—মাইজি ওপরে আছেন, এসো।

ভড়মশায় কিছু বুঝিতে পারিলেন না—এ চাকরটি কি করিয়া জানিল, তিনি আড়তের লোক?

উপরে যে-ঘরে চাকরটি তাঁহাকে লইয়া গেল, সে ঘরে একটি সুন্দরী মেয়ে চেয়ারে হেলান

দিয়া বসিয়া অন্য-একটি মেয়ের সহিত গল্প করিতেছিল—দেখিয়া ভড়মশায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দরজা হইতে সরিয়া যাইতেছিলেন, মেয়েটি বলিল—কে ?

ভড়মশায় বিনয়ে ও সঙ্কোচে গলিয়া বলিলেন—এই—আমি—

চাকর পিছন হইতে বলিল—আড়তের লোক্।

মেয়েটি বলিল—ও, আড়তের লোক ! তা তোমাকে ডেকেছিলাম কেন জানো—এবার ওরকম চাল দিয়েচো কেন ? ও চাল তুমি ফেরত নিয়ে যাও এবার—আর এক মণ কাটারি ভোগ পাঠিয়ে দিও—এখনি—বুঝলে ?

ভড়মশাই ভয়ে-ভয়ে বলিলেন, তিনি চালের আড়ত হইতে আসেন নাই, গদাধর বসুর গদি হইতে আসিয়াছেন।

মেয়েটি কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—তাই নাকি ! ও, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েচে। কিছু মনে করবেন না, বসুন আপনি। গদাধরবাবু এখন কোথায় ?

—আজ্ঞে, তিনি ভোটান ঘাট···

—ও, শুটিং হচ্ছে শুনেছিলাম বটে। এখনও ফেরেন নি ?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, ঠিকানাটা দিয়ে যান আপনি। একটু চা খাবেন ?

—আজ্ঞে না, মাপ করবেন মা-লক্ষ্মী, আমি চা খাই নে।

—শুনুন, আপনি আমার চিঠিখানা পড়েচেন তাহ'লে ? নইলে আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন ? আমার পাওনা টাকাটার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেকদিন হলো। এক মাসের জন্যে নিয়ে আজ তিন মাস···

—আজ্ঞে, বাবু এলেই তিনি দিয়ে দেবেন। আপনি আর কিছুদিন সময় দিন দয়া ক'রে।

—আচ্ছা, আপনি ভাববেন না। এলে যেন একবার উনি আসেন এখানে, বলবেন তাঁকে।

ভড়মশায় অনেক-কিছু ভাবিতে-ভাবিতে গদিতে ফিরিলেন। কে এ মেয়েটি ? হয়তো ভালো শ্রেণীর মেয়ে নয়, কিন্তু বেশ ভদ্র। যাহাই হউক, ইহার নিকট কর্তা টাকা ধার করিতে গেলেন কেন, বৃদ্ধ তাহাও কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। একবার ভাবিলেন, বৌ-ঠাকরুণকে সব খুলিয়া বলিবেন—শেষে ঠিক করিলেন, বৌ-ঠাকুরুণকে এখন কোনো কথা না বলাই ভালো হইবে। কি জানি, মনিব যদি শুনিয়া চটিয়া যান ?

ইহার মাসখানেক পরে শোভারাণী একদিন একদিন হঠাৎ গদাধরকে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

সকালবেলা। শোভারাণীর প্রাতঃস্নান এখনও সম্পন্ন হয় নাই। আলুথালু চুল, ফিকে নীল রংয়ের সিল্কের শাড়ী পরনে, হাতে ভোরের খবরের কাগজ। শোভা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গদাধর বলিলেন—এই যে, ভালো আছো শোভা ? এই ট্রেন থেকে নেমেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। এখনও বাড়ী যাই নি।

—আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। উত্তর দিতুম, কিন্তু চলে আসবো কলকাতায়, ভাবলুম আর চিঠি দিয়ে কি হবে, দেখাই তো করবো।

—আমার টাকার কি ব্যবস্থা করলেন ?

—টাকার ব্যবস্থা হয়েই রয়েচে। ছবি তোলা হয়ে গেল—এখন চালু হলেই টাকা হাতে আসবে।

—তার আগে নয় ?

—তার আগে কোথা থেকে হবে বলো ? সবই তো বোঝো। কলকাতার বাড়ীও মর্টগেজ দিতে হয়েছে বাকী বারো হাজার টাকা তুলতে। এখন সব সার্থক হয়, যদি ছবি ভালো বিক্রি হয় !

—ওসব আমি কি জানি ? বেশ লোক দেখছি আপনি ! কবে আমার টাকা দেবেন, ঠিক ব'লে যান।

—আর দুটো মাস অপেক্ষা করো। তোমার এখন তাড়াতাড়ি টাকার দরকার কি ? সুদ আসচে আসুক না। এও তো ব্যবসা।

শোভা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—বেশ মজার কথা বললেন যে ! আমার সুদের ব্যবসাতে দরকার নেই। টাকা কবে দেবেন, বলুন ? তখন তো বলেন নি এত কথা—টাকা নেবার সময় বলেছিলেন, এক মাসের জন্যে !

গদাধর মিনতির স্বরে বলিলেন—কিছু মনে কোরো না শোভা। এসময় যে কি সময় আমার, বুঝে ভাখো। ক্যাশে টাকা নেই গদিতে। মিলের নতুন অর্ডার আর নিই নি—এখন পুঁজি যা-কিছু সব এতে ফেলেচি।

—কত দিনের মধ্যে দেবেন ? দু'মাস দেরি করতে পারবো না।

—আচ্ছা, একটা মাস ! এই কথা রইলো। এখন তবে আসি। এই কথাটা বলতেই আসা

—বেশ, আসুন।

দুই মাস ছাড়িয়া তিন মাস হইয়া গেল।

গদাধর বড় বিপদে পড়িয়া গেলেন। ডিস্ট্রিবিউটার ছবি তৈরী করিতে অগ্রিম অনেকগুলি টাকা দিয়াছে, ছবি বিক্রির প্রথম দিকের টাকাটা তাহারাই লইতে লাগিল। ছবি ভাড়া দেওয়া বা বিক্রয় করার ভার তাদের হাতে, টাকা আসিলে আগে তাহারা নিজেদের প্রাপ্য কাটিয়া লয়—গদাধরের হাতে এক পয়সাও আসিল না এই তিন মাসের মধ্যে। অথচ পাওনাদাররা দুবেলা তাগাদা শুরু করিল। যে-পরিমাণে তাহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় তাহারা প্রদর্শন করিতে লাগিল টাকার তাগিদ দিতে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখাইয়া মারকোনি বেতার-বার্ত্তা পাঠাইবার কৌশল আবিষ্কার

করিয়াছিলেন, বা প্রখ্যাতনামা বার্ণার্ড পেলিসি এনামেল করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এরূপ অমানুষিক অধ্যবসায় দেখাইয়াও কোনো ফল হইল না—গদাধর কাহাকেও টাকা দিতে পারিলেন না!

ছবি বাজারে চলিল না, কাগজে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে লাগিল—তবুও গোলা-দর্শকরা মাস-তুই ধরিয়া বিভিন্ন মফঃস্বলের শহরে ছবিখানা দেখিল। কিন্তু ডিষ্ট্রিবিউটারের অগ্রিম দেওয়া টাকা শোধ করিতেই সে টাকা ব্যয় হইল—গদাধরের হাতে যাহা পড়িল—তাহার অনেক বেশি তিনি ঘর হইতে বাহির করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া গদাধর পাইলেন সাত হাজার টাকা। তেইশ হাজার টাকা লোকসান।

ইতিমধ্যে আরও মুশকিল হইল।

পুনরায় একখানা ছবি তোলা হইবে বলিয়া আর্টিস্টদের সঙ্গে, যে-বাগান-বাড়ী ভাড়া লইয়া স্টুডিও খোলা হইয়াছিল—তাহাদের সঙ্গে এবং মেসিন-বিক্রেতাদের সঙ্গে এক বৎসরের কণ্ট্রাক্ট করা হইয়াছিল—ছবি তুলিবার দেরি হইতেছে দেখিয়া তাহারা চুক্তিমত টাকার তাগাদা শুরু করিল। কেহ-কেহ অন্যথায় নালিশ করিবার ভয়ও দেখাইল।

গদাধর যে সাত হাজার টাকা পাইয়াছিলেন—তাহার অনেক টাকাই গেল এই দলের মধ্যে কিছু কিছু করিয়া দিয়া তাহাদিগকে আপাততঃ শান্ত করিতে। শোভার টাকা শোধ দেওয়ার কোনো পন্থাই হইল না। বাজারেও এখন প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দেনা।

অঘোরবাবু উপদেশ দিলেন, ইহার একমাত্র প্রতিকার নতুন একখানা ছবি তৈরি করা। আরও টাকা চাই—গদাধর ডিষ্ট্রিবিউটারদের সঙ্গে কথা চালাইলেন। তাহারা এ ছবিতে বিশেষ লোকসান খায় নাই, নিজেদের টাকা প্রায় সব উঠাইয়া লইয়াছিল—তাহারা বাকি ত্রিশ হাজার টাকা দিতে রাজী হইল—কিন্তু গদাধরকে ত্রিশ হাজার বাহির করিতেই হইবে। ষাট হাজার টাকার কমে ছবি হইবে না।

অঘোরবাবু উৎসাহ দিলেন, ছবি করিতেই হইবে। দু'একখানা ছবি অমন হইয়া থাকে।

সাত

সামনের হপ্তাতেই কাজ আরম্ভ করা দরকার—কিছু টাকা চাই।

গদাধর ভড়মশায়কে বলিলেন—ক্যাশে কত টাকা আছে?

—হাজার-পনেরো।

—আর, মোকামে?

—প্রায় সাত হাজার।

—ক্যাশের টাকাটা আমাকে দিতে হবে। আপনি বন্দোবস্ত করুন—দু'চার দিনের মধ্যে দরকার!

ভড়মশায় মৃদু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—ক্যাশের টাকা দিলে মিলের অর্ডারী মাল কিনবো কি দিয়ে বাবু? ক্যাশের টাকা হাতছাড়া করা উচিত হবে না। মিলওয়ালাদের দু'হাজার গাঁটের অর্ডার নেওয়া হয়েছে—মোকামে অত মাল নেই। নগদ কিনতে হবে। এদিকে মহাজনের ঘরে আর বছরের দেনা শোধ হয় নি—তাদেরও কিছু দিতে হবে।

—হাজার-পাঁচেক রেখে, হাজার-দশেক দিন আমায়।

ভড়মশায় আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে-মনে প্রমাদ গণিলেন। ক্যাশের টাকা ভাঙিয়া বাবু কি সেই ছবি তোলার ব্যবসায়ে ফেলিবেন? এবার যে ছবি তোলা হইল, তাহাতে যদি লাভ হইত, তবে পুনরায় টাকার দরকার হইবে কেন বাবুর? এ কি-রকম ব্যবসা? ভড়মশায় গিয়া অনঙ্গকে সব খুলিয়া বলিলেন।

অনঙ্গ কাঁদিয়া বলিল—কি হবে ভড়মশায়? তাও যায় যাক—আমরা দেশে ফিরে নুন-ভাত খেয়ে থাকবো। আপনি ওঁকে ফেরান।

সেদিন অনঙ্গ স্বামীকে বলিল—ছাখো, একটা কথা বলি। আমি কোনো কথা এতদিন বলি নি, বা তুমিও আমার কাছে কিছু বলো নি। কিন্তু শুনলুম, তুমি টাকা নিয়ে ছবি তৈরির ব্যবসা করচো—তাতে লোকসান খেয়েও আবার তাই করতে চাইচো! এ-সব কি ভালো?

গদাধর বলিলেন—তুমি বুঝতে পারচো না অনঙ্গ। এ-সব কথা তোমায় বলেচে ওই বুড়োটা—না? ও এ-সবের কি বোঝে যে, এর মধ্যে কথা বলতে যায়! ছবিতে লোকসান হয়েচে সত্যি কথা—কিন্তু আর-একখানা দিয়ে আগের লোকসান উঠিয়ে আনবো। ব্যবসার এই মজা। ব্যবসাদার যে হবে, তার দিল চাই খুব বড়—সাহস চাই খুব। পুঁটি মাছের প্রাণ নিয়ে ব্যবসায় বড় হওয়া যায় না অনঙ্গ···হারি বা জিতি! আমার কি বুদ্ধি নেই ভাবচো? সব বুঝি আমি। এ-সবের মধ্যে তুমি মেয়েমানুষ, থাকতে যেও না।

—বোঝো যদি, তবে লোকসান খেলে কেন!

—হার-জিৎ সব কাজেরই আছে, তাতে কি? বলেচি তো তুমি এ-সব বুঝবে না!

অনঙ্গ চোখের জল ফেলিয়া বলিল—আমাদের মেলা টাকার দরকার নেই—চলো, আমরা দেশে ফিরে যাই। বেশ ছিলাম সেখানে—এখানে এসে অনেক টাকা হয়ে আমাদের কি হবে? সারাদিনের মধ্যে তোমার একবার দেখা পাই নে, সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকো—দুটো খেতে আসবার সময় পর্য্যন্ত পাও না! সেখানে থাকলে তবুও দু'-বেলা দেখতে পেতাম তোমাকে—আমার মন যে কি হু-হু করে, সে কথা···

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—অত ঘরবোলা হয়ে ছিলুম বলেই সেখানে ব্যবসাতে উন্নতি করতে পারিনি অনঙ্গ। ও ছিল গেরস্ত আড়তদারের ব্যবসা। দিন কেনা, দিন বেচা—লোকসানও নেই, লাভও বেশী নেই। ওতে বড়মানুষ হওয়া যায় না।

—বড়মানুষ হয়ে আমাদের দরকার নেই। লক্ষ্মীটি—চলো, গাঁয়ে ফিরে যাই। আমরা কি কিছু কম সুখে ছিলাম সেখানে, না, খেতে পাচ্ছিলাম না?

গদাধর এইবার স্পষ্টই বিরক্ত হইলেন—কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব নয়—চুপ করিয়া রহিলেন।

অনঙ্গ বলিল—ওগো, আমায় একবার দেশে নিয়ে চলো না—একদিনের জন্যে।

—কেন? গিয়ে কি হবে এখন?

—দশঘরার বন-বিবির থানে পূজো মানত ছিল—দিয়ে আসবো।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—অর্থাৎ তোমার পূজো মানত আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এরি মধ্যে?

—সে জন্যে না। তুমি অমত কোরো না ··লক্ষ্মীটি···সামনের মঙ্গলবার চলো দেশে যাই—দু'দিন থাকবো মোটে!

—পাগল! এখন আমার সময় নেই। ওসব এখন থাক গে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গদাধর শোভারাণীর বাড়ী গেলেন—ফোন করিয়া পূর্ব্বেই যাইবার কথা বলিয়াছিলেন।

শোভা বলিল—কি খবর?

—অনেক কথা আছে। খুব বিপদে প'ড়ে এসেচি তোমার কাছে। তুমি যদি অভয় দাও···

—অত ভণিতে শোনবার সময় নেই আমার। কি হয়েচে বলুন না!

গদাধর নিজের অবস্থা সব খুলিয়া বলিলেন। কিছু টাকার দরকার এখনই। কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না?

বলিলেন—একটা-কিছু করতেই হবে শোভা। বড় বিপদে প'ড়ে গিয়েছি। আর একটা অনুরোধ আমার, এ-ছবিতে তোমাকে নামতে হবে, না নামলে ছবি চলবে না। তোমার টাকা আমি দেবো, আমার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করো—যা তোমার দাম দর হবে, তা থেকে কিছু কমাবো না।

শোভা সব শুনিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। কোনো কথা বলিল না।

—কি? একটা যা হয় বলো আমায়।

—কি বলবো, বলুন? ছবি মার খেয়ে যাবে আমি আগেই জানতাম।

—সে তো বুঝলুম! যা হবার হয়েচে—এখন আমায় বাঁচাও।

—আমি কি করতে পারি যে আমার কাছে এসেচেন?

—আরও কিছু টাকা দাও, আর এ ছবিতে নামো।

—কোনোটাই হবে না আমার দ্বারা। আমায় এত বোকা পেয়েছেন?

—কেন হবে না শোভা? আমায় উদ্ধার করো। প্রথম ছবি—তেমন হয়নি হয়তো। সে-ছবি থেকে অনেক কিছু বুঝে নিয়েছি—আর একটি বার···

শোভা এবার রাগ করিল। গলার সুর তাহার কখনো বিশেষ চড়ে না, একটু চড়িলেই

বুঝিতে হইবে, সে রাগ করিয়াছে। সে চড়া গলায় বলিল—আমাকে টাকা ফেলে দিন, মিটে গেল—আমি উদ্ধার করবার কে? আমার কথা শুনেছিলেন আপনি? আমি বলি নি যে ফিল্ম কোম্পানি চালানো আপনার কর্ম্ম নয়? আপনি যার কিছু বোঝেন না, তার মধ্যে…

গদাধর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁরও গলায় রাগের সুর আসিয়া গেল। হয়তো রাগের সঙ্গে দুঃখ মেশানো ছিল!

বলিলেন—বেশ, তুমি দিও না টাকা! না দিলেই-বা কি করতে পারি আমি? তবে আমি ছবি একখানা করবোই। দেখি অন্য জায়গায় চেষ্টা—আচ্ছা, আসি তাহ'লে।

গদাধর বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইবেন—শোভা ডাকিয়া বলিল—বা রে, চলে গেলেই হলো? শুনে যান—আমার টাকার একটা ব্যবস্থা করুন।

—হবে, হবে, শীগ্‌গির হবে।

—শুনুন, শুনুন!

—কি?

—কোম্পানি করবেনই তবে? আপনার সর্ব্বনাশ হোলেও শুনবেন না?

গদাধর বোধহয় খুব চটিয়া গিয়াছিলেন। সিঁড়ি বাহিয়া তরতর করিয়া নামিতে নামিতে বলিলেন—না, সে তো বলেচি অনেকবার। কতবার আর বলবো? ও আমি না বুঝে করতে যাচ্চি নে। আমায় কারো শেখাতে হবে না।

গদাধর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

শোভা অন্যমনস্ক হইয়া কতক্ষণ সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে এমন এক-ধরণের মানুষ দেখিল, যাহা সে সচরাচর দেখে না! অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল।

একটু পরে শচীন একখানা বড় মোটর-ভর্ত্তি বন্ধুবান্ধব লইয়া হাজির হইল। সকলে কোলাহল করিতে-করিতে উপরে উঠিয়া আসিল। ইহাদের মধ্যে একজনকে শোভা চেনে—উড়িষ্যার কোনো এক দেশীয়-রাজ্যের রাজকুমার, পূর্ব্বে একদিন শোভাদের স্টুডিও দেখিতে গিয়াছিলেন। পৈতৃক অর্থ উড়াইবার তীর্থস্থান কলিকাতা ধামে গত পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে কুমার-বাহাদুর প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা অন্তরীক্ষে অদৃশ্য করিয়া দিয়া স্বীয় দরাজ-হাতের ও রাজোচিত মনের পরিচয় দিয়াছেন!

কুমার-বাহাদুর আগাইয়া আসিয়া পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন—নমস্কার, মিস্ মিত্র, কেমন আছেন? এলাম একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

শোভা নিস্পৃহভাবে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ভালো আছি।

শচীন পিছন হইতে বলিল—কুমার-বাহাদুর এসেছিলেন তোমায় নিয়ে যেতে—উনি মস্ত বড় পার্টি দিচ্চেন ক্যাসানোভায়—আজ সাতটা থেকে। এখন একবার সবাই মিলে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের…

শোভা বলিল—আমার শরীর ভালো নয়।

কুমার-বাহাদুর বেশ সুপুরুষ, তরুণবয়স্ক, সাহেবি পোষাকপরা, কেতাকায়দা-দুরস্ত সাহেবিয়ানাকে যতদূর নকল করা সম্ভব একজন অর্দ্ধশিক্ষিত দেশী লোকের পক্ষে—তাহার ত্রুটি তিনি রাখেন নাই। অসুখের কথা শোভার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র তিনি তটস্থ হইয়া বলিলেন—আপনার অসুখ হয়েছে, মিস্ মিত্র? গাড়ীতে ক'রে যেতে পারবেন না?

শোভা বিরক্তির সুরে বলিল—আজ্ঞে না, মাপ করবেন।

শচীন দলবল লইয়া অগত্যা বিদায় লইল।

দিন-দুই পরে শোভা নিজের স্টুডিওতে হঠাৎ গদাধর ও রেখাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। প্রথমে তাহার মনে হইল, তাহারই জন্য উহারা আসিয়াছে। শেষে দেখিল, তাহা নয়, অন্য কি-একটা কাজে আসিয়া থাকিবে—অন্য কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাছে। শোভা সেটে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে সাজগোজ করিয়াছে, মাথায় মুকুট, হাতে সেকেলে তাড়, বালা, চূড়—বাহুতে নিমফল-ঝোলানো রাংতার গিল্টি-করা বাজু—পৌরাণিক চিত্রের ব্যাপার। তবুও সে একজন ছোকরা চাকরকে বলিল—এই, ওই বাবু আর মাইজিকে ডেকে নিয়ে আয় তো!

তাহার বুকের মধ্যে একটি অনুভূতি, যাহা শোভা কখনো অনুভব করে নাই পূর্ব্বে! রেখাকে গদাধরের সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়াই কি এরূপ হইল? সম্ভব নয়। উহারা যাহা খুশি করিতে পারে, তাহার তাহাতে কিছুই আসে-যায় না। তবে লোকটির মধ্যে তেজ আছে, সাহস আছে—বেশির ভাগ পুরুষই তাহার কাছে আসিয়া কেমন যেন হইয়া যায়; মেরুদণ্ডবিহীন মোমের পুতুলদের দুদণ্ড নাচানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আনন্দ নাই, জয়ের গর্ব্ব সেখানে বড়ই ক্ষণস্থায়ী। শাণিত ছোরার আগার সাহায্যে কচুগাছের ডগা কাটা! ছোরার অপমান হয় না তাতে?

গদাধরবাবুর কাছে গিয়া চাকরটি কি বলিল, গদাধরকে আঙুল দিয়া তাহার দিকে দেখাইল চাকরটা—এ পর্য্যন্ত শোভা দেখিল। তাহার বুকের মধ্যে ভীষণ ঢিপ-ঢিপ শুরু হইল অকস্মাৎ—বুকের রক্ত যেন চল্কাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। ঠিক সেই সময় ডাক পড়িল—গদাধরের সঙ্গে শোভার আর দেখা হইল না সেদিন।

মাস পাঁচ ছয় কাটিল। পুনরায় পূজা আসিল, চলিয়াও গেল। কার্ত্তিক মাসের শেষের দিকে একদিন শচীন কথায়-কথায় বলিল—শুনচো, গদাধর আমাদের বড় বিপদে পড়েচে।

শোভা জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে?

—ওর সেই ছবি অর্দ্ধেক হয়ে আর হলো না—কতকগুলো টাকা নষ্ট হলো। এবার একেবারে মারা পড়বে।

—কেন কি হলো?

—রেখা ঝগড়া ক'রে ছেড়ে দিয়েচে। তার সঙ্গে নাকি কোনো লেখাপড়া ছিল না

এবার। সে স্থবিধে পেয়ে গেছে—এখন নাকি শুনচি, রেখা বিয়ে করবে কাকে, সব ঠিক হয়ে গিয়েচে। যাকে বিয়ে করবে, রেখাকে সে ছবিতে নামতে দেবে না—নানা গোলমাল। রেখা চলে গেলে তার সঙ্গে স্থষমাও চলে আসবে। ডিস্ট্রিবিউটার অনেক টাকা ঢেলেচে—তারা নালিশ করবে গদাধরের নামে, বেচারী এবার একেবারে মারা যাবে তাহ'লে—বাজার স্থদ্ধ দেনা।

শোভা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—গদাধরবাবু এখন কোথায় ?

—সেই বাড়ীতেই আছে। তবে শুনচি নাকি, বাড়ি বন্ধক। বাড়ী থাকবে না, যতদূর মনে হচ্চে !

—ও !

—বড্ড চাল বাড়িয়েছিল, এবার একেবারে ধনে-প্রাণে গেল। মানে, তুই ছিলি বাবু পাটের আড়তদার, করতে গেলি ফিল্মের ব্যবসা, যাকে যা না সাজে—বোকা পেয়ে পাঁচজনে মাথায় হাত বুলিয়ে—বুঝলে ?

শোভা একটু অন্যমনস্ক হইয়া অন্যদিকে চাহিয়া ছিল, শচীনের শেষদিকের কথার মধ্যে কতকটা মজা দেখিবার উল্লাসের স্থর ধ্বনিত হওয়ায় সে হঠাৎ ঝাঁঝিয়া উঠিয়া তীব্র বিরক্তির স্থরে বলিল—আ—আঃ,—কেন মিছিমিছি বাজে বকচেন একজনের নামে ? আপনার গাঁয়ের লোক, আত্মীয় না ? এত আমোদ কিসের তবে ?

শচীনের কণ্ঠ হইতে আমোদের স্থর এক মুহূর্ত্তে উবিয়া গেল, সে শোভার দিকে চাহিয়া বলিল—না, তাই বলচি, তাই বলচি—লোকটার মধ্যে যে কেবল নিছক বেকুবি···

—আবার ওই সব কথা ? লোকটার মধ্যে যাই থাকুক, সে-সব আলোচনা এখানে করবার কোনো দরকার নেই।

শোভার গলার স্থরে রাগ বেশ স্থস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

ইহার পর শচীন এ-সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতে আর সাহস করিল না—কিন্তু সে আশ্চর্য হইল মনে-মনে। সে জানিত, শোভা একগাদা টাকা ধার দিয়াছে গদাধরকে, সে-ধারের একটা পয়সা এখনও সে পায় নাই···!

তাহাদের স্টুডিওর সঙ্গে টেক্কা দিয়া গদাধর ছবি তুলিতে গিয়া বিপন্ন হইয়াছে—বিশেষতঃ রেখার পূর্ব্ব-ইতিহাস যাহাই হউক, এখন যে অভিনয়ক্ষেত্রে সে শোভার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া উঠিতেছে দিন-দিন—এ-সব বিবেচনা করিয়া দেখিলে গদাধরের দুর্দ্দশা তো পরম উপভোগ্য বস্তু—নিতান্ত মুখরোচক গল্পের উপকরণ !

কি জানি, মেয়েমানুষের মেজাজ সে কখন কি, শচীন অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা আজও বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আরো ভীষণ অবাক হইয়া গেল সে, দিনকতক পরে একটি কথা শুনিয়া।

একদিন তাহাদের স্টুডিওর একটি মেয়ে, শোভার বিশেষ বন্ধু, শচীনকে ডাকিয়া বলিল —শুনুন, আপনাকে একটি কথা বলি।

—এই যে অলকা দেবী—ভালো তো? কি কথা?

—কথাটা খুব গোপনে রাখবেন কিন্তু। আপনি শোভাকে জানেন অনেকদিন থেকে, তাই আপনার কাছে বলচি, যদি আপনার দ্বারা কিছু কাজ হয়।

শচীন বিস্ময়ের সুরে বলিল—শোভার সম্বন্ধে কথা? আমায় দিয়ে কি উপকার—বুঝতে পারচি নে।

—শোভা এ স্টুডিও ছেড়ে ভারতী ফিল্ম্ কোম্পানিতে ঢোকবার চেষ্টা করচে—জানেন না? সেখানে চিঠি লিখেচে।

শচীন মূঢ়ের মত দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া অবিশ্বাসের সুরে বলিল—'ভারতী ফিল্ম্ কোম্পানি'? সে তো আমাদের গদাধরের।

—সে-সব জানি নে মশাই, ওই যে যাদের 'ওলট-পালট' ব'লে ছবিটি একেবারে মার খেয়ে গেল।

—বুঝেচি, জানি—তারপর? সেখানে যেতে চাইচে শোভা?

—যেতে চাইচে মানে, চিঠি লিখেচে···দরখাস্ত করেচে···যাকে বলে মশাই—যাওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠেচে!

—তার মানে?

—আমি কিছু বুঝতে পারচি নে। সেইজন্যেই আপনার কাছে বলা।

—এখানে ডিরেক্টরের সঙ্গে ঝগড়া হলো নাকি?

—সে-সব না। ওর সঙ্গে আবার ঝগড়া হবে কার? আমি কিছু বুঝচি নে। ভারতী ফিল্ম্ কোম্পানি একটা ফিল্ম্ বার ক'রে যা নাম কিনেচে—তাতে ওদের ছবি বাজারে চলবে না! যতদূর আমি জানি, ওদের পয়সা-কড়িরও তেমন জোর নেই—ওখানে শোভা কেন যেতে চাইচে, এ আমার মাথায় আসে না কিছুতেই।

—আপনি বুঝিয়ে ব'লে দেখুন না, অলকা দেবী?

—আমি কি না বুঝিয়েচি? অনেক বারণ করেচি। ওর ব্যাপার জানেন তো? যখন যা গোঁ ধরবে, তা না ক'রে ছাড়বে না! খেয়ালী-মেজাজের মেয়ে—এখানে ওর কণ্ট্রাক্ট রয়েচে এক বছরের। এরা নালিশ ক'রে দেবে, তখন কি হবে?

—সে তো জানি!

—আবার বুঝে-সুঝে চলতেও ওর জোড়া নেই! যেখানে, যখন বুঝতে চাইবে সেখানে অঙ্ক কষবে—অথচ কেন অবুঝ হলো এমন যে···

—হুঁ।

—আপনি একবার বুঝিয়ে বলুন না শচীনবাবু। আমার মনে হয়···

—আচ্ছা, দেখি কতদূর কি হয়।

শচীন মুখে বলিল বটে, কিন্তু সে সাহস করিয়া শোভার কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিল না—আজ কাল করিয়া প্রায় দিনপনেরো কাটিল। শোভা কিন্তু স্টুডিও ছাড়িয়া কোথাও গেল না। দিনের পর দিন রীতিমত চাকুরী করিয়া যাইতে লাগিল। তবে শচীন লক্ষ্য করিল, শোভার মুখ ভার-ভার, সে কোনোখানেই তেমন মেলামেশা করে না লোকের সঙ্গে, তবু আগে যাহাও একটু-আধটু করিত, এখন একেবারেই তা করে না। নিজের গাড়ীতে স্টুডিওতে ঢোকে, কাজ শেষ করিয়া গাড়ীতেই বাহির হইয়া যায়।

সেদিন তাহার সঙ্গে অল্প কয়েক মিনিটের জন্য কথা বলিবার সুযোগ ঘটিল অলকার। গাড়ীতে উঠিতে যাইবে শোভা, সামনে অলকাকে দেখিয়া সে একটু অপেক্ষা করিল।

অলকা বলিল—কি, আজকাল যে বড় ব্যস্ত, কেমন আছো শোভা ?

—ভালোই আছি। তুই যাস নে কেন আমার ওখানে ?

—একটু ব্যস্ত ছিলাম ভাই—যাবো শীগ্‌গির একদিন। যাক্‌, আর ক'দিন আছো আমাদের এখানে ?

শোভা হাসিয়া বলিল—বরাবর আছি। ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেছে !

অলকা খুশী হইয়া বলিল—নেমেচে ? সত্যি নেমেচে ভাই ?

—নেমেচে। আচ্ছা, চলি তবে।

শচীন অলকার মুখে সংবাদটা শুনিয়া নিতান্তই খুশী হইয়া উঠিল। সেইদিনই সে শোভার ওখানে গেল। মনের উল্লাস চাপিতে না পারিয়া কথায়-কথায় বলিল—তারপর, একটা কথা আজ অলকা গুপ্তার মুখে শুনে বড় আনন্দ হলো শোভা !

—কি কথা ? কার সম্বন্ধে ?

—তোমার সম্বন্ধেই।

শোভা বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমার সম্বন্ধে ? কি কথা, শুনি ?

—যদিও আমি জানি নে তুমি কেন ঝোঁক ধরেছিলে, 'ভারতী ফিল্মে যাবার জন্যে—তবুও শুনে সুখী হলাম যে, সে ভূত তোমার ঘাড় থেকে নেমে গিয়েচে।

শোভা গম্ভীর মুখে বলিল—ভূত নামে নি নামিয়ে দিয়েছে—জানেন ?

শচীন বুঝিতে না পারার ভঙ্গিতে চাহিয়া বলিল—মানে ?

—মানে, এই দেখুন চিঠি।

শোভা শচীনের হাতে যে চিঠিখানা দিল, সেখানা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—টাইপ-করা ইংরেজি চিঠি। তাতে 'ভারতী ফিল্ম স্টুডিও'র কর্ত্তৃপক্ষ দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছেন যে শোভারাণী মিত্রকে বর্ত্তমানে তাঁহাদের স্টুডিওতে লওয়া সম্ভব হইবে না !

শচীন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। ফিল্ম্‌ গগনের অত্যুজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে তারকা মিস্ শোভারাণী মিত্র দীনভাবে চিঠি লিখিয়া চাকুরী প্রার্থনা করিতে গিয়াছিল ভারতী ফিল্ম্‌ কোম্পানির মত তৃতীয় শ্রেণীর চিত্র প্রতিষ্ঠানে, আর তাহারা কিনা···

ব্যাপারটা শচীন ধারণা করিতেই পারিল না। শোভারাণীর মুখের দিকে চাহিয়া সে আর

* *

কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। তাহার মনে হইল, শোভা এ-সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক। তবুও এ এমনই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যাহা মন হইতে যাইতে চায় না।

শচীন বাসায় ফিরিবার পথে কতবার জিনিসটা মনের মধ্যে নড়াচাড়া করিল। শোভার মত তেজী মেয়ে, সচ্ছল অবস্থার অভিনেত্রী রূপসী তরুণী—কি বুঝিয়া কিসের জন্য এ হাস্যকর ঘটনার অবতারণা করিতে গেল? কোনো মানে হয় ইহার? যার পায়ের ধূলা পাইলে ভারতী স্টুডিওর মত কতশত ছবি-তোলা কোম্পানি কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইত—তাহাকে কিনা চিঠি লিখিয়া জানাইয়া দিল, এখানে তোমাকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হইবে না!

সাহস করিয়া স্টুডিওর বন্ধুবান্ধবের কাছেও এমন মজার কথাটা শচীন বলিতে সাহস করিল না। শোভার কানে উঠিলে সে চটিবে।

ভড়মশায় পাটের কাজ ভালো ভাবেই চালাইতেছিলেন। আড়তের ক্যাশ হইতে মাসে মাসে টাকা যদি তুলিয়া না লওয়া হইত, তবে ভড়মশায়ের সুনিপুণ পরিচালনায় আড়তের কোনোই ক্ষতি হইত না। কিন্তু গদাধর বারবার টাকা তুলিয়া আড়তের খাতা শুধু হাওলাতী-হিসাবে ভর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন। কাজে মন্দা দেখা দিল।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম। নতুন পাট কিনিবার মরসুমে পাঁচ ছ'হাজার টাকা বিভিন্ন মোকামে ছড়ানো ছিল—এইবার সেখান হইতে মাল আনিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এইসময় ভড়মশায় একটা মোটা অর্ডার পাইলেন মিল হইতে—মাল যোগান দিতে পারিলে দু'পয়সা লাভ হইবে—কিন্তু টাকা নাই। ভড়মশায় নানাদিকে বহু চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে অনঙ্গর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। গত চার-পাঁচ মাস তিনি অনঙ্গকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনো কাজ করেন না! অনঙ্গ যে এত ভালো ব্যবসা বোঝে, ভড়মশায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বৌ-ঠাকরুণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে। অনঙ্গ শুনিয়া বলিল—ব্যাঙ্ক থেকে কিছু নেওয়া চলবে না?

—তা হবে না বৌ-ঠাকরুণ, অনেক নেওয়া আছে, আর দেবে না?

—মোকাম থেকে পাট আনিয়ে নিন, আর আমার গহনা যা আছে বিক্রি করুন!

—তোমার যা গহনা এখনও আছে, বৌ-ঠাকরুণ, তাতে আর আমি হাত দিতে চাই নে। পাটের ব্যবসা—জুয়ো খেলা, হেরে গেলে তোমার গহনাগুলো যাবে।

কিন্তু অনঙ্গ শুনিল না। সেও নিতান্ত ভীতু-ধরণের মেয়ে নয়, এখন তাহার পিতৃবংশের যদিও কেহই নাই—কেবল এক বখাটে ভাই ছাড়া—একসময়ে তাহার বাবাও বড় ব্যবসায়ী ছিলেন—ব্যবসাদারের দিল আছে তাহার মধ্যে। সে জোর করিয়া গহনা বিক্রয় করাইয়া সেই টাকায় মালের যোগান দিল। কিছু টাকাও লাভ হইল।

যেদিন মিলের চেক ব্যাঙ্কে ভাঙানো হইবে, সেদিন গদাধর আসিয়া এক হাজার টাকা চাহিয়া বসিলেন। তিনি আজকাল বাড়ীতে বড়-একটা আসেন না। কোথায় রাত কাটান,

কি ভাবে থাকেন, ভড়মশায় বা অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। এবার কিন্তু ভড়মশায় শক্ত হইয়া বলিলেন—বাবু, এ টাকা বৌ-ঠাকরুণের গহনা-বেচা টাকা। এ থেকে আপনাকে দিতে গেলে, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। তাঁর হুকুম ভিন্ন দিতে পারি নে।

গদাধর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—আড়ত আমার নামে, আপনার বৌ-ঠাকরুণের নামে নয়। আমার আড়তে অপরের টাকা খাটে কোন হিসেবে?

—সে কথাটা বাবু আপনি গিয়ে তাঁকে বলুন—আমি এর জবাব দিতে পারবো না।

—আপনি টাকা দিয়ে দিন, আমার বড্ড দরকার, পাওনাদারে ছিঁড়ে খাচ্চে। আমি এখন যাই, কাল সকালে আবার আসবো।

ভড়মশায় অনঙ্গকে গিয়া কথাটা জানাইলেন। অনঙ্গ টাকা দিতে রাজী হইল না। তাহার ও তাহার ছেলেদের দশা কি হইবে, সে-কথা স্বামী কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ওই দেড় হাজার টাকা ভরসা। বাড়ী ভাড়া দিতে হয় না—তাই এক-রকমে সংসার চলিবে কিছুদিন ওই টাকায়।

পরদিন অনঙ্গ দুপুরে কলতলায় মাছ ধুইতেছে, হঠাৎ স্বামীকে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। গদাধর কাছে আসিয়া বলিলেন—কেমন আছো?

অনঙ্গ একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। অনেকদিন দেখে নাই—প্রায় পনেরো-যোলো দিন। স্বামীর স্বাস্থ্য ভালো হইয়াছে, চেহারায় গেঁয়ো-ভাবটা অনেকদিন হইতেই দূর হইয়াছিল—বেশ চমৎকার চেহারা ফুটিয়াছে।

তবুও অভিমানের নীরসতা কণ্ঠে আনিয়া সে বলিল—ভালো থাকি আর না থাকি, তোমার তাতে কি? দেখতে এসেছিলে একদিন, মরে গিয়েছে বাড়ীসুদ্ধ, না বেঁচে আছে?

—তুমি আজকাল বড় রাগ করো। আমি কাজ নিয়ে বড় ব্যস্ত আছি, স্টুডিওতে খাই, স্টুডিওতেই শুই—তাই সময় পাই নে—কিন্তু ভড়মশায়ের কাছে রোজই খবর পাচ্চি ফোনে—রোজ ফোন্ করি গদিতে।

—বেশ করো। না করলেই-বা কি ক্ষতি?

—কার কথা বলছো—তোমার, না আমার?

—দুজনেরই। যাক্, এখন কি মনে ক'রে অসময়ে? খাওয়া হয় নি, তা মুখ দেখেই বুঝতে পারচি। ঘরে গিয়ে বসো, আমি মাছ ক'টা ধুয়ে আসচি।

একটু পরে অনঙ্গ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্বামী ছেলেদের লইয়া গল্প করিতেছেন। অনঙ্গ বলিল—চা খাবে নাকি? এখনও রান্নার দেরি আছে কিন্তু।

গদাধর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আমার দেরি করলে চলবে না। চা বরং একটু ক'রে দাও—আর আমি এসেছিলাম যে জন্তে…

অনঙ্গ বলিল—সে আমি শুনেচি। সে হবে না।

—টাকা তুমি দেবে না অনঙ্গ? লক্ষ্মীটি, বড্ড বিপদে পড়েচি। একটা মেশিনের কিস্তির টাকা কাল দিতে হবে, নইলে তারা মেশিন উঠিয়ে নিয়ে যাবে—স্টুডিওর কাজ বন্ধ

হয়ে যাবে তা হ'লে। লক্ষ্মীটি, অমত কোরো না। বড় আশা ক'রে এসেচি।

গদাধরের চোখে মিনতির দৃষ্টি! অনঙ্গর মন এতটুকু দমিত না, বা টলিত না, যদি স্বামী তম্বি-গম্বি করিত বা রাগঝাল দেখাইত। কিন্তু স্বামীর অসহায় মিনতির দৃষ্টি তাহার মতিভ্রম ঘটাইল। সে নিজেকে দৃঢ় রাখিতে পারিল না।

গদাধর টাকা আদায় করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই টাকা দেওয়ার মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য অনঙ্গকে পরে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

মাসখানেক পরে আদালতের বেলিফ্ আসিয়া বাড়ী শিল করিয়া গেল। বন্ধকী বাড়ী, পাছে বেনামী হস্তান্তর হয়, তাই মহাজন ডিক্রীর আগেই কোর্ট হইতে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

গদাধরের অবস্থা যে কত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, ভড়মশায় তাহা ইদানীং বেশ ভালো করিয়াই জানিতে পারিয়াছিলেন। আড়তের ঠিকানায় বহু পাওনাদার আসিয়া জুটিতে লাগিল। ভড়মশায় পাকা লোক—তাহাদের ভাগাইয়া দিলেন। এ ফার্ম্মের সঙ্গে ও-সব দেনার সম্বন্ধ কি? অনেকে শাসাইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু যেদিন খবর পাওয়া গেল যে, আদালতের বেলিফ্ বাড়ী শিল করিবে, সেদিন ভড়মশায় অনঙ্গকে গিয়া সব খুলিয়া বলিলেন। অনঙ্গ বলিল—আমাদের কি উপায় হবে?

—একটা ভাড়াটে-বাড়ী আজ রাত্রের মধ্যেই দেখি, কাল সেখানে উঠে যাওয়া যাক।

—তার চেয়ে চলুন, দেশে ফিরে যাই ভড়মশায়। সেখানে গেলে আমার মন ভালো থাকবে।

—এই অবস্থায় সেখানে যাবেন বৌ-ঠাকরুণ? লোকে হাসবে না?

—হাসুক ভড়মশায়। আমার স্বামীর, আমার শ্বশুরের ভিটেতে আমি না খেয়ে একবেলা প'ড়ে থাকলেও আমার কোনো অপমান নেই। সেখানে সজনে-শাক সেদ্ধ ক'রে খেয়েও একটা দিন চলে যাবে, এখানে তা হবে না। আপনি চলুন দেশে।

—আমারও তাই মত বৌ-ঠাকরুণ। আপনার যদি তাতে মন না দমে, আজই চলুন না কেন?

আট

অনেকদিন পরে অনঙ্গ আবার দেশের বাড়ীতে ফিরিল।

গত চার বছরের বর্ষার জল পাইয়া দু'খানা ছাদ বসিয়া গিয়াছে, উঠানে ভাঁটশেওড়ার বন; পাচিলে ও কার্নিসে বনমূলা ও চিচ্চিড়ের ঝাড়, রোয়াকে ও দেওয়ালের গায়ে প্রতিবেশীরা ঘুঁটে দিয়াছে। দু'একজোড়া জানালার কবাট কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে বেওয়ারিশ

মাল বিবেচনায়। বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অনঙ্গ চোখের জল রাখিতে পারিল না।

একটা কুলুঙ্গিতে অনঙ্গর শাশুড়ী লক্ষ্মীর বাটা রাখিতেন, শাশুড়ীর নিজের হাতের সিঁদুরের কৌটার পুতুল এখনও কুলুঙ্গির ভিতরে আঁকা। যে খাটে অনঙ্গ নববধূরূপে ফুলশয্যার রাত্রি যাপন করিয়াছিল, পশ্চিমের ঘরে সে প্রকাণ্ড সেকেলে কাঁঠাল কাঠের তক্তপোশখানা উইয়ে-খাওয়া অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান।

বাড়ী আসিয়া নামিবার কিছু পরে, পাশের বাড়ীর বড়-তরফের কর্ত্রী-ঠাকরুণ এ-বাড়ী দেখিতে আসিলেন। অনঙ্গ তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ভালো আছো দিদি? বট্‌ঠাকুর ভালো, ছেলেপিলে সব···

—হ্যাঁ তা সব এক-রকম—কিন্তু বড্ড রোগা হয়ে গেছিস ছোটবৌ। আহা, শচীনের (ইনি শচীনের মা) কাছে সব শুনলাম। তা ঠাকুরপো যে কলকাতায় গিয়ে এ-রকম ক'রে উচ্ছন্নে যাবে, তা কে জানতো। শুনলাম নাকি এক মাগী নাচওয়ালী না কি ওই বলে আজকাল—তাকে নিয়ে কি ঢলাঢলি, কি কাণ্ড! একেবারে পথে বসিয়ে দিলে তোদের ছোটবৌ, কিছু নেই, বাড়ীখানা পর্য্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল গো! আহা-হা···

অনঙ্গর চিত্ত জ্বলিয়া গেল বড়বৌয়ের কথার ধরণে। সহানুভূতি দেখাইবার ছুতায় আসিয়া এ একপ্রকার গায়ের ঝাল ঝাড়া আর কি! বড়-তরফ যখন যে গরীব সেই গরীবই থাকিল, ছোট-তরফের তখন অত বাড় বাড়িয়া কলকাতায় বাড়ী কেনা, আড়ত ও ছবি তুলিবার কোম্পানী খোলা—এসব কেন? কথায় বলে, 'অত বার বেড়োনাকো ঝড়ে ভেঙে যাবে'—এখন কেমন?

অনঙ্গ ঝগড়াটে স্বভাবের মেয়ে কোনোদিনই নয়। ভগবান যখন পাঁচজনকে দেখিতে দিয়াছেন—দেখুক।

কলিকাতার বাড়ীর জন্য ডবল পালঙ্ক, কয়েকখানা সোফা ও একটা বড় কাঁচ-বসানো আলমারি অনঙ্গ শখ করিয়া কিনিয়াছিল—এত কষ্টের মধ্যেও সেগুলি সে বেচিয়া বা ফেলিয়া আসিতে পারে নাই—সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। গত সুখের দিনের স্মৃতিচিহ্ন এগুলি—অনঙ্গ এখানকার ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বড়বৌ সেগুলি দেখিয়া বলিলেন—এসব আর এখন কি হবে ছোটবৌ, বিক্রি ক'রে দিয়ে এলে তবুও দু-দিন চলতো সেই টাকায়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। বলিস তো খাট-আলমারির খদ্দের দেখি,—ওই মুখুজ্যেদের গিন্নি বলছিল একখানা খাট ওর দরকার।

অনঙ্গ বলিল—আচ্ছা দিদি, আমি তোমায় জানাবো দরকার বুঝে। এনেছি যখন, এখন থাকুক—জায়গার তো অভাব নেই রাখবার, কারো ঘাড়েও চেপে নেই।

দিন যাহা হউক একপ্রকার কাটিতে লাগিল! অনঙ্গর মনে কিন্তু বড় দুঃখ, স্বামী তাহার পর হইয়া গেল। এত কষ্টের ও পরের টিটকারীর মধ্যেও যদি স্বামীকে সে কাছে পাইত, এসব দুঃখ-কষ্টকে সে আমল দিত না। পুরানো বাড়ীর কার্নিসের ফাঁকে গোলা-পায়রার ঝাঁক আর পুরানো দিনের মত ডানা ঝট্‌পট্ করে না, সুখের পায়রা অন্য কোন সুখী

গৃহস্থের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে বাড়ীর কানাচে রাত্রিবেলা পেঁচার কর্কশ স্বর শোনা যায় রাত দুপুরে, আমড়া গাছের মাথায় চাঁদ ওঠে, একা-একা ছেলে দুটি লইয়া এই শতস্মৃতিভরা বাড়ীতে থাকিতে তাহার বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, প্রতিদিন কলকাতা হইতে আনা সেই পালঙ্কে শুইবার সময়।

রাত্রি নির্জ্জন—বাড়ীটা ফাঁকা—কেহ কোথাও নাই আজ। দিনের বেলায় তবু কাজ লইয়া ভুলিয়া থাকা যায়, রাতের নির্জ্জনতা যখন বুকে চাপিয়া বসে—তাহার বুক হু হু করে, শত্রু হাসাইবার ভয়ে যে কান্নার বেগ দিনমানে চাপিয়া রাখিতে হয়—রাতে তাহা আর বাধা মানে না।

হাতে বিশেষ পয়সা আর নাই—ভড়মশায়ের সাহায্যে সে ছোট-খাটো খুচরা ব্যবসা চালাইতে লাগিল। মূলধন নাই, হাটবারে রাস্তার ধারে পাটের ফেটি কিনিয়া কোনদিন একমণ, কোনদিন-বা কিছু বেশী মাল কৃষ্ণদাঁয়ের আড়তে বিক্রি করিয়া নগদ আট আনা কি বারো আনা লাভ হয়, হাত-খরচটা একরূপে চলিয়া যায় তাহা হইতে।

মূলধনের অভাবে বেশি পরিমাণে খরিদ-বিক্রি করা চলিল না, দুর্দ্দিনের বন্ধু ভড়মশায় অনেক চেষ্টা করিয়াও কোথাও বেশী পুঁজি জুটাইতে পারিলেন না।

একদিন নির্ম্মল দেখা করিতে আসিল।

অনঙ্গ সন্তুষ্ট ছিল না নির্ম্মলের উপর—তবুও জিজ্ঞাসা করিল—ওঁর খবর জানো ঠাকুরপো?

—কলকাতাতেই আছে, শচীনের কাছে শুনেচি।

—তুমি জানো ঠিকানা ঠাকুরপো? বাড়ীতে একবার আসতে বলো না ওঁকে। যা হবার হয়েচে, তা ভেবে আর কি হবে। বাড়ীতে এসে বসুন, আমি চালাবো, ওঁকে কিছু করতে হবে না।

—পাগল হয়েচো বৌদি? গদাধরদাকে চেনো না? বলে, মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার! সে এসে ব'সে তোমার ওই পাটের ফেটির ব্যবসা করবে? তা ছাড়া তার এখনো রাজ্যের দেনা। কলকাতা ছেড়ে আসবার জো নেই।

—কত টাকা দেনা, ঠাকুরপো?

—তা অনেক। নালিশ হয়েছে তিন-চারটে—জেলে যেতে না হয়!

অনঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—বলো কি ঠাকুরপো! এত দেনা হল কি ক'রে? ছবি চললো না?

—সে নানা গোলমাল। যে মেয়েটির ওপর ভরসা ক'রে ছবি তৈরী করা হচ্ছিলো, তার হয়ে গেল বিয়ে। সে আর ছবিতে নামলো না, অন্য একটি মেয়েকে দিয়ে সে পার্ট করানো হতে লাগলো—ছবি একরকম ক'রে হয়ে গেল। কিন্তু সকলেই জেনে গিয়েছিল যে, রেখা দেবী—মানে, সে মেয়েটি এ-ছবিতে শেষ পর্য্যন্ত নেই—ছবি তেমন জোরে চললো না। গদাধর বড্ড ভুল করলে—একটি খুব নামজাদা অভিনেত্রী ইচ্ছে ক'রে ছবিতে নামতে চেয়েছিল,

গদাধর তাকে নেয় নি—শচীনের মুখে শুনলাম।

—কেন ?

—তা কি ক'রে বলবো ? বোধ হয় মন-কষাকষি ছিল।

—আগে থেকে জানা ছিল নাকি তার সঙ্গে ?

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—খু-ব। কেন, তুমি কিছু জানো না বৌ-ঠাকরুণ ? তার কাছে তো গদাধর অনেক টাকা ধার করেছিল, সেও তো একজন বড় পাওনাদার। তার নাম শোভারাণী। আমি শচীনের কাছে শুনেচি, ভড়মশায় একবার সে দেনার সম্পর্কে মেয়েটির বাড়ী গিয়েছিল।

—তারপর কি হলো ?

—টাকা কি কেউ ছাড়ে ? সেও নালিশ করেচে শুনচি। তারও তো রাগ আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনঙ্গ বলিল—এত কথা আমি জানিনে তো ঠাকুরপো! আমাকে কেউ বলেওনি। আমি না হয় গহনা বেচে তার দেনা শোধ করতাম।

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—সে অনেক টাকা দেনা বৌ-ঠাকরুণ। তোমার গহনা ইদানীং যা ছিল, তা বেচে অত টাকা হবে কোথা থেকে ? সে শুনেচি, হাজার চার-পাঁচ টাকা।

অনঙ্গ আকুল কণ্ঠে বলিল—হোক্‌গে যত টাকা, তুমি একটা কাজ করো ঠাকুরপো—তুমি তাকে যে ক'রে পারো একবার এখানে এনে দাও। দেখিনি কতদিন। আমার মন যে কি হয়েচে, সে শুধু তুমি বলেই বলচি। এই উপকারটা করো তুমি। দেনা আমি যে ক'রে হোক্, জমি-জায়গা বেচে হোক্, শোধ ক'রে দেবো—আমি নিজে এখন ব্যবসা বুঝি—করচিও তো।

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—তুমি জানো না বৌদি, তোমার ধারণা নেই। তুমি যা ভাবচো, তা নয়। দেনা বিশ হাজারের কম নয়—সে তুমি তোমার ওই সামান্য ব্যবসা ক'রেও শোধ করতে পারবে না, জায়গাজমি বেচেও পারবে না।

—তাহ'লে কি হবে ঠাকুরপো !

—কি হবে, কিছুই বুঝতে পারচি নে। আর কিছুদিন না গেলে···

নির্ম্মল চলিয়া গেল। অনঙ্গ বসিয়া-বসিয়া কত কি ভাবিল। সেদিন আর তাহার মুখে ভাত উঠিল না। ভড়মশায়কে ডাকাইয়া পরামর্শ করিতে বসিল। ভড়মশায় পাকা বিষয়ী লোক, সব শুনিয়া বলিলেন—এর তো কোনো কূলকিনেরা পাচ্চি নে বৌ-ঠাকরুণ!

অনঙ্গ চিন্তিতমুখে বলিল—আপনার হাতে এখন কত টাকা আছে ?

অনঙ্গর মুখের দিকে চাহিয়া ভড়মশায় হাসিয়া বলিলেন—আন্দাজ শ'দুই-আড়াই। কি করতে চান্ বৌ-ঠাকরুণ ? ওতে বাবুর দেনা শোধ যাবে না।

—আপনি একবার কলকাতায় যান ভড়মশায়, নির্ম্মল ঠাকুরপো বলছিল, তাঁর নাকি দেনার দায়ে জেল হবে, একবার আপনি নিজের চোখে দেখে আসুন ভড়মশায়—আমি স্থির থাকতে পারচি নে যে একেবারে, এ-কথা শুনে কি আমার মুখে ভাতের দলা ওঠে ? আপনি আজ কি কাল সকালেই যান একবার।

—আজ হবে না বৌ-ঠাকরুণ, আজ হাটবার। টাকা-পঞ্চাশেক হাতে আছে, ও টাকাটায় ওবেলা পাট কিনতে হবে। যা হয় দুপয়সা তো ওই থেকেই আসচে।

পরদিন সকালে অনঙ্গ একপ্রকার জোর করিয়া ভড়মশায়কে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল। সঙ্গে দিল একখানা লম্বা চিঠি আর একশোটা টাকা। ভড়মশায় টাকা দিতে বারণ করিয়াছিলেন, ইহা শুধু সংসার খরচের টাকা নয়, এই যে সামান্য ব্যবসায়ের উপর কষ্টেসৃষ্টেও যা হোক একরকম চলিতেছে, এ টাকা সেই ব্যবসার মূলধনের একটা অংশও বটে। অনঙ্গ শুনিল না। তিনি বিপদের মধ্যে আছেন, যদি তাঁর কোনো দরকারে লাগে!

নয়

ভড়মশায় সটান গিয়া শোভারাণীর বাড়ী উঠিলেন। চাকরের নিকট সন্ধান লইয়া জানিলেন, গদাধরবাবু বহুদিন যাবৎ এখানে আসেন না।···মাইজী? না, মাইজী এখন স্টুডিওতে। এসময় তিনি বাড়ী থাকেন না কোনোদিন।

শচীনের কাছে সন্ধান মিলিল। দক্ষিণ-কলিকাতার একটা মেসের বাড়ীর ক্ষুদ্র ঘরে কেওড়া-কাঠের তক্তপোশে বসিয়া মনিব বিড়ি খাইতেছেন, এ অবস্থায় ভড়মশায় গিয়া পৌঁছিলেন।

গদাধর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—কি খবর ভড়মশায় যে! আমার ঠিকানা পেলেন কোথায়?

—প্রণাম হই বাবু।

বলিয়াই ভড়মশায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

—আরে-আরে, বসুন-বসুন, কি হয়েছে—ছিঃ! আপনি নিতান্ত···

চোখের জল মুছিতে-মুছিতে ভড়মশায় বলিলেন—বাবু, আপনি বাড়ী চলুন।

—বাড়ী যাবার জো নেই এখন ভড়মশায়। সে-সব অনেক কথা। সকল কথা শুনেও দরকার নেই,—আমার এখন বাড়ী যাওয়া হয় না।

—বৌ-ঠাকরুণ কেঁদে-কেটে···

—কি করবো বলুন, এখন আমার যাবার উপায় নেই—বসুন। ঠাণ্ডা হোন। খাওয়া দাওয়া করুন এখানে এবেলা।

ভড়মশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বাবু, একটা কথা বলবো?

—কি বলুন।

—আপনাকে সংসারের ভার নিতে হবে না। আমি ফেটি পাটের কেনাবেচা ক'রে একরকম যা হয় চালাচ্চি—আপনি গিয়ে শুধু বাড়ীতে ব'সে থাকবেন।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ভড়মশায়, আমি এখন গাঁয়ে গেলে যদি চলতো, আমি যেতুম।

আমার সঙ্গে-সঙ্গে সমনজারি করতে পেয়াদা ছুটবে দেশের বাড়ীতে, আর বড়-তরফের ওরা হাসাহাসি করবে! সে-সব হবে না—তাছাড়া আমি আবার একটা কিছু করবার চেষ্টায় আছি।

ভড়মশায় বলিলেন—আপনার জন্যে বৌ-ঠাকরুণ কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার কাছে আছে।

ভড়মশায় দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন যে, মনিব টাকার কথা শুনিয়া বিশেষ-কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না! নিস্পৃহ ভাবে বলিলেন—কত?

—আজ্ঞে, পঞ্চাশ টাকা।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ওতে কি হবে ভড়মশায়? আমায় হাজার-তিনেক টাকা কোনরকমে তুলে দিতে পারেন এখন? তাহলে কাজের খানিকটা অন্ততঃ মীমাংসা হয়।

—না বাবু, সে সম্ভব হবে না। ফেটি পাট কিনি ফি হাটে যাট-সত্তর…বড় জোর একশো টাকার। তাই গণেশ কুণ্ডুর আড়তে বিক্রি ক'রে কোনো হাটে পাঁচ, কোনো হাটে চার—এই লাভ। এতেই বৌ-ঠাকরুণকে সংসার চালাতে হচ্চে। তাঁরই পুঁজি—তিনি যে এই পঞ্চাশ টাকা দিয়েচেন—তাঁর সেই পুঁজি ভেঙে। আমায় বললেন,—বাবুর কষ্ট হচ্চে ভড়মশায়, আপনি গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসুন। অমন লক্ষ্মী মেয়ে…

গদাধর অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন—আচ্ছা, থাক্। আপনি ও টাকাটা দিয়েই যান আমায়। অন্ততঃ যে ক'দিন জেলের বাইরে থাকি, মেস খরচটা চলে যাবে।

জেলের কথা শুনিয়া ভড়মশায় রীতিমত ভয় পাইয়া গেলেন। মনিব জেলে যাইবার পথে উঠিয়াছেন—সে কেমন কথা? এ-কথা শুনিলে বৌ-ঠাকরুণ কি স্থির থাকিতে পারিবেন! এই মেসেই ছুটিয়া আসিবেন দেখা করিতে হয়তো। সুতরাং এ-কথা সেখানে গিয়া উত্থাপন না করাই ভালো। তিন হাজার টাকার যোগাড় করিতে না পারিলে যদি জেলে যাওয়ার মীমাংসা না হয়, তবে চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ, সে টাকা কোনোরকমেই এখন সংগ্রহ করা যাইতে পারে না।

পঞ্চাশটি টাকা গুনিয়া মনিবের হাতে দিয়া ভড়মশায় বিদায় লইলেন। দেশে পৌঁছিতে পরদিন সকাল হইয়া গেল। অনঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি, কি-রকম দেখলেন ভড়মশায়? দেখা হলো? ওঁর শরীর ভালো আছে? কবে বাড়ী ফিরবেন বললেন?

—বলচি বৌ-ঠাকরুণ—আগে আমায় একটু চা ক'রে যদি…

—হ্যাঁ, তা এক্ষুণি দিচ্চি। বলুন আগে—উনি কেমন আছেন? দেখা হয়েচে?

—সব হয়েছে। ভালো আছেন।

—আছেন কোথায়? টাকা দিয়েচেন?

—আছেন একটা কোন্ মেসের বাড়ীতে। দিব্যি আলাদা একটা ঘর! আমায় যেতেই খুব খাতির…বেশ চেহারা হয়েচে।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই অনঙ্গ খুশিতে গলিয়া গিয়া বলিল—আচ্ছা, বসুন, আমি এসে সব

শুনচি, আগে চা ক'রে আনি আপনার জন্যে।

ভড়মশায় ডাকিয়া বলিলেন—হ্যাঁ বৌমা···এই কিছু বিস্কুট আর লেবেঞ্চুস খোকাদের জন্যে···এটা রাখো।

কিছুক্ষণ পরে অনঙ্গ চা আনিয়া রাখিল, তার সঙ্গে একবাটি মুড়ি। সে হঠাৎ বন্য হরিণীর ন্যায় চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে—হাতে-পায়ে বল ও মনে নতুন উৎসাহ পাইয়াছে। ভড়মশায় সব বুঝিলেন, বুঝিয়া একমনে চা ও মুড়ি চালাইতে লাগিলেন।

—হ্যাঁ, তারপর বলুন ভড়মশায়।

—হ্যাঁ, তারপর তো সেই মেসের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

—মেসের বাড়ীতে উঠলেন কেন? চেহারার কথা বলছিলেন—মানে, শরীরটা···

—সুন্দর চেহারা হয়েচে। কলকাতায় থাকা···তার ওপর আজকাল একটু অবস্থা ফিরতির দিকে যাচ্চে···আমায় বললেন—মানে একটু স্ফূর্তি দেখা দিয়েচে কিনা!

—টাকা দিয়ে এলেন তো?

ভড়মশায় লংক্লথের আধময়লা কোটের সুবৃহৎ ঝোলা-সদৃশ পকেট হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিলেন—হ্যাঁ, ভালো কথা—টাকা সব নিলেন না। পঞ্চাশটি নিয়ে বললেন, এখন আর দরকার নেই, বাড়ীতে তো টানাটানি যাচ্চে···তা—এই সেই বাকি টাকাটা একটা খামের মধ্যে—সামনের হাটে এতে···

কথাটা শুনিয়া অনঙ্গ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। স্বামী যখন টাকা ফিরাইয়া দিয়াছেন—তখন নিশ্চয়ই তাঁর অবস্থা ভালোর দিকে যাইতেছে। বাঁচা গেল, লোকে কত কি বলে, তাহা শুনিয়া তাহার যেন পেটের মধ্যে হাত-পা ঢুকিয়া যায়। মা সিদ্ধেশ্বরী মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন এতদিন পরে।

সে একটু সলজ্জ-কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, আমাদের—আমার কথা-টথা কিছু—মানে, কেমন আছিটাছি···

ভড়মশায় তাহার মুখের কথা যেন লুফিয়া লইয়া বলিলেন—ঐ ছাখো, বুড়োমানুষ বলতে ভুলে গিয়েচি। সে কত কথা···অনেকক্ষণ ধ'রে বললেন তোমাদের কথা বৌ-ঠাকরুণ। তোমার সম্বন্ধেও···

—ও! কি বললেন? এই কেমন আছি, মানে···

নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার কণ্ঠে ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সুর আসিয়া গেল।

ভড়মশায় মৃদু-মৃদু হাসিমুখে বলিলেন—এই সব বললেন—একা ওখানে থেকে মনে শান্তি নেই তাঁর। অথচ এ-সময়টা দেশে আসতে গেলে, কাজের ক্ষতি হয়ে যায় কিনা! তোমার কথা কত-ক্ষণ ধ'রে বললেন। আসবার সময় ঐ বিস্কুট লেবেঞ্চুস তো তিনিই কিনে দিলেন!

—আপনাকে শেয়াল-দ' ইস্টিশানে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন বুঝি?

—হ্যাঁ, তাই তো। উঠিয়েই তো দিয়ে গেলেন—সেখানেও তোমার কথা···

অনঙ্গ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখের জল গোপন করিল।

ভড়মশায় চলিয়া আসিলেন। এভাবে বেশীক্ষণ চালানো সম্ভব নয়, হয়তো-বা কোথায় ধরা পড়িয়া যাইবেন। বৌ-ঠাকরুণের বুদ্ধির উপর তাঁর শ্রদ্ধা আছে। তবে স্বামীর ব্যাপার লইয়া কথাবার্ত্তা উঠিলে বৌ-ঠাকরুণ সহজেই ভুলিয়া যান—এই রক্ষা।

ভড়মশায় কি সাধে মনিবকে বাকি পঞ্চাশটি টাকা দেন নাই?

বৌ-ঠাকরুণ বা ছেলেদের কথা তো একবারও লোকে জিজ্ঞাসা করে—এতদিন পরে যখন? অমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী, ছেলেরা বাড়ীতে—তাহাদের সম্বন্ধে একটা কথা নয়? সেখানে ভড়মশায় দিতে যাইবেন—টাকা? তা তিনি কখনো দিবেন না।

শরৎকাল চলিয়া গেল। আবার হেমন্ত আসিল।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনঙ্গ প্রতিদিনই আশা করিয়াছে—স্বামী হঠাৎ আজ হয়তো আসিয়া পড়িবেন। কিন্তু তার সে আশা পূর্ণ হয় নাই!

ভড়মশায় আসিয়া বলেন—বৌ-ঠাকরুণ, টাকা দিতে হবে।

—কত?

—ছত্রিশ টাকা দাও আজ, পাট আর আসচে না হাটে। ওতেই কাজ চলে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা লাভের তু'তিন টাকা-সুদ্ধ টাকাটা আবার ফিরাইয়া দিয়া যান। একদিন শশী বাগদিনী অনঙ্গকে পরামর্শ দিল—হলুদের গুঁড়ার ব্যবসা করিতে। উহাতে খুব লাভ, আস্ত হলুদ বাজার হইতে কিনিয়া বাগদি-পাড়ায় দিলে, তাহাদের ঢেঁকিতে তাহারাই কুটিয়া দিবে—মজুরী বাদেও যাহা থাকে, তাহা অনঙ্গ হিসাব করিয়া দেখিল নিতান্ত মন্দ নয়। আজকাল সে ব্যবসায় বুঝিতে পারে, ব্যবসা বুদ্ধি খুলিয়া গিয়াছে।

ভড়মশায়কে কথাটা বলিতে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

—হুঁঃ—ফুঃ! গুঁড়ো হলদির আবার ব্যবসা?

অনঙ্গ বলিল—না ভড়মশায়, আমি হিসেব ক'রে দেখেচি—আপনি আমায় হলুদ কিনে দিন দিকি, আমি বাগদি-পাড়া থেকে কুটিয়ে আনি···

তু'তিনবার হলুদের গুঁড়ো কেনাবেচা করিয়া দেখা গেল, পাটের খুচরো কেনাবেচার চেয়েও ইহাতে লাভের অঙ্ক বেশি।

আর একটা সুবিধা, এ-ব্যবসা বারোমাস চলিবে। বৌ-ঠাকরুণের বুদ্ধির উপর ভড়মশায়ের শ্রদ্ধা জন্মাইল। টাকা বসিয়া থাকে না, অনঙ্গ নানা বুদ্ধি করিয়া এটা-ওটার ব্যবসায়ে খাটাইয়া যতই সামান্য হউক, তবুও কিছু কিছু আয় করে।

কিন্তু বর্ষার শেষে ম্যালেরিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছে।

অনঙ্গ একদিন জ্বরে পড়িল। জ্বর লইয়াই গৃহকর্ম করিয়া রাত্রের দিকে জ্বর বেশ বাড়িল। আগাগোড়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল বিছানায়—উঠিবার শক্তি নাই। অতবড় বাড়ী, কেহ কোথাও নাই—কেবল এই ঘরখানিতে সে আর তাহার দুটি ছেলে-মেয়ে।

বড় খোকা আট বছরে পড়িয়াছে। সে বলিল—মা, আমাদের এবেলা ভাত দেবে কে?

অনঙ্গ জ্বরের ঘোরে অচৈতন্ত হইয়া পড়িয়াছিল—সে প্রথমটা কোনো উত্তর দিল না। পরে বিরক্ত হইয়া ছেলেকে বকিয়া উঠিল। খোকা কাঁদিতে লাগিল। অনঙ্গ আরও বকিয়া বলিল—কানের কাছে ঘ্যান্-ঘ্যান্ করিস্ নে বলচি খোকা—খাবি কি তা আমি কি বলবো? আপদগুলো মরেও না যে আমার হাড় জুড়োয়! তোদের মানুষ করচে কে, জিগ্যেস্ করি? কে ঝক্কি পোয়ায়? যা, বাসিভাত হাঁড়িতে আছে, বেড়ে নে।

পরদিন ভড়মশায় আসিয়া দেখিলেন, ছেলে দুটি রান্নাঘরের সামনে ভাতের হাঁড়ি বাহির করিয়া একটা থালায় তাহা হইতে একরাশ পান্তা ভাত ঢালিয়া এঁটো হাতে সমস্ত মাখামাখি করিয়া ভাত খাইতেছে। অনঙ্গ আবার একটু শুচিবাইগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে আজকাল—তাহার বাড়ীতে এ কি কাণ্ড! ছেলে দুটো এঁটো-হাতে রান্নার হাঁড়ি লইয়া ভাত তুলিয়া খাইতেছে কি-রকম?

আশ্চর্য্য হইয়া ভড়মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি খোকা? ও কি হচ্চে? মা কোথায়?

খোকা ভড়মশায়কে দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া ভাতের দলা তুলিতে গিয়া হাত গুটাইয়াছিল। মুখের দু'পাশের ভাত ক্ষিপ্রহস্তে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—মা'র জ্বর। আমরা কাল রাত্রে কিছু খাই নি, তাই পলুকে ভাত বেড়ে দিচ্চি। মা কাল বলেছিল, হাঁড়ি থেকে নিয়ে খেতে।

সে এমন ভাব দেখাইল যে, শুধু ছোট ভায়ের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্ম তাহার এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা। তাহার খাওয়ার উপর বিশেষ কোনো স্পৃহা নাই।

—বলো কি খোকা! জ্বর তোমার মা'র? কোথায় তিনি?

খোকা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—বিছানায় শুয়ে। কথা বলচে না কিচ্ছু—এত ক'রে বললাম, আমি নুন পাড়তে পারি নে, পলুকে কি দেবো, তা মা···

ভড়মশায় ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া উঁকি মারিলেন। অনঙ্গ জ্বরের ঘোরে অভিভূত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার কোনো সাড়া-সংজ্ঞা নাই—লেপখানা গা হইতে খুলিয়া একদিকে বিছানার বাহিরে অর্দ্ধেক ঝুলিতেছে!

ভড়মশায় ডাকিলেন—ও বৌ-ঠাকরুণ! বৌ-ঠাকরুণ!

অনঙ্গ কোনো সাড়া দিল না।

—কি সর্ব্বনাশ! এমন কাণ্ড হয়েচে তা কি জানি? ও বৌ-ঠাকরুণ!

দু'তিনবার ডাকাডাকি করার পরে অনঙ্গ জ্বরের ঘোরে—'অ্যাঁ—করিয়া সাড়া দিল। সে সাড়ার কোনো অর্থ নাই। তাহা অচেতন মনের বহুদিনব্যাপী অভ্যাসের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাহার পিছনে বুদ্ধি নাই···চৈতন্ম নাই।

ভড়মশায় ছুটিয়া গিয়া গিরীশ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাইলেন। ডাক্তার দেখিয়া বলিল—কোনো চিন্তা নাই, সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর, তবে একটু সাবধানে রাখা দরকার। ভড়মশায়ের নিজের স্ত্রী বহুদিন পরলোকগত—এক বিধবা ভাইঝি থাকে বাড়ীতে, তাহাকে

আনাইয়া সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন—প্রতিবেশীরা বিশেষ কেহ উঁকি মারিল না।

চৌদ্দ-পনেরো দিন পরে অনঙ্গ সারিয়া উঠিয়া রোগ-জীর্ণ-মুখে পথ্য করিল। কিন্তু তখন সে অত্যন্ত দুর্ব্বল—উঠিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই।

ভড়মশায় এতদিন জিজ্ঞসা করিবার অবকাশ পান নাই, আজ জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌ-ঠাকরুণ, টাকা কোথায়?

—টাকা সিন্দুকে আছে।

—চাবিটা দাও, দেখি।

এদিক-ওদিক খুঁজিয়া চাবি পাওয়া গেল না। বালিশের তলায় তো থাকিত, কোথায় আর যাইবে, এখানে কোথাও আছে। সব জায়গা তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, ছেলেদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, অবশেষে কামার ডাকাইয়া তালা ভাঙিয়া দেখা গেল, সিন্দুকে কিছুই নাই। টাকা তো নাই-ই, উপরন্তু অনঙ্গর হাতের দু'গাছা সোনা-বাঁধানো হাতীর দাঁতের চুড়ি ছিল, তাহাও উবিয়া গিয়াছে। আর গিয়াছে গদাধরের পিতামহের আমলের সোনার তৈরী ক্ষুদ্র একটি শীতলা-মূর্ত্তি। ক্ষুদ্র হইলেও প্রায় ছ'সাত ভরি ওজনের সোনা ছিল মূর্ত্তিটাতে।

বহুকষ্টে অর্জ্জিত অর্থের সঙ্গে শীতলা-মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধানে, নানা অমঙ্গল-আশঙ্কায় অনঙ্গ মাথা ঠুকিতে লাগিল।

ভড়মশায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আজ এক বৎসরের বহু কষ্টে সঞ্চয়-করা যৎসামান্য পুঁজি যাহা ছিল, কোনোরকমে তাহাতে হাত-ফেরতা খুচরা ব্যবসা চালাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল।

অবলম্বনহীন, সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় এখন ইহাদের কি উপায় দাঁড়াইবে?

ভড়মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—বাড়ীতে কে-কে আসতো?

অনঙ্গ বিশেষ কিছু জানে না! তাহার মনে নাই। জ্বরের ঘোরে সে রোগের প্রথমদিকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত—কে আসিয়াছে, গিয়াছে, তাহার খেয়াল ছিল না। প্রতিবেশিনীরা মাঝে-মাঝে তাহাকে দেখিতে আসিত—শচীনের মা একদিন না দুদিন আসিয়াছিলেন, স্বর্ণ গোয়ালিনী একদিন আসিয়াছিল মনে আছে—আর আসিয়াছিলেন, মুখুয্যে-গিন্নী। তবে ইহাদের বেশির ভাগই অশুচি হইবার ভয়ে রোগীর ঘরের মধ্যে ঢোকেন নাই, দোরে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া, ডিঙাইয়া-ডিঙাইয়া উঠান পার হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার একটি ন্যায্য কারণ যে না ছিল তাহা নয়। বাড়ীর ছেলে দুটি মায়ের শাসনদৃষ্টি শিথিল হওয়ায় মনের আনন্দে যেখানে-সেখানে ভাত ছড়াইয়াছে, এঁটো থালাবাসন রাখিয়াছে, যাহা খুশি তাহাই করিয়াছে—সেখানে কোনো জাতিজন্মবিশিষ্ট হিন্দুর ঘরের মেয়ে কি করিয়া নির্ব্বিকারমনে বিচরণ করিতে পারে, ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। শুধু লোকের নিন্দা করিয়া লাভ নাই।

চুরির কোনো হদিস্ মিলিল না। উপরন্তু অনঙ্গ বলিল—ভড়মশায়, আমার যা গিয়েছে,

গিয়েচে—আপনি আর কাউকে বলবেন না চুরির কথা। শত্রু হাসবে, সে বড় খারাপ হবে। উনি শত্রু হাসাবার ভয়ে আজ পর্য্যন্ত গাঁয়ে ফিরলেন না—আর আমি সামান্ত টাকার জন্তে শত্রু হাসাবো? তিনি এত ক্ষতি সহ্য করতে পারলেন—আর আমি এইটুকু পারবো না, ভড়মশায়?

সুতরাং ব্যাপার মিটিয়া গেল।

ভড়মশায় কলিকাতায় মেসের ঠিকানায় দু'তিনখানা চিঠি দিয়া কোনো উত্তর পাইলেন না। অবশেষে সব কথা খুলিয়া লিখিয়া একখানি রেজেষ্ট্রি চিঠি দিলেন—চিঠি ফেরত আসিল, তাহার উপর কৈফিয়ৎ লেখা—'মালিক এ ঠিকানায় নাই'।

অনঙ্গর হাতে দু'গাছা সোনা-বাঁধানো শাঁখা ছিল। খুলিয়া তাহাই সে বিক্রয় করিতে দিল। সেই যৎসামান্য পুঁজিতে হলুদের গুঁড়ার ব্যবসা করিয়া কোনো হাটে বারো আনা, কোনো হাটে-বা কিছু বেশি আসিতে লাগিল। অকূল সমুদ্রে সামান্য একটা ভেলা হয়তো—কিন্তু জাহাজ যেখানে মিলিতেছে না, সেখানে ভেলার মূল্যই কি কিছু কম?

অনঙ্গ এখনও পায়ে বল পায় নাই। কোনক্রমে রান্নাঘরে বসিয়া দুটি রান্না করে, ছেলে দুটিকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া রোয়াকের একপ্রান্তে মাদুর পাতিয়া রৌদ্রে শুইয়া থাকে, কোনদিন বা একটু ঘুমায়। দুবেলা রান্না হয় না, হাঁড়িতে ওবেলার জন্য ভাত-তরকারি থাকে, সন্ধ্যার পরে ছেলে-মেয়েরা খায়।

একটু চুপ করিয়া শুইয়া দেখে, ধীরে-ধীরে উঠানের আতাগাছটা লম্বা ছায়া ফেলিতেছে দোরের কাছে, পাঁচিলের গাছে আমরুল শাকের জঙ্গলে একটি প্রজাপতি ঘুরিতেছে, খোকার বাজনার টিনটা কুয়াতলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, পাশের জমিতে শচীনের সেওড়াতলী আম-গাছটার মগ্ ডালের দিকে রোদ উঠিতেছে ক্রমশঃ, নাইবার চাতালে গত-বর্ষায় বন-বিছুটির গাছ গজাইয়াছে—অনেকদিন আগে গদাধর কুয়াতলায় বসিয়া স্নানের জন্য শখ করিয়া একটি জলচৌকি গড়াইয়াছিলেন—সেখানা একখানা পায়া ভাঙা অবস্থায় কাঠ রাখিবার চালাঘরের সামনে চিত হইয়া পড়িয়া আছে! তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল।

বড় খোকাকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁরে, ও চৌকিখানা ওখানে অমন ক'রে ফেলেছে কে রে?

খোকা এদিকে-ওদিকে চাহিতে-চাহিতে জলচৌকিখানা দেখিতে পাইল। বলিল—আমি জানিনে তো মা? আমি ফেলিনি।

—যেই ফেলুক, তুই নিয়ে এসে দালানের কোণে রেখে দে। কেউ না ওতে হাত দেয়।

তারপর সে আবার দুর্ব্বলভাবে বালিশে ঢলিয়া পড়ে। মনেও বল নাই, হাত-পায়েও জোর নাই যেন। তাহার ভালো লাগে না, একা-একা এ বাড়ীতে যে থাকিতে পারে না। জীবন যেন তার বোঝা হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া এই শীতের সন্ধ্যাবেলা মনের মধ্যে কেমন হু হু করে! সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ! কেহ নাই যে, একটি কথা বলিয়া আদর করে, মুখের দিকে চায়। কত কথা মনে পড়ে—এমনি কত শীতের ঠাণ্ডা-রোদ সেওড়াতলী আমগাছটার

মগ্‌ডালে উঠিয়া গিয়াছে আজ চৌদ্দ বছর ধরিয়া, চৌদ্দ বছর আগে এমনি এক শীতের মধ্যাহ্নে সে নববধূরূপে এ-গৃহে প্রথম প্রবেশ করে। ওই অতি পরিচিত ঠাণ্ডা রোদ-মাখানো আম-গাছটার দিকে চাহিলে কত ভালো দিনের কথা মনে পড়ে, কত আনন্দ-ভরা শীতের সন্ধ্যার স্মৃতিতে হৃদয় ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া ওঠে।

চিরকাল কি এমনি কাটিবে?

মা মঙ্গলচণ্ডী কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না?

ভড়মশায় হাটের টাকা লইয়া দরজার কাছে আসিয়া সাড়া দেন—বৌ-ঠাকরুণ আছো? বৌ-ঠাকরুণ?

—হ্যাঁ, আসুন। নেই তো আর যাচ্চি কোথায়?

—এগুলো গুণে নিও।

অনঙ্গ গুনিয়া বলিল—সাড়ে তের আনা? আজ যে বেশি?

—হল্‌দির দর চড়ে গিয়েচে বাজারে। সামনের হাটে আরও হবে—আর কিছু বেশি টাকা হাতে আসতো এ-সময় তো একটা থোক লাভ করা যেতো হলুদ থেকে।

—আচ্ছা ভড়মশায়?

অনঙ্গর গলায় সুরের পরিবর্ত্তনে ভড়মশায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি? কি হলো?

—আচ্ছা, একবার আপনি কলকাতায় যাবেন?

—কলকাতায়? তা…

—তা নয় ভড়মশায়। অনেকদিন কোনো খবর পাইনি, আমার মনটা…আপনি একবার বরং…

স্বামীর কথা বলিতে গেলেই কোথা হইতে কান্না আসিয়া কেন যে গলার স্বর আট্‌কাইয়া লোকের সামনে লজ্জায় ফেলে এমন ধারা!

ভড়মশায় চিন্তিত মুখে বলেন—তা—তা—গেলেও হয়।

—তাই কেন যান না আজই। একবার দেখে আসুন। আজ কত-দিন হলো, কোনো খবর পাইনি—শরীর-গতিক কেমন আছে, কি-রকম কি করচেন, আপনি নিজের চোখে দেখে এলে ··

ভড়মশায় কথাটা ভাবিয়া দেখিলেন। যাইতে অবশ্য এমন কি আপত্তি, তা নয়। তবে পয়সা খরচের ব্যাপার। এই নিতান্ত টানাটানির সংসারে এমনি পাঁচটা টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে যাতায়াতে। বৌ-ঠাকরুণ সে টাকা পাইবেনই-বা কোথায়?

মুখে বলিলেন—আচ্ছা, দেখি।

—তাহ'লে কোন্ গাড়িতে যাবেন আপনি?

—আজ কাল তো হয় না। হাটবার আসচে সামনে।

—হাটবার লেগেই থাকবে। আমি এক-রকম ক'রে চালিয়ে নেবো এখন, আপনি যান

—আমার কাছে তিনটে টাকা আছে, তুলে রেখে দিইচি, তাই নিয়ে যান।

সপ্তাহের শেষে অনঙ্গ আবার জ্বরে পড়িল। তবে এবার জ্বরটা খুব বেশি নয়, সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর, এসময় পাড়াগাঁয়ের ঘরে-ঘরেই এমন জ্বর লাগিয়া আছে, তাহাতে ডাক্তারও আসে না, বিশেষ কোন ঔষধও পড়ে না। তবুও ভড়মশায় ডাক্তার ডাকানোর প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অনঙ্গ কথাটা উড়াইয়া দিয়া বলিল—হ্যাঁ, আবার ডাক্তার কি হবে? বরং ডাকঘরের কুইনিন এক প্যাকেট কিনে দিন, তাই খেয়েই যাবে এখন—ভারি তো জ্বর!

সে জ্বরে তিন-চারদিন ভুগিয়া তখনকার মত গেল বটে, কিন্তু দুঁদিন অন্ন পথ্য করিতে না করিতে আবার জ্বর দেখা দিল। একেই সে ভালো ভাবে সারিয়া উঠিতে পারে নাই প্রথম অসুখের পর, এভাবে বার-বার ম্যালেরিয়ায় পড়াতে আরও দুর্বল হইয়া পড়িল, রক্তহীনতার দরুন মুখ হলদে ফ্যাকাসে-রংএর হইয়া আসিল, শরীর রোগা, মাথার সামনের চুল উঠিয়া সিঁথির কাছটা কুশ্রী ধরণের চওড়া হইয়া গেল, ভাতে রুচি নাই, একবার পাতের সামনে বসে মাত্র, মুখে কিছু ভালো লাগে না।

সংসারে বেজায় টানাটানি চলিতেছিল, শীত পড়ার মুখে হলুদের দর একটু চড়াতে, হাটে-হাটে আগের চেয়ে আয় কিছু বাড়িল। অনঙ্গ আজকাল ব্যবসা বেশ বোঝে, সে নিজে অসুখ শরীরে শুইয়া-শুইয়া একদিন মুখুজ্যে-বাড়ী হইতে শুকনো পিপুল কিনিয়া আনাইল এবং সেগুলি হাটে পাঠাইয়া পাঁচ-ছ টাকা লাভ করিল।

একদিন সে আবার ভড়মশায়কে ধরিল কলিকাতা যাইবার জন্য।

ভড়মশায় বলিলেন—বেশ!

—বড় দেরি হয়ে যাচ্চে যাই-যাই ক'রে, কাজ তো আছেই, আপনি কালই যান। টাকা সকালে নেবেন, না এখন নেবেন?

—এখন পাঁচ জায়গায় ঘুরবো নিজের কাজে, কোথায় হারিয়ে যাবে। কাল সকালে বরং···

উৎসাহে অনঙ্গ মাদুর ছাড়িয়া ঠেলিয়া উঠিল বিকালে। পরদিন সকালে ভড়মশায় টাকা নিতে আসিলে, অনঙ্গ তাঁহার হাতে একটি বেশ ভারি-গোছের পোঁটলা দিয়া বলিল—এটা ওঁকে দেবেন।

কাল সারাদিন ধরিয়া গুছাইয়াছে সে, ভড়মশায় দেখিলেন, তাহার মধ্যে হেন জিনিস নাই যা নাই। গোটাকতক কাঁচা পেঁপে, এমন কি একটা মানকচু পর্যন্ত। তা ছাড়া গাছের বরবটি, আমসত্ব, পুরানো তেঁতুল, পোস্তদানার বড়ি···

ভড়মশায় মনে-মনে হাসিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না।

অনঙ্গ আঁচল হইতে খুলিয়া আরও তিনটে টাকা বাহির করিয়া বলিল—ভাড়া বাদে একটা টাকা নিয়ে যান, যাবার সময় হরি ময়রার দোকান থেকে নতুন গুড়ের সন্দেশ সের-দুই নিয়ে যাবেন।

ভড়মশায় দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকা কয়টি পকেটে পুরিয়া বলিলেন—চিঠি-টিটি কিছু দেবে না?

—না, চিঠি আর দিতে হবে না, মুখেই বলবেন। একবার অাসিস্তি ক'রে যেন আসেন এরই মধ্যে, বলবেন।

ভড়মশায় দরজার বাইরে পা ভালো করিয়া বাড়ান নাই, এমন সময় অনঙ্গ পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল—শুনুন, বাড়ী আসবার কথা বলবেন। বুঝলেন তো?

—আচ্ছা, বৌ-ঠাকরুণ, নিশ্চয় বলবো।

—এরই মধ্যে যেন আসেন—বুঝলেন?

ভড়মশায় ঘাড় হেলাইয়া প্রকাশ করিতে চাহিলেন যে, তিনি বেশ ভালোই বুঝিয়াছেন। কোনো ভুল হইবে না তাঁহার।

—আর যদি সঙ্গে ক'রে আনতে পারেন···

—বেশ বৌ-ঠাকরুণ! সে চেষ্টাও করবো।

দশ

ভড়মশায় দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই ভড়মশায় মনিবের পুরানো মেসে গেলেন। সংবাদ লইয়া জানিলেন, বহুদিন হইতেই গদাধরবাবু সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মেসের ম্যানেজার কোনো ঠিকানা বা সন্ধান দিতে পারিল না। তাহা হইলে কি জেলই হইল? তাহাই সম্ভব।

কিন্তু সে-কথা তো আর যাকে-তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না?

ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি শচীনের বাসায় গেলেন। শচীনেরও দেখা পাইলেন না। এখন একমাত্র স্থান আছে, যেখানে মনিবের সন্ধান হয়তো মিলতেও পারে—সেটি হইল শোভা-রাণীর বাড়ী। কিন্তু সেখানে যাইতে ভড়মশায়ের কেমন বাধো-বাধো ঠেকিতে লাগিল। অনেকদিন সেখানে যান নাই, হয়তো তাহারা তাঁহাকে চিনিতেই পারিবে না, হয়তো বাড়ীতে ঢুকিতেই দিবে না। তাছাড়া সেখানে যাইতে প্রবৃত্তিও হয় না তাঁহার। তবুও যাইতে হইল। গরজ বড় বালাই!

দরজায় কড়া নাড়িতেই যে চাকরটি দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইল, ভড়মশায় তাহাকে চিনিলেন না। চাকর বলিল—কাকে দরকার?

—মাইজী আছেন?

—হ্যাঁ, আছেন।

—একবার দেখা করবো, বলো গিয়ে।

চাকর কিছুমাত্র না ভাবিয়া বলিল—এখন দেখা হবে না।

ভড়মশায় অনুনয়ের স্বরে বলিলেন—বড্ড দরকার। একবার বলো গিয়ে।

—কি দরকার ? এখন কোনো দরকার হবে না। ওবেলা এসো।

—আচ্ছা, গদাধরবাবুর কোনো সন্ধান দিতে পারো ? আমি তাঁর দেশের লোক, যশোর জেলার কাঁইপুর গ্রামে বাড়ী, থানা রামনগর···

চাকর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দাঁড়াও, আমি আসচি।

দুরুদুরু বক্ষে ভড়মশায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি না-জানি বলে! চাকরটা নিশ্চয় মনিবকে চেনে, অন্ততঃ নামও শুনিয়াছে।

এবার আবার দরজা খুলিল। চাকর মুখ বাড়াইয়া বলিল—আপনার নাম কি ? মাইজী বললেন, জেনে এসো।

—আমার নাম, মাখনলাল ভড়। আমি বাবুর সেরেস্তার মুহুরী। বলো গিয়ে, যাও।

কিছুক্ষণ পরে চাকর পুনরায় আসিয়া ভড়মশায়কে উপরে লইয়া গেল।

ভড়মশায় উপরে গিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এ সে মেয়েটি নয়···সেবার যাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ইহার বয়স বেশি, গায়ের রং তত ফরসা নয়।

মেয়েটি বলিল—আপনি কাকে চান ?

ভড়মশায় অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সম্মুখে কথা বলিতে অভ্যস্ত নন, কেমন একটা আড়ষ্টতা ও অস্বস্তি বোধ করেন এসব ক্ষেত্রে। বিনীতভাবে সসঙ্কোচে বলিলেন—আজ্ঞে, গদাধর বসু, নিবাস যশোর জেলায়।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—বুঝেচি, তা এখানে খোঁজ করচেন কেন ?

—এখানে আগে যিনি থাকতেন, তিনি এখন নেই ?

—কে ? শোভা মিত্তির ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই নাম।

—সে এখান থেকে উঠে গিয়েচে। তাকে কি দরকার ?

—তাঁর সঙ্গে আমাদের বাবুর জানাশোনা ছিল, একবার তাই এসেছিলাম।

—গদাধর বসু। ন্যাশনাল সিনেমা কোম্পানীর জি, বসু তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, উনিই আমার বাবু। কিন্তু···

মেয়েটি বলিল—তা আপনি বলচেন গদাধরবাবুর মুহুরী দেশের—কিন্তু আপনি তাঁর কলকতার ঠিকানা জানেন না কেন ?

ভড়মশায় পাকা লোক। ইহার কাছে ঘরের কথা বলিয়া মিছামিছি মনিবকে ছোট করিতে যাইবেন কেন ? সুতরাং বলিলেন—আজ্ঞে, তাঁর সেরেস্তায় চাকরি নেই আজ বছরাবধি। তাঁকে একটু বলতে এসেছিলাম, যদি চাকরিটা আবার হয়, গরীব মানুষ, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বড় বিপদে পড়েচি, তাই।

—আপনি টালিগঞ্জে গিয়ে স্টুডিওতে দেখা করুন, ঠিকানা কাগজে লিখে দিচ্চি—বাড়ীতে এখন তাঁর দেখা পাবেন না।

ভড়মশায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, আনন্দে হাতে-পায়ে যেন বল পাইলেন। বাঁচা গেল, মনিবের তাহা হইলে জেল হয় নাই! সেই ছবি-তোলার কাজেই লাগিয়া আছেন, বোধহয় চাকরী লইয়া থাকিবেন।

মেয়েটি একটুকরা কাগজে ঠিকানা লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—ট্রাম থেকে নেমে বাঁ-দিকের রাস্তা ধ'রে খানিকটা গেলেই পাবেন। দেখবেন, লেখা আছে ন্যাশনাল ফিল্ম্ কোম্পানীর নাম, গেটের মাথায় আর দেয়ালের গায়ে।

রাস্তায় পড়িয়া পথ হাঁটিতে-হাঁটিতে কিন্তু ভড়মশায়ের মনে আনন্দের ভাবটা আর রহিল না। মনিব জেলে যান নাই—আবার সেই ছবি-তোলার কাজই করিতেছেন, অথচ এই এক বৎসরের মধ্যে একবার স্ত্রীপুত্রের খোঁজ-খবর করেন নাই, এ কেমন কথা? এস্থলে আনন্দ করিবার মত কিছু নাই, বরং ইহার মূলে কি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া যাওয়াটা দরকার। ভড়মশায়ের মন বেশ দমিয়া গেল।

দমিয়া গেলেও, সেই মন লইয়াই অগত্যা পথ চলিতে-চলিতে একসময় তিনি ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। ট্রাম যথাসময়ে টালিগঞ্জ-ডিপোয় আসিয়া পৌছিল। অন্যান্য সহযাত্রীরা একে-একে নামিয়া যাইতেছে দেখিয়া ভড়মশায়ের হুঁশ হইল, তাঁহাকেও এবার নামিতে হইবে। ভড়মশায় ট্রাম হইতে রাস্তায় নামিয়া আবার হাঁটিতে শুরু করিলেন।

মেয়েটির নির্দ্দেশমত বাঁ-দিকের পথ ধরিয়া হাঁটিবার সময় দেখিলেন, ভিন্ন-ভিন্ন ছোট-ছোট দল যে সব কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিয়াছে ঐ পথে, তাহাদের মৃদুগুঞ্জনে বেশ বুঝা যাইতেছে যে তাহারা সকলেই এখন ভড়মশায়ের লক্ষ্য-পথের পথিক। যে কোনো কাজের জন্যই যাক্ না কেন, তাহারাও চলিয়াছে ঐ স্টুডিওর উদ্দেশে।

কিছু পথ যাইতেই চোখে পড়িল, সামনে অনেকখানি জায়গা করোগেট টিন দিয়া ঘেরা মস্ত বাগান, আর সেই বাগানের কাছে পৌছিয়াই তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, তাঁহার ঈপ্সিত স্থানে আসিয়া গিয়াছেন। ঐ বাগানের ফটক। ফটকের দুইদিকে থামের মাথায় অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে লোহার ফ্রেমে সোনালী অক্ষরে জলজল করিতেছে—'ন্যাশনাল ফিল্ম্ স্টুডিও'।

মা-কালীকে স্মরণ করিয়া গেটের মধ্যে সবে পা দিয়াছেন, এমন সময় পিছন হইতে কোমরে আঁকশি দিয়া কে যেন টানিয়া ধরিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, ইয়া গালপাট্টা-ওয়ালা পশ্চিমা-পহলবানের মত এক দীর্ঘবপু দরওয়ানজী হাঁকিয়া বলিতেছে,—কাঁহা যাতা?

ভড়মশায় বলিলেন—হাঁহা আমার বাবু আছেন।

দরওয়ানজী হাঁকিল—গেট-পাশ হ্যায়?

—হাঁ হ্যায়। আমার বাবুর কাছ থেকে এখুনি নিয়ে আ তা হ্যায়, এনে তোমায় দিয়ে দেবো।

—পহেলা ল্যাও, লে-আয়কে অন্দরমে ঘুসো।

—বেশ, এখুনি এনে দিচ্ছি, তোমারা কোনো চিন্তা নেই হ্যায়।

কথাটা বলিয়া ভড়মশায় অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই আবার পশ্চাৎদিক হইতে শব্দের আকর্ষণ···কেঁউ, বাত মানেগা নেহি? মত যাও···লৌট্‌কে আও···

অগত্যা ভড়মশায়কে ফিরিতে হইল। এই বয়সে শেষে কি একজন খোট্টার কাছে অপমানিত হইবেন?

ওই দেখা যায় একটা সুপারি গাছ···তার পাশেই মস্ত বড় পুকুর। পুকুরের ওপারে টিনের ছাদ-আঁটা মস্ত একটা গুদামের মতো। সেখানে কত লোক চলিতেছে ফিরিতেছে··· সকলেই যেন খুব ব্যস্ত। ভড়মশায় ভিতরে ঢুকিতে না পাইয়া নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিশ্চিত বুঝিলেন যে, ঐখানেই ছবি তোলার কাজ হইতেছে। তার-পর দ্বারবানের নিকটে আসিয়া সে কি আকুতি! দ্বারবান ভিতরে যাইতে দিবে না; ভড়মশায়কেও যাইতেই হইবে। মিনতি যখন কলহে পরিণত হইবার উপক্রম, এমন সময় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ভড়মশায়কে দেখিয়া লোকটি বলিল—কাকে চান? ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

—আজ্ঞে, আমি গদাধর বসুমহাশয়কে খুঁজচি—নিবাস কাঁইপুর, জেলা···

—বুঝেচি! আপনি ওখানে যাবেন না। ওখানে সেট্ সাজানো হচ্চে—ওখানে যেতে দেবে না আপনাকে। মিঃ বোসের আসবার সময় হয়েচে—এখানে আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন, মোটর এসে এখানে থামবে।

—আজ্ঞে, আপনার নাম?

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বলিলেন—কোনো দরকার আছে? শান্তশীল রায়কে খুঁজে নেবেন এর পরে—আমার সময় নেই, যাই, আমাকে এখুনি সেটে যেতে হবে।

ভড়মশায় সেখানে বোধহয় পাঁচ মিনিটও দাঁড়ান নাই, এমন সময়—একখানা মাঝারি গোছের লালরঙের মোটর আসিয়া তাঁহার সামনে লাল কাঁকরের রাস্তার উপর দাঁড়াইল।

ভড়মশায় তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেলেন, কিন্তু দেখিলেন, মোটর হইতে নামিল দুটি মেয়ে, হাতে তাদের ছোট ছোট ব্যাগ—তাহারা নামিয়াই দ্রুতপদে পুকুরের পাড়ে চলিয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ পরে আর-একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। এবার ভড়মশায়ের বিস্মিত ও বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে নামিলেন, গদাধর ও তাঁহার সঙ্গে একটি সুবেশা মহিলা। ভড়মশায় চিনিলেন, মেয়েটি সেই শোভারাণী মিত্র। ড্রাইভারের পাশের আসন হইতে তক্‌মা-পরা এক ভৃত্য নামিয়া তাঁহাদের জন্য গাড়ীর দোর খুলিয়া সসম্ভ্রমে একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে এবার একটা ব্যাগ হাতে তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

ভড়মশায় আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন—বাবু, বাবু···

কিন্তু পিছনের ভৃত্যটি একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র, গদাধর ও মহিলাটি ততক্ষণে দ্রুতপদে পুকুরের পাড়ের রাস্তা ধরিয়াছে, বোধ হয় ভড়মশায়ের ডাক তাঁহাদের কানে পৌঁছিল না।

ভড়মশায় কি করিবেন ভাবিতেছেন—এমন সময় পূর্ব্বের সেই তরুণ বয়স্ক ভদ্রলোকটিকে এদিকে আসিতে দেখিতে পাইলেন।

ভড়মহাশয়কে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কাছে আসিয়া বলিলেন—কি, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে? দেখা হয়নি? এই তো গেলেন উনি।

ভড়মশায় নিরীহমুখে বলিলেন—আজ্ঞে, দেখা হয়েচে। ওই মেয়েটি কে বাবু?

ভদ্রলোক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ভড়মশায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—চেনেন না ওঁকে? উনিই শোভারাণী—মস্ত বড় ফিল্‌ম্‌স্টার—ওই। মিঃ বোসের কপাল খুব ভালো। দু'খানা ছবি মার খেয়ে যাবার পরে—আশ্চর্য্য মশাই, শোভারাণী নিজে এসে যোগ দিয়েচে—চমৎকার ছবি হচ্চে—ডিষ্ট্রিবিউটারেরা খরচের সব টাকা দিয়েচে। শোভারাণীর নামের গুণ মশাই—মিঃ বোস এবার বেশ-কিছু হাতে করেছেন, শোভারাণীর সঙ্গে—ইয়ে—খুব মাখামাখি কিনা? এক সঙ্গেই আছেন দু'জনে। আপনি কাজ খুঁজছেন বোধ হয়? তা, ধরুন না গিয়ে ম্যানেজারকে—আমি মশাই, বড় ব্যস্ত। গাড়ী নিয়ে যাচ্ছি একটা জিনিস আনতে, শোভারাণীর বাড়ীতেই···ভুলে ফেলে এসেচেন—নমস্কার!

ভড়মশায় হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জ্যোতিরিঙ্গণ

সংসার

উপেন ভটচাজের পুত্রবধূ বেশ সুন্দরী। একটি মাত্র ছোট ছেলে নিয়ে অত বড় পুরনো সেকেলে ভাঙা বাড়ীর মধ্যে একাই থাকে। স্বামীর পরিচয়ে বৌটি এ গ্রামে পরিচিতা নয়, অমুকের পুত্রবধূ এ-ই তার একমাত্র পরিচয়। কারণ এই যে স্বামী ভবতারণ ভটচাজ ভবঘুরে লোক। গাঁজা খেয়ে মদ খেয়ে বাপের যথাসর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিয়েছে, এখন কোথায় যেন সামান্য মাইনেতে চাকরি করে, শনিবারে শনিবারে বাড়ী আসে, কোন শনিবারে আসেই না। শ্বশুর উপেন ভটচাজ গ্রামের জমিদার মজুমদারদের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্যপূজা করেন। সেখানেই থাকেন, সেখানেই খান। বড়-একটা বাড়ী আসেন না তিনিও। ভালো খেতে পান বলে ঠাকুরবাড়ীতেই পড়ে থাকেন, নইলে সকালের বাল্যভোগের লুচি ও হালুয়া, পায়েস, দই ও বৈকালীর ফলমূল বারভূতে লুটে খায়।

কোন কোন দিন সন্ধ্যার দিকে তিনি বাড়ী আসেন। হাতে একটা ছোট্ট পুঁটুলি, তাতে প্রসাদী লুচি ও মিষ্টি, ফলমূল, একটু বা ক্ষীরের ছাঁচ থাকে। তাঁর নাতি করুণার বয়স এই সাত বছর! না খেতে পেয়ে সে সর্ব্বদা খাইখাই করছে, যা হয় পেলেই খুশী, তা কাঁচা আমড়া হোক, পাকা নোনা হোক, চালভাজা হোক, তালের কল হোক, আধপাকা শক্ত বেল হোক। খাওয়া পেলেই হল, স্বাদের অনুভূতি তার নেই। ঝাল, টক, মিষ্টি, তেতো তার কাছে সব সমান!

—ও করুণা, এই ছাখ্—কি এনেছি—

—কি ঠাকুরদাদা?

'দাদু-টাদু' বলার নিয়ম নেই এই সব অজ পাড়াগাঁয়ে, ওসব শৌখিন শহুরে বুলি করুণা শেখে নি। সে ছুটে যায় উৎসুক লোভীর ব্যগ্রতা নিয়ে। ঠাকুরদাদা পুঁটুলি খুলে দুখানা আখের টিকলি, একটা বাতাসা ওর হাতে দেন। ও তাতেই মহাখুশী। ঠাকুরদাদা যে জিনিস দেন, তার চেয়ে যে জিনিস্ দেন না তা অনেক ভাল ও অনেক বেশি। পুঁটুলির সে অংশে থাকে বৈকালী ভোগের লুচি, কচুরি, মালপুয়া ও তালের বড়া। যখনকার যে ফল সেটা ঠাকুরকে নিবেদন করার প্রথা এ ঠাকুরবাড়ীতে বহুকাল থেকে প্রচলিত। এখন ভাদ্র মাস, কাজেই তালের বড়া রোজ বিকেলে নিবেদিত হয়।

করুণা এক আধবার পুঁটুলির অন্য অংশে চাইলে।

কিন্তু তাতে তার লোভ হয় না, ও রকম দেখতে খুব ছেলেবেলা থেকে সে অভ্যস্ত। সে জানে ও অংশে তার কোন অধিকার নেই।

ঠাকুরদাদার দিকে ও বোকার মত চেয়ে থাকে। উপেন ভটচাজ গলায় কাশির আওয়াজ করে পুত্রবধূকে তাঁর আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করতে করতে বাড়ী ঢোকেন এবং সটাং দোতলায় নিজের ঘরটিতে চলে যান।

রোজ তাঁর ঘরটিতে নিজে চাবি দিয়ে বেরিয়ে যান এবং এসে আবার খোলেন। পুত্র-বধূকে বিশ্বাস করার পাত্র নন তিনি। কোন মেয়েমানুষকেই বিশ্বাস নেই।

—ও বৌমা—বৌমা, ওপরে এস—

—কে? বাবা?

—একবার ওপরে এস।

পুত্রবধূ ওপরে গিয়ে দেখে শ্বশুর পুঁটলি খুলে কি সব খাবার জিনিস ত্রস্ত ভাবে হাঁড়ির মধ্যে পুরছেন। পুত্রবধূকে দেখে তাড়াতাড়ি তিনি হাঁড়িটার দিকে পেছন ফিরে বসে বললেন—বৌমা? ইয়ে কর তো—আমার ঘরে একটা আলো জেলে দিয়ে যাও।

—আপনি রাতে কি খাবেন? ভাত রাঁধব?

—না। তুমি শুধু খাবার জল একঘটি দিয়ে যেও এর পরে।

এ সংসারে বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্য পুত্রবধূর রাঁধবার নিয়ম নেই। যার যার, তার তার। ছেলে যখন আসে, বাপের খোঁজ নেয় না। ওরা নিজে রাঁধে, নিজেরা খায়। উপেন ভটচাজ এসে নিজের ঘরের তালা খুলে বড় জোর একটু জল কোনদিন একটু নুন চান পুত্রবধূর কাছে। এর বেশি তাঁর কিছু চাইবার থাকে না, কেউ তাঁকে দেয়ও না। আজ পুত্রবধূর তাঁর জন্যে রান্না করার প্রস্তাবে তিনি খানিকটা বিস্মিত না হয়ে পারেন নি মনে মনে। বোধ হয় সেইজন্যে পুত্রবধূর প্রতি তাঁর মনোভাব হঠাৎ বড় দরাজ হয়ে গেল। তার ফলে যখন আবার সে জলের ঘটি নিয়ে ঢুকল, তখন তিনি হাঁড়িটা সামনে নিয়ে বললেন—দাঁড়াও বৌমা। করুণাকে দিইছি—আর তুমি এই দুখানা লুচি আর এই একটু মিষ্টি নিয়ে যাও। জল খেও।

পুত্রবধূ দুই হাত পেতে শ্বশুরের দেওয়া আধখানা ক্ষীরের ছাঁচ, খানচারেক লুচি, আধ-খানা ছানার মালপুয়া ও দুটি তালের বড়া নিয়ে একটু অবাক হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

শ্বশুর হঠাৎ কেন এত সদয় হয়ে উঠলেন তার ওপরে? না খেয়ে থাকলেও তো কখনও পোছেন না সে খাচ্ছে, না উপোস করছে।

সে বললে—আমি যাই বাবা?

—হ্যাঁ যাও। পান আছে?

—না তো বাবা। এ হাটে আমার হাতে পয়সা ছিল না। করুণার পাঠশালার মাইনে চার আনা বাকি। তাগাদা করছে মাস্টার। তাও দিতে পারছি নে।

পুত্রবধূর নাম তারা! গরীব ঘরের মেয়ে না হলে আর এমন সংসারে বিয়ে হবে কেন? নিচে নেমে এসে সে ছেলেকে ডেকে দুখানা লুচি আর মিষ্টিগুলো সব খেতে দিলে। নিজের জন্যে রাখলে দুখানা লুচি আর দুটো তালের বড়া। ছেলেকে তালের বড়া খেতে দিলে ওর পেট কামড়াবে রাতে।

সত্যি, তার হাতে পয়সা না থাকায় কোনদিনই রাতে সে কিছু খায় না। করুণার জন্যে দুবেলার চাল মেওয়া হয় ওবেলা, জল দেওয়া ভাত সন্ধ্যের পিদিম জ্বালিয়েই করুণাকে খেতে

দেয়। তার পর মায়ে পোয়ে শুয়ে পড়ে।

নিত্য নক্ষত্র ওঠে আকাশে, নিত্য চাঁদের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে যায় ওদের মস্ত বড় ছাদটা। ও ছেলেকে নিয়ে অত বড় বাড়ীর মধ্যে একখানা ঘরে শুয়ে থাকে, ইঁদুর খুটখাট করে, কলাবাদুড় পুরনো বাড়ীর কোণে কোণে চটাপট শব্দে ওড়ে, ছাদের ধারের বেল গাছটাতে বেলের ডাল বাতাসে দোলে—কোন কোন দিন ওর ছেলের ঘুম ভেঙে যায়, ভয়ে মাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে বলে—ও কি খুটখুট করছে মা ?

—কিছু না, তুই ঘুমো। ও ইঁদুর।

—বাইরে ছাদে ? ওই শোন—

—ও কিছু না। তুই ঘুমো।

—শাঁকচুন্নী আছে মা বেলগাছে ?

—না। সে সব কিছু না।

—শোন মা, রেতার দাদা গল্প করছিল, তাদের বাঁশঝাড়ে শাঁকচুন্নী আছে—রেতা নিজেও দেখেছে একদিন, বুঝলে মা ?

—তুই ঘুমো। ওসব বাজে গল্প। আচ্ছা খোকন, আমি একা একা রাত আটটার সময় পুকুরে কাপড় কেচে আসি, আমি কিছু তো দেখি নে ?

উপেন ভটচাজের পুত্রবধূর সাহস খুব, একথা গাঁয়েও সকলে বলাবলি করে। অত বড় প্রাচীন অট্টালিকায় বহু ঘরদোরের মধ্যে ছোট্ট একটি ছেলে সম্বল করে বাস করে—ওই ভূতের বাড়ীতে। বাবা ! শ্বশুর তো কালভদ্রে বাড়ী ফেরে, সোয়ামীও প্রায় তাই। শনিবারে যদি বা এল, রবিবার বিকেলেই চলে গেল। ধন্যি সাহস বটে মেয়েছেলের !

কেউ কেউ বলে—মেয়েমানুষের ভাই, যাই বল; অতটা সাহস ভাল না। স্বভাব-চরিত্তির কার কি রকম তা তো কেউ বলতে পারে না।

শেষ রাত্রে করুণা আবার মাকে ঠেলা মেরে বললে—ওমা, ওঠ না। কিসের শব্দ হচ্ছে—

—তুই বাবা আর ঘুমুতে দিলি নে। কই কোথায় শব্দ ?

কে এসে দরজায় ঘা দিলে। কড়া নাড়লে ওদের ঘরের বাইরে।

তারা ধড়মড় করে উঠে বললে—কে ?

বাইরে থেকে উত্তর এল—আমি ! দোর খোল।

করুণা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল প্রায়।

—ও, বাবা !

তারা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে খিল খুলে দিয়ে একগাল হেসে বললে—এস এস। একেবারে শেষ রাত্তিরে ? ভাল আছ ?

—হ্যাঁ। বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। আসতে বা কষ্ট হয়েছে ! তালপুকুরের

মাঠের মধ্যে বাস খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাত দশটা থেকে। এই খানিকটা আগে তখন চললে।

—তুমি হাত-মুখ ধোও। জল গামলায় আছে, গাড়ুতে আছে। আমি ভাত চড়াই।

—ভাত? শেষ রাত্তিরি ভাত খেয়ে মরি আর কি। আমার পুঁটুলির মধ্যে সরু চিঁড়ে আছে, তাই দুটো ভিজিয়ে দ্যাও। খোকা, সরে আয়, তোর জন্যি জিলিপি কিনেছিলাম, তা মিইয়ে ন্যাতা হয়ে গিয়েছে। এই ন্যাও, খোকারে দুখানা দ্যাও, তুমি দুখানা খাও।

—আমি খাব না, তুমি খেয়ে এট্টু জল খাও।

—ওগো না না। যা বলছি শোন না। আমার পেট ভাল না কদিন থেকে। সরু চিঁড়ে ভিজিয়ে নেবুর রস আর নুন মেখে বেশ কচ্‌লে কচ্‌লে কথ বের করে—

—থাক, থাক, তোমাকে আর শেখাতে হবে না। হাত-মুখ ধুয়ে এস।

—যাব। তার আগে একবার গাড়ুটা দাও দিকি।—গামছাখানা এখানে রেখে দিও। আসছি আমি।

তারা তখুনি চিঁড়ে ভেজাতে দিলে। স্বামী এসে হাত-মুখ ধুয়ে বসল, তার সামনে পাথরের একটা বড় বাটিতে চিঁড়ের কথ নুন লেবু মিশিয়ে তাকে খেতে দিলে। স্বামী একটুকু মুখে দিয়েই বললে—বাঃ, বেশ! নুন নেবু মিশিয়ে বড় চমৎকার খেতে লাগছে!

—আর দেব?

—না না, এই বেশি হয়েছে। হ্যাগা, ধার দেনা কত এবার?

—মাছ কিনিছিলাম একদিন চার আনা, একদিন দু আনা। আর খোকা আমসত্ত্ব খেতে চেয়েছিল, তাই বোষ্টম বাড়ী থেকে কিনে এনেছিলাম দু আনার।

—আমসত্ত্ব আবার কিনতে গেলে? বড় নবাব হয়েছ, না?

স্বামীর মুখে কড়া সুরের কথা শোনা এই প্রথম নয় তারার। ওর চেয়ে অনেক বেশি রূঢ় ব্যবহার ও কথা সে সহ্য করে আসছে স্বামীর।

গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে তার।

তাও বিনি দোষে। খোকা খেতে চেয়েছিল, ছেলেমানুষ আবদার ধরলে, ও কি বোঝে কিছু? অবোধ। না দিতে পারলে কষ্ট হয়।

—বা রে, খোকা কাঁদতে লাগলো, দেব না কিনে?

—না। বাপের বাড়ী থেকে পয়সা এনে দিও।

—মুখ সামলে কথা কও বলছি। বাপ তুলো না, খবরদার!

—ওরে বাপ্‌রে! দেখো ভয়েতে ইঁদুরের গর্তে না ঢুকি। তবুও যদি বাপের বাড়ীর চালে খড় থাকত!

—ছিল না বলেই তো তোমার মত অজ পাড় মুক্‌খু আর মাতালের হাতে বাপ দিইছিল ধরে!

—তবে রে—

স্বামী ভবতারণ হাতের কাছে ছাতা পেয়ে তাই উঁচিয়ে গেল তারার দিকে। করুণা চীৎকার করে কেঁদে উঠল ভয়ে। ওপর থেকে উপেন ভটচাজ বলে উঠলেন—কে? কে? কি হল? কে ওখানে?

ভবতারণ উদ্যত ছাতা নামিয়ে বললে—তোমায় আমি—ফের যদি—ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার!

—খবরদার! আবার বাপ তুলছ? বেরোও তুমি বাড়ী থেকে। দূর হও। তোমার মুখে ছাইয়ের নুড়ো দেব বলে দিচ্ছি। বেরোও—

—হারামজাদী, ছাখ্, এখনও মুখ সামলা বলে দিচ্ছি। বেরোব কেন, তোর কোন্ বাবা এ বাড়ী করে রেখে গিইছিল জিগ্যেস করি? তুই বেরো—

করুণা আকুল স্বরে কাঁদছে বাবা-মার ধুন্ধুমার ঝগড়ার মাঝখানে পড়ে গিয়ে। ওর মা এসে ওকে কোলে নিয়ে বললে—চল্ খোকা আমরা এ বাড়ী থেকে চলে যাই—ওরা থাকুক, যাদের বাড়ী। তোর-আমার বাড়ী তো না!

—খবরদার, খোকাকে ছুঁয়ো না বলছি। যাবি হারামজাদী তো একলা মর গে যা—খোকা তোর না আমার?

—বেশ! রাখ খোকাকে। আমি একলাই যাচ্ছি।

—যা—বেরো—

করুণা ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে—মা, তুমি যেও না। আমি তোমার সঙ্গে যাব—

ভবতারণ বললে—খোকন, কেঁদ না। তোমায় আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। রেলগাড়ী কিনে দেব। মটোর কিনে দেব—এস—

করুণা কান্নায় জড়িত স্বরে বললে—না—

—এস—

—না—

—কলকাতায় যাবি নে?

—না—

মাকে সে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরে।

এমন সময়ে ওপর থেকে উপেন ভটচাজ নেমে এসে ছেলেকে বললেন—তুই কী চেঁচামেচি আরম্ভ করলি ভোর রাত্তিরি? তুই মানুষ হলি নে এই দুঃখে আর আমি বাড়ী আসি নে। কেন মিছিমিছি বৌমাকে যা তা বলছিস? আমি সব শুনছি নে ওপর থেকে? তোরই তো দোষ। ও আমার ঘরের লক্ষ্মী—

—আপনাকে তো কিছু বলি নি—আপনি ওপরে যান বাবা—আমাদের কথার মধ্যে আসতি কে বলেছে আপনাকে?

—আমি যাই না যাই সে আমি বুঝব। আর তুই যে বলছিস বৌমাকে বাড়ী থেকে

বেরুতি—আমার বাড়ী না তোর বাড়ী ? আমি আজও বেঁচে নেই ? তোর কী দাবি আছে এ বাড়ীর ওপর ? আমি ওপর থেকে সব শুনেছি। বদমাইস পাজি কোথাকার! আমি মরবার আগে খোকনকে বাড়ী লিখে দিয়ে যাব—কালই যাচ্ছি আমি সদরে। বৌমাকে অছি করে যাব। তোমার বাড়ীর আম্বা ঘুচিয়ে তবে আমার কাজ, হতচ্ছাড়া বদমাইশ! রাত দুপুরের সময় এসে উনি ঘরের বৌকে বলবেন, বেরো, বেরো। মুরোদ নেই এক কড়ার—হ্যারে হারামজাদা, ও ভদ্দরনোকের মেয়ে সারা মাস কি খায় তুই তার কোন হদিস রাখিস ? না কেউ রাখে ? বেরো বলতি লজ্জা করে না ? এস তো খোকন, এস—চল বৌমা—ওপরের ঘরে চল—

তারা ঘোমটা টেনে দিয়েছিল শ্বশুর আসবার সঙ্গে সঙ্গেই। সে ফিস ফিস করে খোকনকে কি বললে।

খোকন বললে—ঠাকুরদাদা, তুমি ওপরে যাও—মা বলছে।

ভবতারণ সাহস পেয়ে বললে—আমি তাড়িয়ে দেবার কথা আগে মুখে এনিছি না আপনার গুণধর বৌমা ? জিগ্যেস করুন তো কে আগে কাকে বেরিয়ে যাবার কথা বলেছে ! হ্যা খোকা, বল তো ? আপনার বৌমাই বললে না আমাকে বেরিয়ে যেতে ? কেন, ওর বাবার বাড়ী ?

—হ্যা, ওর বাবার বাড়ী। আলবৎ ওর বাবার বাড়ী। হারামজাদা, ফের যদি তুমি ওসব কথা মুখে এনেছ তবে তোমাকে আমি—

উপেন ভটচাজ ওপরে উঠে চলে গেলেন। ভবতারণ চুপ করে বসে রইল তক্তপোশের এক কোণে।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ ভবতারণ উঠে জামার পকেট হাতড়ে একখানা দু টাকার নোট বার করে স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, এই দিলাম। ধার দেনা শোধ দিও। আমি এক্ষুনি চললাম। দেশলাই কে নিল আমার ?

তারা বললে—খোকন, দেশলাইটা ঐ রয়েছে, দে তো'।

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে ভবতারণ জামা গায়ে দিতে দিতে বললে, এসেছিলাম অনেক আশা করে। তা এ বাড়ী আমি থাকব না। এখানে আমার পোষাবে না বুঝলাম। কেউ যখন আমাকে দেখতে পারে না এ বাড়ীতে। খাওয়া হল না, শরীরটাও খারাপ। তা হক, যাবই। আর আসছি নে। ছাখ খোকন, যাবি কলকাতায় ? চল্ আমার সঙ্গে, মটোর কিনে দেব, লবেঞ্চুস্ কিনে দেব—

করুণা নিরুত্তর।

—যাবি ?

—না।

—এস আমার সোনা, আমার মানিক, চল আমার সঙ্গে—

এই সময় তারা এগিয়ে এসে স্বামীর হাতে ধরে বললে, কেন পাগলামি করছ? বস। এখনও অন্ধকার রয়েছে। এখন কোথায় যাবে? ছিঃ—

—ছাড় হাত—

ঝটকা মেরে ভবতারণ হাত ছাড়িয়ে নিলে।

—তোমার মত ইতরের সঙ্গে আমি কথা বলি নি। আমি খোকনের সঙ্গে কথা বলছি।

—রাগ করে না—ছিঃ—

—ফের আবার? এইবার কিন্তু ভাল হবে না বলছি। খবরদার, আমার গা ছুঁয়ো না—।

—আচ্ছা ছোঁব না। বস ওখানে।

—ফের কথা বলে! খোকন, ও খোকন—যাবি আমার সঙ্গে? আয়—আর কখনও যদি এ ভিটেতে পদার্পণ করি তবে আমার—

করুণা মায়ের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে আছে। তার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না—

সকাল বেলা। বেশ রোদ উঠেছে।

তারা স্বামীকে দুখানা পেঁপের টুকরো হাতে দিয়ে বললে, খাও। পেট ঠাণ্ডা হবে।

ভবতারণ এই ঘুমিয়ে উঠেছে। চোখ ভারি-ভারি। পেঁপের রেকাবি হাতে নিয়ে বললে, উনি কোথায়?

—ওপরে।

—যাবেন না?

—তা কি জানি।

—খাবেন?

—উনি কবে খান? কাল সন্ধের সময় এলেন, বললাম ভাত রেঁধে দিই। উনি বললেন, না।

—পেঁপে আর আছে? দিয়ে এস না ওপরে।

—সে তুমি বললে তবে দেব? সে দিয়ে এসেছি, তুমি তখন ঘুমিয়ে।

—দিও। বুড়ো মানুষ।

—সে তোমাকে শেখাতে হবে না।

—খোকন—ও খোকন—শোন্—

—ও খেয়েছে। ওকে ডাকছ কেন? তুমি খেয়ে ফেল। তোমার পেট ঠাণ্ডা হবে পেঁপে খেলে। এখন কেমন মনে হচ্ছে?

—এখনও গোলযোগ যায় নি। ভাতে জল দিয়ে নুন নেবু দিয়ে তাই খাব। তেল দাও, নেয়ে আসি।

করুণা বাপের কাছে এসে বললে, কি বাবা?

—এই নে, খা—

তারা বললে, আহা, কেন আবার—তুমি খাও—

এই সময় উপেন ভটচাজ খড়ম পায়ে দিয়ে উপর থেকে নেমে এলেন। ঘরে উঁকি দিয়ে বললেন—কে? ভবতারণ? ভাল পেঁপে, খা। ইয়ে বৌমা, আমি আসি। ওখানেই খাব। ভবতারণ আজ আছিস তো?

ভবতারণ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, না বাবা, ওবেলা চলে যাব। আপনি আসবেন না ওবেলা?

—আচ্ছা, তুই যাবার আগে আমি ফিরে আসবো। আমি—

এই সময় তারা ফিস ফিস স্বরে কি বললে স্বামীকে। ভবতারণ ডেকে বললে, বাবা—

—কি?

—এবেলা এখানে দুটো খাবেন, আপনার বৌমা বলছে। কই মাছ আনতে যাচ্ছি বাঁধালে। একসঙ্গে বসে অনেকদিন খাই নি—কেমন?

উপেন ভটচাজ সম্মতি জ্ঞাপন করে রোয়াক থেকে উঠানে পা দিলেন। কি ভেবে এসে আবার বসলেন রোয়াকে।

পুত্রবধূ বললে—তামাক সেজে দেব?

—দাও দিকি।

ছেলে ভবতারণ নিজেই তামাক সেজে নিয়ে এল। বৃদ্ধ উপেন ভটচাজ চোখ বুজে হুঁকোয় টান দিতে দিতে চিন্তা করতে লাগলেন, এমন সকালবেলা কতকাল আসে নি তাঁর জীবনে। স্ত্রী মারা গিয়েছে আজ বোধ হয় বিশ বছর, ভবতারণ তখন এগার বছরের বালক। তার পর থেকেই ছন্নছাড়া সংসারজীবন চলছে, আঁটসাঁট নেই কোন বিষয়ে কারও। তার ওপরে দারিদ্র্য তো আছেই। হাতে পয়সা ছিল না বলেই ভবতারণকে লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি। লেখাপড়া শেখালে অত খারাপ হত না সে। অবহেলিত পুত্রের প্রতি উপেন ভটচাজের মায়া হল। কাল অত বকুনি দেওয়াটা উচিত হয় নি।

ভবতারণ বাড়ী ফিরে এল আটটার সময়। স্ত্রীকে বললে—দেখ, কারে বলে যশুরে কই! আধ পোয়ার নামো নেই, ওপরে এক পোয়া, পাঁচ ছটাক। বাবাকে দেখাও।

পুত্রবধূ বললে—এই দেখুন—

—বাঃ বাঃ—কত করে সের নিলে!

—সাড়ে তিন টাকা।

—তা হবে। যুদ্ধের সময় ছিল ভাল। এ দিন দিন যা হয়ে উঠল—

অনেক দিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূর সেবাযত্ন জুটল উপেন ভটচাজের ভাগ্যে। এমন একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কতকাল হয় নি। তিনি পড়ে থাকেন মজুমদারদের ঠাকুরবাড়ীতে পেটের দায়েই তো। ছেলে উপযুক্ত হয় নি, নিজেরই ছেলেটাকে সে খেতে দিতে পারে না। ওদের ভার লাঘব করবার জন্যেই তিনি পরের বাড়ী খান।

খাওয়া-দাওয়ার পর উপেন ভটচাজ দিবানিদ্রা দেবার জন্যে ওপরের ঘরে চলে গেলেন

পুত্রবধূ তামাক সেজে দিয়ে গেল ? আঃ, কি আরাম। সব আছে তাঁর, অথচ নেই কিছুই।

আজ দিনটা একটা চমৎকার দিন। এমন দিন আবার কবে আসবে!

বারমেসে সজনে গাছে ফুল ফুটেছে। তালপাতা নড়ছে বর্ষার সজল বাতাসে! ঘুমিয়ে পড়লেন উপেন ভটচাজ। উপেন ভটচাজের পুত্রবধূও আপন মনে আজ খুব খুশী। ছন্নছাড়া ভাঙা বৃহৎ বাড়ী আজ যেন কার পাদস্পর্শে লক্ষ্মীর সংসারে পরিণত হয়েছে। দোতলায় শ্বশুরকে তামাক সেজে দিতে যাওয়ার সময় এই কথাই তার মনে হচ্ছিল। তার আছে সবাই। শ্বশুর, স্বামী, পুত্র—যা চায় মেয়েরা, এত বড় বাড়ী, জাজ্বল্যমান সংসার যাকে বলে। ওদের সকলের পাতে পাতে ভাত-মাছ দিয়ে আজ কত সুখ পেয়েছে সে। ওদের খাইয়ে সুখ। ভাবতে ভাবতে সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

ভবতারণ অন্য দিন খেয়ে দেয়ে আড্ডা দিতে বেরোয় রায়-পাড়ার হরু রায়ের নাতি অমূল্য রায়ের ওখানে। স্থলপথের যাত্রী দুজনেই। দুপুরের পর ভরা পেটে মৌতাত জমে ভাল।

আজ কিন্তু সে বাইরে গেল না। স্ত্রীকে ঘুমুতে দেখে সে মনে মনে ক্রুদ্ধ হল। কেন দুটো গল্প করতে কি হয়েছিল। তারাকে কি সে রোজ রোজ পায় ? কত কষ্টে থাকে এই বাড়ীতে একা। সে নিজে অক্ষম স্বামী, কিছু করবার পথ তার নেই সামনে।

সে ভাল হবে ভাবে, ভেবেছে কতবার। কিন্তু তা হবার জো নেই। সে জানে কেন। সঙ্গ বড় খারাপ জিনিস। সে-সব বন্ধুদের সঙ্গ তাকে এইখানে নামিয়েছে। জলপথ ও স্থলপথ, কোন পথ বাকি রাখে নি। আজকের সংকল্প কাল উড়ে যাবে কর্পূরের মত।

তবুও আজকের দিনটি একটা সুন্দর, জাঁকালো, শান্ত দিন হয়ে থাক তার জীবনে। তারাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললে,—চা আছে ঘরে ? চা করো। বাবাকে দিয়ে এস। আমিও একটু খাই—

—না, চা খায় না। নেবু আর নুন দিয়ে চিঁরে কথ করে দি—

স্ত্রী সত্যি তাকে যত্ন করবার চেষ্টা করে। তার অদৃষ্টে নেই, কার কি দোষ ? তারা সত্যি ভাল মেয়ে বড্ড।

এদিকে দিবানিদ্রা ভেঙে উপেন ভটচাজ সবে উঠেছেন, অমনি পুত্রবধূ গরম চায়ের গ্লাস নিয়ে এসে তাঁর হাতে দিলে। বিস্মিত চোখে পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বললেন—কি ? চা ? বাড়ীতে ছিল ?

—ছিল।

—বেশ, বেশ।

পুত্রবধূ হাসিমুখে বললে—আর কিছু খাবেন ?

—হ্যাঁ, তা—কি খাওয়াবে ?

—বেশ দোভাজা করে চিঁড়ে ভেজে নারকোল-কোরা দিয়ে নিয়ে এসে দেব ?

—বেশ। কাঁচা লংকা অমনি ঐ সঙ্গে একটা এনো। আর শোন, ভবতারণকে আর খোকনকেও দিও।

—তামাক দেব বাবা ?

—এখন না। চিঁড়েভাজা আগে খাই, তার পরে। বাঃ, মৌতাতটা নষ্ট করে দেবে বৌমা ?

এমনি সুন্দর হাসিখুশির মধ্যে সেদিনের সূর্য্য ডুবে গেল জামদার বড় বিলের ওপারে।

সারাদিন কেউ কোথাও নেই।

ভবতারণ চলে গিয়েছে। যা সামান্য দুটি টাকা দিয়ে গিয়েছে তাতে পাঁচদিনের চালও হবে না। উপেন ভটচাজ গিয়ে উঠেছেন মজুমদারদের ঠাকুরবাড়ীতে।

একা রয়েছে তাঁর পুত্রবধূ সেই প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়ীতে ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে রাত্রে। আবার কলাবাদুড় ওড়ে কড়িকাঠের খোপে খোপে, পেঁচা ডাকে ডুমুর গাছের নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্যে, করুণা ঘুমের মধ্যে মাকে বলে—ও কিসের শব্দ মা ? ওঠ ওঠ—ওটা কি মা ?

হিঙের কচুরি

আমাদের বাসা ছিল হরিবাবুর খোলার বাড়ীর একটা ঘরে। অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে বাড়ীটাতে বাস করত। এক ঘরে একজন চুড়িওয়ালা ও তার স্ত্রী বাস করত। চুড়িওয়ালার নাম ছিল কেশব। আমি তাকে 'কেশবকাকা' বলে ডাকতাম।

সকালে যখন কলে জল আসত, তখন সবাই মিলে ঘড়া কলসী টিন বালতি নিয়ে গিয়ে হাজির হত কলতলায় এবং ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়া বকুনি শুরু হত জল ভর্ত্তির ব্যাপার নিয়ে।

বাবা বলতেন মাকে, এ বাসায় আর থাকা চলে না। ইতর লোকের মত কাণ্ড এদের ! এখান থেকে উঠে যাব শীগগির।

কিন্তু যাওয়া হত না কেন, তা আমি বলতে পারব না। এখন মনে হয় আমরা গরিব বলে, বাবার হাতে পয়সা ছিল না বলেই।

আমাদের বাসার সামনে পথের ওপারে একটা চালের আড়ত, তার পাশে একটা গুড়ের আড়ত, গুড়ের আড়তের সামনে রাস্তায় একটা কল। কলে অনেক লোক একসঙ্গে ঝগড়া চেঁচামেচি করে জল নেয়। মেয়েমানুষে মেয়েমানুষে মারামারি পর্য্যন্ত হতে দেখেছিলাম একদিন।

এই রকম করে কেটেছিল সে-বাসায় বছরখানেক, এক আষাঢ় থেকে আর এক আষাঢ় পর্য্যন্ত।

আষাঢ় মাসেই দেশের বাড়ী থেকে এসেছিলাম। দেশের বাড়ীতে বাঁশবাগানের ধারে ধুতরো ফুলের ঝোপের পাশেই আমি আর কালী দুজনে মিলে একটা কুঁড়ে করেছিলাম। কালীর গায়ে জোর বেশি আমার চেয়ে, সে সকাল থেকে কত বোঝা আসশ্যাওড়ার ডাল আর পাতা যে বয়ে এনেছিল ! কি চমৎকার কুঁড়ে করেছিলাম দুজনে মিলে, ঠিক যেন

সত্যিকার বাড়ী একখানা। কালী তাই বলত। একটা ময়নাকাঁটা গাছের মোটা ডালে সে পাখীর বাসা বেঁধে দিয়েছিল। ও বলত, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে কিংবা নষ্টচন্দ্রের রাতে রাত-চরা কাঠঠোকরা কিংবা তিওড় পাখী ওখানে ডিম পেড়ে যাবে।

এসব সম্ভব হয় নি আমার দেখে আসা, কারণ আষাঢ় মাসেই গ্রাম থেকে চলে এসে কলকাতার এই খোলার বাড়ীতে উঠেছি।

আমার কেবল মনে হয় দেশের সেই বাঁশবনের ধারের কুঁড়েখানার কথা, কালী আর আমি কত কষ্ট করে সেখানা তৈরি করেছিলাম, ময়না গাছের ডালে বাঁধা সেই পাখীর বাসার কথা—নষ্টচন্দ্রের রাতে কাঠঠোকরা পাখী সেখানে ডিম পেড়েছিল কিনা কে জানে?

কলকাতার এ বাড়ীতে জায়গা বড্ড কম, লোকের ভিড় বেশি। আমি সামনের টিনের বারান্দাতে সারা সকাল বসে বসে দেখি কলে পাড়ার লোক জল নিতে এসেছে, গুড়ের আড়তের সামনে গুড় নামাচ্ছে গরুর গাড়ী থেকে, বাঁ কোণের একটা দোতলা বাড়ীর জানলা থেকে একটি বৌ আমার মত তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। এই গলি থেকে বার হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে একটা হিন্দুস্থানী দোকানদারের ছাতুর দোকান থেকে আমি মাঝে মাঝে ছাতু কিনে আনি। বড় রাস্তায় অনেক গাড়ী-ঘোড়া যায়। আমাদের গ্রামে কখনও একখানা ঘোড়ার গাড়ী দেখি নি, দুচোখ ভরে চেয়ে চেয়ে দেখেও সাধ মেটে না, কিন্তু মা যখন-তখন বড় রাস্তায় যেতে দিতেন না, পাছে গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়ি।

আমাদের বাড়ী থেকে কিছু দূরে গলির ও-মোড়ে কতকগুলো সারবন্দী খোলার বাড়ী আমাদেরই মত। সেখানে আমি মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। তাদের বাড়ী-ঘর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কত কি জিনিসপত্র আছে,—আয়না, পুতুল, কাঁচের বাক্স, দেওয়ালে কেমন সব ছবি টাঙানো। এক এক ঘরে এক একজন মেয়েমানুষ থাকে। আমি তাদের সকলের ঘরে যাই, বিকেলের দিকে যাই, সকালেও মাঝে মাঝে যাই।

ওই বাড়ীগুলোর মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার নাম কুসুম। সে আমাকে খুব ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবাসি। কুসুমের ঘরেই আমি বেশিক্ষণ সময় থাকি। কুসুম আমার সঙ্গে গল্প করে, আমাদের দেশের কথা জিজ্ঞেস করে। তাদের বাড়ী বর্দ্ধমান বলে কোন্ জায়গা আছে সেখানে ছিল। এখন এই ঘরেই থাকে।

কুসুম বলে—তোমায় বড্ড ভালবাসি, তুমি রোজ আসবে তো?

—আমিও ভালবাসি। রোজ আসিই তো।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—আসসিংড়ি, যশোর জেলা।

—কলকাতায় আগে কখনও আস নি বুঝি?

—না।

বিকেলবেলা কুসুম চমৎকার সাজগোজ করত, কপালে টিপ পরত, মুখে ময়দার মত গুঁড়ো মাখত, চুল বাঁধত—কি চমৎকার মানাত ওকে! কিন্তু এই সময় কুসুম আমাকে তার ঘরে

থাকতে দিত না, বলত—তুমি এবার বাড়ী যাও। এবার আমার বাবু আসবে।

প্রথমবার তাকে বলেছিলাম—বাবু কে?

—সে আছে। সে তুমি বুঝবে না। এখন তুমি বাড়ী যাও।

আমার অভিমান হত, বলতাম—আসুক বাবু। আমি থাকব। কি করবে বাবু আমার?

—না না, চলে যাও। তোমার এখন থাকতে নেই। অমন করে না, লক্ষ্মীটি!

—বাবু তোমার কে হয়? ভাই?

—সে তুমি বুঝবে না। এখন যাও দিকি বাড়ী।

আমার বড় কৌতূহল হত, কুসুমের বাবুকে দেখতেই হবে। কেন ও আমাকে বাড়ী যেতে বলে?

একদিন তাকে দেখলাম। লম্বা চুল, বেশ মোটাসোটা লোকটা—হাতে একটা বড় ঠোঙায় এক ঠোঙা কি খাবার। কলকাতার দোকানে খাবার কিনতে গেলে ঐরকম পাতার ঠোঙায় খাবার দেয়। আমাদের দেশে ও পাতা নেই; সেখানে হরি ময়রার দোকানে মুড়কি কি জিলিপি কিনলে পদ্মপাতায় জড়িয়ে দেয়।

কুসুম ঠোঙা খুলে আগে আমার হাতে একখানা বড় কচুরি দিয়ে বলল—এই নাও, খেতে খেতে বাড়ী যাও।

এক কামড় দিয়ে আমার ভারি ভাল লাগল। এমন কচুরি কখনও খাই নি। আমাদের গ্রামের হরি ময়রা যে কচুরি করে, সে তেলে-ভাজা কচুরি, এমন চমৎকার খেতে নয়।

উচ্ছ্বসিত স্বরে বললাম—বাঃ! কিসের গন্ধ আবার!

কুসুম বললে—হিঙের কচুরি, হিঙের গন্ধ। ওকে বলে হিঙের কচুরি—এইবার বাড়ী যাও।

কুসুমের বাবু বললে—কে?

—কলের সামনের বাড়ীর ভাড়াটেদের ছেলে। বামুন।

কুসুমের বাবু আমার দিকে ফিরে বললেন—যাও খোকা, এইবার বাড়ী যাও।

এইবার ভাবলাম বলি, আমি থাকি না কেন, থাকলে দোষ কি? কিন্তু কুসুমের বাবুর দিকে চেয়ে সে কথা বলতে আমার সাহসে কুলোল না। লোকটা যেন রাগী মত, হয়তো এক ঘা মেরেও বসতে পারে। কিন্তু সেই থেকে হিঙের কচুরির লোভে আমি রোজ বাঁধা নিয়মে কুসুমের বাবু আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। আর রোজই কি সকলের আগে কুসুম আমার হাতে দুখানা কচুরি তুলে দিয়ে বলবে—যাও খোকা, এইবার খেতে খেতে বাড়ী চলে যাও।

কুসুমের বাবু বলত—আহা, ভুলে গেলাম। ওর জন্যে খাস্তা গজা দুখানা আনব ভেবেছিলাম কাল। দাঁড়াও, কাল ঠিক আনব।

আমার ভয় কেটে গেল। বললাম—এনো ঠিক কাল?

কুসুমের বাবু হি হি করে হেসে বললে—আনব আনব।

কুসুম বললে—এখন বাড়ী যাও খোকা—

—আমি এখন যাব না। থাকি না কেন?

কুসুমের বাবু আমার এই কথার উত্তরে কি একটা কথা বললে, আমি তার মানে ভাল বুঝতে পারলাম না। কুসুম ওর দিকে চেয়ে রাগের সুরে বলল—যাও, ওকি কথা ছেলে-মানুষের সঙ্গে!

বাড়ী গিয়ে মাকে বললাম—মা, তুমি হিঙের কচুরি খাও নি?

—কেন?

—আমি খেয়েছি। এত বড় বড়, হিঙের গন্ধ কেমন।

—কোথায় পেলি?

—কুসুমের বাবু এনেছিল, আমায় দিয়েছিল।

—পাজি ছেলে, ওখানে যেতে বারণ করেছি না। ওখানে যাবে না।

—কেন?

—কেন কথার উত্তর নেই। ওখানে যেতে নেই। ওরা ভাল লোক না।

—না মা, কুসুম বেশ লোক। আমাকে বড্ড ভালবাসে। হিঙের কচুরি রোজ দেয়।

—আবার বলে হিঙের কচুরি! বাড়িতে পাও না কিছু? খবরদার, ওখানে যাবে না বলে দিচ্ছি।

কুসুমের বাড়ী এর পরে আর দিন-দুই আদৌ গেলাম না। কিন্তু থাকতে পারি নে না গিয়ে। আবার মাকে লুকিয়ে গেলাম একদিন। কুসুম বললে—তুমি আস নি যে?

—মা বারণ করে।

—তবে তুমি এসো না। মা আবার বকবে।

—আসি নি তো দুদিন।

—এলে যে আবার?

—তোমায় ভালবাসি তাই এলাম।

—ওরে আমার সোনা! তুমি না এলে আমারও ভাল লাগে না। তুমি না এলে তোমার জন্যে মন কেমন করে।

—আমারও।

—কি করব, তেমন কপাল করি নি। তোমার মা তোমায় পাছে বকেন তাই ভাবছি।

—মাকে বলব না। আমার মন কেমন করে না এলে। আমি এখন যাই।

—সন্দের সময় এসো।

—ঠিক আসব।

কুসুমের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সন্ধ্যের সময় যাই। কুসুমের বাবু এসে আমায় দেখে বললে—এই যে ছোকরা। ক-দিন দেখি নি কেন? সেদিন তোমার জন্যে খাস্তা গজা নিয়ে এলাম, তা

তোমার অদৃষ্টে নেই। দাও গো ওকে দুখানা কচুরি।

—গজা এনো কাল।

—আনব গো বামুন ঠাকুর, ফলারে বামুন! কাল অমৃতি জিলিপি আনব। খেয়েছ অমৃতি?

—না।

—কাল আনব, এসো অবিশ্যি।

—কাউকে ব'লো না কিন্তু। মা শুনলে আসতে দেবে না।

—তোমার মা বকেন বুঝি এখানে এলে?

—হুঁ।

কুসুম তাড়াতাড়ি বললে, আরে ওর কথা বাদ দাও। ছেলেমানুষ পাগল, ওর কথার মানে আছে! তুমি বাড়ী যাও আজ খোকা। এই নাও কচুরি। খেতে খেতে যাও।

—না, এখানে খেয়ে জল খেয়ে যাই, মা টের পাবে।

—এখানে তোমাকে জল দেব না। রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে যেও।

কুসুমের বাবু বললে—কেন, ওকে জল দেবে না কেন? কি হবে দিলে?

কুসুম ঝাঁজের স্বরে বললে—তুমি থাম। বামুনের ছেলেকে হাতে করে জল দিতে পারব নি। এই জন্মের এই শাস্তি। খাবার দিই হাতে করে তাই যথেষ্ট।

আমার মনে মনে বড় অভিমান হল কুসুমের ওপর। কেন, আমি এতই কি খারাপ যে আমায় হাতে করে জল দেওয়া যায় না? চলে আসবার সময় কুসুম বার বার বললে—কাল সকালে কিন্তু ঠিক এসো। কেমন?

আমি কথা বললাম না।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি কুসুম বসে সজনের ডাঁটা কুটছে। আমায় বললে—এস খোকা।

—তোমার সঙ্গে আড়ি।

—ওমা সে কি কথা! কি করলাম আমি?

—তুমি যে বললে জল দেওয়া যায় না আমাকে। জল খেতে দিলে না কাল।

—এই? বস বস খোকা। সে তুমি বুঝবে না। তুমি বামুন, তোমাকে জল আমরা দিতে পারি নে। বুঝলে? কুলের আচার করছি, খাবে? এখনও হয় নি। সবে কুল গুড় দিয়ে মেখেছি—

এইভাবে কুসুমের সঙ্গে আবার ভাব হয়ে গেল। কুলের আচার হাতে পড়তেই আমি রাগ অভিমান সব ভুলে গেলাম। দুজনে অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। তার পর আমি উঠে মাখনের ঘরে যাই। মাখন কুসুমের পাশের ঘরে থাকে। ওর ঘরটি যে কত রকমের পুতুল দিয়ে সাজানো! একটা কাঠের তাকে মাটির আতা, আম, লিচু, কত রকমের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস। অবিকল আতা। অবিকল আম।

মাখন বললে—এস খোকা। ও সব মাটির জিনিসে হাত দিও না। বসো এখানে এসে। ভেঙে যাবে।

—আচ্ছা, তুমি তামাক খাও কেন?

মাখন হাসিমুখে বললে—শোন কথা। তামাক খায় না লোক?

—মেয়েমানুষে খায় বুঝি? কই আমার মা তো খায় না। বাবা খায়।

—শোন কথা। যে খায় সে খায়।

—কুসুমের বাবু আমায় খাস্তা গজা দেবে।

—বটে? বেশ বেশ।

—তোমার বাবু কোথায়?

মাখন মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

—হি হি—শোন কথা ছেলের, কি যে বলে! হি হি—ও কুসমি শুনে যা কি বলে তোর ছেলে—

মাখনের বয়স কুসুমের চেয়ে বেশী বলে আমার মনে হত। কুসুম সব চেয়ে দেখতে সুন্দর। মাখনকে দিদি বলে ডাকত কুসুম।

কুসুম এসে হাত ধরে আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল। কুসুম আমায় বারণ করেছিল আর কারও ঘরে যেতে। আমি প্রকৃতপক্ষে যেতাম খাবার লোভে। কিন্তু অন্য মেয়েদের ঘরের বাবু কখন আসত কি জানি। সুতরাং সে বিষয়ে আমার হতাশ হতে হয়েছিল। কুসুম আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে বকলে। বললে—অত শত কথায় তোমার দরকার কি শুনি? তুমি ছেলেমানুষ, কোন ঘরে যেতে পারবে না, বসো এখানে।

—আমি প্রভার কাছে যাব—

—কেন, সেখানে কেন? যা তা বলবে সেখানে গিয়ে আবার? বোকা ছেলে। খাওয়ার লোভ, না? এই তো দিলাম কুলচুর।

আমি আশ্চর্য্য হওয়ার স্বরে বললাম—আমি চেয়ে খাই নি। প্রভাকে জিজ্ঞেস করো।

—বেশ, দরকার নেই প্রভার কাছে গিয়ে।

—একটিবার যাব? যাব আর আসব।

সত্যি বলছি প্রভার ঘরে যাওয়ার কারণ ততটা লোভ নয়, যতটা একটা টিয়া পাখী।

টিয়া পাখীটা বলে—রাম, রাম, কে এলো? দূর ব্যাটা, কাকীমা, কাকীমা। আমি ঢুকে দাঁড়ালেই বলে—কে এলে?

—আমার নাম বাসুদেব।

—কে এলে? কে এলে?

আমি হেসে উঠলাম। ভারি মজা লাগে ওর বুলি শুনতে। অবিকল মানুষের গলার মত কথা—কে এলে? কে এলে?

প্রভা বাইরে থেকে বললে—কে ঘরের মধ্যে?

ও রান্নাঘরে রাঁধছিল। খুন্তি হাতে ছুটে এসেছে। খুন্তিতে ডাল লেগে রয়েছে। আমি হেসে বললাম—মারবে নাকি ?

—ও! পাগলা ঠাকুর। তাই বল। আমি বলি কে এল দুপুরবেলা ঘরে।

—তোমার ঘরে কুলচুর নেই ? কুসুম আমায় কুলচুর দিয়েছে—খুব ভাল কুলচুর।

—কুসুমের বড়লোক বাবু আছে। আমার তো তা নেই ? কোথা থেকে কুলচুর আমচুর করব।

—কুসুমের বাবু আমায় গজা দেবে।

—কেন দেবে না ? মোড়ের অত বড় দোকানখানা কুসুমের পায়ে সঁপে দিয়ে বসেছে। ওখানকার কথা ছেড়ে দাও। বলে—মানিনী, তোর মানের বালাই নিয়ে মরি—

ভয়ে ভয়ে বললাম—প্রভা, রাগ ক'রো না আমার ওপর।

—না না, রাগ করব কেন। দুঃখের কথা বলছি। আমিও একপুরুষ বেশ্যে। আমরা উড়ে আসি নি। পনেরো বছর বয়সে কপাল পুড়লে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম।

—কেন ঘর থেকে বেরিয়েছিলে ?

—সে সব দুঃখের কথা তোমার সঙ্গে বলে কি হবে। তুমি কি বুঝবে। বসো, আমার ডাল পুড়ে গেল। গল্প করলে পেট ভরবে না।

—আমি যাই ?

—এস রান্নাঘরে।

প্রভার রং কালো, খুব মোটাসোটা, নাকের ওপর কালো ভোমরার মত একটা আঁচিল। প্রভা একদিন আমাকে গরম জিলিপি আর মুড়ি খেতে দিয়েছিল। ওর ঘরে এত জিনিসপত্তর নেই, ওই খাঁচায় পোষা টিয়া-পাখীটা ছাড়া।

প্রভা রান্না করছে চালতের অম্বল। একটা পাথর বাটিতে চালতে ভেজানো। চালতে অনেকদিন খাই নি, দেশ থেকে এসে পর্য্যন্ত নয়। সেখানে আমাদের মাঠে তালপুকুরের ধারে বড় গাছে কত চালতে পেকে আছে এ সময়।

বললাম—চালতে পেলে কোথায় প্রভা ?

—বাজারে, আবার কোথায় ?

—বেশ চালতে।

প্রভা আর কিছু বললে না। নিজের মনে রাঁধতে লাগল।

আমি বললাম—তোমার বাবা মা কোথায় ?

—পাপমুখে সে সব কথা আর কি বলি।

—বাড়ী যাবে না ?

—কোন্ বাড়ী ?

—তোমাদের দেশের বাড়ী।

—যমের বাড়ী যাব একেবারে।

—তোমাদের দেশের বাড়ীতে ফুল আছে ? আমাদের গাঁয়ে কত ফুলের গাছ !

প্রভা এ কথার কোন উত্তর দিলে না। আবার নিজের মনে রাঁধতে লাগল। খানিক পরে সে একটা ঘটি উনুনের মুখে বসিয়ে চা তৈরি করে গ্লাসে আঁচল জড়িয়ে চুমুক দিয়ে চা খেতে লাগল। আমায় একবার বললেও না আমি চা খাব কি না। অবিশ্যি আমি চা খাই নে, চায়ের সর খাই। মা আমায় চা খেতে দেয় না। চায়ের মধ্যে যে দুধের সর ভাসে, মা তাই আমাকে তুলে দেয়।

প্রভা গল্প করতে লাগল ওদের দেশের বাড়ীতে কত গরু ছিল, কতখানি দুধ ওরা খেত, ওদের বাড়ীর ধারে ওদের নিজেদের পুকুরে কত মাছ ছিল। আর সেসব দেখতে পাবে না ও।

হঠাৎ প্রভা একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড করে বসল। বললে—অম্বল দিয়ে দুটো ভাত খাবে ?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—খাব। কুসুম টের না পায়।

প্রভা হেসে বললে—কুসুমের অত ভয় কিসের ? টের পায় তো কি হবে ? তুমি খাও বসে।

আমি সবে চালতের অম্বল দিয়ে ভাত মেখেছি, এমন সময় কুসুমের গলার শব্দ শোনা গেল —ও প্রভাদি, বামুনদের সেই খোকা তোর এখানে আছে ? ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দিই, কতক্ষণ এসেছে পরের ছেলে।

আমি এঁটো হাতে দৌড়ে উঠে রান্নাঘরের কোণে লুকিয়ে রইলাম। প্রভা কিছু বলবার আগে কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে দেখতে পেল। বললে—ওকি ? কোণে দাঁড়িয়ে কেন ? লুকনো হল বুঝি ? এ ভাত মেখেছে কে অম্বল দিয়ে ? অ্যাঁ—

প্রভার দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বললে—আচ্ছা প্রভাদি, ও না হয় ছেলেমানুষ, পাগলা। তোমারও কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গেল ? কি বলে তুমি ওকে ভাত দিয়েছ খেতে ?

প্রভা অপ্রতিভ হয়ে বললে—কেবল চালতে চালতে করছিল, তাই ভাবলাম অম্বল দিয়ে দুটো ভাত—

—না, ছিঃ ! চল আমার সঙ্গে খোকা। এ জন্মের এই শাস্তি আমাদের, আবার তা বাড়াব বামুনের ছেলেকে ভাত দিয়ে ? চল—হাতে এঁটো নাকি ? খেয়েছ বুঝি ?

আমি সলজ্জ স্বরে বললাম—না।

—চল হাত ধুইয়ে দিই—

কুসুম এসে আমার হাত ধরে বাইরের দিকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে প্রভা বললে— আহা, মুখের ভাত কটা খেতে দিলি নি ওকে। সবে অম্বল দিয়ে দুটো মেখেছিল—

—না, আর খেতে হবে না। চল।

মায়ের শাসনের চেয়েও যেন কুসুমের শাসন বেশি হয়ে গেল। মুখের ভাত ফেলেই চলে আসতে হল। উঠোনের এক পাশে নিয়ে গিয়ে আমার হাত ধুইয়ে দিতে দিতে বললে—তোমার অত খাই-খাই বাই কেন খোকা ? ওদের ঘরে ভাত খেতে নেই সে কথা মনে নেই তোমার ?

ছিঃ ছিঃ! ওবেলা কচুরি দেব এখন খেতে। আর কক্‌খনো অমন খেও না। তাও বলি, এই না হয় ছেলেমানুষ—তুমি বুড়ো ধাড়ি, তুমি কি বলে বামুনের ছেলের পাতে—ছিঃ ছিঃ, লোকেরও বলিহারি যাই—

বলা বাহুল্য প্রভা এসব কথা শুনতে পায় নি, সে এদিকেও ছিল না।

বললাম—মাকে যেন বলে দিও না!

—হ্যাঁ আমি যাই তোমার মাকে বলতে! আমার তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

—বললে মা মারবে কিন্তু।

—মার খাওয়াই ভাল তোমার! তোমার নোলা জব্দ হয় তাহলে।

বাড়ী ফিরতেই মা বললেন—কোথায় ছিলি?

—ওই মোড়ে।

—আর কোথাও যাস নি তো?

—না।

একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। সেদিন দোষটা দিল কুসুমেরই। সে আমাকে বললে—চল খোকা, বেড়াতে যাই। যাবে?

বিকেলবেলা। রোদ বেশি নেই। ট্রাম লাইনের ওপারে যেতে দেখে আমি সভয়ে বললাম—মা বড় রাস্তা পার হতে দেয় না। বারণ করেছে।

—চল আমি সঙ্গে আছি, ভয় নেই।

বড় রাস্তা পার হয়ে আর কিছু দূরে একটা খোলার বস্তির মধ্যে আমরা ঢুকলাম। একটা সরু গলির দুধারে ঘরগুলো। যে বাড়িতে আমরা ঢুকলাম, সেখানেও সবাই মেয়েমানুষ, পুরুষ কেউ নেই। একজন মেয়ে বললে—আয় লো কুস্‌মি কতকাল পরে—বাব্বা, আমাদেরও কি আর নাগর নেই? তা বলে কি অমন করে ভুলে থাকতে হয় ভাই?

আমার দিকে চেয়ে বললে—এ খোকা আবার কে? বেশ সুন্দর দেখতে তো।

—বামুনদের ছেলে। আমাদের গলিতে থাকে। আমার বড্ড ন্যাওটা।

—বাঃ—বসো খোকা, বসো।

—ও ছেলের শুধু ভাই খাই-খাই। খেতে দ্যাও খুব খুশী।

—তাই তো, কি খেতে দিই। ঘরে কুলের আচার আছে, দেব?

আমি অমনি কিছুমাত্র না ভেবেই বলে উঠলাম—কুলের আচার বড্ড ভালবাসি।

কুসুম মুখ ঝামটা দিয়ে বললে—তুমি কী না ভালবাস। খাবার জিনিস হলেই হল। না ভাই, ওর সর্দ্দিকাসি হয়েছে। ও ওসব খাবে না। থাক।

আমার মনে ভয়ানক দুঃখ হল। কুসুম খেতে দিলে না কুলচুর। কখন হল আমার সর্দ্দিকাসি? কুলচুর আমি কত ভালবাসি।

খানিকটা সে-বাড়িতে বসবার পরে আমরা অন্য একটা ঘরে গেলাম। তারাও আমাকে

দেখে নানা কথা জিগ্যেস করতে লাগল। বাড়ীর তৈরী সুজি খেতে দিলে একখানা রেকাবি করে। তাও কুসুম আমায় খেতে দিলে না। আমার নাকি পেটের অসুখ।

সন্ধ্যের খানিকটা আগে আমাকে নিয়ে কুসুম বড় রাস্তার ট্রাম লাইন পার হয়ে এপারে এল। একখানা ট্রাম আসছিল। আমি বললাম—কুসুম, দাঁড়াও—ট্রাম দেখব।

—সন্দে হয়েছে। তোমার মা বকবে।

—বকুক।

—ইস্! ছেলের যে ভারি বিদ্ধি!

—আচ্ছা কুসুম, তুমি ওকথা বললে কেন? আমায় কুলচুর খেতে দিলে না। ওরা তো দিচ্ছিল।

—তুমি ছেলেমানুষ কি বোঝ। কার মধ্যে কি খারাপ রোগ আছে ওসব পাড়ায়। তোমায় আমি যার তার হাতে খেতে দেব। যার তার ঘরের জিনিস মুখে করলেই হল! তোমার কি। কার মধ্যে কি রোগ আছে তুমি তা জান?

—আচ্ছা কুসুম, 'নাগর' মানে কি?

—কিছু না। কোথায় পেলে এ কথা?

—ওই যে ওরা তোমায় বলছিল?

—বলুক। ও সব কথায় তোমার দরকার কি! পাজী ছেলে কোথাকার!

কুসুম আমায় বাড়ীর পথে এগিয়ে দেবার আগে বললে—চল, কচুরি এতক্ষণ এনেছে ও। তোমায় দিই।

—দাও। আমার খিদে পেয়েছে।

—কোন্ সময়ে তোমার পেটে খিদে থাকে না বলতে পার? তোমার মাকে যদি সামনা-সাম্‌নি পাই তো জিগ্যেস করি, ছেলের অত নোলা কেন।

—নোলা আছে তো বেশ হয়েছে। কচুরি দেবে তো?

—চল।

—গজা এনেছে?

—তা আমি জানি নে।

—গজা কাল দেবে?

—গলির রাস্তাটা কি নোংরা! বাবা রে বাবাঃ!

—গজা দেবে তো?

—হ্যাঁ গো হাঁ! এখন কচুরি নিয়ে তো রেহাই দাও আমায়।

সে রাত্রে কুসুম আমায় আমাদের কলটার কাছে এগিয়ে দিয়ে চলে গেল। মার কাছে সত্যি কথা বললাম। কুসুমের বাড়ী গিয়েছিলাম, কুসুম কচুরি খেতে দিয়েছে। মা খুব বকলেন। কাল থেকে আমায় বেঁধে রাখবেন বললেন। বাবাকেও রাত্রে বলে দিলেন বটে, তবে বাবা সে কথায় খুব যে বেশি কান দিলেন এমন মনে হল না।

পরদিন সকালের দিকে আমার জ্বর এল। চার-পাঁচ দিন একেবারে শয্যাগত। একজন বুড়ো ডাক্তার এসে দেখে-শুনে ওষুধ দিয়ে গেল।

জানলার ধারেই আমাদের তক্তপোশ পাতা। একদিন বিকেলে দেখি রাস্তার ওপর কুসুম দাঁড়িয়ে আমাদের ঘরের উল্টো দিকের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর সঙ্গে মাখন। মাখন এগিয়ে গিয়ে আরও দুখানা বাড়ীর পরে একখানা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে।

আমি ডাকলাম—ও কুসুম—

কুসুম পেছনে ফিরে আমায় দেখতে পেল। মাখনকে ডেকে বললে—দিদি, এই বাড়ী—এই যে—

মা কলতলায়। কুসুম ও মাখন এসে জানলার ধারে দাঁড়াল।

কুসুম বললে—কি হয়েছে তোমার? যাও না কেন?

মাখন বললে—কুস্‌মি ভেবে মরছে। বলে, বামুন খোকার কি হল। আমি তাই বললাম, চল দেখে আসি।

বললাম—আমার জ্বর আজ পাঁচ দিন।

কুসুম বললে—তোমার মা কোথায়?

—কুসুম, তুমি চলে যাও। মা দেখতে পেলে আমায় আর তোমাদের ঘরে যেতে দেবে না। আমি সেরে উঠেই যাব। চলে যাও তোমরা।

ওরা চলে গেল। কিন্তু পরদিন বিকেলে আবার কুসুম এসে রাস্তার ওপর দাঁড়াল। নিচু সুরে বললে—যাব?

মা ঘরে নেই। বষ্টিনাথদের ঘরে ডাল মেপে নিতে গিয়েছে আমি জানি। এই গেল একটু আগে। আমায় বলে গেল—ছোট খোকার দুধটা দেখিস তো যেন বেড়ালে খায় না, আমি বষ্টিনাথদের ঘর থেকে ডাল নিয়ে আসি।

হাত দেখিয়ে বললাম—এস।

ও জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে বললে—কেমন আছ?

—ভাল। কাল ভাত খাব।

—দুটো কমলানেবু এনেছিলাম। দেব?

—দাও তাড়াতাড়ি!

—খেও।

—হ্যাঁ।

—অসুখ সারলে যেও—

—যাব।

—কাল ভাত খাবে?

—বাবা বলেছে কাল ভাত খাব।

—কাল আবার আসব। কেমন তো ?

—এসো। আমি না বললে জানলার কাছে এসো না।

—তাই করব। আমি রাস্তায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব। শিস্ দিতে পার ?

—উঁহু! আমি হাত দেখালে এসো।

পরের দুদিন কুসুম ঠিক আসত বিকেলবেলা। একদিন প্রভা দেখতে চেয়েছিল বলে ওকেও সঙ্গে করে এনেছিল। প্রভাও দুটো কমলালেবু দিয়েছিল আমায়, মিথ্যে কথা বলব না। বালিশের তলায় লেবু লুকিয়ে রেখে দিতাম, মা ঘরে না থাকলে খেয়ে ছিবড়ে ফেলে দিতাম রাস্তার ওপর ছুঁড়ে।

সেরে উঠে দুদিন কুসুমের বাড়ী গিয়েছিলাম।

তার পরেই এক ব্যাপার ঘটল। তাতে আমাদের কলকাতার বাসা উঠে গেল, আমরা আবার চলে এলাম আমাদের দেশের বাড়ীতে। মা একদিন সোডাওয়াটার-এর বোতল খুলতে গিয়ে হাতে কাঁচ ফুটিয়ে ফেললে। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। হাতের কব্জি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল! বাসার সব লোক ছুটে এল বিভিন্ন ঘর থেকে। কোণের ঘরের বিপিনবাবু এসে মার হাতে কি একটা ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিলে। কিন্তু মায়ের হাত সারল না। ক্রমে হাতের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠল। মা আর রান্না করতে পারেন না, যন্ত্রণায় কাঁদেন রাত্রে। ডাক্তার এসে দেখতে লাগল। আমার মামার বাড়ীর অবস্থা ভাল। চিঠি পেয়ে মেজমামা এসে আমাদের সকলকে নিয়ে চলে গেলেন মামার বাড়ীতে।

আষাঢ় মাসের শেষ। তাল দু-একটা পাকতে শুরু হয়েছে। মামার বাড়ীর গ্রামে মস্ত বড় একটা পুকুর আছে মাঠের ধারে, তার পাড়ে অনেক তালগাছ। আমি বেড়াতে গিয়ে প্রথম দিনই একটা পাকা তাল কুড়িয়ে পেলাম মনে আছে।

মার হাত সেরে গেল মামার বাড়ী এসে। ভাদ্রমাসের শেষে আমরা দেশের বাড়ীতে চলে এলাম। কলকাতা আর যাওয়া হল না। বাবাও সেখানকার বাসা উঠিয়ে দেশে চলে এলেন।

সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরের কথা।

কলকাতায় মেসে থাকি, আপিসে কেরানীগিরি করি, দেশের বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র থাকে। আমার পুরনো কলেজ-আমলের বন্ধু শ্রীপতির সঙ্গে বসে ছুটির দিনটা কি গল্প করতে করতে শ্রীপতি বললে—কাল ভাই সন্ধ্যের পর প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট দিয়ে আসতে আসতে—দুধারে মুখে রং—হরিব্‌ল!

—আমিও দেখেছি। ঐ পথ দিয়েই তো আসি। আমি কিন্তু ওদের অন্য চোখে দেখি। ওদের আমি খুব চিনি। ওদের ঘরে এক সময়ে আমার যথেষ্ট যাতায়াত ছিল।

আমার বন্ধু আশ্চর্য্য হয়ে বললে—তোমার!

—হ্যাঁ ভাই, আমার। মাইরি বলছি।

—যাঃ, বিশ্বাস হয় না।

—আচ্ছা, চল আমার সঙ্গে এক জায়গায়। প্রমাণ করে দেব।

বছর পনেরো আগে একবার নন্দরাম সেনের গলি খুঁজে বার করে মাখনের বাড়ী যাই। কুসুম, প্রভা—কেউ ছিল না। ওই দলের মধ্যে মাখনই একমাত্র সে খোলার বাড়ীতে ছিল তখনও।

শ্রীপতিকে নিয়ে আমি চলে গেলাম নন্দরাম সেনের গলিতে। মাখন এখনও সেই বাড়ীতেই আছে। একেবারে শনের নুড়ি চুল মাথায়, থুত্থুড়ি বুড়ির মত চেহারা। একটিও দাঁত নেই মাড়িতে।

আমি যেতে মাখন বললে—এস এস! ভাল আছ?

—চিনতে পার?

—ওমা, তোমায় আর চিনতে পারব না! আমাদের চোখের সামনে মানুষ হলে। ভাল কথা, কুসুমের খোঁজ পেইছি।

—কোথায়? কোথায়?

—শোভাবাজার স্ট্রীটে একটা মেস-বাড়ীতে ঝি-গিরি করে। ঢুকেই বাঁ-হাতি। মন্দিরের পাশের ভাঙা দোতলা। আমায় সেদিন নিয়ে গিয়েছিল মন্দিরে নীলের পুজো দিতে। তাই আমায় দেখালে।

শ্রীপতিকে নিয়ে সে মেস-বাড়ী খুঁজে বার করলাম। সন্ধ্যে তখনও হয় নি, নীচে রান্নাঘরে ঠাকুরকে বললাম—তোমাদের ঝি কোথায় গেল?

—বাজারে গিয়েছে বাবু। এখুনি আসবে। কেন?

—দরকার আছে। তার নাম কুসুম তো?

—হ্যাঁ বাবু।

একটু পরে একজন লম্বা রোগা ঝি-শ্রেণীর মেয়ে-মানুষ সদর দরজা দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠাকুর বললে—ও কুসুম, এই বাবুরা তোমায় খুঁজছেন।

আমি ঝিএর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বাল্যদিনের সেই সুন্দরী কুসুম এই! মাখনের মত অত বুড়ি না হলেও—কুসুমও বুড়ি। বুড়ি ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যাবে না। ওর মুখ আমার মনে ছিল, সে মুখের সঙ্গে এ বৃদ্ধার মুখের কিছুই মিল নেই। ঠাকুর না বলে দিলে একে সেই কুসুম বলে চেনবার কিছু উপায় ছিল না।

কুসুমও আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—আমায় খুঁজছেন আপনারা? কোত্থেকে আসছেন?

—মাখনের কাছ থেকে।

—কোন্ মাখন?

—নন্দরাম সেনের গলির মাখন বাড়ীউলি।

—ও! তা আমায় খুঁজছেন কেন?

—চল ওদিকে। কথা আছে।

—চলুন খাবার ঘরে বসবেন।

খাবার ঘরে গিয়ে বললাম—কুসুম, আমায় চিনতে পার?

—না বাবু।

—নন্দরাম সেনের গলিতে আমাদের বাসা ছিল। আমি তখন আট বছরের ছেলে। আমার বাবা-মা ছিলেন ঈশ্বর নাপিতদের বাড়ীর ভাড়াটে। মনে হয়?

কুসুম হেসে বললে—মনে হয় বাবু। তুমি সেই পাগলা ঠাকুর? কত বড় হয়ে গিয়েছ। বাবা মা আছেন?

—কেউ নেই!

—ছেলেপুলে কটি?

—চার পাঁচটি।

—বসো বসো, বাবা।

আরও অনেক কথাবার্তার পরে কুসুম আমাদের বসিয়ে বাইরে কোথায় চলে গেল। খানিক পরে চট করে কোথা থেকে একটা শালপাতার ঠোঙায় খাবার এনে দুখানা থালাতে আমাদের দুজনকে খেতে দিলে।

আমারও মনে ছিল না। খেতে গিয়ে মনে হল। বড় বড় হিঙের কচুরি চারখানা। তখুনি মনে পড়ে গেল কুসুমের সেই বাবুর কথা, সেই হিঙের কচুরির কথা। মনে এল ত্রিশ বছর পরে আবার সেই লোভী ছেলেটির ছবি ও তার কচুরিপ্রীতি। কুসুমের নিশ্চয় মনে ছিল। কিংবা ছিল না—তা জানি নে। কচুরি খেতে খেতে আমার মন সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ধূসর ব্যবধানের ওপারে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে একেবারে নন্দরাম সেনের গলির সেই অধুনালুপ্ত গুড়ের আড়তটা ও রাস্তার কলটার সামনে, যেখানে কুসুম আজও পঁচিশ বছরের যুবতী, যেখানে তার বাবু আজও সন্ধ্যেবেলায় ঠোঙা হাতে হিঙের কচুরি নিয়ে আসে নিয়মমত।

দুই দিন

১২৮৫ সাল। সতেরোই শ্রাবণ।

ভাবনহাটি গ্রামের রামচন্দ্র রায়ের ছেলে পরমেশচন্দ্র রায় আজ বিয়ে করে বৌ নিয়ে আসবে বলে রামচন্দ্র রায়ের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে কয়েকজন লোক জমেছে। রামচন্দ্র রায় ছেলের বিয়েতে যেতে পারেন নি, আনন্দনাড়ু ভাজার দিন তেল জলে উঠে হঠাৎ রান্নাঘরের চালে আগুন ধরে যায়। আগুন নেবাতে গিয়ে রামচন্দ্র রায়ের দুই হাত পুড়ে ঘা হয়েছে করতালুতে। সেজন্যে তিনি ছেলের বিয়েতে যান নি, বরকর্ত্তা করে পাঠিয়েছিলেন ভায়রাভাই ভেবরের গোপেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে।

রামচন্দ্র রায়ের অবস্থা ভাল নয়। দুখানা মাত্র দু-চালা ঘর। কয়েক বিঘে ধানের জমি। বাড়ীর পেছনে একটা খালের এক-চতুর্থাংশের মালিকানা স্বত্ব আছে, তাতে বছরে ত্রিশ-চল্লিশ মণ মাছ পান। এর দাম দশ টাকা হিসাবে মণ ধরলে তিন চার শ টাকা। এ ছাড়া অন্য কোন আয় নেই। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে এক রকম সংসার চলে যায়।

রামচন্দ্র রায়ের ছেলে পরমেশের বয়স তেইশ বছর। ছাত্রবৃত্তি পাশ করে স্থানীয় জমিদারী কাছারিতে মুহুরিগিরি কাজে ঢুকেছে। মাসিক বেতন ছ টাকা।

ইতিমধ্যে সে গ্রামের সমবয়সীদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে।

তাদের বাপ-মা তাদের বলে, সোনার চাঁদ ছেলে দেখ্‌গে যা রামু রায়ের ছেলে পরমেশ। ছাত্রবৃত্তি পাশ করলে দিব্যি—আবার ছ টাকা মাইনেতে মুহুরিগিরিতে ঢুকেছে। ওর উন্নতি ঠেকায় কেডা? তোরা শুধু বাড়ী বসে খাবি আর পাশা খেলবি চণ্ডীমণ্ডপে বসে।

ছ টাকা মাইনে পাওয়ার কথাটা একটু রটে গেল চারিধারে। ফলে ছেলের বিবাহের জন্যে নানা গ্রাম থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগল। রামচন্দ্র রায়ের স্ত্রী ধরে বসলেন আঁকড়ে এক কথা—এক শ এক টাকা বরপণ দিতেই হবে। দশ ভরি সোনা। তা ছাড়া দানসামগ্রী, বরের গরদ আলাদা।

অনেকে বললে, বাপ রে, কি দেখে অত টাকা বরপণ দিতে যাবে লোকে? এক শ টাকা বরপণ কারা পায়? যাদের ভাল জমিজমা আছে। তোমার কি আছে বাপু? ছেলে অবিশ্যি স্বীকার করি অল্প বয়সে চাকরিটা পেয়েছে ভালই। কিন্তু ঐ যা ছেলে দেখেই দেওয়া। কম চাওয়া তো নয়। দশ ভরি সোনার দামই ধর আঠার টাকা ভরি হিসাবে এক শ আশি টাকা। না না, ও চলে না।

আবার অনেকে বলে, চাওয়ার দিন এসেছে তাই চায়। কই, তুমি আমি তো চাইতে সাহসও করি নে। হীরের টুকরো ছেলে। এই বয়সে উন্নতি করেছে কেমন! আট টাকা তো ওর মাইনে হল বলে। ওকে দশ ভরি সোনা দেবে না তো দেবে কাকে?

অনেক মেয়ে দেখা ও উভয় পক্ষের যাতায়াতের পরে অবশেষে গোবরাপুরের তারিণী চক্রবর্ত্তীর বড় মেয়ে পতিতপাবনীকে রামচন্দ্র রায়ের বেশ পছন্দ হল, তাঁরা বরপণ ও দশ ভরি সোনা দিতেও চাইলেন।

আজ সেই কনেকে নিয়ে পরমেশ বাড়ী আসছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে রামচন্দ্র রায়ের বাড়ীতেই কথা উঠেছে—তাই তো, বৌ আসবার আগে নাড়ু ভাজার দিনই ঘরে আগুন লেগে গেল। শ্বশুরের হাত পুড়ে গেল। এ কি অলক্ষুণে বৌ রে বাবা!

রামচন্দ্র রায়ের স্ত্রী স্বামীকে নাড়ু ভাজার দিন শেষরাত্রেই কথাটা বলেছিলেন। তখন শেষরাত্রে দধি-মঙ্গলের শাঁখ বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝল্‌সানো হাতের যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বামীকে জাগিয়ে তুলে পরমেশের মা বললেন—ওগো শোন—

—কি গা?

—আমার মনতা ভাল বলছে না। সেই থেকে আমিও ঘুমুই নি। আমার কথা শোন, ওখানে ছেলের বিয়ে ভেঙে দ্যাও।

—পাগল! আজই বিয়ে, আজ বিয়ে ভেঙে দেবে?

—খুব দেওয়া যায়। অলুক্ষুণে কনে, ঘরে আগুন লাগে ভিটেতে পা দিতে না দিতে? আমার খোকা বেঁচে থাকুক, তার মুখের দিকে চেয়ে সংসারে সব করতে পারি তো ভারি একটা মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া যায় না? কাল রাত্রে যারা যারা নাড়ু ভাজতে এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই একথা বলেছে—দিগম্বর চাটুজ্যের বৌ, ন খুড়ি, পাড়ার মঙ্গল ঠাকরুন, কাশী চক্কত্তির শাশুড়ি; আমাদের মনমতি, ময়না, এরা ছেলেমানুষ এরাও বলছিল।

রামচন্দ্র রায় একটুখানি ঘাবড়ে গেলেন। ছেলের শুভ বিবাহের দিনটিতে এসব কি বিভ্রাট রে বাবা। বললেন—আচ্ছা, দেখব, সেখানে আগে যাই তো।

—ছেলেকে আমি পাঠাব না কিন্তু।

—তবে দধিমঙ্গলের শাঁখ বাজালে কেন? ওসব লোক-হাসাহাসির মধ্যে আমি নেই। একটা নিরীহ মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে আমি পারব না।

—সর্ব্বনাশ কিসে হল?

—ও কথা ব'লো না গিন্নি। পরের দুর্দ্দিনটা নিজের মত দেখতে শেখো। আজ তাঁর মেয়ের বিয়ে, মেয়েরও দধিমঙ্গলের শাঁখ বাজল, কত লোক-কুটুম্ব এসেছে তাঁদের বাড়ী। কি সমাচার, না বর এল না। মেয়ে দো-পড়া হয়ে গেল। কান্নাকাটি উঠল চারিদিকে, রান্নাবান্নার যোগাড় সব নষ্ট। শত্রুরা মুখ টিপে হেসে মুখে আবার গা-ঘেঁষে দুঃখু জানাতে এল। কি দিন ভাব দিকি! ওসব ছেড়ে দ্যাও, পরের মন্দ করতে পারব না; এতে আমাদের ছেলের খারাপ হবে না গিন্নি, ভাল হবে। তুমি ওর মা, তুমি ভাল মনে ওকে আশীর্ব্বাদ কর। তোমার পায়ের ধুলোতে ওর সব মঙ্গল।

পরমেশের মা স্বামীকে মানতেন। স্বামীর কথায় নরম হয়ে গেলেন। উনি যখন বলছেন, তখন কোন ভয় নেই। উনি আমার চেয়ে অনেক বোঝেন। যা ভাল বোঝেন করুন। আমি মেয়েমানুষ, কি বুঝি।

তার পর বেলা হল। বরযাত্রী-ভোজনের যজ্ঞি চড়ে গেল। প্রায় ষাট জন বরযাত্রী হবে। তারা খেয়ে দেয়ে সব রওনা হয়ে চলে গেল, কিন্তু রামচন্দ্র রায় গেলেন না। যেতে পারলেন না। সেই পোড়ার ঘায়ে বড় যন্ত্রণা হতে আরম্ভ করল, একটু জ্বর-মত হল দুপুরের দিকে। তাঁর ভায়রা ভাইএর হাতে বরকর্ত্তার দায়িত্ব তুলে দিয়ে রামচন্দ্র রায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন কোণের ছোট্ট ঘরে।

স্ত্রী সন্ধ্যার পরে ঘরে ঢুকে বললেন—হ্যাঁগা, ঘুমিয়েছ?

—না।

—এ কি হল?

—কি হল ?

—তোমার জর, তুমি খোকার বিয়েতে যেতে পারলে না, এ কি কম কষ্ট আমার। ভেবে ছাখ, সেই খোকা আমাদের। আমার মন মোটেই ভাল নিচ্ছে না। চোখের জল ফেলছি নে পাছে খোকার অমঙ্গল হয়। কি অলুক্ষুণে বৌ আসছে সংসারে যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি !

—গিন্নি, আবার সেই কথা ? জর মানুষের হয় না ? জর হয়েছে বলে একজন নিরীহ মেয়ের উপর রাগ কর কেন, তাকে অলুক্ষুণে বলই বা কেন ? তার কি দোষ ?

—কি খাবে রাত্তিরি ? ও বেলা এত যজ্ঞি, তুমি কিছু মুখে দিলে না—

—একটু সাবু করে দিও। আর, কিছু ভেব না, ভগবানের নাম নিয়ে গিয়ে শুয়ে থাক। যে আসছে, তাকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর মন খুলে।

সেই নতুন বৌ নিয়ে পরমেশ এখুনি বাড়ী আসছে। কেন না দূরে ঢোলের শব্দ পাওয়া গেল। গরিবের ঘরের ঠাট বাট, আত্মীয় কুটুম্বিনীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, শাঁক নিয়ে দোরের বাইরে রাস্তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

পরমেশের মা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন, চোখে তাঁর ঔৎসুক্য, মুখে অনিশ্চয়তার হাসি।

রাস্তার মোড়ে বরকনের পালকি দেখা গেল।

পেছনে বাজনাদার ভক্ত মুচি ও তার দল।

পালকির এ পাশে গোপেশ্বর চক্কত্তি, পাত্রের বড় মেসো।

সকলেই এগিয়ে গেল।

কে একজন চেঁচিয়ে বললে—দুধ-আলতার খোরা ঠিক কর আগে।

গ্রাম্য বৌ-ঝিরা ঘিরে দাঁড়াল। পোঁ পোঁ শাঁখ বেজে উঠল। সুগঠিত-দেহ যুবক পরমেশ রায় পালকি থেকে নেমে মার পায়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করলে। মা গিয়ে নববধূকে কোলে করে পালকি থেকে নামালেন।

তার পর কৌতুহলচঞ্চল হাতে বধূর ঘোমটা খুলে মুখ দেখলেন, হাতে দিলেন দুগাছা সোনার বালা। তাঁর শাশুড়ি, রামচন্দ্র রায়ের স্বর্গগতা মাতৃদেবী একদিন এই বালা জোড়া দিয়ে তাঁর মুখ দেখেছিলেন এই ভিটেতে পা দেওয়ার দিনে।

পুত্রবধূর মুখ দেখে খুশী হলেন পরমেশের মা। কাঁটালতলায় বরণের পিঁড়ি পাতা ছিল, পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করে ঘরে তুললেন।

বাঁশবনের মধ্যে বাড়ী।

অনেক রাত্রে লক্ষ্মী-পেঁচা ডাকছে বাঁশবনের মাথায়। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে বনে। বধূ কি একটা ডাকে ভয় পেয়ে ঘুমের ঘোরে শয্যা-সঙ্গিনী ছোট ননদ হৈমবতীকে জড়িয়ে ধরলে।

—ওকি বৌদি, ভয় কি ? ও শেয়াল ডাকছে।

নববধূ ঘুম ভেঙে হেসে ননদের মুখের দিকে ডাগর ডাগর চোখ মেলে চাইলে। কানের মাকড়ি দুটো ঠিক করে নিলে। হৈমবতী হেসে বললে—রও একটা দিন। কালই তো

ফুলশয্যে। কাল থেকে দাদার কাছে শোবে, ভয়-ভাবনা কিছুই থাকবে না। ছটফট করে মরছ, আমরা বুঝি নে বুঝি ?

নববধূ সলজ্জ কণ্ঠে বললে—ওমা !

ওই দিনটির পরে দীর্ঘ আটষট্টি বছর কেটে গিয়েছে। আজ তের শ তিপ্পান্ন সালের তেরই শ্রাবণ। অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট এন. রায়ের আজ মাতৃশ্রাদ্ধ। লোকজনে বাড়ী পরিপূর্ণ।

ভাবনহাটি গ্রামে এঁদের বড় দোতলা বাড়ী, বৈঠকখানা, পূজোর দালান। এন. রায়ের পিতা ৺পরমেশচন্দ্র রায়ের আমলে দুখানা মাত্র খড়ের চালাঘর ছিল। পরমেশ রায়ের অবস্থা সামান্যই ছিল। স্থানীয় জমিদারী কাছারিতে নায়েবী করে কষ্টেসৃষ্টে দুটি ছেলেকে মানুষ করে গিয়েছিলেন। চারটি মেয়েকেও মোটামুটি পাত্রস্থ করেছিলেন।

বড় ছেলে নৃপেন্দ্রনাথ রায় জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন, আজ সাত আট বছর পেন্‌শন্ নিয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে, একটি গত মহাযুদ্ধে আই এম. এস মেজর ছিল, এখন ভবানীপুরে ডাক্তারি করে। ছোটটি এই বছরে নিজে কনট্রাক্টরির আপিস খুলেছে কলকাতায়। বিগত যুদ্ধে ধানবাদ অঞ্চলে কনট্রাক্টরি করে অনেক টাকা রোজগার করেছে। ভবানীপুরে গোবিন্দ ঘোষাল লেনে সে গত ফাল্গুন মাসে তেতলা প্রকাণ্ড বাড়ী কিনেছে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে। নৃপেন্দ্রনাথ রায় বকুলবাগানে বাড়ী করেছিলেন—ছোট একতলা বাড়ী বটে, তবে বেশ চওড়া কম্পাউণ্ডওয়ালা, ফুলবাগান আছে বাড়ীর সামনে। চাকরি-জীবনের অর্থ দিয়ে বছর ষোল-সতের আগে এই বাড়ীটা তিনি করেছিলেন, এখন ছেলেরা এই বাড়ীতেই থাকে। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কলকাতাতেই। বলা বাহুল্য, সম্পন্ন ঘরেই।

নৃপেনবাবু চাকরি-জীবনের প্রথম দিকে পৈতৃক ভিটেতে এই বড় দোতলা বাড়ী করেন। পূজোর দালানে কয়েক বছর দুর্গোৎসবও করেছিলেন। তখন পরমেশ রায় বেঁচে ছিলেন।

পিতার পরলোকগমনের পর নৃপেনবাবু কয়েক বছর দেশে যাতায়াত করেছিলেন, তার পর আর বড় একটা আসতেন না। মাকে নিয়ে যেতে চাইতেন কর্ম্মস্থানে ; বৃদ্ধা বলতেন—না বাবা, আমার কাছে শ্বশুরের এই ভিটেই গয়া কাশী। এ ফেলে কোথাও যাব না। বৌমার শরীর এখানে টেকে না ম্যালেরিয়াতে, বৌমাকে তুমি নিয়ে যাও সঙ্গে।

তখনও পর্য্যন্ত নৃপেনবাবু স্ত্রীকে বৃদ্ধা মায়ের কাছেই রেখেছিলেন।

ব্যস, ভাবনহাটির বাস উঠে গেল।

শুধু বুড়ি থাকে, বড় বাড়ীর ঘরে প্রদীপ দেয়। ছেলেদের তৈরি বাড়ী, কত আনন্দের, কত আহ্লাদের! লোকের কাছে বলে সুখ, দেখিয়েও সুখ। ছোট ছেলেও এই বাড়ী করতে টাকা দিয়েছে, দুই ভাইয়ের টাকাতে বাড়ী, তবে বড় খোকা নৃপেন বেশি টাকা দিয়েছে। ছোট ছেলে বীরেন দাদা-শ্বশুরের পসারে বসে গোয়াড়ি কেষ্টনগরে ওকালতি

করে, সেখানে শ্বশুরবাড়ীর সম্পত্তি বাড়ীঘর সব তার। সে ক্বচিৎ ভাবনহাটি আসে। তার অবস্থা মন্দ নয়।

পরমেশ রায়ের পরলোকগমনের পর বুড়ি অনেক দিন বেঁচে ছিল। আশি বছর বয়স হয়েছিল মরবার সময়। একবার বড় ছেলে নৃপেন রায়ের খুব অসুখ করে। বুড়ি ভাবনহাটি থেকে ছেলেকে দেখতে যায় বহরমপুরে। তখন নৃপেন রায় বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। বুড়ি বলেছিল—তোকে রেখে আমি যাবই খোকা—কোন ভাবনা নেই, তুই সেরে উঠবি। আমি এই পায়ের ধুলো দিলাম তোর মাথায়, এই তোর বড় ওষুধ।

প্রায় পঁচিশ বছর এই বাড়ীতে একা প্রদীপ দেওয়ার পরে এবার বুড়ি স্বামীর ভিটের পুণ্য মৃত্তিকায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন গত ২রা ফাল্গুন।

প্রকাণ্ড শ্রাদ্ধসভা। মেজর রায় সব দেখাশুনো করে বেড়াচ্ছেন—বুড়ির জ্যেষ্ঠ পৌত্র। সুন্দর গৌরবর্ণ চেহারা, চোখে চশমা। কাকে বলছেন—কনট্রোলারকে লিখে এক মণ ময়দা অতিকষ্টে যোগাড় করেছিলাম—আর কলকাতার রেশন কার্ডে কিছু কিছু কলেক্ট করে। ভাবনহাটি গ্রামের লোক খুব বেশী হয়েছে।

এরা গ্রামের মধ্যে বড় লোক, অনেকদিন পরে দেশে এসেছে, মাতৃশ্রাদ্ধ করছে, একটা বড় ভোজ দেবে। তবে মুশকিল এই যে, না মেলে আটা ময়দা, না মেলে চিনি। এরা বড় লোক তাই যেখান থেকে হোক জোগাড় করেছে এই বাজারে। শ্রাদ্ধসভা একটা দেখবার জিনিস হয়েছে।

বড় শামিয়ানার নীচে শ্রাদ্ধবেদী। তেরটি নাতি মুণ্ডিতমস্তকে যখন দীর্ঘ সারিতে কুশাসনে বসে ভুজ্যি উৎসর্গ করছে—তখন গ্রামের বুড়ি চকত্তি-গিন্নি বললেন—আহা হা, ভাগ্যিমানী চলে গেল। কি ভাগ্যিই নিয়ে এসেছিল! আজ সোনার চাঁদেরা বসে দেখ ভুজ্যি উচ্ছুগ্যুও করছে। এ ভাগ্যি কি সবার হয়। বট্‌ঠাকুরের কী ছিল, দুখানা চালা ঘর। আমরা প্রথম ঘর করতে এসে দেখেছি। দিদি আর কত বড় ছিলেন আমার চেয়ে—না হয় দশ বছরের। সে বাড়ীতে রাজ-অট্টালিকা তুলেছে ছেলেরা, আবার নাতিরা হয়েছে একেবারে রাজা। এমন ভাগ্যি নিয়ে কজন মেয়েমানুষ বসুমতীতে আসে বল—

নাতি মানে শুধু ছেলের ছেলেরা নয়, চার মেয়ের ছেলেরাও আছে।

নৃপেন রায়ের ছোট ছেলে কণ্ট্রাক্টর পরিতোষ বেদী থেকে হেঁকে বললে—বিজয়, গাড়ী গিয়েছে?

বিজয় বিনীত ভাবে বললে—দারোগা বাবুর মেয়েছেলে আনতে গিয়েছে গাড়ী। এখনও ফেরে নি।

—ফিরলে সাবডেপুটির বাড়ীর মেয়েদের আনতে পাঠাতে হবে—এবার বড়খানা পাঠিও।

—যা জল-কাদা সার, গাড়ী চালানো বড় দায় হয়েছে। বড় গাড়ী বেরিয়ে গিয়েছে রাণাঘাটে ছানা আনতে।

—যে করে হোক, একটা-দুটো দিন চালিয়ে নিতে হবে।

পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী মহকুমা টাউন থেকে নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আনবার জন্যে দুখানা নিজেদের মোটর এরা কলকাতা থেকে এনেছে। রাণাঘাট এখান থেকে অনেক দূর, ভাল রাস্তাও নেই, সেখানে গাড়ী পাঠানোর কথায় পরিতোষ বললে, সেখানে গাড়ী পাঠাতে কে বললে? সে তো ষোল মাইলের কম নয়—

বিজয় বললে—সতেরো মাইল সার।

—যত সব স্টুপিড!—তারপর একখানা টায়ার গেলে কি স্প্রিং ভাঙলে এ বাজারে যোগাড় করাই কঠিন—যা রাস্তা! ভাল গাড়ীখানাই ওই রাস্তায় পাঠালে!

এই সময়ে জিপ গাড়ীতে মহকুমা হাকিম ও দুজন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এসে নামলেন।

মেজর রায় বেদী থেকে বললেন, আসুন, আসুন—ওরে গাড়ী থেকে কি কি আছে নামিয়ে নে—আসুন দয়া করে—

মহকুমা হাকিম মিঃ সেন পূর্ব্বে ছোকরা বয়সে নৃপেন রায়ের অধীনে সার্কেল অফিসারের কাজ করেছেন মেদিনীপুরে, কাঁথি মহকুমায়। জিপ থেকে নেমে মিঃ সেন বললেন—আপনার বাবা? ও! নমস্কার সার—আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কাজ আরম্ভ করুন, আমাদের জন্যে ভাববেন না। উই আর কোয়াইট অ্যাট হোম!

—কে আছিস, ওরে? সিগারেটের টিন বার করে দে ওঁদের—চায়ের ব্যবস্থা আগে কর।

এই সময় গোয়ালারা দই আর ক্ষীরের বাঁক নিয়ে উঠোনের এক স্থানে এসে দাঁড়াল। ও পাশে ছোট চালাঘরে মিহিদানা ও দরবেশ ভিয়ান হচ্ছে, লুচির ময়দা মাখা হচ্ছে—সে ঘর থেকে একজন উঠে এসে গোয়ালাদের দই আর ক্ষীর দেখে নামিয়ে হিসেব করে নিতে লাগল।

জার্ম্মান সিলভারের ট্রেতে চা দেওয়া হচ্ছে শামিয়ানায় চেয়ারে বসে যেসব ভদ্রলোক শ্রাদ্ধ দেখছেন, তাঁদের এবং বিশেষভাবে মহকুমার হাকিম ও তাঁর দুজন সঙ্গীকে।

গ্রামের সাধারণ লোকও শামিয়ানার একপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে। শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হয়েছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য। তেরটি সোনার চাঁদ নাতি একসঙ্গে ভূজ্যি উৎসর্গের মন্ত্র পাঠ করছে।

একটু দূরে সেই কাঁঠাল গাছটা। যখন এটা অল্প কয়েক বছরের চারা তখন এরই তলায় দুধে আলতায় গোলা পাথরের খোরায় পরমেশ রায়ের নববধূ এসে দাঁড়িয়েছিল বরণের সময়, পাশেই আলপনা-দেওয়া পিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন নবযুবক পরমেশ রায়। আটষট্টি বছর আগের এ খবর সভাস্থ কোন লোক জানত না, জানবার কথাও না।

অনুশোচনা

বালাদাস আপ্তে সকালে উঠে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজ রবিবার, তাতে পাপস্বীকারকারীদের দল আর একটু পর থেকেই আসতে শুরু করবে। স্নান সেরে তিনি তাড়াতাড়ি তৈরি হতে লাগলেন ভজন-মন্দিরে যাবার জন্যে।

বালাদাস আপ্তে কংকন প্রদেশের টুসুঘাট ও পানজিম অঞ্চলের একজন নাম-করা লোক। গোয়া থেকে যাতায়াতের বড় সড়কের ওপর সেন্ট জেভিয়ায়ের যে ক্ষুদ্র গ্রাম্য মন্দির অবস্থিত, বালাদাস সেখানকার সহকারী পুরোহিত, সাধারণ উপাসনা করেন না বড় একটা, রবিবার সকালে পাপস্বীকার গ্রহণ করেন ও বিধি অনুসারে দণ্ড দেন। বালাদাসের পবিত্রতার জন্যে সকলে তাঁকে খুব মানে, ভয়ও করে। কনফেশন্যালের ক্ষুদ্র ঘুলঘুলি দিয়ে মস্ত বড় জনারের ক্ষেত আর নীচু পশ্চিমঘাট শৈলশ্রেণীর দৃশ্য দেখতে দেখতে অপরাধী ভক্ত এক একবার যখন বালাদাসের দীর্ঘ দাড়ির দিকে চায়, তখন সত্যই নিজেকে সে ঘোর পাপী ও অসহায় মনে না করে পারে না।

বালাদাস জর্ডনের পবিত্র জলের আধার থেকে নিজে একটু জল মাথায় দিয়ে ক্যাম্বিসের চটের মত লম্বা গাউন পরে সেন্ট জেভিয়ারের ধর্মমন্দিরের ঘুলঘুলি-জানালায় গিয়ে বসেন টুলের ওপর। গত বিশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছেন তিনি। তার আগে গোয়ার একজন মেসন্ ব্যবসায়ীর নকলনবিশ ছিলেন।

খুব সকালে প্রথমেই এসেছে একজন চাষী লোক।

বালাদাস তাঁর বাঁধা কাজ কলের মত করে যান। চাষী লোকের মাথায় জর্ডনের জল ছিটিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ল্যাটিন মন্ত্র ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি করে চলেন—

আউট ননকমিটিস্ সনকোমিটিস্ ও ডেল্লা জেস্থ
ননকমিটিস্ সনকোমিটিস্ ও ইমিড ত্রিস মারি
হিপোক্রিটিএ নিহিল স্যালভিটর এ আউট—

তার পর গ্রাম্যকৃষককে জিজ্ঞেস করেন গম্ভীরস্বরে—কি কি দোষ বলিয়া যাও। পারত্রিকের সভায় ভগবান সিংহাসনে অসীন। দেবদূতগণ ভেঁপু বাজাইয়া শেষ বিচারের দিন তোমার কৃত সমুদয় পাপরাশি সকলের কাছে প্রচার করিতেছে। তুমি কি কিছু লুকাইয়া রাখিতে চাও?

সংযত সাধুভাষার বাক্যে চাষা ভীত ও স্তব্ধ হয়ে পুরোহিতের মুখের দিকে চেয়ে বলল—কিছু লুকোব না হুজুর। সোমবার সন্দেতে, সলোমন বালকৃষ্ণ যে কুমড়োর ক্ষেত করেছে পাশেই, সেখান থেকে দুটো কুমড়োর জালি না বলে নিয়ে—

বালাদাস চমক দিয়ে বললেন—বল চুরি রূপ মহাপাপ—

—আজ্ঞে, চুরি রূপ মহাপাপ করেছি। মঙ্গলবার কিছু নেই। বুধবার—

—মঙ্গলবার কিছু নেই? ভেবে দেখ। প্রত্যেক অস্বীকৃত পাপের জন্যে সেণ্ট জেভিয়ারের পবিত্র বেদীতে স পাঁচ আনা—

—মেরী মাতার দোহাই হুজুর, মঙ্গলবার আর কিছু নেই।

—আচ্ছা বলে যাও। বুধবার—

—আমার ক্ষেতের থাম-আলু সাস্তারা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল বুরুথ টুডু আর তার ছেলে সল্ টুডু, তাদের ঢিল ছুঁড়ে পা ভেঙে দিয়েছি।

—পা ভেঙে?

—হ্যাঁ হুজুর। পা একেবারে ভেঙে। মিথ্যে কথা বলব কেন।

—আর তুমি যখন অপরের ক্ষেত থেকে চুরি করলে তখন বুঝি পাপ হল না?

—আজ্ঞে—

—বলে যাও। বৃহস্পতিবার। পবিত্র সেণ্ট টেরেসা বোজার পবিত্র স্মৃতিতে পূত বৃহস্পতিবার।

পুরোহিত হাঁটু গেড়ে বসে উক্ত সেণ্ট টেরেসার উদ্দেশ্যে আভূমি প্রণাম করলেন। চাষাও তাঁর দেখাদেখি তাই করলে। তার পর বললে—হুজুর, বৃহস্পতিবার একজনের ধার শোধার কথা ছিল—দিই নি।

—ইচ্ছে করে? মনে ছিল?

—হ্যাঁ হুজুর। টাকাটা হাতছাড়া করতে কষ্ট হচ্ছিল।

—হুঁ? ধার করবার বেলা মনে থাকে না সেসব? টাকা শোধ দিয়েছ?

—না হুজুর।

—আত্মপাপ-শোধনকারীদের উচিত পাপস্বীকারের দিনই গির্জা থেকে ফিরে গিয়ে পূর্ব্বের ত্রুটি সংশোধন করা। আজই টাকা শোধ দেবে। তারপর?

—তারপর, শুক্রবার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে ওকে বলেছিলাম, তুমি বাপের বাড়ী চলে যাও—

—শনিবার?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—বল।

চাষা দুবার ঢোঁক গিলে বললে—আজ্ঞে ব্যাপারটা একটু—

—বল।

—আজ্ঞে ও-পাড়ার মঙ্গলদাসের শালী এসেছে পানজিম থেকে। তাকে দেখবার জন্যে, রাস্তার ইঁদারার পাশে যখন মেয়েরা চান করছিল, তখন বড় ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে দেখছিলাম।

বালাদাস দুই গালে হাত দিয়ে বললে—কি সর্ব্বনাশ। কেন?

—আজ্ঞে তা যখন বলতেই এসেছি তখন বলব। মঙ্গলদাসের শালী নামকরা সুন্দরী পানজিমের। সেখানে কী নাচঘরে কাজ করে। অমন গাইতে নাচতে কেউ জানে না এ

দেশে। গরবা নাচ খুব ভাল নাচে। খুব ভাল নাচ, সেবার এসে নেচে খুব নাম করে গিয়েছিল যে।

বালাদাসের অস্পষ্ট মনে পড়ল শুনেছিলেন বটে, পানজিমের একটি সুন্দরী মেয়ে গরবা পরবে হিন্দুদের উৎসব-দিনে বটতলায় অদ্ভুত নাচ নেচেছিল।

তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন—হুঁ। বড় উৎসাহ দেখা যাচ্ছে যে! ক বার দেখেছিলে।

—আজ্ঞে, তা চার বার।

—চার বার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। মিথ্যে কথা কেন বলব।

—না, তুমি সত্যাগ্রহী পল। মেয়েটি কত বড় বললে?

—আজ্ঞে, তা যুবতী। লেখাপড়া জানে। মঙ্গলদাসের সংসারের অর্দ্ধেক খরচ তো সেই পাঠায় পানজিম থেকে হুজুর।

—কি নাম?

—সখীবাই।

—আচ্ছা যাও।

চাষা চলে গেল।

নিজের অপরাধের ভারে তার মন এত ভারাক্রান্ত যে বাড়ীতে গিয়ে সে রাঙা মাদ্‌সা চালের ভাত আর খামআলুর তরকারি খেতেই পারলে না। কংকন উপকূল গোধূম উৎপন্ন করে না। ভাদ্রমাসে জনার আর এই মাদ্‌সা ধান উঁচু জমিতে জন্মায়—অন্য নীচু জমিতে হৈমন্তী ধান। মাদ্‌সা ধান ষাট দিনে পাকে বলে গরীব চাষীরা অর্দ্ধেক জমিতে এর চাষ করে; সকালে উঠে ঐ ধানের রাঙা মিষ্টি ভাত পেট ভরে খেয়ে মাঠের কাজে বেরিয়ে যায়।

দুপুর ঘুরে গেল। মাঠে বসে বসে চাষা ভাবলে কাজটা খারাবি হয়ে গেল সন্দেহ নেই। সেজন্য বকুনিও যথেষ্ট খেয়েছে সে মাননীয় পুরোহিত বালাদাসের কাছে।

তবে একটা কথা।

সখীবাই এখানে চিরকাল থাকতে আসে নি।

তিন চার দিন পরে সে পানজিমে চলে যাবে। যাবেই।

আজ না হয় সে জনার ক্ষেতের কাজ শেষ করে বিকেলে ফেরবার পথে সোজা বাড়ী না গিয়ে ওপাড়া দিয়ে একটু ঘুরে সখীবাইকে আর একবার দেখে যাবে এখন।

ও রকম মেয়েছেলে এদিকে হর-হামেশা বড় একটা আসে না। না হয় এই অপরাধের জন্যে সে আগামী রবিবারে বাতি দেবে সেণ্ট জেভিয়ারের দরগায়। পুরোহিত কিছু জরিমানা করবেন একই অপরাধ দুবার করবার জন্যে।

একটাকা স পাঁচ আনা। তা দেবে সে। গোয়ার পাইকারদের কাছে এক গাড়ি কুমড়ো বিক্রি করলে উঠে আসবে এখন ও পয়সা।

কাজ শেষ করে বিকেলের দিকে সে গুটি গুটি চলল মঙ্গলদাসের পাড়ার দিকে। আস্তে

আস্তে সে ইঁদারার অদূরবর্তী বড় ডুমুর গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। ডুমুরের যে ঝাড় ঝাড় কাঁদি নেমেছে বৃদ্ধ মহাপুরুষদের দাড়ির মত, তারই ওপাশে কে যেন একজন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে না ?

—কে রে ?

চাষা গুঁড়ির এদিক থেকে ওদিক ঘুরে গিয়ে দেখলে—ক্যাম্বিসের চটের গাউন পরে লম্বা চুল-দাড়ি কাঠের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে, ডুমুর ঝোড়ের তলায় চোরের মত দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং বালাদাস পুরকোয়াস আপ্তে, পুরোহিত।

দাদু

ঠাকুরদাদা আমার শৈশবের অনেকখানি জুড়ে আছেন। সমস্ত শৈশব-দিগন্তটা জুড়ে আছেন। ছেলেবেলায় জ্ঞান হয়েই দেখেছি আমাদের বাড়ীতে তিনি আছেন।

তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় এক-শ। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখেছি তিনি আমাদের পশ্চিমের ঘরের রোয়াকে সকাল থেকে বসে থাকতেন। একটা বড় গামলায় গরম জল করে দিদি তাঁকে নাইয়ে দিত।

ঠাকুরদাদা চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। তাঁকে সকালে হাত ধরে রোয়াকে নিয়ে এসে তাঁর জায়গাটিতে বসিয়ে দিতে হত। তামাক সেজে দিত দিদি। কেবল মা ঠাকুরদাদার ভাতের থালাটি নিয়ে গিয়ে তাকে খাইয়ে আসতেন। দিদি আবার তামাক সেজে দিত।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরদাদা বসে বসে আপনমনে কি বকতেন। একটু বেশি বেলায় বাবা নায়েবি করে কাছারি থেকে ফিরে বাড়ী ঢুকলেই ঠাকুরদাদা অমনি কান খাড়া করতেন।

—কে এল ? হরিশ ?

—হ্যাঁ বাবা।

—বাবা হরিশ, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

—সে কি বাবা, আপনাকে এখনও ভাত দেয় নি ?

—না বাবা। খিদেয় মরছি, অ হরিশ। ভাত দিতে বলে দে।

বাবার বয়স পঞ্চাশের ওপর। মাথার চুল প্রায় সব সাদা হয়ে গিয়েছে, বেশ মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস চেহারা, সবাই বলে বাবা নাকি দেখতে সুপুরুষ।

বাবা মাকে অনুযোগ করলেন—আচ্ছা বাবাকে এখনও ভাত দাও নি ? ছি ছি, এত বেলা হল !

মা বললেন—ও মা, সে কি গো ! দশটার সময় যে আমি নিজের হাতে খাইয়ে এসেছি !

বাবা চেঁচিয়ে ডেকে বললেন—ও বাবা—

—কি হরিশ ?

—আপনাকে আপনার বৌমা খাইয়ে এসেছে যে ? কি বলছেন আপনি ?

—না না, অ হরিশ, মিথ্যে কথা। আমারে কেউ ভাত দেয় নি, না খেয়ে মলাম আমি—

বলেই ঠাকুরদাদা ছেলেমানুষের মত খুঁৎ খুঁৎ করে কান্না শুরু করে দিলেন।

মা রাগ করে বলে উঠলেন—বুড়ো বাহাত্তুরে, মরেও না, সাত কাল জ্বালাবে। তোমার সাধের হিমি গিয়ে তোমায় খাওয়াক মাখাক—আমি আর যদি কাল থেকে তোমায় দেখি, তবে আমি বেণী মুখুজ্যের—

বাবা দুঃখিত স্বরে বললেন—আহা হা, বড়বৌ—ছেলেপিলের সামনে—

—কি ছেলেপিলের সামনে ? কে না জানে সোহাগের হিমির কথা ! বাহাত্তুরে বুড়ো, চার কালে গিয়ে ঠেকেছে—

—আহা হা বড়বৌ ! অমন করে গুরুজনকে বলতে আছে ? ছি ছি, তোমার মুখখানা আজকাল বড্ড—

ঠাকুরদাদা তখনও কিন্তু কাঁদছেন ছেলেমানুষের মত।

কান্নার মধ্যে ডাকলেন—অ হরিশ।

যেন অসহায় আর্ত্ত বালক তার একমাত্র আশ্রয়স্থল পিতাকে ডাকছে।

বাবা জামা-টামা না খুলেই ছুটে গেলেন, সান্ত্বনার সুরে বললেন—কি বাবা, কি ?

—আমি ভাঁত খাঁব—আঁমি না খেঁয়ে মঁলাম অ হঁরিশ। ওরা আঁমায় নাঁ খেঁতে দিয়ে মাঁরবে—খুঁৎ—খুঁৎ—

—বাবা,—কাঁদবেন না। কাঁদতে নেই। ছিঃ, অমন কাঁদতে আছে !

মা অমনি এ রোয়াক থেকে বলে উঠলেন—আ মরণ, বুড়ো বাহাত্তুরের মরণ ভ্যাখ না, যেন দু বছরের খোকা, ছেলের কাছে কেঁদেই খুন। যমের ভুল এমনও হয়।

বাবা বলেন—আঃ, চুপ কর না, বড়বৌ—কি কর ! ।

ঠাকুরদাদা আবার বলেন—খিদে পেয়েছে—ভাত খাব—

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেখছি—আপনি চুপ করুন।

অবশেষে আবার সামান্য দুটি ভাত বাবা নিয়ে দিয়ে এলেন। ঠাকুরদাদা দিব্যি-খেতে বসে গেলেন আবার। মুখে আর হাসি ধরে না।

আমরাও ঠাকুরদাদার কাণ্ড দেখে হেসে বাঁচি নে।

এমনি একদিন নয়, মাসের মধ্যে দশ দিন হত। ইতিমধ্যে দিদি শ্বশুরবাড়ী চলে গেল।

বাবাকে দেখতাম, ঠাকুরদাদার যত কিছু কাজ নিজের হাতে করতেন। কিন্তু তাঁর সময় নেই, সকালে উঠে সান্ধ্যাহ্নিক করে জল-বাতাসা খেয়ে তিনি বেরিয়ে যেতেন কাছারির কাছে। দুপুরে এসে খেয়ে সামান্য বিশ্রাম করে কাজে বেরুতেন, ফিরতে রাত আটটা নটা

বাজত। এসেই ঠাকুরদাদার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করতেন—বাবা, শরীর ভাল আছে? এদিকে ঠাকুরদাদাও সারা দিনের যত অভাব-অভিযোগের কাহিনী জমিয়ে রাখতেন ছেলের সামনে পেশ করবার জন্যে সেই সময়।

—আর বাবা, শরীর ভাল! একটু তামাক, তা কেউ দেয় না। টিকে ভিজে, আগুনও ধরল না। আজ এমন মশা কামড়াতে লাগল দুপুর বেলা, মশারিটা কেউ টাঙিয়েই দিলে না—এই ছাখ না পিঠটা—

তার পর কাঁদ-কাঁদ সুরে বললেন—তুই একটু হাত বুলিয়ে দে হরিশ—

বাবা বসে বসে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

—তুই বাড়ি না থাকলে আমাকে সবাই অগ্রাহ্যি করে। এক ঘটি জল চাইলে সময়মত ছায় না বাবা।

—সত্যি তো! আহা! আমি সব বলে ঠিক করে দেব এখন।

—দিস। ভাল করে বলে দিয়ে যাস তো।

—দেব।

—তোর খাওয়া হয়েছে?

—না বাবা, এই তো এলাম।

—যা তুই, হাত-পা ধুয়ে জল-টল খা—তোকে পেট ভরে খেতে দিচ্ছে তো?

—হ্যাঁ বাবা।

—দেখি সরে আয় তো। একটু মোটা-সোটা হলি, না সেই রকম আছিস? জানিস, ছেলেবেলায় তোর শরীর ছিল এমনি রোগা। তোর গর্ভধারিণী একদিন বললে, খোকার জন্যে ছাগলের দুধের ব্যবস্থা কর। তখন মেহেরপুরে নীলকুঠিতে কাজ করি। সেইখানেই তোর জন্ম, জানিস তো? হ্যাঁ মেহেরপুরের—ইয়ে—ঐ কি বলছিলাম ভুলে গেলাম—আজকাল কিছু মনেও থাকে না—

—ছাগলের দুধ!

—হ্যাঁ ছাগলের দুধ আনতে বললে তোর গর্ভধারিণী। সাহেবের একটা বড় ছাগল ছিল। মালীর সঙ্গে যড় করে ফেললাম, মাসে দু টাকা করে দেব—আর সে আধ সের করে ছাগলের দুধ আমায় দেবে—

বাবা ওঠেন না সেখান থেকে, যতক্ষণ ঠাকুরদাদা একটু শান্ত না হন।

ভাত খেয়ে বাবার সঙ্গে গল্প করে ঠাকুরদাদা খুশী মনে বলেন—তা হলে তুই এখন যা হরিশ, খেয়ে নিগে—দুধ পাচ্ছিস তো?

—হ্যাঁ বাবা।

—ভাল করে দুধ খাবি। দুধেই বল।

—না বাবা, দুধ ঠিক খাচ্ছি।

বাবা চলে গেলেন। যাবার আগে ঠাকুরদাদাকে বিছানায় শুইয়ে নিজের হাতে একটা

মোটা চাদর ওঁর গায়ে ঢেকে দিলেন।

—চাদর খুলবেন না বাবা, ঠাণ্ডা লাগবে।

মা বকতেন—হল বাপের সেবা? বাব্বাঃ, এমন কীর্ত্তিও কখনও দেখি নি!

বাবা একটু লজ্জা ও সঙ্কোচের সঙ্গে বলতেন—আঃ, চুপ কর—

—কেন চুপ করব? বুড়ো বাপের আবাদার যেন দু বছরের খোকার আবদার—এমন কাণ্ড যদি কখনও দেখেছি।

—না দেখেছ না দেখেছ, থাম তুমি। ঐ যে-কদিন বুড়ো আছে, তার পর আর—

—সে সবাই জানে, তার পর কি আর তুমি বুনোপাড়ার দিগম্বর বুনোর সেবা করবে? এস, দুটো খেয়ে নিয়ে আমার মাথা কিনবে এস।

সেদিনই গভীর রাত্রে আমরা সবাই ঘুমিয়ে যখন, ঠাকুরদাদা নিজের ঘর খুলে হাতড়ে হাতড়ে বাইরের রোয়াকে এসে ডাকছেন—অ বৌমা, অ হরিশ—

বাবা ধড়মড় করে উঠে বাইরে এসে বললেন—কি বাবা, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

—বাবা হরিশ!

—কি হয়েছে?

—বৌমা আমায় এখনও ভাত দিলে না। রাত কত হয়েছে ছাখ তো! আমি বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভাত হয় নি এখনও?

বাবা অবাক!

মা ঘুম-চোখে উঠে বললেন—কি?

—বাবা ভাত চাইছেন।

—বাব্বাঃ হাড়-মাস কালি হয়ে গেল। ঢের ঢের সংসার দেখেছি, ঢের ঢের শ্বশুর দেখেছি—কিন্তু এমন ধারা কাণ্ডকারখানা কখনও শুনিও নি, কখনও দেখিও নি—

—চেঁচালে কাজ চলবে? ও কি! সব সময়—

ইতিমধ্যে আমার নির্ব্বিকার ঠাকুরদাদা, যিনি চোখে ভাল দেখেন না, কানেও ভাল শোনেন না, আবার ডেকে উঠলেন—অ হরিশ! অ বৌমা!

—যাই বাবা, যাচ্ছি।

—আমাকে ভাত দিয়ে যাও। খিদে পেয়েছে।

বাবা গিয়ে ঠাকুরদাদাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—অবোধ শিশুকে যেমন লোকে সান্ত্বনা দেয়। তিনি খেয়েছেন সন্ধ্যার পরেই, তাঁর বৌমা ভাত দিয়ে গিয়েছে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে। মনে নেই তাঁর? তাঁকে ভাত না দিয়ে কি বাড়ীর কেউ খেতে পারে? এখন রাত দুটো। এখন কি ভাত খেতে আছে? এখন খেলে তাঁর অসুখ করবে। কাল সকালেই—খুব ভোরেই তাঁকে খেতে দেওয়া হবে, রাত তো ভোর হয়ে গেল। অমন করলে সবারই মনে কষ্ট দেওয়া হবে। অমন কি করা উচিত? ছিঃ!

ঠাকুরদাদা বালকের মত আশ্বস্ত হয়ে বললেন—খেইছি?

—হ্যাঁ বাবা। আমার কথা বিশ্বাস করুন—মাগুর মাছ এনেছিলাম আপনার জন্যে হাট থেকে কিনে—তাই দিয়ে ভাত খেয়েছেন। সত্যি বলছি, আপনার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলছি নে। চলুন, শোবেন আসুন—ঠাণ্ডা লাগবে—ঘরের মধ্যে আসুন—

—আচ্ছা, আচ্ছা।

—আসুন—

বাবা হাত ধরে ঠাকুরদাদাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়লেন।

মা বললেন—সহজে মিটল ?

—মেটাতে জানলেই মেটে। এখন থেকে বাবার জন্যে দুটো ভাত রেখে দিলে কেমন হয় ?

—হ্যাঁ। তার পর ওই বুড়ো বয়সে পেট ছেড়ে দিক এই শেষ রাত্তিরে গিলে, তখন ঠ্যালা সামলাবে কে শুনি ?

বাবা ন্যায্যপক্ষেই বলতে পারতেন, যে এতকাল সামলে আসছে, সে-ই সামলাবে। কিন্তু তা তিনি বললেন না। নীরবে গিয়ে আবার নিজের ছোট্ট খাটটিতে শুয়ে পড়েন।

কাছারির কাজে বাবাকে কয়েক দিনের জন্য গোয়াবাড়িতে গিয়ে থাকতে হল।

যাবার সময় বার বার মাকে বলে গেলেন, ঠাকুরদাদার যেন কোন অসুবিধে না হয়। অযত্ন না হয় এ কথাটা বলতে বোধ হয় সাহস করলেন না, তাহলে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে যাবে। ঠাকুরদাদাকে গিয়ে বললেন—বাবা, আমি গোয়াড়ি যাচ্ছি, এই পাঁচ-ছ দিন দেরি হবে। একটু বুঝে-শুঝে চলবেন,আপনার বৌমাও তো কাজের লোক, ছেলে-পুলে নিয়ে বিব্রত।

—কবে আসবি ?

—বুধবার নাগাত।

—আজ না গেলে হত না ? শনিবারের বারবেলা। নিশিকান্ত তরফদার বলত মেহেরপুরের কুঠির জমানবিশ ছিল, শনিবারের বারবেলা—

—কে বললে আজ শনিবার ?

—তবে কি বার ?

—শুক্রবার।

—তা কি করে হয় ? তুই বললি পাঁচ দিন দেরি হবে, তবে আজ শনিবার হল না ?

—বাবার এত হিসেব এখনও মাথায় আছে! পাঁচ-ছ দিন বললাম যে। আপনি ভাববেন না, কোন অসুবিধে হবে না আপনার।

বাবা তো চলে গেলেন, এদিকে দু দিন বেশ কাটল। তার পরই ঠাকুরদাদা উৎপাত শুরু করলেন। রোজ সন্ধ্যের পর অভ্যাস-মত বলেন—অ হরিশ!

কেউ উত্তর দেয় না।

মা আমাদের চোখ টিপে বারণ করে দিতেন বাবা বাড়ী আসেন নি সে কথা বলতে,

কারণ তাহলে ঠাকুরদাদা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন।

—অ হরিশ! বাড়ী এলি? অ হরিশ!

আমি মায়ের শিক্ষা মত বলতাম—না, এখনও আসেন নি বাবা।

—আজ কখন কাছারি গেল? আমাকে বলে গেল না?

আমরা উত্তর দিই নে।

—অ হরিশ!

—ঠাকুরদা, তামাক সেজে দেব?

এটিও মায়ের পরামর্শ। ঐ একমাত্র উপায় ঠাকুরদাদাকে অন্যমনস্ক রাখবার। আমাদের বলতেন—বোস্ আমার কাছে।

আমি, আমার ছোট ভাই নীলু ফুচু ও দুই বোন সরলা আর বিনু ঠাকুরদাদাকে ঘিরে বসি।

—সবাই এসেছে?

—হুঁ।

—বিনু এসেছে? আমার কাছে এগিয়ে এসে বোস্ সব। শোন, সুঁদরবনে এক শ ছাপ্পান্ন নম্বর লাটে আমার মনিবের কাছারি ছিল। পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। মস্ত বড় জমিদার। আমি যেখানে থাকতাম, সে কাছারির নাম ছিল গরানহাটির কাছারি। সুঁদরী আর গরান কাঠের জঙ্গল কিনা, তাই নাম ছিল গরানহাটি। একবার নোনাতলার খালে আমাদের ডিঙি লেগেছে, মাঘ মাসের দিন, জলে সোন নেমেছে—

—সে কি ঠাকুরদা?

—সোন মানে জোয়ার। বে-সোন মানে ভাঁটা—বে-সোনে নৌকো চলে না সামনে, নোঙর করতে হয় ও-দিকির গাঙে। তারপর কি বলছিলাম?···

ওই হল মুশকিল। ঠাকুরদাদার কাছে গল্প শোনবার সুখ নেই, কেবল ভুলে যাবেন।

—বলছিলেন সোন নেমেছে জলে—

—হ্যাঁ, তার পর দেখি এক মস্ত বাঘ জলে ডিঙির পাশে জল খাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে উজিরালি বিশ্বেস ছিল বড় শিকারী সে অমনি বন্দুকের চোঙ বাগিয়ে এক দ্যাওড় করলে। এক দ্যাওড়, দু দ্যাওড়, ব্যস, বাঘ উল্টে পড়ল খালের জলে। হ্যাঁ 'মনু?

—কি?

—তোর বাবা এল?

—না, এখনও আসেন নি।

—গিয়ে দেখে এস দাদাভাই আমার। অ হরিশ!

—আসেন নি বাবা। গল্প বলুন ঠাকুরদা।

—দেখে এস না দাদাভাই।

—দেখতে হবে না, আসেন নি। এলে আপনার সঙ্গে কথা বলতেন না?

ঠাকুরদা আবার গল্প বলতে শুরু করলেন। বাঘের গল্প জমাতে পারলেন না, কেবল ভুলে যান, আবার গোড়া থেকে শুরু করেন। উলটো-পালটা করে ফেলেন, কখন বলেন শিকারীর নাম উজিরালি বিশ্বেস, কখনও বলেন তার নাম আজিমুদ্দি বিশ্বেস।

এমন সময় মা ভাত নিয়ে এলেন।

আমরা বললাম—ঠাকুরদাদা, ভাত এনেছে মা।

—ও, এস বৌমা। কি রাঁধলে ?

—মাছের ঝোল আর চচ্চড়ি।

—হরিশ আসে নি বৌমা ?

—না।

—এখনও এল না ? রাত তো অনেক হয়েছে—

—রাত বেশি হয় নি। আপনি খেতে বসুন, আমি দুধ আনি।

—হরিশ এলে ব'লো আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।

মা চলে গেলেন। ঠাকুরদাদার সামনে দাঁড়ালে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হবে। ঠাকুরদাদা খাওয়া শেষ করে কিন্তু অন্য দিনের মত শুতে গেলেন না, ঠায় অনেক রাত পর্য্যন্ত রোয়াকে বসে রইলেন, আর কেবল মাঝে মাঝে যার-তার পায়ের শব্দ শুনে বাবার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন।

অনেক রাত্রে মা বললেন—বাবা, আপনি এবার শুয়ে পড়ুন। ফুচুকে পাঠিয়ে দিই, আপনাকে শুইয়ে আসুক।

—হরিশ এসেছে ?

—না।

—কেন এল না এখনও ?

—আপনার কিছু মনে থাকে না। তিনি গোয়াড়ি গিয়েছেন মনে নেই ? বুধবারে আসবেন আপনাকে বলে গেলেন যে। শুয়ে পড়ুন।

ঠাকুরদাদা বসে কি ভাবলেন। কথার উত্তর দিলেন না। হয়তো মনে পড়ল বাবার গোয়াড়ি যাওয়ার কথা। ফুচু গিয়ে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে এল। অনেক রাতে শুনলাম, ঠাকুরদাদার ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছে। মা শুনে বললেন—দেখে আয় কি হল।

গিয়ে দেখি ঠাকুরদাদা বিছানার ওপর উঠে বসে কোণের দিকে হাত বাড়িয়ে লাঠি হাতড়াচ্ছেন। তিনি নাকি এখুনি বাবার সন্ধানে বেরুবেন। বাবা কেন আসেন নি এখনও। তিনি মোটেই ঘুমুতে পারেন নি নাকি। আমরা জানি, এ কথা ঠিক নয়। ঠাকুরদাদা বসে বসে ঢুলে পড়েন, তিনি না ঘুমিয়ে আছেন এত রাত পর্য্যন্ত ! ইস্ ! তা আর জানি নে !

ঠাকুরদাদাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম। অবশেষে মা গিয়ে কড়া সুরে বললেন—আচ্ছা, বাবা, আপনার কাণ্ডখানা কি শুনি ? ওরা ছেলেমানুষ, ওদের ঘুমুতে দেবেন না একটু ? এক শ বার আপনাকে বলা হচ্ছে তিনি গোয়াড়ি গিয়েছেন, বুধবারে আসবেন, আপনি কিছুতেই

তা শুনবেন না। রাত দুপুরে উঠে বাধিয়ে দিয়েছেন গোলমাল। ও রকম করলে থাকুন আপনি সংসারে, আমি এক দিকে বেরুই।

মাকে ঠাকুরদাদা ভয় করতেন। মা ঘরে পা দিতেই তিনি বেশ নরম হয়ে এসেছিলেন, সুড় সুড় করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সকালে উঠে আমায় কাছে ডাকলেন—শোন মনু—

—কি ?

—দাদাভাই, দাদু আমার, একটা পয়সা দেব এখন—

ঠাকুরদাদা নিঃস্ব নিষ্কপর্দ্দক লোক, তিনি পয়সা দেবেন এ কথা যদিও আমি বিশ্বাস করি নে, তবুও বলি—কি বলছেন ?

—তোর বাবার চিঠি এসেছে ?

—না।

—আজ কি বার ?

—সোমবার।

—হরিশ কবে আসবে !

—বুধবারে।

—আচ্ছা যা।

বুধবারে বাবা কি জন্যে যেন এলেন না, কি জানি। ঠাকুরদাদা সারাদিন রোয়াকে বসে রইলেন, গম্ভীর মুখে তামাক খান আর মাঝে মাঝে বলেন—কে এল ? অ হরিশ ? কিসের পায়ের শব্দ রে, ও ফুচু, ও নীলু—

ফুচু বললে—আমাদের রাঙী গাইএর বক্‌না, ঠাকুরদা।

—ও।

এই রকম চলল সারা দিন। রাত্রে খাবার সময় খেতে বসেছেন, আর মাঝে মাঝে কান খাড়া করে রেলগাড়ীর শব্দ শোনবার চেষ্টা করছেন ; মুখে কিছু বলেন না। হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। আমি তামাক সেজে ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠে বললেন—কে ?

—আমি মনু।

—নটার গাড়ি গিয়েছে জানিস ?

—এখনও যায় নি। আপনি শুয়ে পড়ুন।

—শব্দ পাস নি গাড়ীর ?

—না।

—ও।

বাবার কথা মুখেও আনলেন না। বললেন—পান ছেঁচে এনেছিস ? নিয়ে আয়।

বাবা তার পর দিনও এলেন না। ঠাকুরদাদা কিন্তু আশ্চর্য্য রকমের গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। আর কিছু জিগ্যেস করেন না বা বাবার নাম ধরে ডাকেনও না।

শুক্রবার দিন সন্ধ্যের গাড়ীতে বাবা বাড়ী এলেন। ঠাকুরদাদা অভিমানে কথাই বলেন না। বাবা বুঝতে পারলেন। মাকে বললেন—বাবার দেখছি রাগ হয়েছে—যাই দেখি ব্যাপার।

ঠাকুরদাদা তামাক খাচ্ছেন, বাবা গিয়ে বললেন—বাবা!

পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

ঠাকুরদাদার মুখে কথা নেই।

—বাবা, কেমন আছেন?

ঠাকুরদাদা নিরুত্তর।

—বাবা, রাগ করছেন নাকি? তা আমি আবার রাণাঘাট যাচ্ছি কাল সকাল বেলা।

—রাগ হয় না?

এবার ঠাকুরদাদা আর কথা না বলে থাকতে পারলেন না। কেন না, ওই যে বাবা বললেন, কাল সকালেই রাণাঘাট যাবেন, ওতেই ঠাকুরদাদার রাগ জল হয়ে গিয়েছে একেবারে।

বাবা হেসে বললেন—আপনি রাগ করতে পারেন, তবে আমি পরের কাজ করি, কাজ সারতে গেলে দু-এক দিন দেরি হয়েই যায়।

—আমার জন্যি কি আনলি?

—ভাল জিনিস এনেছি। আপনার ভাল লাগবে। কেষ্টনগরের সরভাজা।

—তা দিতে বল্ বৌমাকে।

সে সময় মা কালীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়েছিলেন। আসতে দেরি হল, ঠাকুরদাদা অধীর ভাবে বার বার আমাকে বলতে লাগলেন—এল তোর মা, ও মনু?

বাবা চলে গিয়েছেন নটবর বাঁড়ুজ্যের চণ্ডীমণ্ডপে পাশা খেলতে। ঠাকুরদাদা আমাদেরই বার বার জিগ্যেস করতে লাগলেন—যা না তোর মার কাছে।

ঠাকুরদাদার উদ্বেগের ন্যায্য কারণ যে ছিল না তা নয়। মা ঠাকুরদাদাকে বিশেষ পছন্দ করতেন না গোড়া থেকেই। তাঁর জন্যে খাবার এলে, বাবা দাঁড়িয়ে থেকে না দিলে ঠাকুরদাদার ভাগ্যে অনেক সময় শূন্যের অঙ্ক লেখা হত, এ আমি জানি। মা বলতেন—ছেলে-পিলেরা খাবে আগে, তা নয়, বাহাত্তুরে বুড়ো খোকনকে আগে খাওয়াও। অত আমার শ্বশুরভক্তি নেই। উনি আমার কি করেছেন কোন্ কালে? কখনও একখানা কাপড় দিয়েছেন পুজোর সময়—ওঁর হাতে যখন পয়সা ছিল, যখন পাইকপাড়ায় কাজ করতেন? আমি আজ আসি নি এ সংসারে, আমারও হয়ে গেল ত্রিশ বছর। আজই না হয় ভীমরতি হয়েছে, কোন্ কালে উনি ভাল ছিলেন? ওই ছেলে আর ছেলে! আর সব যেন বানের জলে ভেসে এসেছিলাম!

একটা নাড়ু কিংবা এতটুকু আমসত্ত্ব-ছেঁড়া পড়ত ঠাকুরদাদার ভাগ্যে।

বাবা নিজের হাতে খাবার নিয়ে ঠাকুরদাদাকে দিতেন বোধ হয় এই জন্যেই। আগে

ঠাকুরদাদাকে না খাওয়ালে বাবার যেন তৃপ্তি হত না।

আষাঢ় মাসে ঠাকুরদাদা জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। আর উঠতে পারেন না। বাবা তাঁকে বিছানা থেকে উঠিয়ে মুখ ধুইয়ে কাপড় ছাড়িয়ে ওষুধ খাইয়ে দেন। বেদানার রস করে মিছরির গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ান। কাছারি থেকে আসবার পথে ঠাকুরদাদার ঘরে কিছুক্ষণ বসে তবে এসে স্নানাহার করেন। কি উদ্বেগ তাঁর ঠাকুরদাদার অসুখের জন্যে!

মাকে বলতেন—বাবার জ্বর কত? দেখেছিলে? উনি তো ভুলে যান, ওষুধ ঠিকমত দেবে।

সেরে উঠেও ঠাকুরদাদা প্রায় দু মাস বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না। বাবা আজ ছাগলের দুধ, কাল কুমড়োর মেঠাই, পরশু আমলকির মোরব্বা—যে যা বলে তাই যোগাড় করে নিয়ে এসে খাওয়ান, ঠাকুরদাদা গায়ে বল পাবেন বলে।

ঠাকুরদাদাও হয়ে গেলেন একেবারে বালক। তাঁর উৎপাতের জ্বালায় বাড়ীসুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কেবল দিনরাত খাই-খাই আর একে ডাকছেন তাকে ডাকছেন। আমরা পারতপক্ষে কোন দিনই কেউ ঠাকুরদাদার ঘেঁষ বড় একটা নিই নে, এখন তো একেবারে ত্রিসীমানায় ঘেঁষি নে। দশ ডাক দিলে একবার উত্তর দিই কি না দিই। মা ভাতের থালা দিয়ে আসেন নিয়ে আসেন, এই পর্যন্ত।

কথার জবাব দিলেও খুব হৃষ্টচিত্তে দেন না। যা দেন, তাও আবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অথচ সেই মা-ই নদীর ঘাটে বাঁড়ুজ্যেগিন্নীর সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে হাবড়হাটি বকেন।

ঠাকুরদাদা অসহায় শিশুর মত বাবার পথ চেয়ে বসে থাকেন। বাবার পায়ের শব্দ পেলেই সুর ধরেন—অ হরিশ, এলি? অ হরিশ!

আর ঠিক কি বাবার পায়ের শব্দ চেনেন ঠাকুরদাদা।

বাবা এসে নিজে দেখাশুনো করবেন, নাওয়াবেন খাওয়াবেন ঠাকুরদাদাকে।

বাবা এলেই ঠাকুরদাদা যত কিছু অভিযোগ শুরু করে দেবেন। তাঁর কাছে ছেলেমানুষের মত—বৌমা আমাকে এ করে নি, আমাকে তা দেয় নি। তাতে ঠাকুরদাদা মায়ের সহানুভূতি আরও হারাতেন।

বাবা তা জানতেনও। সেজন্যে নিজে সর্বদা খবরদারি করতেন।

কারও হাতে ঠাকুরদাদাকে ছেড়ে দিয়ে বাবার বিশ্বাস হত না। দিদি ছাড়া। দিদি তো শ্বশুরবাড়ী চলে গিয়েছে।

পৌষ মাসে বাবা আবাদে গেলেন পৌষ কিস্তির খাজনা আদায় করতে। বার বার মাকে বলে গেলেন ঠাকুরদাদার যেন অযত্ন না হয়।

মা বললেন—কেন, আমি কি বুড়োকে গলা টিপে মেরে ফেলব নাকি?

—ছিঃ, অমন বলতে নেই।

—না, তুমি সেই রকম কথাবার্তা বলছ কিনা তাই বলছি। তবে আমার সংসারের

কাজকর্ম সেরে সব দিক দেখতে তো পারি নে। যত দূর পারি, চিরকাল যা হয়ে আসছে, তাই হবে।

—একটু মন দিয়ে—মানে, উনি বুড়ো মানুষ—

—আমি তা জানি। যা পারি হবে। ভেব না।

বাবা ঠাকুরদাদার কাছে বিদায় নেবার সময় কত দিন দেরি হবে তা ঠিক বললেন না। বললে ঠাকুরদাদা হয়তো যেতে দেবেন না কিংবা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। বাবা যখন বেরুলেন, ঠাকুরদাদা বললেন—অ হরিশ, কবে ফিরবি ?

তাঁর চিরন্তন প্রশ্ন।

—এই যত শীগগির হয় বাবা, আপনি ভাববেন না।

ঠাকুরদাদাকে ফেলে কোথাও গিয়ে বাবা স্বস্তি পেতেন না আমি জানি। ঠাকুরদাদা নাকি তিন বছর বয়স থেকে বাবা ও মার মত করে মানুষ করেন বাবাকে ঠাকুরমায়ের মৃত্যুর পরে। বাবা যেন ভাবতেন ঠাকুরদাদা শত্রুপুরীর মধ্যে বাস করছেন—চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত অবস্থায়—একমাত্র আপনার জন তিনি নিজে। চোখে চোখে রাখতেন এইজন্যে সর্ব্বদা। কারও হাতে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস করতেন না। বলা বাহুল্য, ঠাকুরদাদা তো নিজেকে অসহায় শত্রুবেষ্টিত বলে মনে করতেনই।

বাবা এবার বাড়ী ফিরতে বড় দেরি করতে লাগলেন।

অবশেষে যখন ফিরলেন তখন গরুর গাড়ী করে ভীষণ অসুস্থ অবস্থায়। ঘোর জ্বর। জ্বরের ঘোরে বলতে লাগলেন—বাবাকে কেউ ব'লো না আমি অসুস্থ হয়ে বাড়ী এসেছি।

ঠাকুরদাদা কিন্তু আন্দাজে মাঝে মাঝে বাবাকে ডাক দিতেন। বুঝতে পেরেছিলেন কিনা কি জানি।

—অ হরিশ! আমার জন্যি কি আনলি, অ হরিশ ?

বাবা ঠিক শুনতে পান। জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে বললেন—বাবা বাঁচতে আমার যেন কিছু না হয়, হে ভগবান! মরেও সুখ পাব না।

অসুখ বড় বাড়ল। জেলা থেকে ডাক্তার এসে দেখল দু দিন। সংসারের পুঁজি ভেঙে বাবার চিকিৎসা হল।

একদিন বড় বাড়াবাড়ি হল। ঠাকুরদাদাকে আর দেখাশুনো করার লোক নেই, বাবাকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। গ্রামের ত্রিলোচন ঠাকুরদাদার কাছে বসে তাঁকে বাজে গল্পে ভুলিয়ে রাখলে।

সবাই বলতে লাগল—সুবোধ আর বাঁচবে না। আহা, বুড়োর কি কপাল!

বাবার মৃত্যু হল শেষ রাত্রে।

ঠাকুরদাদা তার কিছুই জানেন না। গভীর ঘুমে অচেতন।

খুব ভোরে বাড়ীতে এসে ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ঠাকুরদাদার হাত ধরে ছুতো করে বাইরে কোথায় নিয়ে গেল।

—চলুন জেঠামশাই, একটু বড়দার বাড়ীতে। আপনাকে একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে সেখানে। তারা বলেছে।

—আমি যাব ?

কান্নাকাটির চাপা শব্দে বলতে লাগলেন—কি রে ? অ হরিশ, কি রে ? কিসের শব্দ ?

সন্ধ্যায় আমরা বাড়ী এসে ঠাকুরদাদাকে ঘিরে বসি। হঠাৎ আমার বড় মমতা হল ঠাকুরদাদার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে।

নতুন কেমন একটা মমতা—যা এতদিন মনের মধ্যে খুঁজে পাই নি।

বাসা

খড়্গপুরে সভা করতে গিয়েছিলাম। বৈশাখ মাস, বৃষ্টি হয় নি প্রায় সারামাস, তার ওপর খড়্গপুর শহরের গরম। গাছ নেই পালা নেই—ছোট্ট ছোট্ট রেলওয়ে কলোনির বাসাঘর, সামনে দিয়ে ড্রেন চলে গেছে, ময়লা জলে ভর্ত্তি। চার নম্বর বাসায় তবুও যা হয় লোক একরকম বাস করতে পারে, তিন নম্বর বাসায় কষ্টেসৃষ্টে চলে, কিন্তু দু নম্বর এবং এক নম্বরের বাসা যে হতভাগ্য লোকেদের জন্যে তৈরি হয়েছে, তারা পশুজীবন যদি যাপন করত অরণ্যে, এর চেয়ে অনেক ভাল থাকতে পারত, ভগবানের আলো-বাতাস থেকে এভাবে বঞ্চিত হত না।

এক ভদ্রলোকের বাড়ী অতিথি হয়েছিলাম। তিনি কি-একটা ভাল কাজ করেন, চার নম্বর বাসায় বাসের অধিকার পেয়েছেন। সেই নীচু নীচু ছোট ছোট ঘরে তাঁর স্ত্রী কার্পেটের ওপর ফুল-বসানো অক্ষরে 'পতি পরম গুরু' লিখে বাঁধিয়ে রেখেছেন। ডিশ, পেয়ালা, পুতুল, মাটির ময়ূর সাজিয়ে রেখেছেন কাঁচের আলমারিতে, দেওয়ালে টাঙানো আছে সানলাইট সাবানের ক্যালেণ্ডার এবং মহাত্মা গান্ধীর ছবি, রাসলীলা ও চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনের ছবি; কোথাকার মজুরেরা এক বিদায়-অভিনন্দন দিয়েছিল বাড়ীর কর্ত্তাকে, সেখানা বাঁধিয়ে টাঙানো —ইত্যাদি। হাওয়া আসে সামান্য, বৈশাখের উত্তাপে নীচু কংক্রিটের ছাদ আগুনের খাপরার মত গরম হয়েছে, হাত-পা নাড়ার স্থান নেই বাসার মধ্যে, গরমে হাঁপ ধরে যায়। চোখের দৃষ্টি সর্ব্বদা দেওয়ালে বেধে যাচ্ছে।

আমি বললাম—কি করে থাকেন এখানে ?

গৃহস্বামী বললেন—কি করি বলুন। চাকরি।

—কত বছর আছেন ?

—১৯২৭ সালে জয়েন করেছি। তাহলে হিসেব করুন। এই একুশ বছর চলছে।

—বরাবর এই বাসায় ?

—তাহলে তো বাঁচতাম। মাইনে যখন কম ছিল, তিন নম্বর বাসায় ছিলাম ন বছর। দু নম্বর বাসা আপনি যদি দেখতেন, তবে না-জানি কি বলতেন! সেই দু নম্বর বাসায় এক বছর।

আমি মনে মনে কল্পনা করলুম সামান্য দু এক শ টাকার জন্যে এই ভদ্রলোক কত জ্যোৎস্নাময়ী দুপুররাত্রির রহস্য, কত বর্ষার ঝর-ঝর ছন্দ, কত সজনে-ফুল-ফোটা কোকিল-ডাকা ফাল্গুনদিন, কত মধুর অপরাহ্ন হারিয়েছেন। শুধু ইনি যে একা হারিয়েছেন তা নয়, এঁর বাড়ীর ছেলেমেয়েরা হারিয়েছে তাদের জীবনের অতি রহস্যময় বাল্যদিনগুলির পরম পবিত্র মুহূর্ত্ত, হারিয়েছেন এঁর স্ত্রীও। তার চেয়েও কষ্ট এই যে, এঁরা জানেন না যে এঁরা কি হারিয়েছেন—সেই কি যেন একটা জিনিসের বিজ্ঞাপনে যেমন ছবির নীচে লেখা থাকে। বললাম—ছুটি পেয়ে দেশে যান ক বার?

—ক বার? মাত্র দুবার দেশে গিয়েছি এই ক বছরের মধ্যে।

আপনা-আপনি আমার অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—বড় কষ্ট আপনাদের।

তিনি তখুনি বললেন—না, এর চেয়েও কষ্ট তাদের, যারা নতুন আসে। বাসা পেতে আগে লাগত সাত-আট বছর—এখন লাগে তের-চোদ্দ বছর।

—কোথায় থেকে চাকরি করবে সে বেচারী?

—গাছতলায়। তা কোম্পানি কি জানে। চাকরি করতে হয় কর। বাসার খবর কোম্পানি রাখে না। অথচ এই খড়্গপুর শহরে কোনও বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না। কেন না, এখানে বাইরের কোন লোকের ঘর নেই, সবই রেলের কোয়ার্টার।

—সত্যি এ ব্যাপার?

—খুব সত্যি।

—তারা থাকে কোথায়?

—ওই হয়তো আপনার একখানা বাইরের ঘর আছে, সেখানে একটু জায়গা দিলেন। নয়তো কোন অবিবাহিত লোকের কোয়ার্টারে রইল। অবিবাহিত লোকের কোয়ার্টারে খুব ভিড় হয়। নতুন চাকরে অবিবাহিত যুবকেরা হার্ড টুগেদার। ভেড়ার গোয়ালেরও অধম। নিয়ে যাব আপনাকে তেমনি এক বাসায়।

আর একজন কে বললেন—আর একবার আপনাকে নিয়ে যাব এক নম্বর দু নম্বরে। দেখবেন সে কি জিনিস। মানুষের বাস করবার জন্যে সেগুলো তৈরি হয় নি। কোন্ এন্‌জিনিয়ার সেগুলো তৈরি করেছিল, তার কি নিজের বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র ছিল না?

এসব কথার উত্তর ভগবানই দিতে পারেন।

সেই আর-একজন ভদ্রলোক বললেন—আপনাকে নিয়ে যেতে হবে আর এক জায়গায়। শহরের দক্ষিণে। সেখানে যতসব অফিসারদের কোয়ার্টারস্। দেখে অবাক হয়ে যাবেন। স্বর্গ।

গৃহস্বামী বললেন—হ্যাঁ হে মিত্তির, সেখানেও একবার নিয়ে যেও তো এঁকে।

পূর্ব্বের ভদ্রলোকটি বললেন—না নিয়ে গেলে কনট্রাস্টটা তৈরি হবে না যে। উনি বুঝবেন কি করে যে, আমরা কোন্ নরকে, আর তারা কোন্ স্বর্গে! বোধ হয় মিঃ বাসুর ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ আছে। যেতেই হবে। খবর দেবে এখুনি।

—স্বর্গই বটে। শহরের দক্ষিণে। খোলা জায়গায়। গিয়ে দেখবেন কি চমৎকার হাওয়া। কি সবুজ লন্। অর্নামেণ্টাল ট্রিজ, বড় বড় কাঁচের সার্সি-খড়খড়িওয়ালা জানালা-দরজা, লাইট, ফ্যান—সেসব অন্য ব্যাপার। আসল কথা সেসব তো আপনার আমার জন্যে তৈরি নয়, সে ছিল সাহেবদের জন্যে। সাদা চামড়া গায়ে থাকলেই অফিসার্স কোয়ার্টার্সে তার জায়গা—কি বড় কি ছোট, কোন সাহেব কখনও তিন নম্বর চার নম্বরে থাকত না—দু নম্বর এক নম্বর তো দূরের কথা। কি করে শোষণ করেছে দেশটা! আমাদের মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে নি।

বেলা গেল।

পয়লা বৈশাখের উৎসবসভা এবং সেই সঙ্গে—'বিচিত্রানুষ্ঠান' বলে একটা কথা সব জায়গায় বড্ড চলেছে—সেই 'বিচিত্রানুষ্ঠান'।

যথারীতি সবই ছিল। সভাপতি-নির্ব্বাচন, উদ্বোধন-সঙ্গীত, মাঝে মাঝে বিকল হওয়া মাইক, রবীন্দ্র-সঙ্গীত (ভুল সুরে), আধুনিক কাব্য-সঙ্গীত (কোন প্রকার সুর নেই তাতে), বক্তৃতা ; তার পরে আবার 'বিচিত্রানুষ্ঠান'।

সর্ব্বশেষে সভাপতির অভিভাষণ দিতে যখন উঠলাম, তখন রাত দশটা। লোক জড় হয়েছে বহু, কয়েক হাজার হবে। বিচিত্রানুষ্ঠানের পরে কেউ দাঁড়াত না সভাপতির অভিভাষণ শোনবার জন্যে—কিন্তু সভার উদ্যোক্তারা ভারি চালাক, তাঁর সবশেষে রেখেছিলেন একটি অতি লোভনীয় ব্যাপার এবং সেটা বড় বড় অক্ষরে কার্য্যসূচীতে ছাপিয়েও দিয়েছিলেন ; সেটি হল 'জলযোগ'। অর্থাৎ দালদায় ভাজা বঁদে আর দরবেশ মিঠাই, ব্যস। শালপাতার ঠোঙায় ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছাসেবকদল সকলের পেছনের সারির ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলুতে শুরু করে দিয়েছে।

দু একজন চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—বড্ড গোলমাল হচ্ছে। দেওয়া বন্ধ কর এখন—দেওয়া বন্ধ কর—

আর দেওয়া বন্ধ কর! ঐ জন্যেই আসা। আর ঐ 'বিচিত্রানুষ্ঠান'-এর জন্যে।

কে এসেছে সভাপতির বাজে ভ্যাজ-ভ্যাজ শুনতে!

দু একবার হাততালি পড়ল। কিন্তু পিছনের ছেলেমেয়ের সারি 'জলযোগ'-এর ঠোঙার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে। সংক্ষেপে সেরে বসে পড়লাম।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়াও শেষ হয়ে গেল।

একজন ভদ্রলোক এসে বললেন—চলুন, একটু জলযোগ—হেঁ হেঁ—এই পথে—আজ্ঞে—

না। আয়োজন বেশ ভালই। নিন্দে করবার কিছুই নেই। খুব ভাল আয়োজন।

বেরিয়ে আসছি, এমন সময় ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ কে একটি ছোকরা এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। মুখ তুলতেই দেখলাম সে আমাদের গ্রামের হীরু জেলের ছেলে কানাই। কানাই ম্যাট্রিক পাশ করে আগে পূর্ব্ববঙ্গে কোথায় যেন রেলে চাকরি করত।

বললাম—এখানে কাজ কর নাকি?

—হ্যাঁ। পাকিস্তান থেকে চলে এসেছি, ঈশ্বরদি ছিলাম। আপনাকে মা ডাকছে—ওই-খানে দাঁড়িয়ে—

—তোমার মা! এখানে?

খুব অবাক হয়ে গেলাম। কানাই জেলের মা চিরদিন পাড়ায় চিঁড়ে কুটে, ধান সিদ্ধ করে ও মাছ বিক্রি করে সংসার চালিয়ে এসেছে। অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ও বৌ সে। চিরদিন দেখে এসেছি জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কুড়ুবার জন্য খুব ভোরে উঠে সে গ্রামের পেছনের বড় জঙ্গলে-ভর্ত্তি আম-কাঁঠালবাগানে আম কুড়ুবার জন্যে যেত, আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত রোজ তাকে দেখা যাবেই আমবাগানে গভীর কাঁটাবন ও লতাপাতার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বাদুড়ে-খেকো আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই পল্লীগ্রামের দেশী আম শেষ হয়ে যায়, আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ওকে আম কুড়ুতে দেখে আমার হাসি পেত।

আমার বাড়ীর ওপর দিয়েই ওর আম কুড়িয়ে ফেরবার রাস্তা। পাড়াগাঁয়ে যেমন হয়, এক বাড়ীর উঠোন দিয়ে অপর বাড়ীর লোকে যাতায়াত করে। ও যখন ফিরত, তখন ওকে বলতাম, ও কানাইয়ের মা, কি আম কুড়ুলে?

কানাইয়ের মা চুপড়ি দেখিয়ে বলত—আম আর কই দাদাঠাকুর। এই দেখুন—

প্রায়ই খেয়ো বাদুড়ে-খেকো আম দু একটা ছাড়া দেখতাম না। ও আবার এত ভাল, যেদিন একটাও ভাল আম পাবে, সেদিন আমাকে বলত—এই আমটা আপনার জন্যি দিয়ে যাই। রাখুন।

আমি বলতাম—না না, তুমি নিয়ে যাও—

ও শুনবে না, ঠিক দিয়েই যাবে।

গ্রামের মধ্যে সকলেই বলত, কানাই জেলের মা বড় সৎ। কখনও কারও সঙ্গে ঝগড়া করে নি। মাছ বিক্রির সময় ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণপাড়ার ঘুঘু গিন্নীরা ধারে মাছ নিত, ছ মাস ঘুরিয়েও পয়সা দিত না—অবশেষে হয়তো পয়সা মেরে দিত। কখনও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ ওর ছিল না, আবার ধার চাইলে, ছ মাস ঘুরিয়ে যে কাল পয়সা দিয়েছে, তাকেও আজ আবার মাছ দেবে।

আমাদের পাড়ার রাম চাটুজ্যের ছেলে জেলি পিতৃহীন দরিদ্র অবস্থায় কোন রকমে নিজের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করে রেলে কি একটা চাকরি পেয়েছিল। জেলির মা একা থাকতেন বাড়ীতে, বাড়ীর সামনের ডোবায় হয়তো সকালে কানাইয়ের মা বাসন মাজতে এসে দেখলে বামুনপাড়ার ঘাটে (একটা ছোট্ট ডোবার আবার তিনটে ঘাট!) জেলির মা বড়ি দেওয়ার

ডাল ধুতে নেমেছেন। জেলির মা হেসে বললেন—ও জেলে-বৌ, জেলি কাল রাত্তিরে বাড়ী এসেছে—

—ওমা, কি হবে! তাই নাকি?

অমনি সে এঁটো বাসন ফেলে ছুটে আসবে।

—কই, কোথায় গেল আমার সোনা, আমার মানিক, আমার বাছা—

জেলিকে সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। যখন জেলি বাড়ী আসবে, তখন সে কি অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের পরিচয় ওর চোখমুখে! জেলির জন্যে বড় কই মাছ জোগাড় করে নিয়ে আসবে, নিজের ঘরের গাইয়ের দুধ ঘটি মেপে দিয়ে যাবে, সরু চিঁড়ে কুটে সঙ্গে বেঁধে দেবে জেলির চাকুরিস্থানে চলে যাওয়ার দিন।

কত দিন এই মাতৃস্নেহের লীলা দেখে এসেছি।

সেই জেলেবৌ আজ এখানে!

কত দূরে যশোর জেলার এক অজ পাড়াগাঁ থেকে। জীবনে কখনও যে রাণাঘাটও যায় নি, সে আজ এসেছে খড়্গপুর, সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে, বাঁশবাগানের তলায় ওদের জেলে-পাড়ার সেই খড়ের ঘরখানা ছেড়ে ছেলের বাসায়!

জেলেবৌ আমায় দেখে এগিয়ে এসে বললে—দাদাঠাকুর আমাদের কতদূরে এসে নেকচার বলছে! আমায় কানাই বললে—দাদাঠাকুরের নেকচার হবে আজ সভায়। আমি বলি, আমায় নিয়ে চল, কতকাল দেখি নি তাঁকে। কি সুন্দর নেকচার বললেন আপনি!

বলে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। বয়সে সে আমার চেয়ে বড়, আমার দিদির সমান। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, জেলেবৌ আরও বড় হলেও সে এমনিভাবেই আমায় প্রণাম করত। গ্রামের নিয়ম।

বললাম—ভাল আছ কানাইয়ের মা?

—আপনাদের আশীর্বাদে আছি একরকম। বৌদিদি কই? ছেলেমেয়েরা সব ভাল?

—একরকম ভাল আছে। আজকাল সবাই কলকাতায়।

—দেশে যান নি?

—মধ্যে গিয়েছিলাম একবার। মাস দুই আগে।

ও অমনি আকুল ও পিপাসিত স্বরে বললে—বলুন গাঁয়ে কে কেমন আছে?

ইতিমধ্যে সভার উদ্যোক্তাগণ আমাকে তাগিদ দিতে লাগলেন—তাহলে কাইণ্ডলি আসুন, আবার আমাদের নববর্ষের ডিনার পার্টির আয়োজন রয়েছে মিঃ বাসুর ওখানে—

আমার কিন্তু যাবার ইচ্ছে নেই সত্যি একটুও। এদের টান আমার হাজার ডিনার পার্টির চেয়েও বেশি। সমস্ত খড়্গপুর শহরের হাজার সুশিক্ষিত, সুমার্জ্জিত, সুভদ্র লোকের মধ্যে এই গ্রাম্য, অশিক্ষিতা জেলেবৌকে আমার অনেক বেশি আপনার জন বলে মনে হল সেই মুহূর্ত্তে।

জেলে-বৌ বললে—তা হবে না, সে কি দাদাঠাকুর? মোদের বাসায় যেতি হবে না বুঝি, না এমনি ছাড়ব? পায়ের ধুলো দেবেন না বুঝি বাসায়?

—চল। যাব না কেন? বাঃ—

এদিকে এরা ছাড়ে না।—সে কি সার? এখন গেলে আর কি ওরা না খাইয়ে ছাড়বে? যাবেন না।

আমি বললাম, কিছু না, বেশি দেরি হবে না। এখুনি আসছি। দেশের লোক, ধরেছে—

ওদের সঙ্গে ওদের বাসায় গেলাম। মুশকিল, দু নম্বরের বাসা, কম মাইনের লোকের বাসা।

আমাকে ওরা নিয়ে গিয়ে ঘরে বসালে। দুখানা ছোট্ট ঘর, একটা রান্নাঘর, একটা বারান্দা—এই হল দু-নম্বর কোয়ার্টার্স। বৈশাখ মাসের দারুণ উত্তাপে সে ঘরের অবস্থা যে কি, তা না অনুভব করলে বুঝিয়ে বলা কঠিন। জেলখানা এর চেয়ে ভাল। নড়বার-চড়বার জায়গা নেই। আলো বাতাস আসে না, হাঁপ ধরে যায়। একখানা ঘর একটু সাজিয়ে রেখেছে, একখানা ফর্সা চাদরও পেতে রেখেছে বিছানায়। একটা সস্তা টাইমপিস ঘড়ি কিনে ছোট একটা টেবিলে রেখে দিয়েছে। ওর বাপ হীরু জেলেকে আমরা বাল্যকালে দেখেছি বাঁশের দোয়াড়ি তৈরী করে মাছ ধরত, হাটে মাছের ঝুড়ি নিয়ে গিয়ে মাছ বিক্রি করত। কানাইয়ের মা টিনের ক্যানেস্তায় ধান সেদ্ধ করত বাড়ীর উঠোনের আমতলায়। বড় গরিব ছিল ওরা।

কানাইয়ের বৌ এসে আমাকে প্রণাম করলে। বললে—বসুন, একটু চা করে দেব?

আশ্চর্য, এরা চা খেতে আরম্ভ করেছে এখানে এসে! কানাইয়ের মা আহ্লাদের সুরে বললে—কানাই একটা ঘড়ি কিনেছে দেখেছ দাদাঠাকুর।

সেই সস্তা টাইমপিস ঘড়িটা।

আমি সেটা হাতে নিয়ে ভাল করে নাড়িচাড়ি, দেখি। খুব প্রশংসা করি ঘড়ির।

বললাম—বাঃ, বেশ টেবিল-চেয়ার দেখছি যে!

—কানাই সব করেছে দাদাঠাকুর।

দিব্যি সাজানো ঘর। ওখানা কি টাঙানো?

—বৌমার হাতে তৈরি। ঝিনুক দিয়ে তৈরি ফুল।

—বাঃ, বেশ করেছে বৌমা।

—হবে না? বেশ ভাল ঘরের মেয়ে যে! গান গাইতে জানে। দিব্যি গান, হ্যাঁ।

—গান?

—হ্যাঁ, বাজনার বাক্স বাজিয়ে—

—হারমোনিয়াম? এটা সত্যি আশ্চর্য্য কথা হল।

—শোনবা গান দাদাঠাকুর? ও বৌমা, চা করে গান শুনিয়ে দাও দাদাঠাকুরকে। আজ আমার কত আনন্দের দিন। দাদাঠাকুর পায়ের মাটি ঝেড়েছেন আমার ঘরে।

—না, বড্ড খুশী হলাম কানাইয়ের মা। কানাই যে এত উন্নতি করবে সব রকমে, তা আমি জানতাম না।

কানাইয়ের মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে—আশীর্ব্বাদ কর দাদাঠাকুর, কানাই আমার বেঁচে থাকুক, সংসারে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে আঁচায় যেন। জান তো, যখন তিনি মারা গেল, কি কষ্ট করে মানুষ করেছি। কানাই তখন এক বছরের, বাচ্চা। কত কষ্ট করিছি ওর জন্যি। লোকের ধান সেদ্ধ করে, চিঁড়ে কুটে, বাসন মেজে তবে ওকে মানুষ করিছি। সেই কানাই আজ বিয়ে করে মোরে বাসায় এনেছে, ঘড়ি কিনেছে, কেদারা কিনেছে, চা খাচ্ছে—

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম—ঠিক ঠিক। তার আর কথা কি বল।

এই সময় কানাই আমার জন্যে খাবার কিনে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। কানাইয়ের বৌ একটা রেকাবিতে গরম কুমড়োর ফুলুরি, রসগোল্লা ও নিমকি আমায় খেতে দিলে। বললে—খেয়ে দেখুন, কুমড়োর ফুলুরি এখন ভাজলাম। চা নিয়ে এসে কানাইয়ের মা বললে—এই পেয়ালাগুলো কানাই এবার কিনেছে। ভাল দাদাঠাকুর ?

খুব ভাল। চমৎকার।

কানাই সলজ্জ স্বরে মাকে বললে—তুমি যাও ওদিকে, পান নিয়ে এস কাকাবাবুর জন্যে।

সে বেচারী জানে না, তার মা আগে কি বলেছে, বা এখন আরও কি বলবে।

কানাইয়ের মা কিন্তু নাছোড়বান্দা।

ওর বৌমাকে নিয়ে এসে হাজির করলে গান শোনাতে। হারমোনিয়ম নিয়ে এল।

বললাম—এ হারমোনিয়ম কি কানাই কিনেছে নাকি ?

কানাইয়ের মা বললে—না দাদাঠাকুর। বৌমা গান করে বলে পাশের বাসা থেকে আনা।

গান গাইলে কানাইয়ের বৌ। মন্দ নয়, বেশ গান।

আসবার সময় কানাইয়েব মা বললে—কেমন গান গায় আমার বৌমা ?

—ভারি চমৎকার। অতি সুন্দর গান।

কানাই বললে—তুমি যাও দিকি মা—ও দিকে যাও। কাকাবাবুর দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

কানাইয়ের মা আমার সঙ্গে গলির মোড় পর্য্যন্ত এল।

সে বড্ড খুশী যে, আমি তাদের বাসায় এসেছি বা এখানে চা-খাবার খেয়েছি।

আমাদের গ্রামে বসে কখনও এ ব্যাপার সম্ভব হত না।

আরও খুশী এই যে, কানাই আজ এত বড় হয়েছে, এত উন্নতি করেছে।

বার বার আমায় বলতে লাগল—যদি গাঁয়ে যান দাদাঠাকুর, মোদের কথা বলবেন সবাইকে। আমি কতকাল গাঁয়ে যাই নি। সেই আর বছর আষাঢ় মাসে বাসায় এইছি এক বছর হতি চলল—বড্ড মনে পড়ে গাঁয়ের কথা—মোদের উঠোনের গাছটার অতগুলো পেয়ারা, এবারে কে খাবে কি জানি !

এর পরে মিঃ বাসুর ডিনার পার্টিতে খুব জাঁকজমকের ভোজ ও আদর-আপ্যায়নের ব্যাপার। চপ, কাটলেট, পায়েস, ক্ষীর, আম, সন্দেশের ছড়াছড়ি। সত্যি চমৎকার খাওয়া। অফিসারদের অঞ্চলের বড় বাংলো। টেনিসের সবুজ লন। ভারবিনা ও জিনিয়ার সারি। অ্যারিস্টলোকিয়া লতার ঝুমকো ফুল গেটে দুলছে। মিঃ বাসুর মেয়ে কল্যাণী, নীলিমা এসরাজ বাজিয়ে আমাদের শোনালে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে, ছোট মেয়ে রেণু একটা ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করলে! তার পর দুই বোনে মিলে রামধুন গাইলে অতি সুন্দর। দুই বোনই শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশোনা করে। দেখতেও সুন্দরী।

খেতে বসে কতবার মনে হল কানাইয়ের মার বাসার সেই সস্তা টাইমপিস ঘড়িটাতে কটা বাজল দেখে আসি।

বন্দী

অনেকদিন পরে দেশে ফিরেছি মাত্র দিন পাঁচ-ছয়ের জন্যে। বাড়ীতে চাবি দেওয়া আছে আজ বছর খানেক। স্ত্রীপুত্র ঘাটশিলার বাড়ীতে গিয়েছে অনেকদিন। বর্ষাকালে আর নিয়ে আসব না।

বাজারে একটি লাইব্রেরী করেছে ছেলেরা। বিকেলে সেখানে তারা আমায় নিয়ে গেল। সেখানে বসে ওদের সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময় বাইরে থেকে কে বললে, আপনাকে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন। বাইরে এসে দেখি একটি যুবক বেঞ্চির উপর বসে আছে, আমায় দেখে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে উঠল। বললাম, বসুন বসুন, নমস্কার। কোথা থেকে আসছেন?

যুবকের বেশের দিকে চেয়ে আমার একটু অদ্ভুত লাগল। লম্বা প্যাণ্ট ও হাফ-শার্ট পরা, গলায় দুটো টাই একসঙ্গে বাঁধা। পায়ে দামী চামড়ার জুতো, তবে বর্ষার জলে-কাদায় বিবর্ণ। চোখে চশমা, কব্জিতে হাত-ঘড়ি। আমায় 'যুক্ত করে' নমস্কার করে বললে, চিনতে পারছেন না?

—না।

—কেন, সেই বাগেরহাটে?

বাগেরহাটে দু বছর আগে একটা সভায় গিয়েছিলাম বটে, কত লোকের সঙ্গেই সেখানে আলাপ হয়েছিল, তার মধ্যে কোন একজনকে মনে করে রাখার মত আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি আমার নেই। তবুও মিথ্যে কথা বলতে হল বাধ্য হয়ে। এত আশার দৃষ্টি যুবকের চোখে, কেমন মায়া হল। বললাম, ও! এবার মনে পড়েছে বটে। না চিনতে পারার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে গিয়ে বললাম,—আপনার চেহারা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছে।

এখন কেউ নেই যে ভাবে না তার স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে ভাল যাচ্ছে না। যুবকটি তখনই বললে,

মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হচ্ছে এদেশে এসে।

—ও।

—বড় মনের কষ্টে আছি।

—ও।

—আপনার কাছে এলাম—

বলে একটু অপ্রতিভের হাসি হাসল। আমি চুপ করে বসে রইলুম, কোন্ দিকে ওর কথা-বার্ত্তার গতি বুঝতে না পেরে।

ও আবার বললে, আপনি যদি একটু—মানে—

আর একবার লাজুক হাসি হেসে ও চুপ করল।

আমি কিছু বুঝতে পারলাম না কোন্ সাহায্যের ইঙ্গিত করছে বক্তা। আর্থিক সাহায্য নিশ্চয়ই নয়, বেশভূষা দেখেই সেটা বেশ বোঝা যায়। অন্য কি ধরনের সাহায্য পেতে পারে? খুলেও তো কিছু বলে না।

বললাম, আপনি এখানে আছেন কোথায়?

—চালতেপোতা গ্রামে। বড় কষ্টে আছি। আই অ্যাম অলমোস্ট এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম!

—কেন, কেন?

—পয়সা হাতে নেই, বুঝলেন না! একটুখানি রাণাঘাটে যদি যেতে হয় তাও পরের হাত-তোলা পয়সার ওপর ডিপেণ্ড করতে হয়! আই ফীল লাইক এ হাফ-ড্রাউনড্ ম্যান। কলকাতা তো বহুদূর—কে অত পয়সা ভাড়া দেবে!

—ও।

আর কি বলি 'ও' ছাড়া? ব্যাপারটার চারিপাশে এখনও বেশ ঘনীভূত কুয়াশা। কেনই বা নিজের বাড়ীতে নিজে বন্দী। কেনই বা কোন চেষ্টা করে না অর্থ উপার্জ্জনের, বাধা দিচ্ছেই বা কে। ব্যক্তিগত সংবাদ বেশি জিজ্ঞাসা করার দরকারই বা কি আমার।

তার পর ও আপনিই বললে,—বড্ড কষ্ট হচ্ছে এখানে। কখনও পাড়াগাঁয়ে থাকি নি। একটা মানুষ নেই যার সঙ্গে মিশি। আজ আপনি এসেছেন শুনে চালতেপোতা থেকে হেঁটে এলাম।

—হেঁটে এলেন? সে যে খাঁটি ছ মাইল রাস্তা।

—বেশি হবে! প্রায় সাত মাইল। তবে একটা সোজা রাস্তা আছে মেহেরপুর রেল ফটকের পাশ দিয়ে মাঠের মাঝখান বেয়ে। এখন বর্ষায় সে পথে বেজায় কাদা।

—আপনার বড্ড কষ্ট হয়েছে—

—এ আর কিসের কষ্ট। আসল কষ্ট পাচ্ছি গাঁয়ে বসে। একটা কালচার্ড লোক নেই। না বোঝে সাহিত্য না বোঝে কোন কিছু। জানেন, পিকাসো বলে যে একজন শিল্পী আছে, তাই তারা কোনদিন শোনে নি।

—সেটা অপরাধ নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজেই বা ক'জন জানে পিকাসোর নাম?

—যাই বলুন, আমার শিক্ষা একটু অন্য রকম। আমি ভালবাসি কালচার, ভালবাসি আর্ট। যখন ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়াতাম, সে সময় একবার লাইব্রেরিয়ানের কাছে সেগান্ সম্বন্ধে বই চাইতেই তিনি—

—আপনি এম-এ পাশ?

যুবক পুনরায় অপ্রতিভের হাসি হেসে চুপ করলে একটুখানির জন্যে। বললে, পাশ করি নি। এক বছর পড়েছিলাম—ওঃ—নাইনটিন থার্টিনাইন টু নাইনটিন ফর্টিটু এই তিন-চার বছর—আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কটি বছর কেটেছে! বলে, সে খানিকক্ষণ স্বপ্নাতুর আকুল দৃষ্টিতে জানলার বাইরে গিরীন ঘোষের ধানের আড়তের দিকে চেয়ে রইল।

তার পরে বললে,—জানেন, আমি ইংরেজি প্রবন্ধ লিখে স্টেট্‌সম্যানে পাঠিয়েছিলাম। ফেরত পাঠিয়েছে। নেয় না। ইংরেজি কবিতাও লিখে থাকি। শুনবেন?

—বেশ, বেশ। বলুন না!

—আচ্ছা, একটু পরে বলব। এখন এদের সামনে কি বলি বলুন। একখানা উপন্যাস লিখেছি—দু ভল্যুমে শেষ হচ্ছে। প্রায় ন শ পাতা। আপনাকে একদিন শোনাতে চাই।

—বেশ। একদিন নিয়ে আসুন না, তবে এই হপ্তার মধ্যে। নয়তো আবার চলে যাব।

—কালই নিয়ে আসব। আর ছোট গল্পও লিখেছি চার পাঁচটা। সেগুলো যদি কোন কাগজে বের করে দেন—

—আপনি পাঠিয়ে দিন কোন ভাল মাসিক পত্রিকার ঠিকানায়। তাদের ভাল লাগে, ছাপবে।

—ওরা নেয় না। ভাল গল্প পাঠিয়ে দেখেছি, পড়েও দেখে না। ফেরত দেয়। সেই-জন্যেই তো আপনার কাছে আসা—যদি একটু সাহায্য করেন। আসল কথা কি জানেন, আই অ্যাম এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম। দুটো টাকা চাই, রাণাঘাটে যাব তা বাড়ীতে চাইলে কেউ দেবে না।

আবার সেই কথা। এবার জিগ্যেস না করে পারলাম না। বললাম, বাড়ীতে কে আছেন।

—সবাই আছেন। বাবা, মা—

—মা বেঁচে?

—আপন মা নয়। তাহলে আর ভাবনা ছিল কি। বিমাতা। বাবা বুড়োবয়সে বিমাতার বশ। আমি কেউ নই বলেই মনে হচ্ছে। বাড়ী থাকি, দুটো খেতে পাই—এই পর্য্যন্ত। একটা পয়সা হাতখরচ দেবে না। আই লাইক টু বাই বুকস্, আই নীড এ নিউজ-পেপার—এসব কোথা থেকে হয় বলুন।

—তাই তো।

কি আর বলি। লোকটি আমাকে বড়ই বিপদে ফেললে দেখছি। সাংসারিক ব্যাপারের

এসব কথা আমাকে শোনানোর দরকার কি। বলেই ফেললাম কথাটা শেষে।

—আপনার তো চাকরি করা উচিত ছিল?

—ওই যে বললাম, আই অ্যাম এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম—

এ কথাটা বার বার বলে কেন? কে তোকে বেঁধে রেখেছে দড়ি দিয়ে বাপু। আর তাহলে তুমি এখানেই বা আস কি করে? যাক, ওসব কথায় আমার কোনই দরকার নেই।

চুপ করেই রইলাম।

হঠাৎ সে বললে, হ্যাঁ, আমার ইংরিজি কবিতাটি শুনুন—

—বেশ, বেশ, আনন্দের সঙ্গে শুনব—

—একটু বাইরের দিকে নির্জ্জনে চলুন, এখানে আবার মেলা লোক রয়েছে। না থাকলেও জমে যাবে কবিতার আবৃত্তি শুনলে।

লাইব্রেরির বাঁ দিকে মাঠের মধ্যেকার একটা কৎবেল গাছ, তার পাশে বৈঁচি ঝোপ, তার পাশে একটা ডোবা।—এই নির্জ্জন জায়গাটাতে বৈঁচি ঝোপের আড়ালে সে আমায় নিয়ে গিয়ে হাত-পা নেড়ে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলে—'ও মাই বিলভেড ইংল্যাণ্ড!' এই হল তার কবিতার প্রথম লাইন। বেশ চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে। ইংরিজি কবিতাটিও মন্দ লেখে নি—তবে কি আর শেলি, শেকস্‌পিয়ার, কীট্‌স্ কিংবা ব্রাউনিঙের মত হবে ওর কবিতা? না তরু দত্ত বা রবীন্দ্রনাথের মত হবে? একজন বাঙালী যুবকের সাধারণ বুদ্ধিবিত্তার পক্ষে মন্দ শুধু নয়—ভাল।

আমার সত্যি আশ্চর্য্য লাগল। এর মধ্যে দেখছি জিনিস আছে।

লাইব্রেরিতে স্কুলের ইংরিজি পড়ানোর মাস্টার ব্রজেনবাবু বসে ছিলেন, তাঁকে ডেকে ওর আবৃত্তি শোনালাম। তিনি বললেন, বাঃ, বাঃ, সত্যি খুব ভাল। আপনি কি করেন?

আমি বললাম, কিছুই করেন না। দিন না আপনাদের ইস্কুলে একটা চাকরি।

যুবকটিও হাত কচলে বিনীত ভাবে বললে, দিন না, তা হলে তো খুব ভাল হয়।

ব্রজেনবাবু অপ্রতিভ ভাবে বললেন, আমি আপনার মত লোকের চাকরির কি ব্যবস্থা করব বলুন—হেড মাস্টারকে বরং বলুন। বেশ ইংরিজি জানেন আপনি।

যুবক উৎফুল্ল মুখে বললে, কলেজে আমাদের ক্লাসে আমার নাম ছিল 'দি পোয়েট'। শ্যামসুন্দর রায়কে চেনেন তো? চেনেন না? ও আমার ক্লাস-মেট। 'ফিলজফিতে অনার্স ছিল ওর। কলেজ লাইব্রেরিতে বসে দুজনে একসঙ্গে পড়াশুনা করতাম। বিলেত যাওয়ার কত শখ ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে বসে দুজনে এই রকম বই পড়ব কল্পনা করতাম। বললাম যে আপনাকে, কলেজের দিনগুলো, নাইনটিন থার্টিনাইন টু নাইনটিন ফর্টিটু—এই গিয়েছে বেস্ট ইয়ার্স অব মাই লাইফ—আর সেসব দিন ফিরবে না—

আমি কৌতুহল অনুভব করছিলাম ওর কথায়। হাত-পা নেড়ে বেশ কথা বলে। বলবার ক্ষমতা আছে। এসব অজ পাড়াগাঁয়ে বসে ওই সব অতীত দিনের গল্পের সময় যে ছবিটা ওর মনে জাগে, ও সুখ পায় তাতে। সুতরাং বলতে ভালবাসে সেসব গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির

কথা। ওর জীবন ওর কাছে বড়। আমি তার কি বুঝি।

আরও বুঝলাম বেচারী শ্রোতা পায় না। এসব কথা শোনবার লোক এ অজ পাড়াগাঁয়ে নেই। তাই বোধ হয় আমার খোঁজ করে আমায় বার করেছে। শুনিয়ে ওর সুখ হয়, আমার শুনতে আপত্তি কি।

বললাম, আপনার বন্ধু শ্যামসুন্দরবাবু এখন কোথায় ?

ওর মুখখানা কালো হয়ে গেল যেন। কি যেন একটা ব্যথা পেয়েছে। কি একটা কথা খানিকক্ষণ ভাবল। তার পর আস্তে আস্তে বললে, সে লণ্ডনে থাকে।

—লণ্ডনে ? কিছু পড়তে গিয়েছেন ?

—ইণ্ডিয়া অফিসে চাকরি করে আর সেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করে। যা আমরা বসে বসে কল্পনা করতাম, তাই। আমার হল না, ওর হল। আর আমি এই পাড়াগাঁয়ে বসে বসে—

সান্ত্বনার সুরে বললাম, কি আর করবেন বলুন। এমন কত হয়।

—হয়, জানি। কিন্তু—

আবার সেই স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে বৈঁচি ঝোপ আর ডোবার ওধারে দীর্ঘ টানা দূরবিস্তৃত আউশ ধানের মাঠে কচি কচি সবুজ ধানের জাওলার দিকে চেয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, জানেন ? ডেভনশায়ার ইজ দি ফেয়ারেস্ট কান্ট্রি ইন ইংল্যাণ্ড! লর্না ডুনের লেখক বলে গিয়েছেন। ওঃ ন্যারো লেন্‌স্ অব ডেভন! কত জিনিস ঘটে গিয়েছে ডেভন-শায়ারে। ডেন্‌স্‌রা এসে ওর গ্রামগুলো পুড়িয়েছিল, স্প্যানিয়ার্ডরা ওর কোস্ট আক্রমণ করেছে। ইংল্যাণ্ডের সিভিল ওআরে ওখানকার লোক লড়েছে। সমস্ত ডেভনশায়ার এক সময়ে বনভূমি ছিল। হরিণ চরে বেড়াত। র‍্যালে, ড্রেক, হকিন্‌স্—সব ডেভনের লোক। বিরাট মুরল্যাণ্ড, বাল্যকাল থেকে কত সাধ ছিল, সন্ধ্যেবেলা মুরল্যাণ্ডে বেড়িয়ে বেড়াব, ক্রমলেক দেখব। লর্না ডুন পড়ে পাগল হয়েছিলুম কলেজে, ডুন কাউন্টি দেখব, ব্ল্যাকমুরের অমর কাহিনী।—লিণ্টন! লিন্‌মাউথ! ইনফ্রাকুম্‌ব্! এসব কতদিনের স্বপ্ন! হল না। কোথায় ডেভনশায়ার লেনের সৌন্দর্য্য, কোথায় ডার্টমুর—আর কোথায় পড়ে আছি চালতে-পোতা গাঁয়ে বাঁশবাগানে মশার কামড় খেয়ে। কি অদ্ভুত আয়রনি অব ফেট, তাই ভাবি! শ্যামসুন্দর দিব্যি দেখছে। আমি শুয়ে ভাবি ও লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্ছে, উইণ্ডার-মিয়ার দেখছে, ওআর্ডসওয়ার্থের লেক অঞ্চল দেখছে—আর আমি কি করছি ? ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে যায়—রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। কি হতে চলেছিলাম আর কি হলাম! জানেন, ইংল্যাণ্ডকে এত ভালবাসি! কেন জানি নে, মনে মনে এত ভালবাসি! কত সাধ ওখানে যাব—আমারই হল না।

কি বিপদ! ডোবার ধারে বৈঁচি ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে এ উইণ্ডারমিয়ার হ্রদের ছবি দেখতে লাগল! লোক জমে যাবে এখুনি ওর উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে। অবিশ্যি এখন কেউ নেই এখানে। ব্রজেনবাবু আবৃত্তি শোনবার পরে চলে গিয়েছেন। আমি আবার

সান্ত্বনার স্বরে বললাম—আপনার বয়স বেশি না, কত বেশি বয়সের লোক বিলেতে যাচ্ছে না কি? আমার এক বন্ধু এতকাল পরে এবার এক মালজাহাজে ডানবার বন্দরে গেল। সে ইস্কুলে মাস্টারি চাকরি পেয়েছে ভিক্টোরিয়া নায়ান্‌জা হ্রদের ধারে একটা ছোট শহরে। অনেক ভারতীয় আছে, তাদের ইস্কুল আছে, সেই ইস্কুলে। দেখুন তো, মনের কত তেজ ও উৎসাহ! ভারত স্বাধীন হয়েছে, এখন ভারতের তরুণদের সামনে কত বিস্তৃততর ক্ষেত্র, কত কাজ কত দিকে, কত দেশে কত ডাক পড়বে! আর্মিতে যান, নেভিতে যান, ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে ঢোকবার চেষ্টা করুন, ব্যবসা করুন, খবরের কাগজে লিখুন, বই লিখুন, বক্তৃতা করুন—আপনি এ বয়সে বসে থাকবেন কি! কিসের বলছেন বন্দী, বন্দী। কিসের বন্দী আপনি?

যুবক বসে বসে আমার কথা শুনলে। কোন উত্তর দিলে না। বিশেষ কোন উৎসাহ পেয়েছে আমার কথা থেকে বলেও মনে হল না।

একটু পরে সে বললে, আমার অবস্থা জানেন না। কি কষ্টে যে আছি, তা আমি জানি। আই অ্যাম রিয়্যালি এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম। মানে, বাবা এ বয়সে আমার বিমাতার বাধ্য। তিনি সংসারের তবিল রাখেন বিমাতার কাছে। আমার একটা পয়সা নিতে হলেও বিমাতার কাছে চাইতে হবে। তিনি মুখ ভার করেন পয়সা চাইলেই, পারতপক্ষে দিতে চান না। বাবা চাকরির চেষ্টা করতে বলছেন, তাও তো কলকাতা যাবার গাড়ীভাড়া চাই। এই কাছে রাণাঘাটে যাওয়ার পয়সা পাওয়া যায় না, তা কলকাতার ভাড়া দিচ্ছে কে বলুন। এই পায়ে হেঁটে রোজ বিকেলে যতটা বেড়াই। কাজেই প্রিজনার ছাড়া আর কি বলুন।

—তাই তো দেখছি। তবে আপনি এ ভাবে বাড়ী বসে থাকলেও তো এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে না। আপনাকে বাড়ী থেকে বেরুতে হবে, তা যতই দুঃসাধ্য হোক। আপনি কি বিয়ে করেছেন?

যুবক ঈষৎ কুণ্ঠা ও লজ্জার সঙ্গে বললে, তা করেছি।

—ও।

সমস্যা গুরুতর সন্দেহ নেই। যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও জটিল। স্ত্রী এবং সম্ভবত দু-একটি পুত্রকন্যা নিয়ে ইনি পিতার সংসারের বেকার অতিথি, এই বর্ত্তমান দুর্মূল্যতার বাজারে।

যুবক যেন খানিকটা আপন মনেই বলতে লাগল, কত আশা ছিল। এখনও সে আশা আমি ছাড়ি নি। বিলেত আমি যাবই। এই মূর্খ আন্‌লেটার্ড পাড়াগাঁয়ে আমি বেশি দিন পড়ে থাকব না। একখানা ভাল বই কি কাগজ পাই নে পড়তে। অথচ এত পড়তে ভালবাসি। শেলির একটা ভাল এডিশন কিনব, বাবার কাছে টাকা চাইলে পাব না জানি, কেন না টাকা তাঁর কন্‌ট্রোলের মধ্যে নয়। আর একটা কথা আপনাকে বলি—

—হ্যাঁ বলুন।

—আমি একখানা ভাল উপন্যাস লিখেছি—দু ভল্যুম—বড় উপন্যাস। আপনাকে একদিন শোনাব।

—বেশ বেশ। যেদিন ইচ্ছে শোনাবেন।

—আপনার কবে সময় হবে?

—বিকেলে যে-কোনদিন আসতে পারেন।

—আপনি দেখে দেবেন উপন্যাসখানা, তার পর একজন পাবলিশার ঠিক করে দেবেন আমাকে। দেখি, আপনার দয়ায় যদি এবার মুক্তি পাই বন্ধন থেকে। আমি তাহলে বাঁচি—আমি বাঁচি—উঃ আমি মরে যাচ্ছি—আপনি জানেন না—ও, হোয়াট এগনি অ্যাণ্ড টর্চার আই অ্যাম পাসিং থ্রু।

বেলা গিয়েছিল।

বৈঁচিঝোপে রাঙা রোদ এসে পড়েছে।

লাইব্রেরী থেকে লোক চলে যাচ্ছে, পাড়াগাঁয়ের লাইব্রেরী কেরোসিন তেলের খরচ যোগাতে পারে না।

বাদুড় উড়ে যাচ্ছে বাঁওড়ের ওপার দিয়ে।

এই সন্ধ্যার আকাশের তলায় এই যুবকের মনের বেদনা আমাকে স্পর্শ করল।

কিসের বাঁধনে এই লেখাপড়া-জানা লোকটি পড়েছে তার খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম।

একটি স্নেহময় পিতার বড় আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র—একদিন যার জন্মলগ্নে শুভশঙ্খ বেজেছিল একটি আনন্দমুখর গৃহস্থ-বাটিতে, আজ সেই পুত্র বড় হয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে—বিবাহ করেছে—তবুও সেই পিতা আজ অসুখী কেন? সেই পুত্রই বা কেন সেই গৃহে নিজেকে বন্দী বলে মনে করছে আজ? প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের লাক্ষাবন্ধন-ন্যায় কাকে বলে আজ ভাল ভাবে বুঝলাম।

যুবক বললে, তবে আজ আসি—সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে। আমার কি, আমি রাত হলেও অন্ধকারে যেতে পারি—যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততটুকুই ভাল থাকি।

—না না, দেরি না করাই ভাল। চালতেপোতা গ্রামের রাস্তা বড় খারাপ।

—তাহলে উপন্যাসখানা কাল নিয়ে আসব? দেখবেন একটু? ভাল উপন্যাস। চুনি নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম। একটা ডুমুর গাছের তলায় বসে মনে কেমন ভাব এসে গেল। কি চমৎকার যে লাগল! যেন কোথায় এসেছি। কি সুন্দর পৃথিবী। অমনি এই উপন্যাসের প্লটটা মনে এসে—

—বুঝেছি। আসবেন কাল। নমস্কার।

যুবক প্রতিনমস্কার করে ছন্নছাড়া হতভাগ্যের মত শূন্যদৃষ্টি নিয়ে একবার চারদিকে চাইলে। কি দেখলে চেয়ে জানি নে, সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। তার পর হন হন করে মাঠ পার হয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠে হেঁটে চালতেপোতার দিকে চলল। বড় মমতা হল ওর ওপর। ওর মনে রস আছে, অনুভূতির যাওয়া-আসা আছে, তা সত্ত্বেও ওর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ওর বাপের চোখের সামনে। ওর তরুণী স্ত্রী রয়েছে বাড়ীতে, তবুও ঘরে ফিরতে ওর মনে আনন্দ নেই।

এত কষ্ট করে দু ভল্যুম উপন্যাস লিখে কোন্ সার্থকতা আসবে ওর জীবনে? আমি জানি কোন প্রকাশকই হঠাৎ তো ওর মত অজানা লেখকের উপন্যাস ছাপতে চাইবে না, ভাল হলেও না। ওর লেখক হওয়ার আশা আকাশ-কুসুম, যেমন আকাশ-কুসুম ওর বিলেতে যাওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

লাইব্রেরিতে ফিরে গেলাম।

সেখানে দু-একজন তখনও বসে ছিল। একজন বললে, পাগলটা চলে গেল? আচ্ছা ভ্যাজোর ভ্যাজোর আরম্ভ করে দিয়েছিল আপনাকে নিয়ে সন্ধ্যের সময়।

—কে পাগল?

—আরে ওর মাথায় গোলমাল। জানেন না? সেই জন্যেই ওর বাবা ওকে কোথাও বেরোতে দেন না। কেবল বলে, বিলেতে যাব, এখানে যাব ওখানে যাব। সৎমা বড় কড়া, ওকে ঠিক শাসনে রেখেছে। ওর নামই হল পাগলা যতীশ, ভীষণ ছিট-গ্রস্ত—ওর বাবা সেদিন বড় দুঃখ করছিলেন ইষ্টিশান মাস্টারের কাছে। বলছিলেন, এত আশা করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন বিয়েও দিয়েছিলেন ছেলেও বি এ পাশ, অথচ সব কিছুই গোলমাল হয়ে গেল।

সত্যি তো। ছেলে হল, সে ছেলে শিক্ষিত হল, বিয়েও করলে। সে ছেলে ভাবুক, কবি, মার্জ্জিতরুচি, অনেক কিছু জানে, অনেক কিছুর খবর রাখে।

তবে কিসের অভাবে সে সংসারের বোঝা হয়ে দাঁড়াল আজ? এর উত্তর কে দেবে? কেন এমন হয় কি জানি!

থনটন কাকা

রজনীবাবুদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে সেদিন ছোটখাটো একটা সাহিত্যিক বৈঠক ছিল। তর্ক, আলোচনা ও প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে সন্ধ্যা বেশ ভালই কাটল। রজনীবাবু বর্ত্তমান সাত-আটটা বড় কয়লাখনি, বর্দ্ধমান জেলার জমিদারি ও সিংভূম জেলার শালবন ও মৌজার মালিক; এসব বাদে কলকাতায় বাড়ী জমি তো আছেই নানাস্থানে।

রজনীবাবু বললেন—বসুন, বসুন। বেশি রাত হয় নি এখনও। পৌঁছে দেব এখন গাড়ীতে। একটা গল্প বলি।—আমার তখন বয়েস ন বছর। আমাদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার বনপাশ স্টেশন থেকে দু ক্রোশ দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রামে। গ্রামের বাইরে অবধি মাঠ, শুধুই ধান হয় সে মাঠে, মাঠের মাঝখানে বড় বড় তালগাছে ঘেরা সেকেলে দীঘি, তার নাম 'গলাকাটা পুকুর'। বহু আগে যখন ওসব দেশের ওইসব তেপান্তর মাঠে নির্ব্বান্ধব পথিকদের গলা কেটে ডাকাতেরা লাশ বেমালুম দীঘির জলে পুঁতে রাখত, তখন থেকে ওই নামে চলে আসছে দীঘিটা।

এবার রোদপোড়া মাঠে চৈত্র দুপুরে আমি আর গ্রামের দুটি ছেলে মাছ ধরছি, হঠাৎ একটি ছেলে—তার নাম হরু, রামচন্দ্র সাবুই এর ছেলে, আজও মনে আছে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ও কে—ওই ছাখ—

—কে রে? কই, কোথায়?

—ওই তো বসে।

তার পর সবাই মিলে কাছে গিয়ে দেখলাম তালগাছের তলায় এক সাহেব বসে; তার পরনে অতি জীর্ণ ও মলিন তালি দেওয়া প্যাণ্টালুন, তেমনি কোট, তেমনি জুতো।

আমরা কাছে যেতে সাহেব কি-একটা বললে, আমরা বুঝতে পারলাম না। যে সময়ের কথা বলছি, তখন একজন সাহেবকে এ অবস্থায় অজ পল্লীগ্রামে দেখা খুব একটা আশ্চর্য্য বিষয় ছিল। আমরা সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছি, এমন সময় সাহেবটা আবার কি যেন বললে।

হরু বললে, ও খেতে চাইছে ভাই।

আমারও তাই মনে হল।

আমি হাত দিয়ে দেখিয়ে বললাম—আমার সঙ্গে এস।

সেই সাহেবকে নিয়ে আমাদের বাড়ী এলাম।

বাবা অবাক হয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি মাইনর স্কুলের সেকেন মাস্টার। আমাদের বাড়ীতে দু তিনটে ধানের গোলা ছিল, চল্লিশ বিঘে ধানের জমি ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, জিনিসপত্রও তখন সস্তা ছিল। সংসার ভালই চলত, মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব ছিল না।

বাবা সাহেবকে বাইরের ঘরে একটা টুলের ওপর বসালেন। চেয়ার ছিল না আমাদের বাড়ী। ইংরেজিতে কি কথা তার সঙ্গে বললেন। তার পর আমাকে বললেন, বাড়ীর মধ্যে যা, তোর দিদিকে গিয়ে বল গে এক বাটি মুড়ি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে। সাহেব খাবে।

আমি কিছু আশ্চর্য্য হয়েই দিদিকে গিয়ে কথাটা বললাম। আমার মা এ সময় খুব পীড়িত, আমার ছোট ভাই বিনয় তখন সবে মাস-খানেক হল জন্মেছে, মার শরীর সেই থেকেই খারাপ। দিদি কাঁসার বড় জামবাটিতে মুড়ি দুধ আর তালের গুড় একসঙ্গে মেখে আমার হাতে দিয়ে বললে, কেমন সাহেব রে?

—ভাল সাহেব।

—চল আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে আসি।

আমার দিদির নাম ছিল বীণা, আমার সে দিদি মারা গিয়েছে বহুদিন।

বাবার মুখে সব শুনলাম। সাহেব আসছে বরাকর থেকে, গরিব, ওর কেউ কোথাও নেই। বাবার কাছে আশ্রয় চেয়েছে; বাবা বলছেন, থাক। তবে আমাদের ঘরে যা জোটে তাই খেতে হবে।

সাহেব তাতেই রাজী হয়েছে।

সেই থেকে সাহেব আমাদের বাড়ীই রয়ে গেল। গাঁয়ের লোক দলে দলে আসতে লাগল সাহেবকে দেখতে।

আমরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতাম, ওই তো সাহেব বসে আছে—

বাইরের ঘরে সাহেব থাকত। কৃষাণের জন্যে একটা ছোট তক্তপোশ পাতা ছিল সেখানে অনেক দিন; সেইখানে পুরনো তোশক ও থলের চট, একখানা পুরনো চাদর ও একটা বালিশ, একটা ছোট মশারি দিয়ে সাহেবকে শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন বাবা। একখানা লোহার কলাই-করা সান্‌কি আর একটা কলাই-করা গেলাস, এই আমরা দিয়েছিলুম ওকে, তাতে সে ভাত খেত।

সাহেবের নাম ছিল থর্নটন। আমার মুখে ভাল উচ্চারণ হত না, আমি বলতাম থনটন কাকা। কেউ বলত ঠনঠন সাহেব।

আমাদের যা রান্না হত, থনটন কাকাকে তাই দেওয়া হত। দিদি এসে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, থনটন কাকা খেতে জানে না, মাছের ঝোল আর তালের গুড় একসঙ্গে মেখেছে!

ওর কথা শুনে আমি গেলাম দেখতে। সে এক কাণ্ডই করেছে সাহেব। ডাল খায় নি, অথচ মাছের ঝোলে তালের গুড় দিয়ে মেখে চুমুক দিচ্ছে।

বললে ও, ইট ইজ সো হট!

কথাটা আমি স্পষ্ট বুঝলাম; ফার্স্ট বুক পড়ি, মানে করলাম, ইহা হয় এত গরম!

কিন্তু গরম—তাই কি? তালের গুড় মাখলে কি গরম কমবে?

পরে বাবা বলেছিলেন ওর মানে, খুব ঝাল। মাছের ঝোল খুব ঝাল হয়েছিল। হয়ই আমাদের বাড়ীতে।

বাবা বলেছিলেন সাহেবের তরকারিতে ঝাল কম দিতে।

আমি আর দিদি ওকে খেতে শেখালাম—কিসের পর কি খেতে হয়, কোন্ জিনিসটা কি ভাবে মাখতে হয়। থনটন কাকা আমাদের, বিশেষত দিদিকে, বড় ভালবাসতে শুরু করলে। ক্রমে একটু আধটু বাংলাও শিখে ফেললে আমাদের কাছে।

দিদিকে বলত অদ্ভুত বাঁকা সুরে—বী-ণা, ডাল ডেও।' বাট ডেও নো—ডাল ডেও।

দিদি হাসতে হাসতে বলত—ভাত দেব না কাকা?

—নো। বাট ডেও নো। ডাল ডেও।

—বেগুন ভাজা দেব? এই যে—এই দেব?

—নো।

থনটন কাকা বুড়ো লোক, পরে আমরা আবিষ্কার করলাম। সাহেব লোকের বয়স প্রথমটা আমরা বুঝতে পারি নি।

আমাদের সে তাসের খেলা শেখাত বাদলার দিনে বসে বসে। আমাকে ইংরেজি পড়াত বটে, তবে তার বাঁকা বাঁকা জড়ানো উচ্চারণ আমি প্রথমটা বুঝতেই পারতাম না। একদিন বাবাকে বললাম—বাবা, সাহেবকাকা ইংরেজি জানেন না।

—সে কি!

—কি রকম বলে, হাসি পায়।

—ও যা বলে, ওই ঠিক উচ্চারণ। আমাদের মুখেই হয় না। ও ঠিক বলে। ও যা বলে তাই শিখবি।

থনটন কাকা আমাদের গাঁয়ে পুরনো হয়ে গেল। রামায়ণ-গানের আসরে, কবির আসরে সাহেব গিয়ে বসত সকলের সামনে। করুণ গান শুনে হয়তো খুব হাততালি দিলে হাসিমুখে—এই রকম বুঝত।

একখানা মোটা বই বের করে মাঝে মাঝে পড়ত। বাবা বলতেন, ও বইকে বলে বাইবেল। সাহেবদের ধর্ম্মপুস্তক।

সন্ধ্যের সময় ডাকত—বীণা—

দিদি এসে বলত—কি থনটন কাকা?

—খাটে ডাও।

—এখনও রান্না হয় নি। মুড়ি দেব?

—নিয়ে এস। টেল নো।

—না, তেল দেব না। গুড় দেব?

—গুড় ডাও।

এইভাবে দু বছর কাটল আমাদের বাড়িতে। তখন সে বেশ বাংলা শিখেছে, এমন কি নিজের নাম বাংলায় লিখত—জেমস থরনটন।

আমি বললাম—ও কাকা, ভুল হয়েছে। থরনটন কি? থর্নটন হবে। এই দেখ—একে বলে রেফ, এই বসাও। এবার হল থর্নটন।

—নো, নো রেফ অ্যাণ্ড অল ত্থাট। এই ডেখ—

—বেশ, দেখি—

সাহেব লিখল—থরনটন—

—আমার দিকে চেয়ে বললে, ঠিক?

—না ঠিক না। এই দেখ—

—ও, হ্যাং—হোক। আমি লিখব—টোমার রেফ আমি লিখব না।

—লিখো না। লোকে বলবে থরনটন—

—লেট দেম। বলটে ডাও।

—দিলাম।

সেবার জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে তাড়াতাড়ি সব আম পেকে গেল। আমি বললাম—থনটন কাকা, আম পেড়ে নিয়ে আসি চল পুকুরধারের বাগান থেকে।

—আমি সব পাকা আম খাব।

—খেও। লগা নিয়ে চল, আম পাড়তে হবে।

কিন্তু আম পাড়তে যাবার আগে পিওন এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে,

পড়তে পার ? এ বোধ হয় সাহেবের চিঠি।

থনটন কাকাকে চিঠিখানা দিলাম। চিঠিখানা পেয়ে হঠাৎ ওর মুখ কেমন হয়ে গেল। সেখানেই খুলে পড়ল। পড়ে কি সব বলতে লাগল ইংরিজিতে! আর নড়ে না, ওঠেও না। কখনও আপনমনে হাসে, কি বিড়বিড় করে বলে। রাতে বাবার কাছে শুনলাম থনটন কাকা অনেক টাকা পাবে বিলেতে। ওর এক খুড়ী না পিসি ছিল, সে মারা গিয়েছে, ও তার সম্পত্তি পেয়েছে। বিলেতের উকিলেরা চিঠি লিখেছে।

মাসখানেকের মধ্যে থনটন কাকা দেশে চলে গেল।

তার পর যে কথাটা বলবার জন্যে এ গল্পটার অবতারণা সেটা এখন বলি।

যাবার কিছুদিন আগে থনটন কাকা বাবাকে বললে—আমার তুমি অনেক উপকার করেছ, তোমার একটা উপকার আমি যাবার সময় করব। আমার সঙ্গে একজায়গায় চল, রেলে যেতে হবে।

বাবা গেলেন।

বরাকর নদীর কাছাকাছি কোন একটা পাহাড়ের তলাকার শালবন আর লাল কাঁকুরে মাটির ডাঙা দেখিয়ে সাহেব বলেছিল বাবাকে—সমস্ত বাংলাদেশের কয়লার ক্ষেতের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কয়লা আছে এই জমির তলায়। আমি মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। কেন আমি তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলাম, কেন এমন অবস্থায় পড়েছিলাম, সে কথা তোমাকে জানাব সময় মত। এখন আমার পরামর্শ, এই জমি বন্দোবস্ত নাও, কিংবা কেনো। কেউ জানে না এর তলায় কি অমূল্য সম্পদ লুকানো। আমার কথা অবিশ্বাস ক'রো না। একদিন ভেবেছিলাম নিজে আমি এই জমি কিনে নেব বা বন্দোবস্ত নেব। কিন্তু অবস্থার ফেরে তা আমার ঘটল না। তার জন্যে দুঃখিত নই। তুমি আমাকে নিজের ঘরে নিজের সহোদর ভাইয়ের মত স্থান দিয়েছিলে, তার খানিকটা প্রতিদান দিতে পেরে আমি খুশী হয়েছি। আমার কথা শোন, বড়লোক হয়ে যাবে। বীণার বিয়েতে যৌতুক দিলাম এই জমি। কাউকে এসব কথা বলবে না। ঘুণাক্ষরেও না। তা হলে সব যাবে।

বাবা বাড়ী এসে মার গহনা বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার চলে গেলেন বরাকরে।

সন্ধান নিয়ে জানলেন নিকটবর্তী পালনড়ি মৌজার ডিহি পাঁচপুর কাছারির জমিদার গঙ্গারাম মাহাতোর দু-আনি অংশের জমি ওটা। কলকাতার গৌরমোহন পাল দিগর বর্ত্তমান মালিক।

গেলেন কলকাতায় জমিদারের বাড়ী। গৌরমোহন পাল দিগরের নায়েবকে কুড়ি টাকা ঘুষ দিলেন। নায়েব নক্সা ও কাগজপত্র দেখে বললে—এ জমি বহুকাল থেকে পতিত। এ আপনি কি করবেন ?

নায়েবের সুরের মধ্যে যেন সন্দেহের রেশ রয়েছে।

বাবার বুক কেঁপে গেল। মনের অগোচর পাপ নেই। বাবা বললেন—চাষ-বাস করব।

ঘুঘু নায়েব হেসে বললে—সে কি মশাই? পাথুরে ডাঙায় কি চাষ হবে? চাষের জমি হলে এতকাল ও জমি পতিত থাকে? তা ছাড়া ওর ত্রিসীমায় জল নেই। কিসের চাষ করবেন?

—গরুমহিষ পুষব, চাষ করব, বাসও করব, সব রকমেই—

নায়েব চোখ মিটকি মেরে বললে—আমায় কি দেবেন?

—কেন গরিবের ওপর জুলুম করবেন? আপনাকে খুশী করব।

—কত?

—এক শ টাকা।

—না। ওতে হবে না।

—দেড় শ?

—না।

—কত বলুন?

—দশ হাজার টাকা। পাঁচ বছর পরে। নগদ দিতে হবে না। লেখাপড়া করুন। এরা কলকাতার বড়লোক, এরা কি জানে মশাই, আমি আন্দাজে বুঝেছি। তবে আপানাকে নগদ দিতে হবে না। একটি কর্জ্জনামার খত রেজিষ্ট্রি করা থাকবে। বুঝলেন? যেন আপনি দশ হাজার টাকা ধার নিলেন আমার কাছ থেকে।

—সে হবে না। রেজিস্ট্রার টাকার লেনদেন নিজের হাতে করবে। দশ হাজার টাকা কে দেবে!

—তার ব্যবস্থা হবে। সব রোগের ওষুধ আছে।

জমি রেজিষ্ট্রি হয়ে গেল।

তবে আমরা জমিদারকেও ফাঁকি দিই নি। এখন সে জমির আয় বার্ষিক নিট্ দেড় লক্ষ টাকা।

জমিদারের নাবালক ছেলেকে আমরা দু হাজার টাকা ফি বছর দিই।

আমাদের যা কিছু দেখছেন, সব সেই পালনড়ি কয়লার খনি থেকে। এখন আমাদের দশটা কোলিয়ারি, কোনওটাই কিন্তু পালনড়ির মত নয়। পালনড়ি লক্ষ্মীর ঝাঁপি। থর্নটন কাকার ছবি দেখবেন? চলুন পাশের ঘরে। না, আসল ছবি বা ফটো নয়। আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকিয়েছি। আমি চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলাম অবিশ্যি যতটা মনে ছিল।

রজনীবাবু গল্প শেষ করলেন। বললেন—চা খান আর একবার।

আমি বললাম—সাহেবের আর কোন খবর পান নি?

—কিছু না। আমার মনে হয় বিলেত যাওয়ার পথেই মারা গিয়েছিল। নইলে অন্তত বীণা দিদির খবর সে নিশ্চয় নিত। চলুন থর্নটন কাকার অয়েল পেন্টিং দেখাই। থর্নটন কাকা ভাঙা লোহার সান্‌কিতে ভাত খাচ্ছে, এই ছবিটাই আঁকিয়েছি। আসুন এই ঘরে।

কালচিতি

কালচিতি গ্রামের নারান হাঁসদা এসে আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেল ওদের গ্রামে যাবার জন্যে।

কালচিতি এখান থেকে পাকা দশ মাইল দূর, ডিবুডুংরি ও সারোয়া দুটি জঙ্গলাবৃত পাহাড় পেরিয়ে তবে। দুর্গম রাস্তা।

যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল। এই চালের বাজার, জিনিসপত্র দুর্লভ বটে, আক্রাও বটে। ভাল দুধ তো দেশ থেকে উঠেই গিয়েছে। নারান হাঁসদা ও গ্রামের প্রধান, আমার মক্কেল। তাকে অনেকদিন থেকে বলছিলাম ওদিকে কিছু ধানের জমি পাওয়া যায় কিনা। এবার এসে সে খবর দিল, ত্রিশ বিঘা ভাল জমি এক বন্দে আছে, সেই সঙ্গে একটা পুকুর ও শাল মহুয়ার জঙ্গল। দরে সে কিছু সস্তা করে দিতে পারে আমাকে, সে-ই যখন গ্রামের প্রধান।

সেদিন সকালে সে একখানা গরুর গাড়ী পাঠিয়ে দিলে। গাড়োয়ানের হাতে একখানা চিঠি, তাতে লেখা আছে আমি যেন বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে যাই।

দুপুরে আহারাদির পর কালচিতি রওনা হলাম! মাইল দুই গিয়ে টাউনের সীমা ছাড়ালাম। তার পর একটা ঝাঁটি শালচারার বন, সেও মাইলখানেক---তার পরেই পড়ল ডিবুডুংরি পাহাড়। পাহাড়ের উপর এঁকেবেঁকে গরুর গাড়ী উঠতে লাগল। তখন বেলা দুটো, আদৌ রোদ নেই; মেঘস্নিগ্ধ আকাশতল, অথচ সকাল থেকে বৃষ্টি নেই, শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পাহাড়ের চড়াইয়ে বড় বড় শাল, করম, আসামের ছায়াবহুল জঙ্গল, এক রকমের ছোট বাঁদর খেলা করে বেড়াচ্ছে ডালে ডালে। করম গাছের হলদে ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে পাষাণময় পথের ওপর। যেন কে ইচ্ছে করে ছড়িয়ে রেখেছে।

আবার বহুদূর ঢালু পথে গরুর গাড়ী মন্থরগতিতে নামতে নামতে চলে।

গাড়োয়ান মুখে বলছে—ইঃ ইঃ। ডুংরিটা পেরিয়ে জল খাওয়াইয়ে লিব, চল্ ইঃ—শালের পাচন মারছে গরুর গায়ে।

পাহাড় পার হয়ে ঢালু বিস্তীর্ণ পথটা যেখানে সমতল ভূমিতে এসে মিশেছে সেখানে একটা পাহাড়ী নদী উপলরাশির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। পার্ব্বত্য নদীর বন্ধুর তটভূমিতে দু পারেই কুটজ কুসুমের শোভা, চিহড় লতা অজগর সাপের মত বড় বড় শালগাছের গুঁড়িকে বেষ্টন করে উপরের দিকে উঠেছে। কম্‌ব্রিটাম লতার ছোটবড় ঝোপ একেবারে জল ছুঁয়ে আছে। পক্ষিকাকলীমুখর বড় সুন্দর স্নিগ্ধ উপত্যকাটি। যেন এখানে সংসারের কোন গোলমাল নেই। রাজাকরদের উৎপাতের কথা শুনতে হয় না সকালে উঠে, ব্ল্যাকমার্কেটের সংবাদ পৌছয় না, মানুষের সঙ্গে বিবাদের বার্ত্তা নেই এখানে। গাড়োয়ান বললে—নাম বাপু, জল খাওয়াইয়ে লিব গরু দুটাকে।—আমরা গাড়ী থেকে নেমে একটু দূরে একটা বড় শিলাসনে বসতে যাচ্ছিলাম। গাড়োয়ান বললে, উ ধারে যাবি না আজ্ঞে।

—কেন?

—উ ধারে ভালুক-ঝোড় আছে। ভালুকটা বাহিরাবে। গরু ডরাবে।

ভালুক! পথের ধারেই দিনের বেলা ভালুকের ভয়! মেয়েরা ভয় পেয়ে গেলেন। আমরা কাছেই বসলাম কিছুক্ষণ, তার পর আবার গাড়ীতে উঠলাম।

এবার কিছুদূর গিয়ে একটা বন্য গ্রাম পড়ল, নাম কাড়াডোবা। ঘর কুড়ি-বাইশ মুণ্ডা খৃষ্টানের বাস, মকাই ক্ষেতে কাজ করছে মেয়েরা, বাঙালী মেয়ের মত শাড়ী পরনে। একটি মুণ্ডা যুবককে জিজ্ঞেস করলাম—কি নাম আছে?

—পল্।

—ও মেয়ের কি নাম?

—রত্না কুই।

একেবারে আধুনিক নাম—'রত্না'। খৃষ্টান মিশনারীরা ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে অনেকখানি বাইরের আলো দিয়েছে যে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাস্তার দুধারে অবস্থিত সারবন্দী ওদের বাঁশ-খড়ের ছোট নীচু ঘরগুলির মেঝে ও দাওয়া এলা মাটির রং করা, নিকানো মোছানো, দেওয়ালের বাইরে ধনেশপাখীর ছবি আঁকা, ভালুকের, পাহাড়ের ও ফুলগাছের ছবি আঁকা।

ওদের ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে ছেলে কোলে করে কৌতূহলের সঙ্গে বন্য মেয়েরা একদৃষ্টে আমাদের গাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে।

একটি বৃদ্ধা গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলে—কুথাকার গাড়ী বটে?

—কালচিতি।

—কে আসছে সঙ্গে?

—ডাক্তারবাবু বটে।

—হোই।

আবার নির্জ্জন বনপথ। একেবারে নির্জ্জন। সন্ধ্যার পর বন্যহস্তিযূথ এ পথে বর্ষার ধানক্ষেতে নামে পাহাড় থেকে, পথের ধারে নরম মাটির বুকে তাদের পদচিহ্ন এঁকে। সাদা মেঘপুঞ্জ থোলো থোলো জমেছে দূর শৈলমালার শিখরে শিখরে, কালিদাসের দেশের সানুমান আম্রকূটের ছবি মনে জাগিয়ে দেয়। সঙ্গে একখানি মেঘদূত যদি আনতাম, তবে ওই বন্য কুটজ-বৃক্ষের তলায় পাহাড়ী নদীর পাড়ে পাথরের ওপর পা ছড়িয়ে বসে এমন মেঘমেদুর দিনের স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের সুখমন্থর দিনগুলির কথা পাঠ করতাম, আর শুনতাম ধনেশ-পাখীর ডাক, শুনতাম বনময়ূরের কেকাধ্বনি। শহরের দোতলা ঘরে বৈদ্যুতিক বাতির তলায় ও কাব্য পড়ে কেউ ওর প্রাণস্পন্দন কানে শুনতে পারে না।

অনেকদূর যাবার পরে আর একটা গ্রাম পড়ল, এর নাম টেঁড়াপানি। একেবারে সাঁওতালি নাম, যে জায়গা থেকে জল দূরে। বহুব্রীহি সমাস।

এ গ্রামটিও খুব বড় নয়, খুব বড় গ্রাম ও অঞ্চলে বড় একটা নেই। এই গ্রামে একটা দেখবার মত জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে একটা পাথরের চবুতারা, তার চারদিকে পয়ঃপ্রণালী। বহু পুরনো আমলে এখানে নাকি প্রাণদণ্ডের আসামীদের শিরশ্ছেদ করা হত, রক্ত গড়িয়ে পড়ত ঐ

পয়ঃপ্রণালী দিয়ে। কে যে কার প্রাণদণ্ড দিত, তা বোঝবার কোন উপায় নেই—সম্ভবত পুরনো প্রাক্‌বৃটিশ যুগের কোন বন্য রাজা।

টেঁড়াপানি ছাড়িয়ে দু রশি গিয়েই সারোয়া পাহাড়ের চড়াই শুরু হল ক্রমোচ্চ বনপথের মধ্য দিয়ে। এই বর্ষাকালে ছোটখাটো ঝরনা কুলকুল্ রবে এদিক-ওদিক থেকে সরবে নেমে আসছে, দ্রোণঘাসের ফুল ফুটেছে, যে ফুল তীরের মত বিঁধে যায় কাপড়ে।

এ পাহাড়ে বড় গাছ অনেক বেশি, চড়াইয়ের পথ দুর্গমতর। কিন্তু শোভা সবচেয়ে চমৎকার। উচ্চতা এত বেশি যে, এখানে চড়াইয়ের মাথা থেকে বহু দূরে টাটানগরের ডালমা পাহাড় চোখে পড়ে। চারিধারেই ঢেউ-খেলানো পাহাড়শ্রেণী, কোথাও উঁচু কোথাও নীচু—দূরে দূরে পাহাড়-গুলো ঘননীল, কালো মেঘের পটে ছবির মত।

একজন বুড়ো কাঠুরে লুদাম গাছের কাঠ কাটছে পাহাড়ের মাথায়। তার পরনে ইঞ্চি-দুই চওড়া কাপড়ের কৌপীন মাত্র।

জিজ্ঞেস করা গেল—কি নাম রে?

—গনু সর্দার।

—বাড়ী কোথায়?

—টেঁড়াপানি।

—তোর বয়েস কত?

—কি জানি বটেক।

—পঞ্চাশ হয়েছে?

—পঞ্চাশ হতে পারে, ত্রিশ হতে পারে।

—কি খেয়েছিস?

—নাই খাইল।

—তবুও?

—সোঁধা চাল আর নুন।

অর্থাৎ ভিজে চাল নুন দিয়ে খেয়েছে। এ সব বন্য দেশে আটা ছাতু প্রভৃতি খাদ্য একেবারে অচল। এরা ভাত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এমন কি তরকারি পর্য্যন্ত খায় না, হয়তো একটু শাকভাজা আর নুনের টাকনা দিয়ে এক বড় জামবাটি ভর্ত্তি পান্তভাত দিব্যি মেরে দিলে। তাতেই এদের সবল স্বাস্থ্যবান পাথরেকোঁদা চেহারা, ধনুকবাণ নিয়ে বড় বাঘ ও বুনো হাতী আর ভীষণ বিষধর শঙ্খচূড় সাপের সামনে এগিয়ে যাবে নির্ভয়ে। আর ভালুক? সে তো এদের ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘোরে।

আমাদের গাড়ীর একটি মেয়ে হাসতে হাসতে বললে—হ্যাঁ গনু সর্দার, তোমার বয়েস পনের পর্য্যন্ত হয়েছে কি?

—তা হতে পারে বটে।

—তাহলে বড্ড বয়েস হয়েছে তোমার?

—হ্যাঁ, রেলটা বসল চাঁইবাসাতে, তখন আমি কাড়া চরাই আজ্ঞে। তুমি আগুন দিলি ?

—কি ?

আমি বুঝিয়ে বললাম গন্নু দেশলাই চাইছে। পিকা খাবে। পিকা অর্থাৎ কাঁচা শালপাতায় জড়ানো তামাকের পাতা ; বিড়ির আকারের বটে, তবে আধহাত লম্বা। বাজারের বিড়ির চেয়ে পিকা খেতে অনেক ভাল লাগে। এই সব বন্য অঞ্চলের কোন লোকই বাজারের তৈরি বিড়ি কিনে খায় না।

জিজ্ঞেস করলে বলে—উ উদাস লাগছে রে।

এবার সারোয়া পাহাড় থেকে পথ নামল। ঐ পথটা আগের পাহাড়ের উৎরাইয়ের মত অতটা ঢালু নয়। অর্থাৎ রাস্তাটা দিয়ে আরোহী-বোঝাই গরুর গাড়ী নিয়ে নামা একটু বিপজ্জনক। নামবার রাস্তার একপাশে খাদ বেশ গভীর। গরু যদি ভয় পেয়ে একটু এদিক-ওদিক নিয়ে যায় তবে ঐ খাদে আরোহী-পূর্ণ গাড়ীর সমাধি সুনিশ্চিত।

ঢালু পথটা যেখানে সমতলে এসে মিলল, সেখানেই কালচিতি গ্রাম। অর্থাৎ সারোয়া পাহাড়ের এপারে টেঁড়াপানি আর ওপারে কালচিতি, মাঝখানে পাহাড়টা দাঁড়িয়ে। এই গ্রামটা এদিকের মধ্যে বড়। অনেক ঘর লোকের বাস, এদের মধ্যে অনেক বাঙালী অধিবাসীও আছে। বাঙালী অধিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষ বহুকাল আগে বাঁকুড়া বা মেদিনীপুর জেলা থেকে এসে এখানে বাস করেছিল। এই বনাঞ্চলের পরিবেশের মধ্যেও এরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ঠিক বজায় রেখে চলেছে।

আমরা নারান হাঁসদার বাড়ী গিয়ে উঠলাম। খড়ের বাড়ী, মাটির দেওয়াল, মাঝখানে বড় একটা চওড়া ঘর, তার চারপাশে কুঠুরি, শালকাঠের দরজা জানালা। কোথাও চুন সিমেন্টের বালাই নেই। নারান হাঁসদার মুখে শুনলাম এ ঘর অন্তত সত্তর বছর আগে তৈরি, অথচ মাঝে মাঝে নতুন ছাউনি দেওয়া ছাড়া অন্য বিশেষ কোন খরচ নেই এর পেছনে। নারান হাঁসদার বাড়ীর মেয়েরা এগিয়ে এসে গাড়ী থেকে আমাদের বাড়ীর মেয়েদের নামিয়ে নিয়ে গেল। তাদের পরনে ফর্সা শাড়ী, গায়েও ব্লাউজ, এমনি অজ বন্য গ্রামের মেয়েদের তুলনায় অনেক মার্জ্জিত ও সভ্য, এদের কথাবার্ত্তাও ভাল, খানিকটা এ অঞ্চলের বুলি ও টান থাকা সত্ত্বেও ভাল বাংলা বলেই মনে হয়।

নারান হাঁসদা বাঙালী নয়, সাঁওতাল। ওদের বাড়ীটা একটু বেশি ভাল, আসবাবপত্রও অনেক রকম আছে, কারণ ও গ্রামের প্রধান, অবস্থাও ভাল।

নারান হাঁসদার মা এসে বললে—ঠাকরাইনরা, আসেন ঘরের মধ্যে। গরিবের ঘরে পা দিছেন, পায়ে জল দেন।

আমি বাইরের ঘরে একটা চৌকির ওপর বসলাম। নারান হাঁসদার ভাই এসে তার ওপর একটা ভাল শতরঞ্জি পেতে দিয়ে গেল।

এতটা পাহাড়ী রাস্তায় এসে শরীর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি গরুর গাড়ীতে বেশি উঠি নি, হেঁটেই এসেছিলাম গরুর গাড়ীর পাশে পাশে। বালতিতে ঠাণ্ডা জল ঝরনা থেকে

তুলে নিয়ে এল, হাত মুখ ধুয়ে ফেললাম, মাথাও ধুয়ে ফেললাম। শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। সারাদিনের পরে এখন হঠাৎ হলদে রোদ গাছপালার মাথায়, দূর পাহাড়ের মাথায়। বনকুসুমের সুবাসভরা অপরাহ্নটি বন্যবিহঙ্গের কলরবে মুখর। ওদের বাড়ীর সামনে মস্তবড় কুসুমগাছ, তার তলায় কাঠের আস্ত গুঁড়ি-চেরা ছালটের বেঞ্চি পাতা। সেখানটাতে গিয়ে বসলাম ঝিরঝিরে পাহাড়ী হাওয়ায়। গ্রামটি বেষ্টন করে দূরে দূরে নীল পাহাড়মালা। অরণ্যের শ্যামশোভা সারোয়া পাহাড়ের সানুদেশে, দু ফার্লং দূরে পার্ব্বত্য নদীর ধারে ধারে। এ যেন রূপকথার গাঁ—যেখানে :

রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল কুঁড়ি,
তাহারি মাঝে বাসা।

শহর থেকে অনেকদূরে, পাহাড়ী বনের ধারে, শাল আসান মহুল গাছের ছায়ায় লুকানো আছে রূপকথার গ্রাম। জ্যোৎস্নারাত্রে বনের ফুলের সুবাসে এদের কুটিরের বাতাস মদির করে তোলে, বাঘ-ভালুক উঁকি মারে আনাচেকানাচে, বনের ময়ূর নৃত্য করে এমনি বর্ষার দিনে কুসুম-গাছের ডালে ; খুব নিস্তব্ধ, শান্তি ও নির্জ্জনতায় ভরা দিনে এরা গান গেয়ে বেড়ায় গ্রামের মাঠে পথে। ঝরণার স্বচ্ছ জল তুলে আনে সুঠাম বনবধূরা, কুরচি-ফুল-ফোটা পাষাণপথ বেয়ে রিক্ত-বৃন্ত করবীর বাঁকা ডালে মাংসল বটের, চাহা, তিত্তির পাখী উড়ে এসে বসে।

শহরের লোকে এ গাঁয়ের সন্ধান খুঁজে পায় না।

নারান হাঁসদার ভাই এসে বললে—বাবু, চা দেব কোথায়? ঘরে আসবেন?

—এখানেই ভাল। বেশ ফাঁকা জায়গা গাছের তলায়।

—পিকা বানাব বাবু? বিড়ি-সিগারেট এখানে মেলে না।

—চমৎকার হবে—বানাও।

ঘটিতে চা এল আর এল তালের পরোটা, গরম ভাজা মুড়ি, তালের ক্ষীর, মর্ত্তমান কলা, আর শসার কুচি নুন-নেবু মাখানো। যা কিছু সবই এ গ্রামের, কেবল পরোটার আটা এসেছে বাইরে থেকে। অবিশ্যি চা-চিনিও। খাঁটি দুধের তৈরি তালের ক্ষীরটি অতি উপাদেয় হয়েছিল।

নারান হাঁসদা বিনীতভাবে বললে—আমাদের ইস্কুল দেখবেন? আমার মেয়ে সেখানে মাস্টার। যাবেন।

—নিশ্চয়ই যাব।—আমার জানা ছিল না নারান হাঁসদার কোন মেয়ে আবার ইস্কুল মাস্টার।

বললাম—কিন্তু এখনও স্কুল খোলা আছে? বেলা তো বেশি নেই।

—আপনি দেখতে যাবেন বলে খোলা রাখা হয়েছে।

—সে কি! এতক্ষণ বলতে হয়। চল চল।

অনেকটা গিয়ে গ্রামের প্রান্তসীমায় ফাঁকা মাঠ ও বনের সামনে খড়ের স্কুলঘর। সে এমন একটি স্বপ্নময় সুন্দর জায়গা যে মনে হল এখানে মাস্টারি করা একটা সৌভাগ্য। স্কুলের মাঠের অল্পদূরেই নিবিড় অরণ্য-ভূমি শুরু। রাত্রে নাকি স্কুলের রোয়াকে ভালুক এসে বেড়ায়। জারুল ফুল ফুটে আছে অদূরবর্ত্তী বনশীর্ষে, যে জারুল গাছ কত যত্ন করে কলকাতার রাস্তার ধারে মানুষ করা হচ্ছে।

আমি স্কুলের মধ্যে ঢুকতেই ছাত্রছাত্রীরা উঠে দাঁড়াল একসঙ্গে। নারান হাঁসদার মেয়ে নার্সদের মত কাপড় পরে নীচু টুলে বসে ছাত্র পড়াচ্ছিল। বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে, কালো বটে, তবে কুচকুচে কালো নয়, চোখ দুটিতে সরলতা ও ঔৎসুক্যের দৃষ্টি। হাতজোড় করে নমস্কার করলে, আমিও নমস্কার করলাম। বেশ লাগল মেয়েটিকে।

স্কুলের দেওয়ালে একখানা ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো, তার একপাশে মহাত্মা গান্ধীর ছবি একখানা। একখানা বাংলা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে তার পাশে। মেজেতে মাদুর পাতা, তাতে ছাত্রছাত্রীরা বসে; সামনে একটা করে নীচু টুল, তাতে বইপত্তর রাখে।

নারান হাঁসদা বললে—এই আমার মেয়ে, এর নাম সুশীলা।

আমি বললাম—বেশ। আপনি বসুন। আপনার ছাত্রছাত্রীরা কি পড়ে?

মেয়েটি বিনীতভাবে বললে—লোয়ার প্রাইমারি পাঠশালা এটা।

একটি ওরই মধ্যে বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম—কি পড়?

—সরল সাহিত্যপাঠ।

—পড় তো একটু।...আচ্ছা, বেশ হয়েছে। বস। ভাল পড়েছ।

মেয়েটি বললে—একটা কবিতা শুনবেন?

—নিশ্চয়ই।

আমাকে অত্যন্ত অবাক করে দিয়ে একটি ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলে—

ঐ দেখ মা, আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এলো আলো,
আজকে আমার ছুটোছুটি
লাগলো না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন,
অনেক হলো বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল,
ফেলে এলেম খেলা।

যে দেশের ঘন বনানী ও পাহাড় অঞ্চলের ক্ষুদ্র সাঁওতাল গ্রামের ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, সে দেশ বাংলা-ভাষী নয় এ অদ্ভুত মন্তব্য কাদের? তারা এসে যেন দেখে যায়।

বোর্ডে একটা ছোট অঙ্ক দিয়ে ওদের কষতে বললে সুশীলা। তারা শ্লেটে অঙ্ক কষে আমার কাছে দেখাতে নিয়ে এল। গান্ধীজীর ছবি দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের বললাম—কার ছবি বল তো?

বড় বড় ছেলেরা সবাই বললে—গান্ধীজীর।

ছোট ছেলেমেয়েরা উত্তর দিলে না।

আমি ওদের খুব উৎসাহ দিলাম লেখাপড়ার বিষয়ে। সুশীলা স্কুলের ছুটি দিয়ে দিলে। আমার স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে নাকি আগামী কালও ছুটি থাকবে:

ছেলেরা তিন বার বললে—জয়-হিন্দ! জয়-হিন্দ! জয়-হিন্দ!

একে একে আমায় নমস্কার করে সবাই স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে উচ্চ কলরব ও হাসি-খুশির ঢেউ তুলে যে যার বাড়ীর দিকে চলল।

মেয়েরা দেখি মেয়েদের সঙ্গে খুব জমিয়ে তুলেছে। বেলা গেল, যদিও সুমুখে জ্যোৎস্নারাত, মেঘে ঢাকা আকাশে জ্যোৎস্না বিশেষ সাহায্য করবে না দুর্গম পাহাড়ী পথে। সেই জন্যে নারান হাঁসদা বার বার বলতে লাগল—রাত্রে এখানে থাকুন বাবু।

সুশীলা এসে বললে—থাকুন রাত্রে আজ। আপনারা থাকলে বড় খুশী হব।

বললাম—আপনি বরং একদিন আমাদের ওখানে আসুন আপনার বাবার সঙ্গে। আজ ছেড়ে দিন আমাদের। সুশীলা চুপ করে রইল! অনেকক্ষণ থেকে একটা প্রশ্ন ওকে জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। এইবার বললাম—

—আপনি কতদূর পড়াশুনা করেছিলেন?

সুশীলা উত্তর দিল—মেদিনীপুর স্কুল থেকে মাইনর পাশ করেছি। একটা ক্রিশ্চান মিশনে সেলাই আর ইংরিজি শিখেছি কিছুদিন।

—এখানে মাইনে কত পান?

—কুড়ি টাকা।

—স্কুলের লাইব্রেরী আছে?

—সামান্য কিছু বই আছে। রবীন্দ্রনাথের বই কিছু আনব এবার।

—কি বই পড়েছেন রবীন্দ্রনাথের?

—কিছুই পড়ি নি। আমি যে মিশনে সেলাই শিখতাম, সেখানকার টিচারের কাছে ওঁর অনেক বই ছিল। ওঁর গানের বই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।

—রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে পারেন?

—গান গাইতে জানি নে। কোন গানই নয়। শুনতে ভালবাসি। একটা কথা বলব? এঁদের মধ্যে যদি কেউ গান করেন একটি, তবে, বড় ভাল হয়।

আমাদের বাড়ীর একটি মেয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেন। ওরা সবাই খুব মন দিয়ে শুনল।

এবার আমরা বিদায় নিলাম। আসবার পথে ওরা খানিকদূর আমাদের এগিয়ে দিলে,

আর উপঢৌকন দিলে সঙ্গে ঢেঁড়স, কুমড়ো, পাতিলেবু, বড় একছড়া মর্ত্তমান কলা, গোটাচারেক পাকা তাল।

সারোয়া পাহাড়ের ওপরে যখন উঠেছি, তখন অস্তদিগন্তের মেঘের নীচে দূরের পাহাড়-গুলো ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। একটা চমৎকার ওষধিগন্ধ উঠছে বনলতা গাছপালা থেকে। পাখীদের কাকলী-ধ্বনিতে অধিত্যকার বনানী মুখর হয়ে উঠেছে। একটি পরিচিত পাখীর ডাক শুনে খুশী হলাম। সমতল বাংলাদেশের, বাঁশবনে, আমবনে, বৈঁচি-ঝোপের পাশে এ পাখী ডাকে। পাপিয়া।

সারোয়া পাহাড় থেকে যখন নামলাম, এপাশে টেঁড়াপানি গ্রামের কুটিরে কুটিরে তখন মাটির প্রদীপে মহুয়া বীজের তৈল ও বন-করনজার তৈলের মিটমিটে আলো। কেরোসিন তেল এসব দুর্গম বনাঞ্চলে আদৌ পৌছয় না আজকাল, তার ধারও এরা ধারে না।

ডিবুডুংরি পাহাড়ের আগে সেই বনভূমির মধ্যে দিয়ে অতি সন্তর্পণে মশাল জ্বালিয়ে গাড়িখানা চালাতে লাগল গাড়োয়ান বন্যহস্তীর ভয়ে। অন্ধকার খুব ঘন নয়, মেঘভরা জ্যোৎস্নায় পথ দেখতে কোন অসুবিধে নেই।

হঠাৎ দেখি সেই নির্জ্জন বনপথে দুজন লোক আসছে। দুটিই মেয়েমানুষ।

বললাম—বাড়ী কোথায় রে।

—উই গাঁয়ে বটে।

—কোন্ গাঁয়ে ?

—টেঁড়াপনি।

—এত রাতে কোথা থেকে আসছিস ?

—হাটে গিয়েছিলেক, আবার কুথা থেকে আসব বটে।

তা বটে। আজ কালিকাপুরের হাট, মনে ছিল না সে কথা।

এই দুটি মেয়ে যদি এত রাত্রে এই বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অন্ধকার বনপথে নির্ভয়ে আসা-যাওয়া করতে পারে, তবে আমরা মস্তবড় দুঃসাহসের কাজ কিছু করছি না রাত্রে গাড়ী করে ফিরে।

আগে ভয় যে না হয়েছিল এমন নয়; এখন লজ্জিত হলাম সেজন্যে। তবে এ বনই এদের জন্য, কিছু বোঝে না ওরা বন ছাড়া। স্নেহময়ী জননীর অঙ্কের সমান ওদের কাছে এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত বনাঞ্চল, বাঘ-ভালুক ওদের বাল্যসঙ্গী। আমাদের তা নয়, এইটুকু যা তফাত।

দিবাবসান

যে কটা জিনিস আমার ভাল লাগছিল তার মধ্যে প্রধান একটা হচ্ছে চারিধারের নির্জ্জনতা—যে দিকে চাই, কোন দিকে কাউকে চোখে পড়ে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, গাছপালার সমাবেশে প্রকৃতির কোন দৈন্য চোখে পড়ছিল না—বনে, ঝোপে, পাতায়, লতায়, ফুলে, ফলে, খড়ে, ঘাসে অযত্ন-সজ্জিত প্রকৃতির পরিস্ফুট বন্য-সৌন্দর্য্য। এই আছে, তার পেছনে আরও, তার পেছনে আরও, দূরে দূরে আরও নানা রকমের বন ঝোপের সমাবেশ, ঠাসাঠাসি, অগাধ সবুজ সমুদ্রে জমাট পাকিয়ে আছে। ইচ্ছামত যত খুশি দেখতে পারি, ফুরিয়ে যাবে না, মানুষের হাতে বাছাই করে পোঁতা দু-দশ রকমের শখের গাছ নয়। একটা উঁচু ঢিবির ওপরে নানাজাতীয় গাছ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে—একটা বড় সাঁইবাবলা গাছ, তলায় আধ-শুকনো উলু খড়, কাঁটাওয়ালা বৈঁচি গাছ, আসশেওড়া, ভাঁট, কচু, ওল, বিছুটি-লতা—সবগুলো জড়িয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। ঢিবিটার ওপর উঠে নোনা গাছটার ছায়ায় একটু বসলুম। এমন শান্তি অনেকদিন অনুভব করি নি—চারিদিকে চেয়ে শান্তি—কেউ কোন দিকে নেই। আর গাছগুলোর দিকে চেয়ে মহাশান্তি এই যে, সেগুলো মানুষের হাতে পোঁতা নয় আদৌ—সম্পূর্ণ বনজ, একেবারে খাঁটি নিখুঁত বনজ। তলায় একেবারে শুয়ে পড়লুম। আঃ, কি আরাম! হলদে ফুলে ভরা বিছুটিলতা মাথার ওপরে দুলছে, বাতাস লেগে শুকনো সাঁইবাবলার পাতা ঝর-ঝর করে বুকের ওপর ঝরে পড়ছে। দুর্গা-টুনটুনি পাখী একেবারে কানের কাছে শেওড়ার ডালে বসে কুচকুচ করছে। বড় দুঃখ হল, সঙ্গে কোন বই আনি নি। প্রাণে রস যোগায় এমন বই যদি পড়তে হয় তবে এই তার স্থান। এই রকম শান্ত শীতের অপরাহ্ণে, এই রকম ধূ-ধূ মাঠের ধারের নির্জ্জন ঝোপের মধ্যে, ডান হাতের খুঁটি দিয়ে মাথাটাকে উঁচু করে পাশ ফিরে শুয়ে, পড়তে হয় শেলির কবিতা, কি ডারউইন, কি মানুষের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার ইতিহাস, কি ঐ রকম একটা কিছু। আবদ্ধ লাইব্রেরী ঘরে পুরাতন বই ও ন্যাপথলিনের গন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাসের মধ্যে বসে বই পড়লে অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্য্যের আবহাওয়ায় সদ্য পণ্ডিত হয়ে উঠেছি মনে করে পুলকিত হওয়া যায় বটে, কিন্তু এ-রকম নির্জ্জন ঝোপে খোলা আকাশের তলায় বসে পড়বার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। আরাম করে পড়বার এই তো জায়গা। গাছগুলোর পাতার দিকে চেয়ে যখন মনে হবে, মাঠের মধ্যের এই সামান্য শেওড়া গাছ, এই সামান্য উলু-খড়টাও নয় কোটি মাইল দূরবর্ত্তী সূর্য্যের দিকে পত্র-পুষ্প ফিরিয়ে আছে প্রাণশক্তির ইন্ধন ভিক্ষার আশায়, ঐ বিরাট অগ্নিপিণ্ডের লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ প্রজ্বলন্ত হাইড্রোজেন-শিখার রুদ্রলীলার আড়ালে পৃথিবীর মাঠের এই সামান্য বিছুটিলতাটিরও জীবন লুকানো রয়েছে—ডারউইনের লেখা তখন মনের মধ্যে নতুন রস যোগাবে, শেলির কবিতার নতুন অর্থ হবে। এ-রকম অবস্থায় আধ ঘণ্টার মধ্যে মনের হয়তো যে দ্বার খুলে যেতে পারে, আঁটাসাঁটা বদ্ধ ঘরে ইলেকট্রিক পাখার তলায় আরাম-কেদারা হেলান দিয়ে পড়লে সাত বৎসরেও সে দ্বারের

সন্ধান মিলবে না।

লতা যেমন ঐ বাবলা গাছের আড়ালে হেলে পড়া সূর্য্য থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে, এখানে মন তেমনি উন্মুক্ত উদার বিপুলা প্রকৃতি থেকে নতুন রস পান করে বলী হয়।

বেলা পড়ে যাচ্ছে দেখে নোনা গাছের তলা থেকে উঠলুম। মাঠের মধ্যে তখন গাছপালার দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া পড়ে গেছে, বাবলা বনের ওপর সূর্য্য হেলে পড়েছে। চলতে চলতে আর একটা ঝোপের মাথা থেকে একটা বেগুনে রঙের অজানা বনফুল তুলে নিলুম। তার গর্ভকেশরের চারিপাশ ছোট ছোট লাল লাল পিঁপড়েয় ভরা, তাদের সর্ব্বাঙ্গ ফুটন্ত ফুলের পরাগে মাথামাখি,—মধু খেতে এসে তারা গাছের কি মহৎ উপকার করে যাচ্ছে। চেয়ে দেখলুম সে-রকম গাছ চারি পাশে আরও অনেক। সবগুলোতেই ফুল ফুটে আছে। আমি উদ্ভিদ-বিদ্যার ছাত্র নই, স্ত্রী-ফুল পুরুষ-ফুল চিনি নে, তা হলে ব্যাপারটা বেশি করে উপভোগ করতে পারতাম। ঝোপের মাথায় হলদে-পাখা প্রজাপতি উড়ছে। এই সব ছোট ছোট পোকামাকড় প্রজাপতি আর এই অখ্যাত অজ্ঞাত উদ্ভিদ-জগৎ পরস্পর অদ্ভুত কার্য্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ, পরস্পরের উপর নির্ভর করছে। গাছপালা কঠিন মাটি থেকে, বায়ুমণ্ডল থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজের দেহের মধ্যে অদ্ভুত কৌশলে খাদ্য তৈরি করছে প্রাণী-জগতের জীবনধারণের জন্যে—ওগুলো তো প্রাণী-জগৎকে খাদ্য যোগাবার একপ্রকার যন্ত্র। প্রাণী-জগৎ কত রকমে তাদের বংশবৃদ্ধির সাহায্য করছে ; আর সকলে মিলে নির্ভর করে আছে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী ঐ বিরাট অগ্নিকুণ্ডটার ওপর। এই পাখী, এই প্রজাপতিটা, এই ফুল, এই তুচ্ছ কি গাছটা, এই লতা, এই আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, ঐ যে উজ্জ্বল হয়ে আসছে ঐ চাঁদটা, এই চারিধার, এই প্রাণী-জগৎ, ঐ লক্ষ মাইল দূরের সূর্য্য, ঐ অনন্ত মহাব্যোম, এই বিপুল বিশাল অচিন্তনীয় অসীমতা, সবগুলোর মধ্যে পরস্পর কি আশ্চর্য্য নাড়ীর যোগ! কি বিপুল রহস্যে ভরা তাদের এই পরস্পরনির্ভরতা!

মাঠের সামনে গ্রাম পড়ল। অড়হর ক্ষেতের চারিধারে ধঞ্চে গাছের বেড়া দিয়েছে। ওধারে ভুর-ভুর করে কোথা থেকে ফুটন্ত সরষে ফুলের গন্ধ আসছে। এদিকে বেড়ার গায়ে ক্ষুদে-ক্ষুদে ফুল ফুটে বেড়া আলো করে রেখেছে, গন্ধটায় বড় ঝাঁঝ। মাঝে মাঝে গাছে নাটা ফলের থোলো শুকিয়ে আছে। একঝাড় পাথরকুচি গাছের পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে, তাদের পাতাগুলো সিঁদুরের রং হয়ে উঠছে। একটা ঘন আলকুশি লতার ঝোপের মধ্যে থেকে শীতের বৈকালের ঠাণ্ডা গন্ধের সঙ্গে কি একটা ফুলের তীব্র ঘন সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে···মাথার উপর দিয়ে আকাশ বেয়ে এক ঝাঁক বালিহাঁস বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

কাশির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, গ্রামের ও-দিকের পথ বেয়ে দুজন র‍্যাপার-গায়ে জুতো-পায়ে ভদ্রলোক আসছেন। এখান থেকে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত, এ রকম ঝোপের কাছে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তাঁরা আমাকে পাগল ঠাওরাবেন নিশ্চয়, কারণ বিনা কাজে মাঠের মধ্যে ঝোপের দিকে হাঁ করে চেয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে—এ-দৃশ্যটা আমাদের দেশে একেবারেই আজগুবি।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই বাড়ী। একজন বৃদ্ধ জনকতক লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে—'এই তো পথ ছিল রে বাপু। মাছ তরকারি সব বাড়ী বসে কেনো। বাজারে কি যেতে হত। বেগুন সব এমন এমন। আর সস্তাও কি! মনে আছে তখন বিষ্ণুপুরের হাট বিষ্ণুপুরেই ছিল, রাজগঞ্জে উঠে আসে নি। একবার—।'…পুরনো পোড়ো বাড়ীটার একটা দেওয়াল তখনও দাঁড়িয়ে আছে, স্তূপাকৃতি ইটকাঠের মধ্যে নিমগাছ আর যগডুমুর চারা গজিয়ে উঠেছে। দেওয়ালের গায়ে দোতলার সমান উঁচুতে একটা কুলুঙ্গি। কে জানে, সত্তর বছর আগে হয়তো এই জীর্ণ পরিত্যক্ত আবাসে কোন নববধূ তার মেথিতে ভেজানো সুগন্ধ নারকেল তেলের পাথর-বাটি ঐ কুলুঙ্গিতে রেখে দিত। ঐ ঘরের মধ্যেই কত বছর আগেকারের তাদের ফুলশয্যার প্রথম প্রণয়ের মধুরাত্রি কেটে গিয়েছে।

কোথায় আজ আশি বৎসর আগেকার সে সব প্রথম প্রণয়-হর্ষাকুলা তরুণী নববধূ? কোথায় তাদের প্রিয়জনেরা? কোন্ দূর অতীতে কতদিন হল ছায়ার মত মিশে গিয়েছে, কে আজ তাদের সন্ধান দিতে পারে!

একটা বাড়ীর উঠানে একটা বিলাতী আমরা-গাছতলায় একদল পাড়ার ছেলে খেলা করছে, নতুন লোক দেখে তারা খেলা ফেলে আমার দিকে সকৌতুকে চেয়ে রইল। অন্ধকার ঝুপসী বাঁশ-বাগানের মধ্যে ডোবার ধারে বসে একজন পল্লীবধূ বাসন মাজছে—তাদের তরুণ জীবনও সেই বাঁশ-বাগানের মধ্যেকার আসন্ন শীতসন্ধ্যার মতই ঘুলিঘুলি অন্ধকার। সামনের এক বাড়ীর দোর খুলে আর একটি বধূ এ-হাতে একটি ঘড়া ও-হাতে আর একটি নিয়ে বার হয়েই হঠাৎ আমায় সামনে দেখে ঘড়াসুদ্ধ ডান হাতটা তাড়াতাড়ি খানিকটা উঠিয়ে এবং মাথাটা খানিকটা নুইয়ে হাতের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘোমটা টেনে দিলেন। একটি বাড়ীর মধ্যে উঁচু মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—'আমি জানি নে খুড়িমা, মাঝের ঘরেই তো ছিল, কে নিয়েছে আমি জানি নে!'—জন চার-পাঁচ ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে—তাদের মধ্যে একজন একটা কঞ্চি হাতে উঠানের একটা কুলগাছ থেকে কাঁচা সবুজ কুল পাড়ছে। —'ঐ যে রে তোর বাঁ হাতের ডালে—আর একটু উঁচুতে—এ যে, একটু একটু রাঙা হয়েছে, না? হ্যাঁ হ্যাঁ'—বলা বাহুল্য পৌষমাসের প্রথম, রাঙা হওয়া দূরের কথা কুলের মধ্যে আঁঠিও হয় নি। পথের বাঁক ফিরে একটা বেশ বড় বাড়ী—লোহার বড় বড় গজাল-মারা প্রকাণ্ড সিংদরজা, বালির কাজ খসে পড়ছে, পাঁচিলের মাথায় বনমূলোর গাছ গজিয়েছে। বাড়ীর সামনে পেরেকে ঝুলনো একটা রং-করা ডাকবাক্স, Next Clearence-এর নীচে Thursday-র প্লেট বসানো।

পাড়া পার হয়ে একটা বাঁশ-বাগান পড়ল। তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা। মচ মচ করে শুকনো বাঁশপাতার রাশ ও বাঁশের খোলা জুতোর নীচে ভেঙে যেতে লাগল। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছপালার-লতা-ঝোপের ঘন সমাবেশ, কি বিরাট প্রাচুর্য্য! জীবনের কি প্রবল উচ্ছ্বাস! সমস্ত ঝোপটার মাথা জুড়ে সাদা সাদা তুলোর মতো রাধালতার ফুল ফুটে রয়েছে। সমস্ত ঝোপটির কি সম্মিলিত সুগন্ধ, কি স্নিগ্ধ স্পর্শ! এইবার গ্রামের শেষে কাওরাপাড়া।

ছোট্ট ছোট্ট চালাঘর, একটার উঠানে শুকনো পাতালতা জ্বেলে অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে আগুন পোয়াচ্ছে। বাড়ীর পিছনে খেজুর গাছে ভাঁড় ঝুলনো। বাড়ীর মধ্যে সীম গাছ, লাল গাছের মাচা। তিন-চারটে কুকুর জুতোর শব্দে ছুটে এসে নতুন লোক দেখে বেজায় ঘেউ-ঘেউ আওয়াজ শুরু করে দিলে। সরু পথ বেয়ে আবার গ্রামের পিছনের মাঠে এসে পড়লুম।

মুশকিল

পিসিমা সকালে উঠে আমায় বললেন—যা পয়সা নিয়ে গিয়ে দেখে আয় দিকি বনগাঁর খোঁয়াড়ে। যদি সেখানে গরুটা গিয়ে থাকে,—দেখেই এস না কেন বাপু—

মা বললেন—ওকে পাঠানো আর না পাঠানো দু-ই সমান। ও কি করবে সেখানে গিয়ে? ও পারবে না। ওর বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, কখনও ঘরের বার হয় নি।

এ কথায় আমি চটে গেলাম মনে মনে। বললাম—তুমি পাঠিয়েই দেখ না কেন, পারি কি পারি নে। আমি বনগাঁ গিয়ে আর গরু দেখে আসতে পারি নে? খুব পারি।

বনগাঁ আমি কখনও যাই নি। শুনেছি সে মস্ত বড় শহর-জায়গা। কত গাড়ী ঘোড়া, লোকজন, রেলগাড়ী—আরও কত কি দেখার জিনিস সেখানে। আমাদের গ্রামের কিছু দূরে যে পাকা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরে পূবদিকে তিনক্রোশ রাস্তা নাকি যেতে হয়।

ওখানে বড় স্কুল আছে। আমাদের গাঁয়ের গিরীন ডাক্তারের ছেলে সুরেন সেখানে স্কুল-বোর্ডিংএ থেকে পড়ে। মাঝে মাঝে ফিরে এসে বনগাঁ শহরের কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প করে শুনেছি। সেখানে যাবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মা কিছুতেই আমাকে সেখানে যেতে দেবে না। গেলে নাকি আমি গাড়ীঘোড়া চাপা পড়ব। গাড়ীঘোড়া কি লোকের দিকে তেড়ে ছুটে আসে? সাবধান হয়ে বেড়ালেও কি লোকে গাড়ীঘোড়া চাপা পড়ে?

অনেক বুঝিয়ে মাকে রাজী করাই। আট আনা পয়সা দিয়ে মা বললেন—এটা কাপড়ের খুঁটে আলাদা করে বেঁধে নে—তুই আবার যে রকম ছেলে, হারিয়ে ফেলবি কোথায়। আর তুই কিছু কিনে খাস, এই নে চার পয়সা।

আমি বললাম—আরও দুটো পয়সা দাও।

—আবার কি হবে?

—দাও না। খেলনা কি নতুন জিনিস কিনে আনব!

—যা নিয়ে।

ভাদ্রমাস। চারিদিকে সবুজ আমন ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে ঢেউ খেলছে। বন-ধুঁধুলের বড় হলদে ফুল ঝোপে ঝোপে ফুটে রয়েছে। শুকনো কাঠ ভেঙে পড়েছে পাকা রাস্তার উপর

একটা চটকা গাছের তলায়। একটা বিলিতি শিরীষ গাছে মাকাল ফল পেকে ঝুলছে। পাট-বোঝাই একখানা গরুর গাড়ী আমার আগে আগে চলেছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে করতে।

আমার মন খাঁচা-খোলা পাখীর মত হয়ে গিয়েছে। কোথায় যেন চলেছি কত দূরে!

রক্ত-কুঁচের কাঁটালতায় হলুদ ফুল ফুটেছে, তার কেমন গন্ধ! লতা বেয়ে কাঠবেড়ালি উঠেছে ঝোপের মাথায়। দাঁড়িয়ে দেখে দেখে যেমন একটা ঢিল মেরেছি, অমনি পালিয়ে গেল।

পাটবোঝাই গাড়ীটা এবার ধরে ফেলেছি! একটা বুড়ো মুসলমান গাড়ী চালাচ্ছে, একটি ছোট ছেলে পাটের বস্তার ওপর বাঁশ ধরে বসে আছে। বুড়োকে দেখতে আমাদের গাঁয়ে ময়জদ্দি কাকার মত।

আমি বললাম—কোথাকার গাড়ী?

বুড়ো গাড়োয়ান বললে—সনেকপুরির।

—কোথায় যাবে?

—বনগাঁয়ে কুণ্ডুদের আড়তে।

—আমায় নেবে?

—উঠতি যদি পার ওপরে, তবে চল।

—গাড়ী থামাও!

—থামাতি পারব না, পেছন দিয়ে ওঠ।

—হ্যাঁ, পড়ে মরি আর কি! যাও তুমি চলে।

—ওঠ না খোকা, ভয় কি।

—না, তুমি যাও—তোমার আগে বনগাঁ পৌঁছে যাব।

খানিকক্ষণ জোর পায়ে হাঁটবার পরে কোথায় পড়ে রইল গরুর গাড়ীটা! বার বার খুশির সঙ্গে পেছন ফিরে চেয়ে দেখতে লাগলাম। একজন বাগ্দী মস্ত বড় একটা মাছ নিয়ে চলেছে বনগাঁর দিকে। তাকেও গিয়ে জোর পায়ে ধরে ফেললাম। সে আমার দিকে ফিরে চাইলে। দু একবার চাইবার পর বললে—বাবা, কোথায় যাবা?

—বনগাঁ।

—কেন?

—গরু পণ্টে গিয়েছে, আনতে যাব।

—আপনাদের বাড়ী কনে?

—গোপালনগর।

—ওখানে তো পণ্ট আছে।

—সে পণ্টে নেই, আজ দুদিন হারিয়েছে। মা বললে, বনগাঁর পণ্ট খুঁজে আসতে।

—আজকাল দুষ্টুমি করে দূরির পণ্টে দেয়। তা চল মোর সঙ্গে।

খানিকদূর গিয়ে পথের ধারে একটা বনজঙ্গলের মধ্যে তালগাছ থেকে ধুপ করে একটা

তাল পড়ল। আমি ছুটে আনতে যাচ্ছি, মাছওয়ালা বাগ্দী আমাকে বললে—কোথায় যাচ্ছেন বাবা? যাবেন না। জঙ্গলের মধ্যে সাপখোপ আছে। এখন বিকেলে রোদ নেই, দেখতে পাবেন না। আর তাল নিয়ে বইবেন কেমন করে?

সে কথা ঠিক। বইব কি করে অত বড় তালটা সে কথা ভেবে দেখি নি। তাল পড়বার শব্দ হলেই দৌড়নো চাই। তখন আরও মনে পড়ল আমাদের পুকুরধারেই জ্যাঠামশায়দের তালগাছ থেকে আজই সকালে দুটো বড় বড় তাল কুড়িয়ে এনেছি। গিয়ে আরও কত কুড়োবো। কি হবে এখান থেকে তাল বয়ে নিয়ে গিয়ে? রাস্তার দু-ধারে খালি বনজঙ্গল। এক জায়গায় বুনো করমচা পেকে আছে দেখে তুলতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গী বারণ করলে—যেও না যেও না। ও তুলো না—

—কেন?

—কেন আবার! বাড়ী থেকে সদ্য বেরিয়েছ ছেলেমানুষ। ও ফল খেলি হাড়ের জ্বর এখুনি টেনে বের করে এনে ফ্যালবে।

—আমাদের বাড়ীতে তো কত খায়।

—খায় রেঁধে। কাঁচা কেউ খায় বলতি পার?

ওর ওপর আমার বড় রাগ হল। ও কি আমার অভিভাবক, যা করতে যাচ্ছি তাতেই বাধা দিচ্ছে? তাল কুড়ুতে দেবে না, করমচা খেতে দেবে না, ভাল রে ভাল! তুমি তোমার পথে যাও, আমি আমার পথে যাই। আমি ওকে বললাম—বনগাঁ কতদূর হবে?

—এইবার চাঁপাবেড়ে ছাড়ালি তবে বনগাঁ।

—তোমার বাড়ী কোথায়?

—সাতবেড়ে।

দূর থেকে একটা সাদা কোঠাবাড়ী চোখে পড়ছে। ওই হল বনগাঁ শহর। আমার মন আনন্দে ও ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। না জানি কত কি জিনিস এখুনি চোখে পড়বে! কত বড় শহর বনগাঁ। কি বড় বড় বাড়ী!

শহরে ঢুকে দু পাশে দেখতে দেখতে চললাম। মাছওয়ালা বাগ্দী তখনও আমার সঙ্গ ছাড়ে নি; সে বললে, চলুন, আপনি ছেলেমানুষ, আমি পণ্টঘর আপনাকে দেখিয়ে দিই।—আমি যদি তখন তার সদুপদেশ শুনতাম! যাগ গে। আমি তখন ওর ওপর ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠেছি। আমি এসেছি বেড়াতে, বাবার আর মার শাসন থেকে দূরে। আমি এখানে যা খুশি তাই করব। তুমি কে হে বাপু সব সময়ে আমার পেছনে লেগে আছ? আমার গরু আমি নিই না-নিই সে আমার খুশি। পণ্টে গিয়ে গরু পেলেই আমায় এখুনি গরু নিয়ে বাড়ী ফিরতে হবে, আমি একটু বেড়িয়ে দেখতে পারব না। আমি এসেছি শহর বেড়িয়ে দেখতে।

বাগ্দী সত্যিই আমায় ছেড়ে এবার অন্য দিকে চলে গেল। আমি আজ বাড়ী ফিরব না। তুমি যাও।

আমি আরও এগিয়ে গিয়ে বাজারে পড়লাম। কি লোকজনের ভিড়! ঝুমঝুমি বাজিয়ে এক জায়গায় কি বিক্রি হচ্ছে। চানাচুর! সে আবার কি জিনিস? একটা লোক ঝুমঝুমি বাজিয়ে বলছে—চা-না-চু-র, মজার চানাচুর গরম। যে খাবে ও পস্তাবে, যে না খাবে ও ভি পস্তাবে—মজার চানাচুর গরম!

কি ও জিনিসটা? খেয়ে দেখব?

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম—কত দাম? কি জিনিস?

—চানাচুর গরম!

—এক পয়সার দেবে?

—কাহে নেহি দেবে বাবা? এই লাও।

লোকটা একটা শালপাতার ছোট ঠোঙা আমার হাতে দিলে। আমি ঠোঙা খুলে ভেতরের জিনিস দেখতে গেলাম তাড়াতাড়ি। ও মা! ছোলা ভাজা আর কি কি ভাজা। কেমন চমৎকার মসলা! একগাল খেয়ে দেখলাম—ও মা, কি চমৎকার। আর এক পয়সার চানাচুর নিলাম, বাড়ী নিয়ে যাব ছোট ভাইটার জন্যে।

একজায়গায় একটা মুচি জুতো সেলাই করছিল! তার সামনে একটা লোহার তিনপায়া জিনিস, তার ওপর রেখে জুতোয় ঠুকছিল পেরেক। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। সেখানে কি সব বড় বড় দোকান। কত রকম জিনিস সাজানো। একটা দোকানে নানারকম ফল বিক্রি হচ্ছে, সেই দিকে গিয়ে দেখি, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না আমাদের গাঁয়ে—কি বিক্রি হচ্ছে বল তো? আম! কেউ কখনও শুনেছে ভাদ্র মাসে আমের কথা! আষাঢ়ের প্রথমে দু-একটা গাছে আম থাকতে দেখা যায় আমাদের ওদিকে। আম এখনও বিক্রি হয়, পাকা আম? আমি সেই ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমগুলো কতক্ষণ ধরে দেখলাম। কত শিল-নোড়া একটা দোকানে। এত শিল-নোড়া কেনে কে? কত রকম টোপর বিক্রি হচ্ছে একটা দোকানে। টোপর তো মালীরা করে দেয় দেখেছি, দোকানে বিক্রি হয় জানতাম না। পেছন দিকে একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখি—এর নাম কী গাড়ী? বা রে। মানুষে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ তার ভেতরে লোক বসে! একজনকে বললাম—ওটা কী গাড়ী?

—রিক্শা গাড়ী বলে ওকে খোকা।

—রিক্শা গাড়ী?

—হ্যাঁ! দেখ নি কখনও? তোমার বাড়ি কোথায়?

—গোপালনগর। পাড়া গাঁ।

—তাই দেখ নি। এ গাড়ী এখানেই নতুন এসেছে। একখানা মাত্র দেখছি।

আরও এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা ফাঁকা জায়গায় ভিড় করে গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। কি ব্যাপার?

দেখি একটা লোক ফড় খেলছে। চার পয়সা দিলে চার আনা ফেরত দিচ্ছে জিতলে।

আমি ফড়খেলা আমাদের গাঁয়ে মেলার সময় দেখেছি। বাবা খেলতে দেয় না। নইলে আমার খেলার খুব ইচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছি, আরও অনেক লোক দেখছে। খেলছেও অনেক লোক। এই উপযুক্ত সুযোগ, আর আসবে না। মায়ের দেওয়া আট আনাটা কিছু না ভেবেই একটা ঘরে দিলাম।

খেলার মালিক বললে—কার আধুলি ?

—আমার।

—আধুলি উঠিয়ে নাও।

—কেন ? আমি খেলেছি যে !

—না, তুমি আধুলি নিয়ে চলে যাও।

—না, আমি খেললাম যে ! বা রে !

—হেরে গেলে আমার কোন দোষ নেই কিন্তু খোকা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, আমি এবার ঠিক ধরেছি। জিতব বলে ও শুধু ঐ রকম করছে। চালাকি পেয়েছে ! আমি বললাম না, তোমার কোন দোষ কেন থাকবে।

লোকটা অমনি ফড়ের বাটি তুলে বললে—এই চলে এস—ছক্কা। তোল দান।

বাস্! আমার আধুলি তিরির ঘরে। চক্ষের নিমেষে সে আধুলিটা আত্মসাৎ করলে।

বললে—গেল খোকা ? তোমায় বললাম ভাল কথা, তোমার আধুলি তুলে নাও—শুনলে না।

আমার চোখে যেন সরষের ফুল দেখলাম।

হাতে আর একটা পয়সাও নেই আমার। পণ্টের গরু কি দিয়ে খালাস করে নিয়ে যাব ? সর্ব্বনাশ। সেই মাছওয়ালা বাগ্দী লোকটা সৎপরামর্শই দিয়েছিল, তখন কেন শুনলাম না। বাবা অবিশ্যি বাড়ী থাকেন না, মা শুনলে কি বলবে ? আ-ট আ-না পয়সা গেল ! এক আধটা কি। আহা, সেই অপূর্ব্ব বস্তু চানাচুরও যদি কিনতাম ঐ আট আনা দিয়ে, এতগুলো দিত। বাড়ীর সবাই খেয়ে খুশী হত। এভাবে একেবারে মূলে-হাভাত হত না আধুলিটা।

না আর কোথাও দাঁড়ালাম না।

মন বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শহর অতি খারাপ জায়গা। পেট চুঁই-চুই করছে ক্ষিদেতে। চার পয়সা আছে সঙ্গে, ওই পয়সায় পান কিনে নিয়ে যেতে হবে মার জন্যে। মা পান পেলে খুশী হয়। হয়তো আধুলি খোয়ানোর রাগটা একটুখানি কমতে পারে। পান কোন্ দিকে বিক্রি হয় ? পান নিয়ে যাই চার পয়সার। বেলা পড়ে আসছে ! তিন ক্রোশ রাস্তা এখন যেতে হবে।

গল্প নয়

সেদিন হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে ঢুকে দেখি কামরাতে আদৌ ভিড় নেই।

সকালের ট্রেনে কামরা অনেকটা খালি পাওয়া যায় বটে। নিজের ইচ্ছামত বিছানা পেতে নিয়ে বসেছি, এমন সময় একটি বৃদ্ধ মুসলমান একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ঢুকল এবং আমার বিছানার অদূরে বসল।

খবরের কাগজ পড়বার ফাঁকে খবরের কাগজের ওপর দিয়ে ওদের চেয়ে দেখলাম। এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে কখনও পড়েছে কিনা সন্দেহ। বৃদ্ধ মুসলমান পরম যত্নে শিশুটিকে কোলের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছে। কিন্তু শিশুটির চেহারা দেখে মনে হল, বেশিদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস ওকে ভোগ করতে হবে না। শুধু কখানি হাড়ের ওপর চামড়া দিয়ে ঢাকা, মাংস আদৌ নেই বললেই হয়, সেইজন্যে হাঁটুর ও পায়ের নীচের চামড়া কুঁচকে জড়ো হয়ে এসেছে। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, মাথার চারিদিকে বড় বড় সাত-আটটি ঘা। ওষুধের তুলো লেপটানো রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে আমরা যেমন করে থাকি, তাই করলাম।

কড়া স্বরে বললাম—সরে বস না বাপু, একেবারে ঘাড়ের ওপরে কেন! গাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা তো পড়ে রয়েছে। বৃদ্ধ মুসলমানটি আমাকে বলতে পারত অনায়াসেই—কেন মশাই, আপনার বিছানাতে আমি বসি নি তো। তফাতেই বসে আছি, তবে সরে বসতে বলছেন কেন? টিকিট করে আপনিও যাচ্ছেন, আমিও যাচ্ছি। আপনি সরে বসতে বলবার কে?

কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেমন সাধারণত হয়ে থাকে—লোকটি সরে বসল। আমি আবার আমার খবরের কাগজে মন দিলাম।

একবার গাড়ীতে ফেরিওয়ালা উঠে বিস্কুট ফেরি করতে লাগল। মুসলমানটি শিশুকে দুখানা বিস্কুট কিনে দিলে। আর একবার তাকে চানাচুর কিনে দিলে। আমার মনে হল আমার নিজের ছেলে হলে তাকে এই রুগ্ণ অবস্থায় আমি কি বিস্কুট-চানাচুর খাওয়াতাম?

কিন্তু মুখে কোন কথা ওকে বলি নি।

যা খুশি করুক, আমার বলবার দরকার কি?

এক একবার চেয়ে দেখি, আমার বিছানার কাছে এসে বসল কিনা। কি কুশ্রী কদাকার হয়েছে দেখতে ছোট ছেলেটা!

ইতিমধ্যেই অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। গাড়ীতেও লোকজনের যথেষ্ট ভিড় হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ আমার কানে গেল একটি ছোট মেয়ের স্নেহময় স্বরে কে যেন বলছে—এ বিস্কুটগুলো তেমন মিষ্টি নয় বলে খোকা খাচ্ছিল না—এখন দেখ কেমন খাচ্ছে। না মা, দেই, কেমন হাত দিয়ে মুখে তুলে কুটুর কুটুর কাটছে—

এমন ধরনের কথা এবং এমন ধরনের স্বর আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত বলেই প্রথম ওই কথাটা আমার অন্যমনস্ক মনকে আকৃষ্ট করে!

আমাদের ছোট্ট খোকাটি যখন তার মামার বাড়ী যায় তখন তার ছোট মাসি ও মামাতো বোনেরা এমনি স্নেহমাখা আগ্রহ নিয়ে খোকার প্রত্যেকটি তুচ্ছ কাজ এবং অকাজ লক্ষ্য করে এবং ঐ রকম সুরে সহর্ষ মন্তব্য করে।

সোজা হয়ে উঠে বসে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। ইতিমধ্যে কখন দুটি স্ত্রীলোক এসে গাড়ীতে ঢুকেছিল আমি লক্ষ্য করি নি। একটি তরুণী বধূ, মলিন শাড়ী পরনে, রুক্ষ চুল, মুখশ্রী সুন্দর, চোখ দুটিতে পল্লী-প্রান্তের শান্ত অবসর। বধূটির পাশে আধা-বয়সী একটি থানপরা স্ত্রীলোক, কিন্তু এর রং কিছু ফর্সা, তরুণীটির রং কালো।

দুজনেই থলে নিয়ে চলেছে এই ট্রেনে চাল আনতে। এরা সম্ভবত উঠেছে বাগনান স্টেশনে, যাবে বোধ হয় ঝাড়গ্রামে। প্রত্যেক স্টেশনেই দেখেছি চাল আনবার জন্যে পল্লীর গরিব মেয়েরা ভিড় করে উঠছে। কোথা থেকে এরা চাল আনে তা ঠিক বলতে পারব না।

এরা দুটিও সেই দলের লোক। এদের সঙ্গের আট ন বছরের থাটো কাপড় পরা খুকীটি বোধ হয় আধা-বয়সী স্ত্রীলোকটির মেয়ে।

তরুণী বধূটি জিজ্ঞেস করছে বৃদ্ধ মুসলমানটিকে—সেখানে তারা বুঝি রাখলে না?

এদের আগের কথাবার্তা আমি শুনি নি। কারা রাখলে না, কোথায় রাখলে না, এ সব কথা নিশ্চয় আগে হয়ে গিয়ে থাকবে।

বৃদ্ধ বললে—না গো। তাইতে তো একে নিয়ে যাচ্ছি।

—মা কতদিন মারা গিয়েছে বললে?

—এ তখন সাত মাসের।

শুনেই মেয়ে দুটি পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে। তরুণীটি বললে—আহা!

অন্য মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে—এখন একে কোথায় নিয়ে যাবে?

—বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি।

—একে সেখানে দেখবার লোক আছে?

—না গো, কেউ না, আমাদেরই দেখতে হবে।

—ডাক্তার দেখানো হয় নি?

—কিছু না। পরে কি করে গো?

—বয়েস কত হল?

—এই এগারো মাস।

—আহা, শরীরে শুধু হাড় আর চামড়া সার হয়েছে।

—তা নসিবের দোষ। কি করব। এখন খোদা যদি বাঁচান, তবেই বাঁচবে।

—কি খেতে দিচ্ছ?

—কি দেব, যা জোটে। আমি একা মানুষ বলেই তো কলকেতায় ওদের ওখানে রেখেছিলাম। এমন হাল করবে তা কি করে জানব। করে, এখন খবর দিয়েছে, নিয়ে যাও।

—ঠাণ্ডা মোটে লাগিও না, বিষ্টি হচ্ছে, জানালাটা বন্ধ করে দাও। আহা, এমনিতেই তো ওর কাসি হয়েছে!

আরও কত কি প্রশ্ন মেয়ে দুটি করতে লাগল, আমার সব মনে রাখবার কথা নয়। আমার এটি গল্প নয়; সুতরাং বানানো কিছু এর মধ্যে স্থান পাবে না। এইটুকু আমার মনে আছে, ওরা দুজনে যতগুলি প্রশ্ন করলে, সবগুলি ঐ ছোট্ট রুগ্‌ণ খোকার রোগ সম্বন্ধে, পথ্য সম্বন্ধে, ওর চিকিৎসা সম্বন্ধে, ওর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে। একবার তরুণী বধূটি করে আর একবার অন্য মেয়েটি করে। এ একবার ও আর বার। যা কিছু প্রশ্ন, সব ওই খোকাকে ঘিরে। আর ওদের চোখে—বিশেষ করে সেই তরুণী বধূটির চোখে—অদ্ভুত স্নেহঝরা দৃষ্টি।

একবার খোকা হাঁচল।

তরুণী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—জীব!

আমার অন্যমনস্কতা চলে গিয়েচে ততক্ষণ। আমি বিস্মিত হয়ে উঠেছি। এমন একটা ঘটনা যেন দেখছি যা শুধু এই বিংশ শতাব্দীর নয়, সর্ব্বকালের, সর্ব্বযুগের। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসায়, শঠতায়, নিষ্ঠুরতায়, স্বার্থপরতায়, ঈর্ষায় যে বিংশ শতাব্দীর নভোমণ্ডল আজ ধূমমলিন—যে বিংশ শতাব্দীতে আছে শুধু অর্থের আদর—সেখানে এই ময়লা-শাড়ী-পরনে দরিদ্রা পল্লীবধূটি ও তার করুণাময়ী সঙ্গিনী এক নতুন বার্ত্তা শুনিয়ে দিলে। সে বার্ত্তা নতুন হলেও হিমালয়ের মতই পুরনো।

এই গাড়ীর মধ্যে এত পুরুষ মানুষ ছিল, কেউ ফিরেও চেয়ে দেখে নি ছেলেটার দিকে। সনাতনী মাতৃরূপা নারী দুটি এসে এই মাতৃহীন মৃত্যুপথযাত্রী শিশুকে মাতৃস্নেহের বহু-পুরাতন অথচ চির-নূতন বাণী শুনিয়ে দিলে: সেদিন সে ট্রেনের মধ্যে গুটি-কয়েক ক্ষণের জন্য বিংশ-শতাব্দী ছিল না—সমাজদ্রোহী, কালোবাজার-পুষ্ট, লোভী বিংশ-শতাব্দী। ছিল সেই অমর মাতৃলোক, বিশ্বের সমগ্র জীবজগৎ যার করুণাধারায় বিধৌত।

পাঁশকুড়া স্টেশনে বধূটি ও তার সঙ্গিনী ট্রেন থেকে নেমে গেল।

কুশল পাহাড়ী

কুশল পাহাড়ী

ভাদ্রের শেষে মনোহরপুর বেড়াতে গিয়েছিলুম সেবার। কাছেই অরণ্যময় সুন্দরগড় স্টেট। মনোহরপুর স্থানটা চারিধারে শৈলাচলে ঘেরা। বেড়াতে এসেছিলুম দুদিনের জন্যে, এখানে থাকবো ঠিক করেছিলুম ডাকবাংলোয়। কিন্তু আলাপ হয়ে গেল স্থানীয় এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি নিয়ে গেলেন তাঁর বাসায়, ছাড়লেন না কিছুতেই।

আমি বল্লাম—আপনার অসুবিধে হবে। হয়তো বেশিদিন থাকবো।

তিনি মৃদু হেসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—আঃ বাঁচলুম। দুমাসের বেশিও কি থাকবেন।

—না।

—থাকুন না।

—না।

—তবে কেন 'কিন্তু' করচেন? প্রবাসে বাঙালীর বন্ধু বাঙালী। স্বদেশে তা নয়। জানেন তো সঞ্জীববাবুর উক্তি? যতদিন ইচ্ছে থাকুন। নিজের বাড়ী মনে ভাববেন।

মনোহরপুর থেকে ন' ক্রোশ দূরে কুশল পাহাড়ীর 'ভৈরব থান'—অর্থাৎ দেবতার ক্ষেত্র। একদিন মন্মথবাবু বল্লেন—যাবেন সতীশবাবু একটা খুব ভালো জায়গায়?

—কোথায়?

—ভালো একজন সাধু আছেন ওখানে। বড্ড জঙ্গল। রাস্তাও দুর্গম। গরুর গাড়ীতে যেতে হবে।

—আমার সাধু-সন্নিসিতে দরকার নেই। জঙ্গল আছে তো?

—রাম জঙ্গল।

—তবে যাবো।

সুন্দরগড় আরণ্য-প্রকৃতির লীলানিকেতন। পথে পথে করম গাছের ফুলের ঝরা পাপড়ি বিছানো। লম্বা-ঠোঁট ধনেশ পাখী ও বনটিয়া ডালে ডালে বেড়াচ্চে। কচিৎ কোনো পর্ব্বতচূড়ায় প্রভাতের সোনালী রোদ এলানো, কচিৎ কোনো পার্ব্বত্য ঝর্ণার জলের ধারে লোহাজালি ফুল ফুটে পাথর ঢেকে ফেলেচে। পথেরও শেষ নেই, অরণ্যেরও শেষ নেই, মুক্ত শৈলমালাবেষ্টিত ভূমিশ্রীরও শেষ নেই, প্রান্তরেরও শেষ নেই। বনে বনে ময়ূর, বনে বনে কোটরা, ভালুক, লেপার্ড।

গরুর গাড়ী চলেচে মন্থর গতিতে। কখনো ঢালু পাহাড়ীপথ উঠচে আমলকী গাছের ফলভারানত শাখাপ্রশাখার ছই ঘেঁষে। কখনো ফুল ছড়ানো উপত্যকা বেয়ে নামচে জলভরা নালার দিকে। কালীপাহাড়ীর শৃঙ্গ ঠেলে উঠেচে ঘনবনের ওপরে ভিসুভিয়াসের মোচাকৃতি শিখরদেশের মত।

সকালে গরুর গাড়ী ছাড়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিল চিঁড়ে, চিনি, কলা, দই, পাকা পেঁপে,

বাড়ীর তৈরি ক্ষীরের সন্দেশ ও আচার। পথে যোগাড় করে নিলাম বড় বড় ডাঁসা আমলকী, পাকা বনডুমুর, কাঁচড়াদাম শাক। বর্ষার দিনে পথের এই সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। সেদিন ভাবছিলুম আজ এ বন যেন শেষ না হয়। শেষ হলেই তো এ মায়া ফুরিয়ে যাবে। আবার পড়বে লোকালয়, তখুনি শুরু হবে ব্লাকমার্কেট, খবরের কাগজ, হপ্তায়-একদিন-ভাত-খেওনা-উপদেশ, উদ্বাস্তু-সমস্যা। এই রকম মায়া জগতের মধ্যে দিয়ে যতদিন চলে চলুক গাড়ী।

বেলা বারোটা।

একটা কি বন্য নদী বনের ছায়ায় ছায়ায় ছোট জলপ্রপাত তৈরি করে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলেচে। বর্ষার উচ্ছল জলস্রোতে প্রাণবন্ত।

বল্লাম সঙ্গীকে—কি নদী মশাই?

—কোয়েল নদীর শাখা।

—দক্ষিণ কোয়েল?

—নিশ্চয়। এই নদীর জলে এক রকম পাথর পাওয়া যায়, বেশ সুন্দর রং। আপনাকে দেখাবো···মনে হবে হাইনিজ্ জেড্। আসুন আগে একটা বড় পাথর আছে—তার ওপর বসে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।

—আপনি কতবার এসেচেন এদিকে?

—ভৈরব থানের সাধুজির সঙ্গে দেখা করতে চারবার এসেচি। দেখবেন, তিনি সাধারণ সাধু নন। ভক্তি হবে আপনার।

—'এমনকি আপনারও' বলা উচিত ছিল বোধ হয়। আমার মতামত তো কাল শুনলেনই।

সেই প্রকাণ্ড পাথরখানাতে একটা শতরঞ্চি বিছিয়ে আমরা বসে পড়লুম। ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল এ উক্তি আমাদের পেটের অবস্থার তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল ও অবাস্তব। ক্ষুধায় আমাদের পেটের ভেতরটা দাউ দাউ করে জলছিল। এ দেশের জলের গুণ আছে বটে। অগ্নিমান্দ্যে ভুগছিলাম গত একবছর, ক্ষুধাবোধ একেবারে ছিল না। বেশ পেট ভরে চিঁড়ে, দই ও ফল খেয়ে ঝর্ণার নির্ম্মল জল পান করে আবার গাড়ী ছেড়ে দিলাম। এবার অনেকটা পথ আমরা হেঁটে গেলাম—কেননা সব সময় গরুর গাড়ীতে যাওয়া বড়ই কষ্টকর। ছায়াস্নিগ্ধ বনবীথিতে বন্যকুসুম ছড়িয়ে দিয়েচে ঠাণ্ডা বাতাসে, অলস হয়ে এসেচে মধ্যাহ্নটি, এই দীর্ঘ অবকাশমুখর নিভৃত, নির্জ্জন, অরণ্য-পথে, কুঞ্জনবনে শুধু পাখীর মেলা, শুধুই সাদা মেঘের উড়ে-যাওয়া মাথার ওপরকার নীল আকাশের মাঝখানে, শুধুই ঘুঘুর ডাক দূরে দূরে গাছপালার মগডালে! বর্ষার মেঘ ওঠেনি তাই রক্ষে।

একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। নাগরিক জীবন থেকে বহু দূরের এই সব বনপথ সম্পূর্ণ নিরাপদ। চুরি ডাকাতি এখানকার লোকেরা জানে না। সঙ্গী বল্লেন—এদের কাছে টাকার বাক্স রেখে যাবেন, চেনেন না চেনেন, এসে আবার নিয়ে যাবেন—আমি জানি।

—রাস্তাঘাটে মেরে ধরে নেয় না? রিভলবার নেই? হাতবোমা নেই? জিপ নেই?

—ওসব শোনে নি কখনো এরা। চুরিই জানে না।

—চলে কি করে এদের? চাষ তো তেমন দেখচি নে।

—বিরহোড় জাত এদিকে বেশি। তারা বনের গাছে শিমের লতা তুলে ছায়—যেখানে সেখানে। ওই শিমই তাদের খাদ্য। আর পাখী, খরগোশ, গিরগিটি, সাপ সবই ওদের খাদ্য। অল্পে সন্তুষ্ট, খাটতে চায় না। মহুয়ার তাড়ি খেয়ে তিন দিন বুঁদ হয়ে রইল। টাকার মূল্য বোঝে খুব কমই।

একটি বিরহোড় পরিবারের পর্ণকুটির পড়লো পথের পাশে বনের আড়ালে। পুরুষ নেই। মেয়েরা উদূখলে চিঁড়ে কুট্‌চে। সুন্দর, সুঠাম দেহভঙ্গি, অটুট স্বাস্থ্য উপচে পড়চে সারা শরীর বেয়ে। মুখের হাসি পবিত্র, সলজ্জ। ওদের ঘরের কাছে অন্য কোনো ঘর নেই—আছে দূরে দূরে। কোনো বাঙালীর মেয়ে এই নিবিড় বনের মধ্যে এমনধারা পর্ণকুটিরে একা ছেলেপুলে নিয়ে থাকতে পারবেন না একদিনও। তাঁদের সভ্যতাদুর্ব্বল মন বাঘ ভালুক ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাবে একদিনে। হাতে পায়ে খিল লাগবে।

সভ্যতা আমাদের শরীর ও মন নিস্তেজ করে দিয়েচে, এ কথার সত্যতা শহরে থেকে তত উপলব্ধি করা যাবে না। এক ট্রামস্টপ থেকে অন্য ট্রামস্টপ পর্য্যন্ত যেতে হলে যেখানে লোকে ট্রামে ওঠে, সেখানে থেকে বুঝতে পারা যাবে না মুক্ত অরণ্য জীবনের সাহস, শক্তি, তেজ কষ্ট-সহিষ্ণুতা। ভাল করে বুঝলাম সেটা আজ।

অস্তদিগন্ত পাটল বর্ণের রঙে আকাশ রাঙিয়েচে, বনতরুর শীর্ষে শীর্ষে রাঙা আলো, লতার তুলুনি ঝোপে ঝোপে—এমন সময় ভৈরব থানে আমরা পৌঁছে গেলাম। সাথী বল্লেন—সঙ্গে মশারী আছে আমাদের?

—নেই।

—তবে?

—মশা খুব?

—মনে হচ্চে এখানে মশা আছে।

—চীনে ধূপ দু-একটা সুটকেসে আছে, জ্বালাবো এখন। থাকবো কোথায়?

—একটা ঘর আছে সেখানে কেউ থাকে না। গাড়োয়ানকে দিয়ে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নেবো। রান্না করা যাবে রাত্রে।

—খুব ভালো। এ তো এক রকমের পিক্‌নিক্। এখন মনে হচ্চে মেয়েদের নিয়ে এলে খুব আমোদ হত।

—সামনের পূর্ণিমায় মেলা হবে এখানে। কলকাতা থেকে মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে আসুন সে সময়ে, চমৎকার হবে।

—সাধুজীর সঙ্গে দেখা হবে না এখন?

—নিশ্চয়ই হবে। চলুন, ডেরা ঠিক করে নিয়ে তারপর ওখানে যাওয়া যাবে।

বাসা ঠিক হয়ে গেল তখনি। বেশি পরিষ্কার করতে হল না—কিন্তু ঘরের মেঝেতে

গোটাকতক গর্ত্ত দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এই বর্ষাকালে গর্ত্ত যেখানে থাকে, সেখানে বিষাক্ত সর্পের আড্ডা। কি করা যায়? আমার সঙ্গী বল্লেন, অত ভয় পাবেন না। রান্না তো শেষ করি আগে।

মঙ্গল টুডু বলে একজন সাঁওতালের সঙ্গে কাঠের কথা বলতে সে কাঠ এনে দিতে রাজী হল। চার পয়সা মাত্র চুক্তি—আমাদের রান্নার সব কাঠ এনে দেবে। সে-ই বল্লে—কোন ঘরে রান্না করচিস তুরা?

—নাট মন্দিরে।

—কেনে রে? ওটায় যাসনি। ঘাটোয়ালী বাংলায় যা, তোদের জন্যেই তো সাহেবের বাংলো খোলা থাকে। লিয়ে যাবো চল্ সেখানে।

মঙ্গল টুডু আমাদের কাঠ ও জল এনে দিয়ে রান্নার সাহায্য করলে। ঘাটোয়ালী বাংলোয় আমরা গেলাম রান্না খাওয়ার পরে। তখন সন্দে হওয়ার পর ঘণ্টা-দুই কেটে গিয়েছিল।

ঘাটোয়ালী বাংলোটি খড়ের ঘর বটে কিন্তু সিমেণ্টের মেঝে, চেয়ার টেবিল খাটিয়া সব সাজানো আছে, এমন কি জানলায় দরজায় পর্দ্দা পর্য্যন্ত। শিমুল শালের ঘাটোয়ালী জমিদার গবর্ণমেণ্ট বন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বাসের জন্যে এই বাংলোঘর করে দিয়েচেন এবং তাঁর খরচে এটার মেরামত, পরিষ্কার ইত্যাদি চালু রেখেচেন দয়া করে নয়, ঘাটোয়ালী আইন-অনুসারে বাধ্য হয়ে। আমরা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী নই বটে কিন্তু বাঙালী ভদ্রলোক—সুতরাং সাত-খুন মাপ। চৌকিদার তখুনি সেলাম বাজিয়ে ঘর খুলে দিলে।

এইবার সাধুজীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্যে আমরা বেরুলাম। মঙ্গল টুডু আমাদের সঙ্গে ছিল, সে আমাদের জানালে, সাধু খুব বড়। মৌন থাকেন দিনে। রাত্রে কথা বলেন।

সাধু দেখে বিস্মিত হলাম। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স হবে, আবক্ষ বিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু, গলায় তুলসীর মালা, হৃষ্টপুষ্ট নাদুস-নুদুস দেহ, পিতৃস্নেহভরা শান্ত বড় বড় চোখদুটি। বাঙালী সাধু, মানভূম জেলায় বাড়ী ছিল। সতেরো বছর বয়স থেকে উদাসী, গৃহত্যাগী। সব খোলাখুলি বল্লেন আমাদের কাছে। সাধুসুলভ গর্ব্বের অস্পষ্টতা নেই তাঁর।

সাধুজী বসে ছিলেন একটা সুপ্রাচীন বিশাল শালতরুর গুঁড়ি ঘেঁষে খুব বড় ও চওড়া একখানা মসৃণ শিলাখণ্ডের ওপর। শুক্লা নবমী তিথির জ্যোৎস্না ডালপালার ফাঁকে ওঁর আসনে এসে পড়েচে। কুশল পাহাড়ীর শৈলশ্রেণী ভৈরব থানকে চারিদিকে ঘিরেছে। বহু পুরাতন পাথরের চাঁই। সব যেন এখানে সুপ্রাচীন—প্রাচীন সাধু, প্রাচীন শালবৃক্ষ, প্রাচীন শিলাসন, প্রাচীন অরণ্যভূমি! মনে হল এ পরিবেশ ছেড়ে আর কোথাও যাচ্চিনে। থেকে যাই এখানেই। ঋষি, সাধু, প্রবক্তাদের জ্যোতির্ব্বাহিনী এখানেই, এ জিনিস আর কোথাও পাবো না।—সুন্দরগড় রাজ্যের এই সুদূর বনভূমিতে যে বৃদ্ধ, পিতৃবৎ স্নেহশীল, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির পাদমূলে এসে আজ পৌঁছেচি, তিনিই মনে শান্তি এনে দেবেন। পথেঘাটে এ দুর্লভ জিনিসের সন্ধান মেলে না।

আরো মুগ্ধ হলাম যখন সাধুজী ঈশোপনিষদের একটা শ্লোক উচ্চারণ করে তার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বার বার বলতে লাগলেন, "কবির্মনীষী পরিভূঃ সয়ম্ভু।" শ্লোকটির মধ্যেকার 'কবি' কথাটার অর্থ—বৃদ্ধ। সাধুর মুখের সেই মধুর গম্ভীর বাণী আজও কানে বাজচে :

"কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখছি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ুর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি, কবিই বটে তিনি। আমি কিছু পাইনি বাবা। ভড়ং দেখচো, এ সব বাইরের। ভেতরের জ্ঞান কিছু হয়নি। তবে দেখতে চেয়েচি তাঁকে। তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েচি।"

এ সব বছর সাতেক আগেকার কথা।

আবার কলকাতা শহরে দুবেলা নিয়মিত অফিস করচি। অর্থের সচ্ছলতা এমন নেই যে যখন তখন বা প্রতিবৎসর বেরিয়ে যাবো বেড়াতে। সেদিন একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম। বড়লোকের বাড়ীর পার্টি। অনেক বড়লোকের আনাগোনা দেখলাম—ক্রাইসলার হাঁকিয়ে, বুইক হাঁকিয়ে, মিনার্ভা হাঁকিয়ে। বেশ সুন্দর সব চেহারা, কেতাদুরস্ত সাজগোজ।

কিন্তু এত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন লোকের সম্মেলনে সেদিন যা আশা করে গিয়েছিলুম তা পেলাম কই ? শুধুই শুনলুম বৈষয়িক কথাবার্ত্তা।

যেমন—

—দেওঘরের বাড়ীটাতে এবার যাওয়া হল না। বড় ছেলের ইচ্ছে, আরো কিছু ফার্ণিচার কিনে পাঠিয়ে দিলাম। কেউ গেল না গতবার, এবারও না। ওটা আর রাখবো না। আমার তো নিজের সময় নেই যাওয়ার। ছেলেরাও যেতে চায় না। বিষণলাল দালাল চল্লিশ হাজার দর দিয়েছিল মার্চ মাসে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছে নয় বাড়ী বেচি। অথচ যাওয়াও হয় না। আপনার রিজেণ্ট পার্কের জমিটাতে কিছু করলেন ?

—হ্যাঁ, প্ল্যান শ্যাংশন করতে দেওয়া হয়েচে। আশি হাজারের ওপর এস্টিমেট দিয়েচে বাগচি। ওরাই করবে। পি. ঘোষালের বাড়ীটা তো বাগচি করলো—চমৎকার করেচে।

অথবা—

—ইলেক্শনের আগে এই সব মজুর শ্রমিকের গোলমাল কেমন মনে করেন ?

—ভালো না। সব জায়গায় চলচে। যে পার্টি মনে ভাবুন এদের সপক্ষে যাবে না, ইলেক্‌শনের সময় তাদের মুশ্‌কিলে পড়তে হবে।

—সে তো বোঝাই যাচ্চে। ইলেকশনের আগে দেশের মধ্যে বিরোধ, দলাদলির ফল এই দাঁড়াবে—

তারপর চললো বিশ্লেষণ। রাজনৈতিক তথ্যের বিশ্লেষণ।

সেই বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত, সুবেশ, সুশিক্ষিত, ভদ্রজনসমাগমের মধ্যে বসে আমার মনে আসছিল কুশল পাহাড়ীর সেই প্রাচীন সাধুর কথা। তাঁর সেই সুন্দর সরল বাণী, নির্জ্জন

বনানীঘেরা বটতলটিতে যা সে-রাত্রে উচ্চারিত হয়েছিল, এখানে বসে আবার তারই স্মৃতি জেগে উঠলো অতীত দিনের দ্রুত, আধো-ভোলা, আধো মনে-পড়া কোনো মধুর গানের একটি চরণের মত।

আর একটি কথা তিনি বলেছিলেন।

কি অদ্ভুত লাগছিল সেটা সেই ভরা ভাদরের বেতসকুঞ্জ ও শালবীথির পরিবেষ্টনীতে। মস্ত বড় একটি বাণী।

বলেছিলেন তিনি :

—মুক্তির ধারণা বন্ধন আছে বলেই আসে। যথার্থ বিচারের দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তিও নেই বন্ধনও নেই। ব্রহ্ম এক অচিন রাজ্য, যে যেখানে যায়, সেই বোঝে ব্রহ্ম দ্বৈতও নয় অদ্বৈতও নয়। তিনি শাস্ত্রেরও পারে, বাদানুবাদেরও পারে, দ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য নয়, অদ্বৈতবাদেরও প্রাপ্য নয়! অনুভূতিই একমাত্র জিনিস। মানুষ মুক্ত আছেই, কেবল সে-সম্বন্ধে সচেতন নয় সে। মানুষ সদামুক্ত, সে মানুষ। কিছু পড়তে হবে না। কিছু সাধনা করতে হবে না। অনুভূতিই উত্তরায়ণের সেই অভিযাত্রী, যা তাকে পলকে মুক্তির জ্যোতির্লোকে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে! বিশ্বাস কর বাবা। মানুষ মুক্ত। সে-ই নিজেকে নিজে বেঁধেছে। সে-ই অনুভব করুক সে মুক্ত! সে মানুষ, সে মুক্ত।

ঝগড়া

সন্ধ্যার সময় কেশব গাঙ্গুলীর ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেল দুই কন্যা ও স্ত্রীর সঙ্গে। কন্যা দুটিও মায়ের দিকে চিরকাল। এদের কাছ থেকে কখনো শ্রদ্ধা ভালবাসা পান নি কেশব।

শুধু এনে দাও বাজার থেকে, এই আক্রা চাল মাথায় করে আনো দেড়কোশ দূরের বাজার থেকে। তেল আনো, নুন আনো, কাঠ আনো—এই শুধু ওদের মুখের বুলি। কখনো একটা ভালো কথা শুনেছেন ওদের মুখ থেকে?

ব্যাপারটা সেদিন দাঁড়ালো এইরকম।

সন্ধ্যার আগে কেশব গাঙ্গুলী হাট করে আনলেন। তাঁর বয়েস বাহাত্তর বছর, চলতে আজকাল যেন পা কাঁপে—আগের মত শক্তি নেই আর শরীরে। আড়াই টাকা করে চালের কাঠা। দু কাঠা চাল কিনে, আর তাছাড়া তরিতরকারি কিনে ভীষণ কর্দমময় পিছল পথে কোনরকমে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে কেশব গাঙ্গুলী তো হাটের বোঝা বাড়ী নিয়ে এলেন।

স্ত্রী মুক্তকেশী বললে—দেখি কি রকম বাজার করলে? পটোলগুলো এত ছোট কেন? কত করে সের?

—দশ আনা।

—ও বাড়ীর পণ্টু এনেচে ন' আনা সের। তুমি বেশী দর দিয়ে নিয়ে এলে, তাও ছোট পটোল। ও কখনো দশ আনা সের না।

—বাঃ, আমি মিথ্যে বলছি ?

—তুমি বড্ড সত্যবাদী যুধিষ্ঠির—তা আমার ভালো জানা আছে। আচ্ছা, রও, ও পটোল আমি ওজন করে দেখবো।

—কেন আমার কথা বিশ্বাস হল না ?

—না। তোমার কথা আমার বিশ্বাস তো হয়ই না। সত্যি কথা বলবো তার আবার ঢাক-ঢাক গুড়গুড় কি ?

এই হল সূত্রপাত। তারপর কেশব গাঙ্গুলী হাত পা ধুয়ে রোজকার মত বললেন—ও ময়না, চাল ভাজা নিয়ে আয়—

ময়না কথা বলে না, চাল ভাজার বাটিও আনে না। তাতে বুঝি কেশব বলেছিলেন—কৈ, কানে কি তুলো দিয়ে বসে আছ নাকি, ও ময়না ?

ছোট মেয়ে ময়না নীরস স্বরে বললে—চাল ভাজি নি।

—কেন ?

—রোজ রোজ চাল ভাজা খাওয়ার চাল জুটছে কোথা থেকে ? তা ছাড়া আমার শরীরও ভাল ছিল না।

—কেন, তোর দিদি ?

—দিদি সেলাই করছিল।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে বাহাত্তর-তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ কেশব গাঙ্গুলী দশ সের ভারী মোট বয়ে এনে মেয়েদের এ উদাসীনতায় বিরক্ত হবেন, বা প্রতিবাদে দু-কথা শোনাবেন। কিন্তু তার ফল দাঁড়ালো খুবই খারাপ।

পাঁচজনের সামনে বলবার কথা নয়, বলতেও সঙ্কোচ হয়। ছোট মেয়ে ময়না তাঁকে একটা ভাঙা ছাতির বাঁট তুলে মারতে এল। মেজ মেয়ে লীলা বললে—তুমি মর না কেন ? মলে তো সংসারের আপদ চোকে—

স্ত্রী মুক্তকেশী বললে—অমন আপদ থাকলেও যা, না থাকলেও তা—

কেশব গাঙ্গুলী রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, আমি তোদের ভাত আর খাবো না—চললাম।

মুক্তকেশী ও ছোট মেয়ে ময়না একসঙ্গে বলে উঠলো—যাও না—যাও।

ময়না বললে—আর বাড়ী ঢুকো না। মনে থাকে যেন।

শুনে বিশ্বাস হবে না জানি। কিন্তু একেবারে নির্জ্জলা সত্যি। আপন মেয়ে বুড়ো বাবাকে ছাতি তুলে মারতে যায় !

কেশব গাঙ্গুলী রাত্রে বাইরের ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপে শুয়ে রইলেন। কেউ এসে খেতে ডাকলে না। মাও না, মেয়েরাও তা। সত্যিই কেউ ডাকতে আসবে না, এটা কেশব

বুঝতে পারেন নি, ধারণা করতে পারেন নি। তাই ঘটে গেল অবশেষে। না খেয়ে সমস্ত রাত কাটলো কেশব গাঙ্গুলীর—নিজের পৈতৃক ভিটেতে, স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্ত্তমানে। উঃ, এ কথা ভাবতে পারা যায় ?

কেশব গাঙ্গুলী সত্যি কথনো ভাবেন নি যে, এতটা তিনি হেনস্থার পাত্র তাঁর সংসারে। মেয়েরা বা স্ত্রী তাঁকে কেউ ভালবাসে না, এ তিনি অনেকদিন থেকেই জানেন। কিন্তু তার বহর যে এতটা, তা তিনি ধারণা করবেন কি ভাবে ?

ক্ষুধায় ও মশার কামড়ের যন্ত্রণায় সারারাত কেটে গেল ছটফট করে। সকালে উঠে আগে কেশব নদী থেকে স্নান করে এসে সন্ধ্যাহ্নিক ও জপ করে নিয়ে প্রতিবেশী যদুনন্দন মজুমদারের বাড়ী চা খেতে গেলেন।

যদুনন্দন বললেন—কি কাকা, আজ এত সকালে কি মনে করে ?

এ কথার উত্তরে কেশব গাঙ্গুলী বললেন কাল রাত্রের কথা। পরিবার ও মেয়ে দুটির দুর্ব্ব্যবহারের কাহিনী। যদুনন্দনের কাছে এ কথা নতুন নয়, পাড়ার মেয়েদের কানাকানির মধ্যে দিয়ে কেশব গাঙ্গুলীর দুরবস্থার কথা অনেকদিন শুনেছেন তিনি।

তবুও বিস্ময়ের ভান করে বললেন—সে কি কাকা, বলেন কি ? কাল রাত্রে খান নি ? এ বড্ড অন্যায় কাকীমার। ছিঃ ছিঃ—এ বেলা আপনি আমার বাড়ী খাবেন। বসুন।

কেশব গাঙ্গুলী আর বাড়ী এলেন না। সেখানেই দুপুর পর্য্যন্ত থেকে আহারের পর যখন বাড়ী এলেন, তখন এক ভীষণ কাণ্ড বেধে গেল। মুক্তকেশী বললে—আবার বাড়িতে কেন ? যাও দূর হও, যে বাড়ীতে গিয়ে নিন্দে রটনা করে এক পাথর ভাত মেরে এলে, সেখানেই যাও না, কতদিন খেতে ছায়, দেখি একবার।

মেয়েরাও বললে—বেশ তো, পরের বাড়ী টোক্‌লা সেধে কদ্দিন চলে, দেখি না ? এখানে আবার কেন ? যাও না—

—কাকে কি বলেছি আমি ?

—আহা! ন্যাকা! আমরা আর জানিনে। এই তো যদুদার মেয়ে ঘাটে আজ ব্যাখ্যান করেছে সবার কাছে। ওই বুড়ো মানুষ ওঁকে খেতে ছায়নি, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, মেরেছে —সে কত কথা! আমরা শুনি নি কিছু!

—তা তো মিথ্যে কিছু বলি নি।

—মেরেছিলাম তোমাকে আমরা ? খেতে দিই নি আমরা ? তুই না তেজ করে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে শুয়ে রইলে! আবার লাগানি-ভাঙ্গানি পাড়ায় পাড়ায়! বেশ লাগাও, লাগিয়ে করবে কি ? যাও না, যেখানে খুশি—আমরা তো বলেছি, বেরোও না—

ছোট মেয়ে বললে—মরে যাও না, মলেই তো বাঁচি—

কেশব গাঙ্গুলী ঘরের মধ্যে ঢুকে কাপড়-জামা পরে এবং একটা থলের মধ্যে কাপড়-গামছা পুরে নিয়ে তেড়েফুঁড়ে বাড়ী থেকে বেরুলেন!

বলে গেলেন—বেশ তাই যাচ্ছি—আর তোদের বাড়ী আসবো না—চললাম।

মুক্তকেশী চেঁচিয়ে বললে—তেজ করে যেমন বেরুনো হল তেমনি আর ঢুকো না বাড়ীতে কালামুখ নিয়ে—দেখবো তেজ—কে জর হলে দেখে, তা দেখবো।

কেশব গাঙ্গুলী হন্ হন্ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। হোক জর। নৈহাটী থেকে এখানে এসে পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন। দুর্ব্বল করে ফেলে দিয়েছে বড়। তা হোক। যা হয় হবে।

কেশব গাঙ্গুলী রেলে চাকরী করতেন। চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে নৈহাটিতে বাড়ী করেছিলেন, কিন্তু বারো চোদ্দ বছর বসে খেয়ে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের সামান্য টাকা যা বাড়ী তৈরীর পর অবশিষ্ট ছিল, ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে যেতে লাগল—এখনো ছোট মেয়ের বিয়ে বাকী। টাকা ফুরিয়ে গেলে কি খাবেন ?

অগত্যা নৈহাটির বাড়ী বিক্রি করে পৈতৃক গ্রামে এসে এই দুবছর বাস করছেন। সরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে দু'ঝাড় বাঁশ ও বিঘে-দুই ধানের জমির ভাগ পেয়ে যাহোক একরকম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মেয়ে দুটি আর পরিবারের জন্যে সত্যি তাঁর সংসারে বিতৃষ্ণা হয়ে গিয়েছে। মেজ মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীর চরিত্র ভালো নয়, সে মেয়ে তাঁর কাছেই আছে বিয়ের দু'বছর পর থেকেই। সব দিক থেকেই তাঁর গোলমাল।

ভেবেছিলেন ছোট মেয়েটার বিয়ে দিয়ে একরকম নির্ঝঞ্ঝাট হবেন, কিন্তু আর সংসারে তাঁর দরকার নেই। যাদের জন্য চুরি করেন, তারাই বলে চোর। সে সংসার আর ধরতে আছে ?

কেশব গাঙ্গুলী রেলের বোতাম বসানো সাদা কোট একটা নিয়ে বেরিয়েছেন, রেলের ভাড়া লাগবে না। রেলের বোতাম-ওয়ালা কোট দেখলে ছেলেছোকরা টিকিট-চেকাররা একবার চেয়ে দেখে চলে যায়, কিছু জিগ্যেস করে না।

একটি পয়সা তাঁর নিজের হাতে নেই। হাজার চারেক টাকা আছে স্ত্রীর নামে আর হাজার তিনেক আছে অবিবাহিত ছোট মেয়ের নামে। যদি তিনি মারা যান, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগেই, কারণ বয়স তাঁর যথেষ্ট হয়েছে, তাই বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে নৈহাটিতে থাকতে বাড়ী-বিক্রীর টাকা থেকে ছোট মেয়ের নামে টাকাটা রেখেছিলেন। আজ চাইলে কেউ একটা পয়সা তাঁকে দেবে ? না স্ত্রী, না মেয়ে।

তাই হাটের পয়সা থেকে দু'চার আনা এদিক ওদিক করতেন কেশব গাঙ্গুলী। না করলে চলে না। তাঁর নিজের একটু নস্যি, একটু তামাক, হয়তো বা ইচ্ছে হল দু'পেয়ালা চা কিনে খেলেন—এ পয়সা আসে কোথা থেকে।

মুক্তকেশী এ সন্দেহ করেছিল আগে থেকেই। তাই স্বামী হাট থেকে ফিরলে জিনিস-পত্রের ওজন, দরদস্তুর সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে, দাঁড়ি ধরে আলু, পটোল, চাল, ডাল ওজন করে নেয়।

পাড়ার ছেলেদের জিগ্যেস করে—হ্যাঁরে, আজ হাটে পটল কত করে সের ?

—ও নিতাই, আজ হাটে মাছ কত করে সের ?

তবুও কেশব গাঙ্গুলীকে সামলানো অত সহজ নয়। চল্লিশ বছর তিনি রেলে কাজ করে এসেছেন। মুক্তকেশী যতই কৌশল করুক, যতই সতর্ক হোক, কেশব গাঙ্গুলীর ফাঁক ধরতে পারা অত সহজ কাজ বুঝি ?

পটোলের মধ্যে বাসি তাজা নেই ?

দেখলে হয়তো ঠিক ধরা যায় না, কিন্তু দর বিভিন্ন। মাছের মধ্যেও দরের তারতম্য নেই ? কত ধরবে মুক্তকেশী ? না করলেই বা কেশব গাঙ্গুলীর বাজে খরচ চলে কোথা থেকে ? চাইলে স্ত্রীর হাত থেকে পয়সা বার করা শক্ত। ঐ নিয়েই তো যত ঝগড়া।

কেশব গাঙ্গুলী বাড়ী থেকে বেরিয়ে স্টেশনে এসে পৌছলেন বেলা তিনটের সময়। কাল হাট থেকে ফিরবার সময় ছ' আনা পয়সার হেরফের করেছিলেন, সেই পয়সা পকেটে খুচরো আছে—আর আছে গুপ্তস্থান থেকে সন্তর্পণে বার করা তিন টাকা সাত আনা। এই তিন টাকা তের আনা ছাড়া জগতে তাঁর বলতে আর কোথাও কিছু নেই। হ্যাঁ, অবিশ্যি পকেট ঘড়িটা আছে। সেটাও রেলের জামার বুক পকেটে এনেছেন। বিক্রী করলে কোন্ না ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হবে ? সেকালের কুরুভাইজার ফ্রেরিসের ঘড়ি। এখনকার মত ফঙ্গবেনে জিনিস নয়।

স্টেশনের কাছে একটা জমি গাছের তলায় পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের পানবিড়ির দোকান। পান কিনলেন দু'পয়সার। বিড়িও দু'পয়সার। দেশলাই একটা কত ? চার পয়সা ? দাও একটা।

পান খেয়ে বিড়ির ধোঁয়া টেনে কেশব গাঙ্গুলীর শরীরের কষ্ট খানিকটা দূর হল। এতক্ষণ চিন্তা করবার মত অবস্থা তাঁর ছিল না।

তিনি আপাতত যাবেন কোথায় ?

সেটা কিছু ঠিক করেন নি, না করেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন অবিশ্যি। এখনো ট্রেণের ঘণ্টা-খানেক বিলম্ব আছে। যাবেন কোথায় ? যেখানে যান, যেতে তো হবে ? তিন টাকা তেরো আনায় স্বাধীনভাবে খাওয়া কতদিন চলবে ?

মেয়ের বাড়ী যাবেন ? জামাই কাজ করে টিটাগড়ের কাগজের কলে। টিটাগড়েই বাসা। সেখানে যেতে লজ্জা করে। এই গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সেখানে গিয়ে দুদিন ছিলেন। অবিশ্যি জামাইষষ্ঠীর তত্ত্বস্বরূপ নিয়ে গিয়েছিলেন কিছু আম ও দুটো কাঁঠাল। বার বার জামাইবাড়ী যেতে আছে ?

বিশেষ করে আজকাল রেশনের চালের দিনে কারো বাড়ীতেই একবেলার বেশি দুবেলা থাকতে নেই। কি মনে করবে। যে কাল পড়েছে।

ট্রেণ এসে পড়লো। উঠে বসলেন এক কোণে। রেলের জামা আছে, টিকিট লাগবে না।

হু হু করে ট্রেণ চললো। কাশফুলের ক্ষেতে কাশফুল ফুটতে শুরু করেছে। খুব বৃষ্টি

হওয়ায় ধানের ক্ষেত জলে ডুবু ডুবু। অনেক জায়গায় এখনো ধান বুনছে। আমন ধান এবার নাবি।

খুব ভাল করেছেন কেশব। যখন কাজ থেকে অবসর নিলেন, তখন প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের দরুন ন'হাজার টাকা পেয়েই যদি তা থেকে কিছু ধানের জমি কিনতেন নিজের নামে, তবে আজ স্ত্রী আর মেয়েরা এমন হেনস্থা করতে পারতো?

স্ত্রী আর মেয়েদের দুর্ব্যবহারের কথা মনে আসায় চোখ দিয়ে জল পড়লো, কোঁচার খুঁটে মুছলেন। কি না করেছেন ওদের জন্যে। ঐ ছোট মেয়েটার নৈহাটিতে থাকতে একবার টাইফয়েড্ হয়েছিল, কেশব গাঙ্গুলী রাত জেগে ঘণ্টায় ঘণ্টায় থার্মোমিটার দেখেছেন, ওষুধ খাইয়েছেন, কই অবহেলা করতে পেরেছিলেন? একশো ষাট টাকা খরচ হয়ে যায় সেই অসুখে।…

ঐ স্ত্রী মুক্তকেশীর সেবার হাঁপানির মত হল। চুঁচুড়ায় নিয়ে গিয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে কবিরাজ দেখানো, অনুপানের ব্যবস্থা করা, পাছে আগুনের তাতে কষ্ট হয় বলে রাঁধতে দিতেন না, রান্নাঘরের কাছে যেতে দিতেন না। রাত্রে শুয়ে ভাবতেন, এই বয়সে হাঁপানি হল, মুক্তকেশী বড় কষ্ট পাবে, কি করা যায়? রঘুনাথপুরের পীতাম্বর দাসের কাছে হাঁপানির মাদুলি পাওয়া যায়, তাই কি আনবেন? কত ভেবেছেন। কত ব্যস্ত হয়েছিলেন।

সেই মুক্তকেশী তাকে আজ বললে—বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও, আর এসো না—

ছোট মেয়ে বললে—মরো না তুমি, মলেই বাঁচি। তুমি মলেই বা কি?

কেন তিনি কি ওদের জন্যে কিছু করেন নি? চিরকাল রেলে টরে-টক্কা করেছেন তবে কাদের জন্যে? খাইয়ে মাখিয়ে বড় না করলে ওরা অত বড় হল কি করে? আজ কিনা তিনি মরে গেলে ওরা বাঁচে। তিনি আজ সংসারের আপদ, এই তিয়াত্তর বছর বয়সে।

এই তিয়াত্তর বছর বয়সেও গত আষাঢ় মাসে যখন কাঠের ভয়ানক অভাব হল, নিজে বাঁশঝাড় খুঁজে খুঁজে শুকনো বাঁশ আর কঞ্চি কেটে গোয়ালে ডাং করেন নি, পাছে স্ত্রীর বা মেয়েদের রান্নার এতটুকু অসুবিধে হয় সে জন্যে? এই ভীষণ জলকাদার পথে মোট বয়ে নিয়ে যান নি?

যাক্, এসব কথা তিনি বলতে চান না। তবে মনে কষ্ট হয় এই ভেবে যে, সংসার কি রকম অকৃতজ্ঞ! যাদের জন্যে সারাজীবন খেটে খেটে গায়ের রক্ত জল করেছেন, তারাই আজ বলে কিনা তিনি মলেই তারা বাঁচে, তাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

কেশব গাঙ্গুলীর মনের মধ্যেটা হা হা করে উঠলো দুঃখে। চোখে আবার হু হু করে জল এল, কোঁচার খুঁটে মুছলেন। আজ যদি—

—টিকিট?

কেশব গাঙ্গলী মুখ তুলে চমকে চাইলেন। একটি ছোকরা টিকেট-চেকার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেশব গাঙ্গুলী বললেন—রেলওয়ে সার্ভেণ্ট—

ছোকরা চলে গেল।

বেশ ছেলেটি। ওই রকম একটি ছেলে যদি আজ তাঁর থাকতো! তা হলে ওরা এমন কথা বলতে সাহস পেতো না! সবই অদৃষ্ট। ছেলে তাঁর হয় নি? হয়েছিল। তখন তিনি তিনপাহাড় স্টেশনের তারবাবু। ছেলের নাম ছিল সাণ্টু! প্ল্যাটফর্মে হেলে দুলে চলে বেড়াতো। আজও বেশ মনে আছে, তাঁকে বলতো—বাবা, আমাকে পুরনো টিকিট দেবে? পুরনো টিকিট হাতে পেলেই সে হঠাৎ মুখে 'পু-উ উ-উ' শব্দ করে ট্রেণ ছেড়ে দিত⋯তারপর, ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ শব্দ করতে করতে প্ল্যাটফর্মের ধারে ধারে খানিকদূর মাথা নাঁড়তে নাড়তে কেমন যেতো।

টরে-টক্কার টেবিলে কাজ করতে করতে তিনি বসে দেখতেন আর হাসতেন। মাল-কুলি রামদেওকে বলতেন—শিশুকে ধরে বাসায় দিয়ে আসতে। শিশু বুঝতে পারতো, রামদেও তাকে ধরে নিয়ে যেতে আসছে, সে ছোট পায়ে ছুট দিতো আর রামদেও পেছনে পেছনে 'এ খোঁকাবাবু, এ খোঁকাবাবু' বলে ছুটতো—এ দৃশ্য আজও এই এখুনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কেশব।

দেড় বছর বয়সে সাণ্টু মারা যায়।⋯আজ ছত্রিশ বছর আগেকার কথা। তবুও যেন মনে হয়, সেই সাহেবগঞ্জ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বড় ঘোড়ানিম গাছটার ছায়ায় আজও সাণ্টু সেই রকম ছুটে ছুটে খেলা করে বেড়াচ্ছে।⋯সাণ্টু থাকলে আজ বোধ হয় এমন কষ্ট কেশব গাঙ্গুলীর হত না। চোখ দিয়ে এবার ঝর ঝর করে জল পড়লো, মনের মধ্যে—বুকের মধ্যে কি একটা যেন ঠেলে ফুলে কেঁপে উত্তাল হয়ে উঠলো। কেশব জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন! একটা রাখাল বালক একটা গরুকে কি নির্দ্দয়ভাবেই না প্রহার করছে! খুব বৃষ্টির জল বেধেছে ডোবায়, পুকুরে। এক জায়গায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গামছা দিয়ে ছেঁকে কুঁচো মাছ ধরছে। টেলিগ্রাফের তারে একটা কি পাখী বসে রয়েছে।

নৈ-হা-টি!

কেশব গাঙ্গুলীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন।

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। এখানে সাবেক বাসা ছিল। দু-চারজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ আছে। তাদের কারো বাড়ী যাবার ইচ্ছে নেই, তবুও না গেলে, রাত্রে থাকবেন কোথায় এই অভদ্রা বর্ষাকালে, খাবেনই বা কি? রমাপতির বাড়ী যাবেন?

রমাপতি কুণ্ডুর বড় গোলদারী দোকান ও রেস্টুরেণ্ট। নাম, দি কমলাপতি মডার্ণ রেস্টোরাণ্ট। রমাপতির বড় ছেলের নাম কমলাপতি, তার ছেলে শান্তি ওই রেস্টোরাণ্টে বসে! খুব বিক্রি। চার পাঁচটা ছোকরা চা খাবার দিতে দিতে হিম্‌শিম্ খেয়ে যাচ্ছে।

শান্তি তাঁকে দেখে বললে—এই যে দাদু, আসুন? দেশ থেকে? ভাল সব? ওরে, ভাল করে গরম জলে ধুয়ে এক কাপ চা দে দাদুকে। আর কি খাবেন? একটা চপ দেবে? ভালো চপ আছে। না? টোস্ট দিক? তবে থাক্।

কেশব গাঙ্গুলী জানেন, এখানে যা খাবেন তার নগদ দাম দিতে হবে এখুনি। আর একবার এ রকম হয়েছিল, তাঁকে খাতির করছে ভেবে চপ, কাটলেট, ডিম যা নিয়ে আসে, তাই খান। শেষে হাসিমুখে আপ্যায়িত করে বিদায় নেবার জন্যে টেবিলের কাছে যেতেই শান্তি হাসিমুখে বললে—এক টাকা সাড়ে তেরো আনা—

আজ আর সে ভুল করবেন না। হাতে পয়সা কম। চায়ের ছ'পয়সা দাম দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। শান্তিকে বললেন, তোমার বাবা ভালো? তোমার দাদু বাড়ীতে আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একবার যাবো দেখা করতে?

—যান না। এখন বৈঠকখানাতেই বসে আছেন। ডাক্তারবাবু আছেন, আর শশী কাকা আছেন।

—আচ্ছা আসি।

কেশব গাঙ্গুলীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। ব্যবসাদারের চক্ষুলজ্জা নেই। সংসার বড় কঠিন জায়গা?

তবুও রমাপতির বাড়ীতেই গেলেন। রমাপতি কুণ্ডু তাঁর সমবয়সী। তাঁকে দেখে খুশী হল। যত্ন করলে খুব। রাত্রে লুচি, তরকারী, মিষ্টি খাওয়ালে। ভাল গদিপাতা, নেটের মশারি খাটানো বিছানায় শুয়ে কেশব মশারির চালের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। পরের এমন সুন্দর বিছানাতে কদিন তিনি শোবেন? তাঁর আশ্রয়স্থল তো বৃক্ষতল। এরা না হয় আজ রাত্রেই খাতির করে আশ্রয় দিয়েছে।

কেন অপরের অদৃষ্টে এত সুখ থাকে, আর তাঁর অদৃষ্টে এমন ধারা?

এই তো রমাপতিকে দেখলেন, তার নাতনীরা কত যত্নে বাতাস করতে লাগলো খাওয়ার সময়ে। খাওয়ার পর এক বড় নাতনী আমলা না কি রোজ তেল মালিশ করে দাদুর পায়ে। পুত্রবধূরা 'বাবা' বলতে অজ্ঞান।

সেটা হয়তো পয়সাওয়ালা বলে, রমাপতির নামেই ব্যবসা, লক্ষপতি লোক। আজ তাঁর হাতে যদি পয়সা থাকতো, তবে কি আর মেয়েটা তাঁকে অমন কথা বলতে সাহস করতো? তিনি নিঃস্ব, কাজেই তাঁকে হেনস্থা করে। পয়সা এমন জিনিস।

কত কি ভাবতে ভাবতে কেশবের ঘুম এল। একটা বড্ড ব্যথার জায়গা খচ খচ করে। যখন তিনি চলে যাচ্ছেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে, তখন মেয়েরা কেন দৌড়ে এসে পথ আটকালে না? স্ত্রী কেন ছুটে এল না?

সব মিথ্যে। সব ভুয়ো। সব স্বার্থের দাস। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা পৃথিবীতে নেই। রমাপতি কুণ্ডু লক্ষপতি, তাই আজ নাতি-নাতনী তার পায়ে তেল মালিশ করে, পুত্রবধূরা দুধের বাটি মুখে ধরে। যদি তাঁর টাকা থাকতো, তাঁর আদরও ওই রকমই হত।

সকালে উঠে রমাপতি কুণ্ডু বললে—গঙ্গাস্নান করবেন না গাঙ্গুলীমশায়? গঙ্গাহীন দেশে

থাকেন, গঙ্গাস্নানটা করলে ভাল হত!

দুজনে গঙ্গাস্নান করে এলেন। তারপর রমাপতির ছোট নাতনী তাঁদের দুজনের জন্যে শ্বেত-পাথরের রেকাবিতে কাটা পেঁপে, কলা, নাশপাতির টুকরো আর সন্দেশ, রসগোল্লা ও চমচম নিয়ে এল। কেশব গাঙ্গুলীকে বললে—দাদু, আপনার রান্নার যোগাড় কি এক্ষুনি করে দেবো! না একটু দেরি হবে?

অর্থাৎ এরা গন্ধবণিক। ভাত রেঁধে দেবে না ব্রাহ্মণের পাতে। রাত্রে লুচি খাওয়াতে পারে, কিন্তু দিনে ভাত রেঁধে খেতে হবে।

কেশব বললেন—আমি চলে যাবো আজ দিদি—

রমাপতি কুণ্ডু বললে—সে কি কথা গাঙ্গুলীমশায়? আজ ওবেলা আপনাকে নিয়ে হরিসভায় ভাগবতপাঠ শুনতে যাবো ঠিক করে রেখেছি—

রমাপতির নাতনী টুনিও বললে—আজ যাবেন কি দাদু? আজ আমরা ওবেলা তালের ফুলুরি, তালের ক্ষীর করবো, আপনি আজ চলে যাবেন, যেতে তো দিলাম?

কেমন সুখের সংসার! কেমন মিষ্টি কথাবার্ত্তা, মিষ্টি ব্যবহার। লক্ষ্মী যেখানে বিরাজ করেন, সেখানে কি কোনো জিনিসের ক্রটি থাকে?

সারাদিন বড় আনন্দে কাটলো। খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর ব্যবস্থা। সন্ধ্যার দিকে গঙ্গার ধারের হরিসভায় 'অজামিলের উপাখ্যান' শুনতে গেলেন দুজনে। ব্যাখ্যাকারী নবদ্বীপের গোস্বামী-বংশের লোক, বড় সুন্দর বোঝাবার ও বর্ণনা করবার ক্ষমতা।

ভগবান অমন মহাপাপী অজামিলকে কৃপা করেছিলেন, শুধু বিপন্ন হয়ে সে কাতরে তাঁকে মৃত্যুকালে ডেকেছিল বলে।

তিনি কি এতই পাপ করেছেন?

ভগবান নিশ্চয় তাঁকে ঠেলে ফেলে দেবেন না দূরে।

কিন্তু কোথায় কিভাবে স্থান দেবেন ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না। আহা! জগতে এত সুখ এত আনন্দ চারিদিকে, অথচ তাঁরই ভাগ্যে সব এমন হল কেন?

আসবার সময় রমাপতি কুণ্ডুকে বললেন—বেশ আছেন কুণ্ডুমশাই, না?

—আপনার আশীর্ব্বাদে—

—আমায় একটা চাকরি করে দিন না?

—কি রকম চাকরি?

—এই ধরুন, কারো বাড়ীতে থেকে ছেলে পড়ানো, কি হাট-বাজার করা।

—পাগল! আমাদের এই বয়সে কি পরের চাকরি করা চলে দাদা? কেন, চিরকাল চাকরি করে এসে বুঝি বাড়ী থাকতে ভালো লাগছে না? তা হোক। বাড়ী বসে ভগবানের নাম করুন গে।

না। বোঝাতে পারলেন না। সব কথা বলা যায় না। কাল এখান থেকে চলে যেতে হবেই।

রাত্রে আবার সেই লুচি, মাছ, মিষ্টি, দুধ। কি খাওয়া-দাওয়া এ বাড়ীর! কি সব আট-পৌরে শাড়ী পরেছে মেয়েরা! বিদ্যুতের আলো, পাখা। কত সুখে এরা আছে, কেমন খাওয়া-দাওয়া!

মুক্তকেশীকে, মেয়েদের কি যত্নে তিনি রেখেছেন? চিরকাল রেলের ঘুপচি বাসায় বাস করে এসেছে, এখন দেশে গিয়ে দুবেলা ধান সেদ্ধ করতে হয়, ক্ষারে কেচে কাপড় পরতে হয়, থোড় আর এঁচড়ের তরকারি ছাড়া মাছ-মাংস হয় মাসে কদিন? হাতে পয়সা কোথায়?···কোনো ভাল জিনিস দিতে পারেন ওদের মুখে আজকালকার বাজারে?

লুচি ছিঁড়তে গিয়ে কেশব গাঙ্গুলীর চোখে জল এল। মাছের মুড়ো···কতকাল মাছের মুড়ো খাননি, ওদের খেতে দিতে পারেননি! কি সুখে রেখেছেন ওদের?

-টুনি বলল—চমচম দুটোই খেয়ে ফেলুন দাদু, গরম লুচি নিয়ে আসি।

পরদিন সকালে রমাপতি কুণ্ডুর বাড়ী থেকে চলে গেলেন কেশব। ওঁরা বলেছিলেন সেদিনটাও থাকতে। কেশব থাকতে চাইলেন না। তাতে দুঃখ ঘুচবে না। একটা চাকরি পেলেও হত। এখানে সেজন্যেই আসা। ওদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারের দিকে চললেন। একটা নির্জ্জন স্থানে বসে কতক্ষণ ভাবলেন। জগতে কেউ কাউকে ক্ষমা করে না। মুক্তকেশীর ওপর হয়তো কোনো সময় অন্যায় কিছু করে থাকবেন, তা ওরা কখনো ভুলবে না, প্রতিশোধ নেবার সময় এলেই প্রতিশোধ নেবে।

এই কি জগতের নিয়ম?

এ জগতে কেউ কি ভালবাসার নেই? বিচার করবার, দণ্ড দেবার সকলেই আছে?

বেলা দুপুর হল। একটা হোটেল থেকে কিছু খেলেন হুগলীতে। হুগলী থেকে গেলেন ব্যাণ্ডেলে। উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। রাত হয়ে আসছে। এই বর্ষায় থাকবেন কোথায়?

রাত্রে ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে স্টেশনের একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে রইলেন। শীত করতে লাগলো ঠাণ্ডা বাতাসে। গায়ে দেবার কিছু আনা উচিত ছিল, আনা হয় নি। ভুল হয়ে গিয়েছে।

ভুল! ভুল! সব ভুল জীবনে।

চাকরি করা ভুল, বিয়ে করা ভুল, সংসার করা ভুল। সন্তান-উৎপাদন ভুল, কারো কাছে স্নেহ-মমতা আশা করা ভুল, সব ভুল।

জীবনটা একটা মস্ত ভুল। একটা মস্ত ফাঁকা—একটা মস্ত ফাঁকি। না, ও সব আর তিনি ভাববেন না।

চার দিন পরে।

কেশব গাঙ্গুলীর হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। ব্যাণ্ডেল স্টেশনের বেঞ্চিতে শুয়ে এ কদিন কাটলো। কাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি। খুব খিদে পেয়েছে। চলব কি করে? তাঁর শরীর ঝিম্-ঝিম্ করছে খিদেতে। তিয়াত্তর বছর বয়সে খিদে সহ্য করবার

মত শক্তি নেই তাঁর।

সত্যি। বড় খিদে পেয়েছে। কি করবেন এখন? ঘড়িটা বেচবেন?

মনে পড়ে, তাঁর প্রথম যৌবনে তিনি ব্যাণ্ডেল স্টেশনের সিগন্যাল ক্লার্ক ছিলেন। ওই তো তাঁর সেই ঘর; সেই টেবিল—সব সেই রকমই আছে। তাঁর কোয়ার্টার্স এখানে ছিল না, গঙ্গার ধারে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে পিসীমাকে নিয়ে থাকতেন। বাসার কাছে একটা ঘোড়ানিম গাছ ছিল। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, অর্দ্ধ শতাব্দী! আশ্চর্য্য, সেই টেলিগ্রাফের টেবিলটা আজও আছে!

মুক্তকেশীর সঙ্গে তখন সবে বিয়ে হয়েছে। ঘোড়ানিম গাছের তলাকার সেই বাসায় মুক্তকেশী ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো। তিনি ফিরবেন, তাঁকে দেখবে বলে।

ষোড়শী বালিকা মুক্তকেশী। কি হাসি ছিল মুখের। চোখ হাসতো তাঁকে দূরে পথের উপর দেখতে পেয়ে।

আছে সেই বাড়ীটা আজও? তাঁদের দুজনের অতীত যৌবনের সুখের প্রহরগুলির সাক্ষী সেই বাড়ীটা?

একদিন বললেন—আচ্ছা মুক্ত, তুমি দাঁড়িয়ে থাকো কেন জানলায়?

মুক্ত বলেছিল—তুমি আস, তাই।

—কেন?

—পথের ওপর দেখতে পেয়ে খুশী লাগে। কতক্ষণ দেখিনে।

—মন কেমন করে?

—তা করে না?

একদিন মনে আছে, তাঁকে জানলা থেকে বললে—আজ কি করেছি বলো তো তোমার জন্যে?

—কি গো?

—ডাল-পুরি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, এসে দ্যাখো।

তারপর তিনি বাড়ীতে ঢুকলে তাঁকে পাখার বাতাস দিয়ে সুস্থ করে মুক্ত পিঁড়ি পেতে বসিয়ে ১৬।১৭ খানা গরম ডালপুরি খাইয়েছিল কত যত্ন করে।

আর সেই মুক্তকেশী আজ পঞ্চাশ বছর পরে তাঁকে 'দূর, দূর' করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল। আজ যখন মুক্তকেশীর সেবা সবচেয়ে তাঁর দরকার হয়েছে, তখন!

চোখ দিয়ে জল বেয়ে পড়লো হু হু করে কেশব গাঙ্গুলীর। কেমন যেন মনে হল সব শূন্য। ওই আকাশের নিরালা মেঘগুলির মতই তাঁর মন শূন্য, জীবন শূন্য, নিরালা, নিরবলম্বন। পৃথিবীতে কেউ তাঁর কোথাও নেই—পঞ্চাশ বছর আগের সেই ষোড়শী রূপসী মুক্তকেশীকে

আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোন্ অজানা দিগন্তে সে মিলিয়ে গিয়েছে বহুকাল আগে!

জীবনটা কেন এত বড় ফাঁকি, এত বড় মিথ্যে, এত বড় জুয়োচুরি?

—আরে, গাঙ্গুলীবাবু যে! কোথায় ছিলেন এতদিন?

কেশব চমকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলেন। একজন মধ্যবয়স্ক টিকিটচেকার, ক্রু-দলের মোড়ল। ওর নামটা তিনি জানতেন, এইমাত্র তিনি হঠাৎ ভুলে গেলেন। বুড়ো হয়েছেন, মুখ দেখে এখন আর ভাল বলতে পারেন না।

—বাড়ী ছিলাম ভাই।

—তারপর এখানে কি মনে করে? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে নাকি?

কেশবের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন—হ্যাঁ ভাই—সে-সব, তাই বটে।

—চলুন, সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত বেড়িয়ে আসা যাক। চেক্ করতে বেরিয়েছি। চলুন আমার সঙ্গে। সেকেন ক্লাসে তুলি দিচ্ছি। আসুন—

—খাবো কোথায়।

—আপনি খান নি এখনো। বর্দ্ধমানে খাওয়াবো চলুন! জিনিসপত্র কিছু আছে?

—কিছু না।

—তবে চলুন।

এক্সপ্রেস এসে পড়ল। বর্দ্ধমানের ক্রুদের ঘর থেকে সঙ্গী লোকটির জন্যে ভাত-তরকারি এল। রাত তখন সাড়ে সাতটা। দুজনে ভাগ করে খেলেন।

সঙ্গী ব্রাহ্মণ, নাম পঞ্চানন বাঁড়ুযো, বাড়ী জয়নগর-মজিলপুর। পেট ভরে ভাত খেয়ে কেশব গাঙ্গুলীর যেন ধড়ে প্রাণ এল। উঃ, সোজা ক্ষিদেটা পেয়েছিল?

কি সুন্দর বর্ষা-সজল বাতাস দুদিকের মাঠে-বনে বইছে! কুরচি ফুলের সুবাস মাঝে মাঝে আসে বাতাসে। এই সব বন, এই অন্ধকার আকাশ, নক্ষত্রের দল কেমন যেন তাঁকে বহুদূরের সঙ্গীহীন একক জীবনের বাণী এনে দিচ্ছে! নিঃসঙ্গ জীবনে কতদূরে কোথায় যেন যাচ্ছেন তিনি। আর বাড়ী ফিরবেন না। আর মুক্তকেশীর হাতে হাটের থলে তুলে দেবেন না। তাঁর সংসার করা ফুরিয়ে গিয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা শুরু করলেন আজ তিনি।

সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে তিনি একা। বেশ লাগছে অনেক দিন পরে। গত এক বছর শুধু মাথায় মোট করে হাট ঘুরেছেন, বাজার করেছেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রেশনের আটা, চিনি, কেরোসিন তেল এনেছেন—যাদের জন্যে, তারা আজ এই তিয়াত্তর বছর বয়সে তাঁকে পারলে ঘরের বার করে দিতে! পয়সার তাঁর দরকার নেই। পয়সা সব মুক্তকেশীর হাতে থাকুক। তাঁর পয়সাকেই ওদের দরকার, তাঁকে নয় তো? বেশ, পয়সাই রইল, চললেন তিনি।

...সাঁইথিয়া।

অনেক রাত হয়েছে। এবার একটু ঘুমুলে হত না? সারাদিন টো টো করে বেড়িয়েছেন ব্যাণ্ডেলে। এই সাঁইথিয়াতে একবার তিনি রিলিফে এসেছিলেন মনে আছে, বহুকাল আগে। তখন মুক্ত বলে দিয়েছিল, রোজ একখানা করে চিঠি দিও। আটখানা পোস্টকার্ড সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা।

সাঁইথিয়াতে তখন বিধুভূষণ রায় ছিলেন স্টেশনমাস্টার। তাঁর বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়া হত। বিধুবাবুর ছেলে সদানন্দ তাঁর চেয়ে কিছু ছোট, সদানন্দ ও তিনি একসঙ্গে তাস খেলতেন কাছাকাছি একজন ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে বসে।

একবার একটা পাকা কাঁঠাল বিধুবাবু নামিয়ে নিলেন গার্ডের গাড়ী থেকে। কাঁঠালটা আধপচা। সদানন্দ বললে—দাদা, মা বলেছেন, ক্ষীর-কাঁটাল খাবেন ওবেলা।

কেশব বললেন,—দূর। ওর বীচি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না—

—আমি বলছি পাওয়া যাবে।

—কখ্‌খনো না।

—বাজি!

—কি, বলো?

—বৌদিকে তিন দিন চিঠি দিতে পারবেন না দাদা? অত কি টেবিলে বসে লেখেন? ক্ষুদে ক্ষুদে লেখাতে একখানা পোস্টকার্ডে একখানা খামের কাজ করে নেন। ফেলবেন বাজি?

রাজী হন নি কেশব। মুক্তকে চিঠি না দিয়ে থাকা? অসম্ভব। সে একা সেই ব্যাণ্ডেলের সেই ছোট্ট বাসাতে বসে তাঁর জন্যে দিন গুণছে, রোজ ঘোড়ানিম গাছটার তলায় পিওনের আবির্ভাবের অপেক্ষায় বসে থাকে খাওয়া-দাওয়ার পর জানলাটিতে। তাকে তিনদিন চিঠি না দিয়ে বঞ্চিত করতে পারবেন না। তা কখনই হয় না।

সেসব দিন কি খুব দূরে চলে গিয়েছে? বড্ড পেছনে ফেলে এসেছেন কি? স্বপ্নের মত মনে হল—আব্‌ছায়া আব্‌ছায়া, সব মিলে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মুক্তকেশী…সান্টু… ব্যাণ্ডেল…তিনপাহাড়। প্রথম যৌবন…তিয়াত্তর বছরের বার্দ্ধক্য! স্বপ্ন।

কাঁদছেন নাকি আবার তিনি?…হুঁ, তাই তো, কোটের গলার কাছটায় ভিজে! না, না, কাঁদবার কি আছে? বুড়ো বয়সে চোখ পান্‌সে হয়ে যায়। কাঁদবেন কেন তিনি?

—গাঙ্গুলী বাবু, ঘুমোলেন? অমন ভাবে শুয়ে কেন? শরীর খারাপ হয় নি তো?

পঞ্চানন চক্রবর্তী ক্রু। চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলে ঢুকলো। সাঁইথিয়া থেকে এইমাত্র ট্রেণ ছেড়েছে।

কেশব যেন চমকে উঠলেন। বললেন—না তো!

—একটু চা খেয়ে নিন আগের স্টেশনে।

—এত রাত্রে চা? পাগল হয়েছ ভায়া? আমি চা খাইনে এত রাত্তিরে। তুমি খাও। ঘুমুবে না?

—আরও গোটাকতক স্টেশন পার হয়ে যাক্। এখন না। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ক্রু চলে গেল। গাড়ী ঝড়ের বেগে চলেছে। বাইরে এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে বেশ জোরে। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্ আসছে জানলা দিয়ে কামরার মধ্যে। কি একটা ফুলের সুগন্ধ এল এক ঝলক।

আঃ, কি সুন্দর আরাম!—ঘুমিয়ে আরাম আছে এমন জায়গায়। বুকের মধ্যে কেমন করছে, কেন কে জানে? নির্জ্জন গাড়ী। তিনপাহাড়ে কত রাত্রে গাড়ী পৌছুবে? বিয়ের দুতিন বছর পরে তিনপাহাড়ে ছিলেন তিনি মুক্তকে নিয়ে, সান্টুকে নিয়ে। সেই সময়ের কথা কখনো ভুলবেন না তিনি।

ব্যাণ্ডেল আর তিনপাহাড়। জীবনে এই দুই স্বর্গ। দুটি স্বর্গের দুটি অমর কাহিনী তাঁর বুকে লেখা রয়েছে। পঞ্চানন ঘুমিয়ে পড়লে তিনপাহাড়ে তিনি নেমে পড়বেন।

তিনপাহাড়ে এই বর্ষাকাল কাটে সেবার। একটা কি পাহাড়ের ওপর কি ঠাকুর ছিলেন। মুক্ত ও তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। মুক্ত বললে—খাবে কি? পাহাড়ের নিচে চড়ুইভাতি করবো।

রান্না করতে করতে বৃষ্টি এল। একটা পাকুড় গাছের তলায় রান্না হচ্ছিল। স্টেশনমাস্টার ছিলেন শশিপদ সামন্ত, মেদিনীপুরে বাড়ী।

তাঁর দুই ছেলে ননী ও হাবু ছিল সঙ্গে।

হাবু কাঠ ভেঙে নিয়ে এলো পাহাড়ের ওপর থেকে। মুক্ত খিচুড়ি রাঁধতে গিয়ে ধরিয়ে ফেললে। তাই নিয়ে কি হাসাহাসি!

পাকুড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে মুক্ত চোখ পাকিয়ে বললে,—তুমি থাবে না?

—কে বলেছে?

—ননী হাবু বলেছে?

—বাজে কথা।

চমৎকার চড়ুইভাতি।

—খেয়ে বলতে পারবে না যে, খিচুড়ি এঁটে গিয়েছে।

—না গো, বলবো না। দিয়েই ছাখো।

মুক্ত হি হি করে হেসে উঠে বললে—ও পেটুকের পাল্লায় পড়লে খিচুড়ির হাঁড়িই কাবার হবে, তা বুঝতে পারছি—বসো। বসে যাও। ভালো সরের ঘি এনেছি, খিচুড়ি দিয়ে খাবে বলে। কিন্তু সত্যি, ধরে গেল বলে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

—পাগল! দিয়েই ছাখো না। মন খারাপ করতে হবে সেজন্যে নয়, আরও বেশি করে রাঁধ নি কেন সেইজন্যে।

—বেশ, খাও না। আবার না হয় চড়িয়ে দেবো।

মনে আছে সেই পাহাড়ের ওধারে কোথায় ছিল কদম ফুলের গাছ। ননী প্রথমে নিয়ে এল এক গুচ্ছ।

মুক্ত বললে—বাঃ, চমৎকার! খোঁপায় গুঁজবো।

তারপর চুপি চুপি বললে—কিন্তু সে ফুল তোমায় নিজের হাতে তুলে এনে দিতে হবে।

—ঠিক এনে দেবো। খাওয়া হয়ে যাক্। যাবার সময়ে নিয়ে আসবো—

পঞ্চাশ বছরের পার থেকে সেই প্রথম যৌবনের ফুটন্ত কদমফুলের সুবাস আজকার এই বর্ষা-সজল বাতাসে বৃষ্টির ছাটের সঙ্গে যেন ভেসে আসে।

সে বর্ষাদিনের সুন্দর অপরাহ্নটি, পাহাড়ের নিচের সেই পাকুড় গাছটি আজ স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে। সে মুক্তকেশীও…

কখন যেন মুক্ত এসে ওর শিয়রে দাঁড়ালো। সপ্তদশী তরুণী সুন্দরী মুক্তকেশী। হাসিতে মুক্তোর মত দাঁতগুলি ঝক্‌ঝক্ করছে যেন। স্নেহভরে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললে—তুমি কদম ফুল এনে দেবে তো? তুমি এনে দিলে আমি খোঁপায় পর্‌বো—ভুলো না যেন, ভুলো না।

তারপর আবার চোখ নিচু করে বলছে—রোজ একখানা করে চিঠি দিতে হবে কিন্তু। আমি থাকতে পারবো না—সত্যি বলো, আমাকে ছুঁয়ে—দেবে তো?

পরক্ষণেই বিরলদন্তী পক্ককেশী বৃদ্ধা মুক্তকেশী হাঁটুর ওপর গামছা পরে তাঁকে ঝাঁটা উঁচিয়ে মারমুখী হয়ে বলছে—বেরো, বেরো, আপদ দূর হও বাড়ী থেকে। ম'লেই বাঁচি—মরণ হবে কবে তোমার? যম নেয় না কেন?

ঘুমের মধ্যেও চমকে উঠলেন কেশব। মস্ত একটা ঝাঁকুনি লাগলো গাড়ীটায়।

অনেক রাতে তিনপাহাড় স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়ালে তিনি নেমে পড়লেন। দৌড়ে ছুটে গেলেন প্ল্যাটফর্মের পশ্চিম প্রান্তের সেই বুড়ো ঘোড়ানিম গাছটার দিকে। আধ-অন্ধকারে গাছের তলায় খুঁজে দেখলেন।

—সাণ্টু—বাবা—সাণ্টু!

আজ কোথায় গেল খোকা?

পঞ্চাশ বছর আগে সে এই ঘোড়ানিম গাছটার তলায় যে খেলা করতো!

যেন শান্তি পেলেন কেশব গাঙ্গুলী যৌবনের হারানো দিনগুলোর মধ্যে আবার ফিরে এসে, তিনপাহাড়ের নির্জন প্রান্তরে, প্ল্যাটফর্মে, অন্ধকার আকাশের তলায় এসে। তিনি আবার ছাব্বিশ বছরের যুবক কেশব গাঙ্গুলী, এই ইস্টিশনের তার-বাবু—বুকে কত আশা, কত বল, কত উৎসাহ, চোখে কত স্বপ্ন! তাঁর খোকা সাণ্টু আছে কাছে, তার তরুণী মা মুক্তকেশী আছে।

সব তিনি ফিরে পেয়েছেন!

—সাণ্টু, আয় আমার কোলে আয়। রামদেও এখন তোকে বাসায় নিয়ে যাবে না। খেলা করে বেড়া প্ল্যাটফর্মে।

প্ল্যাটফর্মের ঘোড়ানিম গাছটার তলায় দুদিন কেশব গাঙ্গুলী শুয়ে রইলেন।

নির্জ্জন স্টেশন, বিশেষ কেউ লক্ষ্য করতো না। সত্যি, কি অপূর্ব্ব আনন্দে কাটলো এই দুটো দিন। সব ফিরে পেয়েছিলেন আবার।

পঞ্চাশ বছর আগেকার হারানো সব দিনগুলি।

তিনপাহাড়ের বিহারী স্টেশনমাস্টার একদিন কুলিদের কাছে খবর পেলেন, কে এক বুড়ো বাঙালীবাবু জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় নিমগাছটার তলায় শুয়ে আছে। কোনো পরিচয় পাওয়া গেল না তখন রোগীর কাছে। আরও দুদিন পরে স্টেশনের মুসাফিরখানায় লোকটি মারা গেল জ্বরের তাড়নায় এবং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে।

তখন মৃত ব্যক্তির শিয়রের তলা থেকে রেলের বোতামযুক্ত কোট বের হওয়াতে চার ধারে জানাজানি হল এবং ক্রু-ম্যান পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী এসে পড়ে সব পরিচয় দিলে কিন্তু সে দেশের ঠিকানা কিছুই জানে না, দিতেও পারলে না কোনো খবর। ব্যাণ্ডেল স্টেশনে দেখা হয়েছিল এই পর্য্যন্ত, কোথায় থাকতেন সে তখন বলতে পারলে না।

আরও কয়েকদিন পরে মুক্তকেশী ও মেয়েরা টেলিগ্রাম পেয়ে এসে পড়লেন যেদিন তিনপাহাড়ে, তার কয়েকদিন আগে কেশব গাঙ্গুলীর অস্থি ক'খানা সক্রিগলি ঘাটের গঙ্গায় স্থান পেয়ে গিয়েছে রেলের বাবুদের সহযোগিতায়। মুক্তকেশী শুধু ফিরে পেলেন কুরুভাইজার ফ্রেরিসের সেই ঘড়িটা।

বড় দিদিমা

অনেকদিন পরে মামার বাড়ী গিয়েচি। বোধ হয় বিশ বছর পরে। জঙ্গলে ভর্ত্তি হয়ে গিয়েচে সারাটা গ্রাম। বড় বড় বাড়ী পোড়ো হয়ে, ভাঙা হয়ে পড়ে আছে, বট অশ্বত্থর চারা উঠেচে ছাদের আর দেওয়ালের ফাটলে। ঘুঘু পাখীর বাসা হয়েচে চিলেকোঠায়—অনেক বাড়ীতে রাত্রে বাঘ ডাকে, বুনো শূওর লুকিয়ে থাকে উঠোনের জঙ্গলে।

লোকজন যারা গাঁয়ে ছিল, অনেককাল আগে বিদেশে চলে গিয়েচে। সেখানেই চাকৃরি বা ব্যবসার সূত্রে ঘর বাড়ী বেঁধে বাস করে, ম্যালেরিয়ার দেশে আসতে চায় না। তাদের বাবা জ্যাঠারা হয়তো আসতো, নতুন চাকৃরি করবার সময় বছর কয়েক এসে দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা করেছিল। এখন তারা বুড়ো হয়ে গিয়েচে, তাদের ছেলেরা জন্মেচে বিদেশে, দেশ তারা জানে না, চেনে না—কেউ বাল্যকালে এক-আধবার এসেছিল, কেউ তাও আসে নি। এই ম্যালেরিয়ার দেশে দূর বিদেশ থেকে পয়সা খরচ করে কিসের টানে তারা আসবে?

সুতরাং বড় বড় বাড়ী ভেঙে পড়ে আছে, দেউড়ি ভেঙে গিয়েচে, হয়তো দরজায় তালা দেওয়া ঠিকই আছে। সাপের ভয়ে দিনমানে কেউ সেদিকে যায় না।

অনাদি-মামার বাড়ীটা বাইরে থেকে দেখলাম। বাল্যে এই অনাদি-মামার বাড়ী প্রথম গ্রামোফোন শুনি মনে আছে। অনাদি-মামার বাবা হরি দাদামশায় ভারি শৌখীন লোক

ছিলেন, কলকাতায় চাকরি করতেন—তিনিই বিংশ শতাব্দীর এই আশ্চর্য্য যন্ত্রটি মামার বাড়ীর গ্রামে সর্ব্বপ্রথম আনলেন কলকাতা থেকে।

কলের গান! কলের গান!

সতীশ মামার ছেলে যাদু বললে—এই কানু, চল্—গ্রামফনো দেখে আসি—

—সে আবার কি?

—গ্রামফনো। কলের গান। হরিজ্যাঠা এনেছেন—

দৌড়ে গেলাম ছুটে। একটা কাঠের বাক্সের ওপর একটা চোঙ বসানো। চোঙের ভেতর থেকে একেবারে অবিকল মানুষের গলার গান বেরিয়ে আসচে!

একটা ছোট্ট ছেলে বললে—ওর মধ্যে কে আছে?

—কে আবার থাকবে?

—তবে গান গায় যে?

—কলে গান হচ্চে। এ'কে বলে কলের গান।

প্রাচীন আমলের বৃদ্ধ রামতারণ চক্রবর্ত্তী লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে এসেছিলেন এই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখতে। তিনি সেকালের আমলে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন, নীলকুঠির সায়েবদের অনেক ঘোড়া, টমটম, বন্দুক দেখেচেন—কিন্তু কলের গান কখনো দেখেনও নি, শোনেনও নি! এগিয়ে বসে ভারী গলায় বললেন—হরি বাবাজি, এর নামডা কি বল্লে?

—গ্রামোফোন।

—মানে কি?

—মানে—মানে হল কলের গান।

রামতারণ চক্রবর্ত্তী আমার বাল্যেই দেহরক্ষা করেছিলেন, শুধু কলের গান ছাড়া আধুনিক যুগের অনেক আশ্চর্য্য জিনিসের কিছুই দেখে যেতে পারেন নি।

সেই অনাদি-মামাদের বড় বাড়ী পড়ে আছে জঙ্গলাবৃত হয়ে। দরজা খসে পড়েচে, ওপরের ঘরের জানলা ঝুলে বাতাসে এদিক ওদিক করচে, ছাদের ওপরে এতবড় অশ্বত্থ গাছ গজিয়েচে যে তার তলায় বসে রাখাল বাঁশি বাজাতে পারে। অনাদি-মামা বৃদ্ধ হয়েচেন, তিনি কাশী থাকেন, তাঁর ছেলেরা কেউ জৌনপুরে, কেউ এলাহাবাদে কাজ করে। অজ পাড়াগাঁয়ের পৈতৃক ভিটের নাম মুখেও আনে না।

সেই রামতারণ চক্রবর্ত্তীর দোতলা প্রকাণ্ড বাড়ী ও পূজোর দালান পড়ে আছে, চামচিকে ও বাদুড়ের বাসা কড়ির গায়ে, ভাঙা মেঝেতে গোখ্‌রো সাপের বাসা। ও সব বাড়ীর ত্রিসীমানায় কেউ যায় না সর্পাঘাতের ভয়ে। দু' তিনটি এ গাঁয়ের নীচ জাতীয় লোকে অসাবধানে চলাফেরার ফলে সাপের কামড়ে জীবনও দিয়েচে।

বড় মামাদের বাড়ীটার কি দশা হয়েচে!

এই বড় মামা কাজ করতেন পশ্চিমে কোথায় যেন। আমার ছেলেবেলায় তিনি গ্রামের

মধ্যে একজন শৌখীন লোক বলে গণ্য হতেন। বড় মামা হোলেন আমার আপন মামাদের জ্ঞাতি ভাই। যখন তাঁদের নিজেদের সরিকি পৈতৃক বাড়ীর অংশ একবার বৃষ্টির সময় খসে ভেঙ্গে পড়ে, তখন তাঁর আপন জ্যাঠামশাই হাততালি দিয়ে হেসেছিলেন। বড় মামা তখন বাইশ বছরের যুবক, পিতৃহীন, অবস্থাও খারাপ, ওই জ্যাঠামশাই তাঁদের পৃথক করে দিয়েছিলেন।

ওদের অংশ ভেঙে পড়ে গেল, বেশ হয়েচে, এখন কিসে বাস করবে করুক, এই হল তাঁর আটাত্তর বছর বয়স্ক জ্যাঠামশায়ের উল্লাসের কারণ।

এদিনের কথা বড় মামার বড্ড মনে ছিল।

তাই তিনি রেঙ্গুনে চাকুরি করতে করতে যা করে হোক টাকা জমিয়ে পাচ হাজার টাকা দিয়ে এই বাড়ী তৈরী করেন। এ বাড়ী যখন তৈরী হয়, তখন আমার মায়ের বিয়ে হয় নি—অত আগের কালের পাঁচ হাজার টাকা আজকালকার দিনে ষাট হাজার টাকার সমান।

সেই বাড়ী ভুতের বাসা হয়ে পড়ে আছে আজ কতদিন—বোধ হয় ত্রিশ বছর সে বাড়ীতে জনপ্রাণী পদার্পণ করে নি। ছাদের মাথায় কুঁচকাঁটার জঙ্গল। বট-অশ্বত্থ গাছের স্বাভাবিক ভিড়। কেউ আসে না—বড় মামার ছেলেরা কেউ কলকাতায় থাকে, কেউ আসামে থাকে।

আর বড় মামার সেই যে জ্যাঠামশাই, হাততালি দিয়ে যিনি হেসেছিলেন—তাঁদের বৃহৎ বাড়ীটাও জঙ্গলে একেবারে ভরে গিয়েছে। বড় বড় সেকালের লোহার তালা দেওয়া আছে দরজাতে। তালা ঠিক আছে, কবাটগুলো খুলে শেকলের অবলম্বনে মাত্র ঝুলচে।

দোতালার খোলা ও ভাঙা জানালা দিয়ে ঠাকুরদিদিমার হাতের সাজানো হাঁড়ি-কলসী এখনো তাকের ওপর সাজানো দেখা যাচ্চে। আজ চল্লিশ বছরের ওপর হল এগুলো অমনি সাজানো রয়েচে। ঠাকুরদিদিমা চল্লিশ বছর মরেচেন।

দাদ্‌জীর একমাত্র পুত্র, নাম তাঁর ছিল রামলাল, তাঁকে আমার আবছায়া মনে হয়। দার্জ্জিলিংয়ে চাকরী করতেন, খুব সুপুরুষ ছিলেন। দাদ্‌জীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে একদিন দার্জ্জিলিং থেকে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ এলো। আমার তখন এগার বছর বয়েস।

সেদিনকার কথা আমার বড্ড মনে আছে।

আমার আপন দিদিমা তখন ডাল রান্না করছিলেন, তাও মনে আছে। দুপুর বেলা, তিনি রান্না ফেলে ছুটতে ছুটতে গেলেন ওদের বাড়ীতে। আমিও গেলাম দিদিমার সঙ্গে।

গিয়ে একটি করুণ দৃশ্য দেখলুম।

সেই দৃশ্যের জন্যেই সেই দিনটি বড্ড মনে আছে আমার।

দেখি যে রামলাল মামার সুন্দর তরুণী বধূ উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন মামার বাড়ীর দেশে তখনকার আমলে। উঠোনে এক উঠোন লোকের মধ্যে তিনি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কাঁদচেন না। কে তাঁকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে,

শাঁখা ভেঙে ও সিন্দুর মুছিয়ে নিয়ে আসবে, কেউ রাজী হচ্চে না, সবাই কাঁদচে, তিনিও কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছেন—এইটুকু মাত্র ছবি আমার মনে আছে।

রামলাল মামার একমাত্র শিশুপুত্রকে দিদিমা গিয়ে কোলে তুলে নিলেন রোয়াক থেকে। তার মা কিছুদিন পরে তাকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেলেন। তবে কোনোদিন স্বামীর ভিটেতে তিনি পদার্পণ করেছিলেন কিনা, আমার জানা নেই। ছেলেটি শুনেচি বড় হয়ে পশ্চিমে কোথায় চাকরি করে এখন।

সেই জঙ্গলের মধ্যে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে আবার চলাচলের রাস্তায় এসে উঠেচি—দেখি যে পরেশনাথ আসচে। পরেশনাথ সম্পর্কে আমার মামা হয়—আমার চেয়ে বেশি বড় নয়—অথচ এমন বুড়ো হয়ে গেল কি করে?

ও কাছে এলে বল্লাম—মামা যে? চিনতে পারো? কেমন আছ?

পরেশনাথ আমাকে দেখে মস্ত একটা হাঁ করলো। বল্লে—কোথায় যেন দেখেচি, চেনা চেনা মুখ—

আমি হেসে বল্লাম—বেশ! আমি কানাই—সতীনাথ চক্কত্তির ভাগনে!

সে উদাসীন এবং আগ্রহশূন্যভাবে বল্লে—ও।

ব্যস্।

অথচ আমি ওর সঙ্গে একত্র খেলা করেচি ছেলেবেলায়। এতদিন পরে ছেলেবেলার সঙ্গী দেখে ওর মনে এতটুকু উৎসাহ বা আনন্দ দেখলুম না। কেমন যেন হয়ে গিয়েচে।

বল্লাম—ভাল আছ?

জিজ্ঞাসার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবুও বলতে হল ভদ্রতার খাতিরে।

সে বল্লে—আর ম'লেই বাঁচি।

বলেই সে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি বল্লাম—দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমায় চিনতে পারলে?

—হ্যাঁ, তুমি কানাই।

—তোমার কোনো অসুখ হয়েচে?

—হাঁপানিতে ভুগচি।

—বটে। চিকিৎসা হচ্চে?

—গঙ্গাতীরে হবে, চিতের বিছানায় যেদিন শোবো। খেতেই পাইনে—চিকিচ্ছে।

—আচ্ছা, কেউ আছে নাকি এ পাড়ায় পুরনো দলের মধ্যে?

—বড় জ্যাঠাইমা আছেন। একা থাকেন।

বড় জ্যাঠাইমা মানে দাদ্জীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাঁকে বাল্যকালেই আমি বৃদ্ধা দেখেচি। তিনি এখনও বেঁচে আছেন? রামলাল মামাকে ইনিই হাতে করে মানুষ করেছিলেন তাঁর আপন মা মারা যাওয়ার পর। যখন রামলাল মারা যান, তখনি ইনি বৃদ্ধা। ইনিই উঠোনে পড়ে সেদিন গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিলেন আমার মনে আছে। আজ বিরাশি তিরাশি বছর

বয়েস হয়েচে তাঁর, এর কম হবে না কোনো হিসেবেই।

বড় দিদিমাকে দেখতে গেলাম।

সেই মস্ত বড় বাড়ীর মধ্যে কুঁচকাঁটার জঙ্গল বাঁচিয়ে অতিকষ্টে ঢুকলাম। সরু পায়ে-চলার পথ কে যত্নে ঝাঁট দিয়ে রেখে দিয়েচে।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

নব ময়রার যে বাড়ীতে আমাদের বাল্যকালের পাঠশালা বসতো, সে বাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে শেয়াল ডেকে উঠলো।

আমি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখি এক মাজা-ভাঙা বুড়ী তুলসীতলায় পিদিম দেখিয়ে আস্তে আস্তে ভাঙা রোয়াকের ওপরকার কালমেঘের জঙ্গল মাড়িয়ে বারান্দার দোরের দিকে যাচ্চে।

—ও বড়দিদিমা।

—কে ?

বুড়ী পেছন ফিরে দেখলে। আমায় চিনতে পারলে না। (চেনা সম্ভবও ছিল না অবিশ্যি)।

—কে তুমি ?

—আমি কানাই। সীতানাথ চক্কত্তির ভাগ্নে আমি।

বুড়ী থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। অবাক হয়ে গিয়েচে যেন। পরেশনাথের চেয়ে এঁর মুখের ভাব অনেক বেশি সজীব ও পরিস্ফুট। প্রাণ এখনো মরে নি।

—ও, তুমি সত্যভামার সেই খোকা! কত বড় হয়ে গিয়েচ। এসো এসো, বসো। এসো, বারান্দায় এসে বসো।

বুড়ী পিদিম রেখে এসে হরিনামের মালা হাতে আমার কাছে বসলো। বল্লাম—দিদিমা, এ বাড়ীতে কতদিন একা আছেন ?

—আজন্মো। তিনি মরে গিয়ে এস্তক।

—আচ্ছা, আপনার ছেলেপিলে হয়নি দিদিমা ?

—একটি মেয়ে হয়েছিল, ন'মাসের হয়ে মারা যায়। তারপর সেই শত্তুরকে মানুষ করেছিলাম—

—শত্তুর কে ?

—তার নাম ছিল রামলাল।

—আমি বুঝতে পেরেচি, আমার ছেলেবেলায় তিনি মারা যান।

বড় দিদিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বল্লেন—কেউ নেই ভাই। আজ আমার বিয়ে হয়েচে কতকাল তা মনেও নেই। ন'বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। আমার সতীন, রামলালের মা তখন আঠারো উনিশ বছরের। রামলাল হল, আমার কি ন্যাওটো ছিল! হাতে করে মানুষ করেছিলাম। ওর মা তো তার ঝক্কি নিতো না।

—এখন আপনার বয়েস কত হল ?

—চার কুড়ি পুরে গিয়েচে ভাই।

—একা কতদিন এ বাড়ীতে আছেন?

—তোমাকে তো বল্লাম ভাই! তিনি মরে গিয়ে এস্তক। রামলাল তখন থেকেই তো চাকরি করতো। তার বৌ এ বাড়ীতে থাকতো আমার কাছে। রামলাল মারা গেলে বৌমা চলে গেল এখান থেকে।

—আর আসে নি?

—না। বৌমার বাবার বাড়ী ছিল কলকাতার শহরে। শহরের মেয়ে, আর কখনো এখানে আসে!

—তাঁর একটি ছোট ছেলে ছিল?

বড় দিদিমা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—তুমি কি করে জানলে?

—ছেলেবেলার কথা মনে আছে যে। সে ছেলে কোথায়?

—জানিনে ভাই। পশ্চিমে চাকরি করে, এই শুনেছিলাম।

—চিঠিপত্তর দেয়?

—নাঃ।

—রামলাল মামার স্ত্রী বেঁচে আছেন?

—তা কি করে জানবো?

—খোঁজ নেয় না আপনার?

—কি জন্যে নেবে ভাই। পরে কি তা কখনো নেয়? তারা তো আর আমার কেউ না। বৌমা আমার সতীন-পোর বৌ। আমার ওপর তার কি দরদ থাকতে পারে বলো। খোকা তো আমায় মনেই করতে পারে না—তখন সে দেড় বছরের বাচ্চা। একাই থাকি, আজ কতকাল আছি তা ভুলেই গিয়েচি। কেউ নেই কোনোদিকে আপনার।

—আপনার বাপের বাড়ীর কেউ?

—হুগলীর কাছে মশাট গ্রামে আমার বাপের বাড়ী। ম্যালেরিয়ায় সে দেশ উচ্ছন্ন গিয়েচে। একটা ভাই ছিল, সে তারকেশ্বরে দোকান করতো। কোনদিন খবর নেয়নি ইনি মারা যাওয়ার পরে। সে আছে কি নেই, তা কি করে জানবো? বসো ভাই, আসচি—

বড় দিদিমা ঘরের মধ্যে ঢুকে হাঁড়ি-কলসী ঘুটঘুট করতে লাগলেন। সেকেলে খাবরাটে ইটের প্রকাণ্ড বাড়ীর ছোট ছোট জানালা-দরজাশূন্য কুঠুরী, দিনমানেই অন্ধকার। দু-তিনটি ঘর দিদিমা ব্যবহার করেন, বাকিগুলো পড়ে থাকে চামচিকে আর বাদুড়ের বাসা হয়ে। তেলের অভাবে এতবড় বাড়ী অন্ধকার। খানিকটা পরে দিদিমা বেতের ধামিতে করে আমায় নিয়ে এসে দিলেন দুটি মুড়ি আর গোটাকতক নারকেলের নাড়ু—আমার সামনে নিয়ে এসে বল্লেন—খা—

—আবার এ সব কেন?

—তুই কতকাল পরে এলি ভাই, সত্যভামার ছেলে, শুধু মুখে যাবি? আমার মনে

সাধ তো আছে, হাতেই কিছু নেই আজ।

দিদিমার স্বর ভারী হয়ে এল। বল্লেন—কাঁচা লঙ্কা খাবি? তুলে এনে দেবো?

—না, আমি লঙ্কা খাইনে।

—হ্যাঁরে, রাজায় রাজায় যে একটা মকদ্দমা বেধেছিল, তা মিটে গিয়েচে?

—কি মকদ্দমা? কোন্ রাজায় রাজায়?

—তা তো জানিনে। সবাই বলতো। চাল আক্রা হয়েছিল, কাপড় মেলে না, কেরোসিন মেলে না। কি নাকি রাজায় রাজায় মকদ্দমা হচ্চে সবাই বলতো। মিটেচে?

বড় দিদিমা বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলচেন বুঝলাম। বল্লাম—হ্যাঁ, সে মিটে গিয়েচে। আচ্ছা দিদিমা—

—কি ভাই?

—আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েচে জানেন?

—কি হয়েচে?

—স্বাধীন হয়েচে। মানে, আমরা এখন কারো অধীন নই। ইংরেজ চলে গিয়েচে দেশ থেকে।

—মহারাণীর রাজত্ব এখন আর নেই?

মহারাণী! না, দিদিমাকে কোনো রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে না নিয়ে ফেলাই ভালো। কথাবার্ত্তার ধারা বদলে ফেলার জন্যে বল্লাম—আপনার চলে কি করে?

—ওই দু তিন বিঘে ধানের জমি আছে। কর্ত্তাদের আমলের। প্রজারা বড় ভালো। তাদের কাছে ভাগে দুটো ধান পাই—আর কিছু খাজনা পাই, তাতেই একরকম কষ্টেস্ৃষ্টে চলে।

মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেল। বড় দিদিমা ঘটী করে জল দিয়েচেন, চায়ের কথা এখানে উঠতেই পারে না, এখনো দিদিমা মহারাণীর রাজত্বেই যখন বাস করেন।

বড় দিদিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—রামলালকে দেখতে পাই যেন, ছোট্ট দশ মাসের খোকা, ফুটফুটে, এই বড় বড় চোখ—হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সেই খুকীকে দেখতে পাই, রামলালের খোকাকে দেখতে পাই। কালকের কথা, চোখের সামনে যেন আজও সব ঘোরে। রামলাল আমায় আজও ভোলে নি—বড্ড ভালবাসতো। আমায় বলতো, ছোট মা, আমি এবার এসে তোমাকে আর তোমার বৌমাকে চাক্‌রির জায়গায় নিয়ে যাবো। সেই কোন্ পাহাড়ে। বড্ড শীত সেখানে নাকি?

আমি সচকিতে বলে উঠলাম—ও কিসের শব্দ?

বড় দিদিমা দন্তহীন মুখে হেসে বল্লেন—ভয় পেলি নাকি? ও ঘরে চামচিকে ঝটাপটি করচে। ও রোজই করে—আমার ও সব সয়ে গিয়েচে। শুধু তাই? বাড়ীতে বড় বড় সাপ। বাস্তু। ওঁরা কিছু বলেন না। হয়তো বিছানায় শুয়ে আছি, রাত্তিরে গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল।

সভয়ে বলে উঠলাম,—বলেন কি!

—বলচি কি। প্রায়ই দেখি। ঠাণ্ডা হিমমত গায়ে লাগে, তখন বুঝতে পারি। কি বলবো, সবই অদেষ্ট ভাই। নইলে অমন সোনার রামলাল আমায় ফাঁকি দিয়ে যাবে কেন? সতীন-পো বলে কেউ বলতে পারতো না। নিজের পেটের ছেলেও অত ভালবাসে না। আজকাল তো অনেক দেখতে পাচ্চি। বিয়ে করে এনে আমায় বল্লে—মা, তোমার দাসী নিয়ে এলাম। আমি বল্লাম—না রে, আমার দাসী কেন, সংসারের লক্ষ্মী। হেসে বল্লে—না মা, সংসারের লক্ষ্মী তুমি থাকতে আবার কে মা? বেশ মনে আছে—সূর্য্যি পাটে বসেচে, আষাঢ় মাসের লম্বা দিন, বৌ নিয়ে এসে আমার খোকা রামলাল দুধে-আলতা পিঁড়িতে দাঁড়ালো—

বড় দিদিমা কেঁদে ফেল্লেন। আমি সান্ত্বনা দেবার কথা বল্লাম অনেক। নিজেই বুঝলাম সব বৃথা। আমি এবার উঠি। যতক্ষণ থাকবো, উনি রামলালের কথা অনবরত বলতে থাকবেন। এতদিন বোধ হয় শ্রোতা পান নি—কতকাল মনের মত শ্রোতা পান নি কে জানে!

চোখ মুছে বল্লেন—তবুও আছি, কর্ত্তা তো চলে গিয়েচেন, তাদের ভিটেতে সন্দেবেলা পিদিমটা দিচ্চি—এই ভেবে মনকে বোঝাই। আজ আমার নাৎবোয়ের পিদিম দেওয়ার কথা, শাঁখ বাজানোর কথা—

আমি দিদিমাকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। কোথায় হুতুম প্যাঁচা ডাকচে যেন দুর্গা-মণ্ডপের জঙ্গলে। জ্যোৎস্নার আলোয় এই প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা আর কালমেঘের গোয়ালে-লতার জঙ্গল রহস্যময় দেখাচ্চে। কত কালের কত ইতিহাস এদের গায়ে লেখা।

পিছন ফিরে আবার দেখলাম, বড় দিদিমা বাইরের রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে আমার গমনপথের দিকে চেয়ে আছেন। কতদিন এই ইটের কারাগারে বন্দিনী থাকবেন দিদিমা? পাষাণী অহল্যার উদ্ধারের আর কত বিলম্ব কে বলবে।

অবিশ্বাস্য

চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

আমি দরিদ্র স্কুল-মাস্টার। চাকুলিয়া এরোড্রোমের চিফ্ এন্‌জিনিয়ারের তক্‌মা-পরা উর্দ্দি-আঁটা চাপরাসী নামলো যে স্টেশন-ওয়াগন থেকে সে স্টেশন-ওয়াগন আমার খোলার বাড়ীর দোরে কেন? এগিয়ে গেলুম। কি ব্যাপার চাপরাসী সাহেব? কোথা থেকে আসা হচ্ছে? ভুল করনি তো?

—আপ্‌কো নাম আছে চাটুর্জ্জি বাবু? ইস্কুল-কা মাস্টার? একঠো চিট্টি হ্যায় বড়া সাব্‌কা, আপ্‌কা নামমে।

—কোন্ বড় সাহেব?

—চিফ্ এন্‌জিনিয়ার সাব্, চাকুলিয়া এরোড্রোম।

—হ্যাঁ, আমারই নাম শৈলেন চট্টোপাধ্যায়।

—এস. এন. চাটার্জি—এহি লিজিয়ে—ঠিক হুয়া, ওহি নামমে চিটি হ্যায়।

অ্যা?···বলে কি! আমার নামের চিঠি। তাতে লেখা আছেঃ

"ভাই বগ্‌দা, অনেক কষ্টে তোর সন্ধান পেয়েছি। তোর 'বগদা' নাম আমরাই দিয়েছিলাম মনে আছে? তুই এখানে মাস্টারি করিস্ শুনলাম। তাই গাড়ি পাঠালুম। বৌ ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চলে আসবি, এখানেই খাবি রাত্রে। গাড়ী করে পাঠিয়ে দেবো। আসা চাই—একা নয় কিন্তু, সস্ত্রীক। ইতি—তোদের ধীরেন রায়।

ঘাটপাত্‌লে হাই-স্কুল। আমার মাসীর বাড়ী। মেসোমশায় আমায় ভালো চোখে দেখেন নি কখনো। তাঁর কড়া, নির্মম শাসন, হৃদয়হীন শাস্তি। মাসীমার খিট্‌খিটে মেজাজ, বেশি ভাত খাই বলে দুবেলা পাকেপ্রকারে অনুযোগ। সহপাঠিরা 'বগ্‌দা' বলে খেপাতো। পেট ভরে খেতে পেতাম না। কাপড় সেলাই করে পরতে হত।

কিন্তু ধীরেন রায় কোন্ ছেলেটি? আজ পঁচিশ বছর আগেকার বিস্মৃতপ্রায় স্কুল জীবনের দিনগুলির কুয়াশার মধ্যে ধীরেন বলে কোনো ছেলের মুখ তো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো না চোখের সামনে? নাম সব ভুলে গিয়েচি। চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়েস হল। পনেরো-ষোল বছরের কথা কত মনে আছে, বিশেষত এই দরিদ্র জীবনে।

সুহাসিনী শুনে হঠাৎ বড় ভয় পেয়ে গেল। অত বড়লোকের বাড়ী যাওয়ার উপযুক্ত শাড়ী নেই, গহনা তো দুগাছা ব্রোঞ্জের ওপর সোনার কাজ-করা চুড়ি। তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি লাল কলকা-পাড় একমাত্র ভালো শাড়ীখানা, যা কি-না বৃটিশ ফ্ল্যাগের মত সর্ব্বজনবিদিত, পরিবর্ত্তনহীন ও অকাট্য হয়ে উঠেচে, পরে উঠলো ছেলেমেয়ের হাত ধরে গাড়ীতে।

গবর্ণমেণ্টের গাড়ী হু হু বেগে ছুটলো মাঠ-বনের পাশ কাটিয়ে চওড়া পিচঢালা রাস্তা বেয়ে। স্টেশন-ওয়াগনের মধ্যে তিনটি গদিমোড়া বেঞ্চি—হাত পা মেলে দিব্যি বসা গেল।

সুহাসিনী জীবনে এতদূর মোটরগাড়ী চড়ে যায় নি কখনো, সে এবং ছেলেমেয়েরা খুশি-উপ্‌চে-পড়া চোখগুলো বড় বড় করে জানলা দিয়ে দ্রুত চলমান গাছপালা, পাথর, ঝরণার দিকে চেয়ে ছিল। মাঝে মাঝে বলছিল—হ্যাঁগা, আমরা ক'মাইল এলাম? ঐ ঘরখানাতে কারা আছে? দ্যাখো দ্যাখো কি চমৎকার ফুল ফুটে আছে বনে! আচ্ছা, এটা কি নদী? আর কদ্দূর আছে? বেশ সিনারি এ জায়গাটার, না? ওটা কি পাহাড়? ঐ যে বন-ধুঁধুলের ফুল ফুটে আছে দেখলাম, ওই ধুঁধুল কি তরকারী রেঁধে খায়? জবার জামাটা খুব ময়লা না তো? তাকিয়ে দ্যাখো তো! বাঃ কি সুন্দর ঢালু পাহাড়টা! দ্যাখো দ্যাখো—পাহাড়ের ওপর ওটা কি গাছ? কুসুম গাছ?···

চাকুলিয়া এরোড্রোমে গাড়ী পৌঁছে গেল। তার পরও পাঁচ মিনিট চলবার পর একটা

সাদা বড় বাংলোর সামনে হর্ণ দিয়ে গাড়ী দাঁড়াতেই ফুল-প্যাণ্ট ও হাতগোটানো কামিজ-পরা এক ভদ্রলোক হাসিমুখে বাংলোর বারান্দায় দেখা দিলেন, তাঁর পেছনে একটি ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়ালেন, ছোট-বড় ছেলেমেয়ে সঙ্গে। সুহাসিনীর মুখ চুণ হয়ে গিয়েচে দেখলাম, বেচারী এমন বড়লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে কখনো আসেনি, দেখে শুনে ঘাবড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় ওর পক্ষে।

—আরে এই যে, আয় বগ্‌দা! এসো এসো বৌ-ঠাকরুণ!. ওগো, এই ছাখো আমাদের বগ্‌দা! তারপর—সব ভালো? একটি ছেলে, দুটি মেয়ে? বেশ বেশ···থাক্ থাক্, এসো বাবা, সুখে থাকো,—ইনি তোমাদের কাকী-মা হন, প্রণাম করো।

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে সাহেবী-পোশাক-পরা ব্যক্তিটির দিকে চেয়ে ছিলুম। আরে, এ দেখচি আমাদের ক্লাসের সেই হাজু! যে সেকেণ্ড মাস্টারের অঙ্কের পিরিয়ডে নিয়মিত টাস্কের খাতা দেখাতো, একদিনও বাদ দিত না বলে মনে আছে সেকেণ্ড মাস্টার ওকে বড্ড ভালবাসতেন। কিন্তু নীলমণি মিত্রের ইংরিজির পিরিয়ডে হাজু পেছনের বেঞ্চিতে আত্মগোপন করতো কোথায়, একদিন একটাও পার্সিং করতে শুনিনি ওর মুখে। আর মনে আছে ফুটবল খেলতে গিয়ে স্কুলের মাঠে ওর হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। মাস খানেক সেজন্য হাসপাতালে ছিল। মেয়েরা চলে গেল বাড়ীর মধ্যে, আমি ও হাজু বসে বসে কত পুরনো কথা বলতে লাগলুম। ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। হাজুর বড় মেয়ে চা ও খাবার দিয়ে গেল আমাদের দুজনের।

মিথ্যে কথা বলবো না, অনেকক্ষণ থেকে এই খাবারের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল ক্ষুধাতুর মন। তা খাবার এলো ভালই—লুচি, বেগুন ভাজা, ইলিশ মাছ ভাজা, সন্দেশ, রাবড়ি। পরিশেষে চা।

হাজু বল্লে—সব বাড়ীর তৈরি। গৃহিণী ভাল রাঁধিয়ে—ওই মস্ত এক সুখ।

—কই, তোর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি তো?

—চল্ বাড়ীর মধ্যে। খাবার-টাবার তৈরি করছিল। রাত্রে এখানে খেয়ে যাবি কিন্তু।

—এই তো ভাই যথেষ্ট পেটভরা খাওয়া হল। আবার রাত্রে কি খাবো?—কথাটা কিন্তু আদৌ অতিরঞ্জিত বলিনি।

চা খাওয়ার পর হাজু বল্লে—চল্—এরোড্রোমের রান্-ওয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

—বৌকেও নিয়ে যাবো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যাব, সেখানে খাওয়া যাবে।

সুহাসিনী এসে মোটরে উঠলো হাজুর সঙ্গে—আলাপ করিয়ে দিলাম। হাজু বল্লে—বৌ-ঠাকরুণ, একদিন আপনার হাতের রান্না খেতে যাচ্ছি কিন্তু—

সুহাসিনী বল্লে—সামনের রবিবার চলুন না সবাই। দিদি, মণ্টু, নীলিমা, অনিমা, সবাই যাবে।

হাজু হেসে বল্লে—সে হবে না। স্টেশন ছেড়ে বেশিক্ষণ কোথাও যাবার জো নেই আমার। খাবো গিয়ে সন্দের পরই। ঘণ্টা খানেক থাকবো। বাড়ীতে এরা না থাকলে চলবে না,

এরোড্রোমের সাহেব-সুবো আসে ঐ দিন বেড়াতে—তাদের চা-টা দিতে হবে। আমি ঠিক যাবো।

—মণ্টু, নীলিমা, অনিমাকে নিয়ে যাবেন কিন্তু।

চাকুলিয়া এরোড্রোমের নানা জায়গা ঘুরে কেনেডি বলে এক সাহেবের বাংলোয় হাজু মোটর নিয়ে হাজির হল। কেনেডি এরোড্রোমের গ্রাউণ্ড অফিসার এবং এন্‌জিনিয়ার। হাজুর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব আছে বোঝা গেল। আমাকে, বিশেষ করে সুহাসিনীকে, খুব খাতির করলে। সুহাসিনী তো ভয়ে ও সংকোচে জড়সড়। ছেলে মেয়েদের বিস্কুট, পনির, কলা প্রভৃতি খেতে দিলে। আমাদের দিলে কফি। দেশী গান শুনতে নাকি বড় ভালবাসে শুনে আমি সুহাসিনীকে একটা গান করতে বললাম। সুহাসিনী গরীবের ঘরনী বটে, কিন্তু ভারি সুন্দর ওর কণ্ঠ, তবে সময়াভাবে চর্চ্চা না হওয়ায় নতুন আর কিছু শিখতে পারে নি। রজনী সেনের একটা গান ও কেমন চমৎকার গাইলে। কেনেডি শুনে খুব খুশি। আমি বল্লাম, যেদিন আমাদের বাড়ী যাবে কেনেডিকেও নিয়ে যেও। সুহাসিনীও তাই বল্লে। কেনেডিকে আমি সুহাসিনীর অনুরোধ বুঝিয়ে দিলাম। কেনেডির খুশি আর ধরে না। সুহাসিনীকে বল্লে—মাই ইণ্ডিয়ান সিস্‌টার, আই মাস্‌ট্ কীপ ইওর ইন্‌ভিটেশন।

হাজুর বাংলোয় যখন আমরা ফিরে এলাম, তখন রাত আটটা। তখুনি আমাদের খাবার জায়গা হল। ঘি-ভাত, মাংস, মাছ, চাটনি, পায়েস ও সন্দেশ। বেশ রান্না। ঘি খুব ভালো! মুঙ্গের থেকে কে একজন ওকে এই ঘি নাকি এনে দেয়।

খাওয়া হয়ে গেলে স্টেশন-ওয়াগন তৈরী হয়ে এল আমাদের জন্যে। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মোটরে চড়ে আমরা রওনা হলাম। আবার সেই অরণ্যপথ ও মুক্ত প্রান্তর, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। আমাদের মন আনন্দে পূর্ণ। সমস্ত পথ সুহাসিনী কেবল সেই কথা বলতে বলতে এলো। বল্লে—আগে ভেবেছিলাম বড়লোকের কাণ্ড-কারখানা, না জানি কি বিপদেই পড়বো গিয়ে। কিন্তু এমন অমায়িক সবাই! দিদি তো মাটির মানুষ। তেমনি ঠাকুর-পো। সাহেবটাই বা কি ভাল লোক! ওদের কিন্তু ভাল করে খাওয়াতে হবে রবিবারে। আমি ছেলেমেয়েদের আসতে বলে দিয়ে এসেচি।

আমরা রাত দশটার সময়ে এসে নিজেদের খোলার ঘরের বাসায় পৌঁছলাম। উৎসাহ ও আনন্দে সুহাসিনী সারারাত প্রায় জেগেই রইল এবং শুধুই এরোড্রোম-ভ্রমণের নানা ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। সে জীবনে কখনো এমন মোটর-ভ্রমণ করে নি, এমন সুখাদ্য খায় নি, এত বড় দলের লোকের সঙ্গে মেশেনি। সবটা মিলিয়ে আজ তার জীবনের একটি অতি স্মরণীয় দিন। আমার তৃপ্তি এই ভেবে যে, আমার নিজের কোনো দিনও ক্ষমতা হত না ওকে এভাবে আনন্দ দিই—তবুও অপরের দৌলতে যা হয় একটু আমোদ আহ্লাদের মুখ দেখে নিলে একদিন।

—আচ্ছা, ওঁদের কি খাওয়াবো বল দিকি? সাহেবটা যদি আসে, আমাদের খাওয়া খাবে তো?

—ঘি-ভাত রঁাধতে পারবে না ?

—খুব।

—মাংস আর ঘি-ভাত রেঁধো। পায়েসের দুধ কতটা লাগবে বলো তো ?

—তা আড়াই সেরের কম নয়। সেও ধরো একটা টাকা। বাদাম, কিসমিস্ চাই।

—বাদাম নয়, পেস্তা বলো।

—ওই হল। পেস্তা।

—মাছ, কি মাছ আনবো ?

—রুই কি কাৎলা এনো। কিন্তু মাছ কোথায় পাবে এ সময় ? মনে হচ্ছে না যে মাছ পাবে। দেখো চেষ্টা করে। তোমার বন্ধুটি মাছ-মাংস খুব ভালবাসেন।

—কে বললে তোমায় ?

—দিদি বলছিলেন।

—মুরগী খায় বলেচে ?

—ওঃ, খুব। বাড়ীতে মুরগী পোষে, পেছন দিকটাতে। না খেলে বাড়ীতে মুরগী পোষে কেন ?

শেষরাতের দিকে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেও যেন বড় স্টেশন-ওয়াগনের গদি-আঁটা বেঞ্চিতে বসে চক্রাকারে মস্ত বড় রান্‌ওয়েটায় ঘুরচি···ঘুরচি···

—বাবু! বাবুজি! বাবু!

আগেই মোটর আসার শব্দ পেয়েছি। সেই স্টেশন-ওয়াগনটা। ছুটে বাইরে এলাম। সবে স্কুল থেকে এসে বসেছি হাত-পা ধুয়ে। বেলা পাঁচটা।

—কি ব্যাপার চাপরাসী সাহেব ? বড় সাহেব পাঠিয়েছে বুঝি ? চিঠি কই, ছায় নি ?

—বাবুজি, বড়া সাব—নেহি হায়। আজ বেলা করীব এক বাজে বহুৎ ভারী অ্যাকসিডেণ্ট হুয়া দো নম্বর রান-ওয়েমে। পাথল কাটাতা থা ডিনামাইটসে। বড়া সাব হুঁয়াপর হাজির থা—মগর ওহি পাথল ফাট করকে ছুটা বহুৎ দূর। বড়া সাবকো মাথামে গিরা—একদম চুর হো গিয়া। মাইজিকো ফিট হুয়া, আবতক হোঁশ নেহি আয়া। কেনেডি সাহেবনে ভেজিন আপকো পাস—চলিয়ে। কেনেডি সাবকা চিট্টি হায়—

সুহাসিনী বাইরে এসে বল্লে—কার চিঠি গা ? ওঁরা আসবেন ? হাজু ঠাকুরপো লিখেচে ? কবে আসবে ?

মতিলাল ছেলেকে বল্লে—বোসো বাবা, গোলমাল করো না। হিসেব দেখছি—

ছেলে বাবার কোঁচার প্রান্ত ধরে টেনে বল্লে—'ও বাবা, খেলা কব্‌বি আয়—

—না, এখন টানিস্‌নে—আমার কাজ আছে—

—ও বাবা, খেলা কব্‌বি আয়—ঘোয়া খেলা কব্‌বি আয়—

—আঃ, জ্বালালে—চল্‌ দেখি—

মতিলাল হিসাবের খাতা বন্ধ করে ছেলের পিছু পিছু চললো। ছেলে তার কোঁচার কাপড় ধরে টেনে নিয়ে চললো কোথায় তা সেই জানে।

—কোথায় রে?

—ওখেনে—

হাত তুলে খোকা একটা অনির্দ্দেশ্য অস্পষ্ট ইঙ্গিত করে—ভাল বোঝা যায় না। অবশেষে দেখা যায়, ভাঁড়ারঘরের পেছনে যে ছোট রোয়াক আছে, বর্ষার জলে সেটা বেজায় পেছল, শেওলা জমে বিপজ্জনক ভাবে মসৃণ—সেখানে নিয়ে এসে দাঁড় করালে মতিলালকে—

—এখানে কি রে?

—আউভাজা খা, আউভাজা খা—নে—

খোকা রোয়াকের নিচেকার কালকাসুন্দে গাছের পাতা এক একটা করে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে লাগলো হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে, তারপর বাবার সামনে সেগুলো এক এক করে বসিয়ে দিলে।

—পড়ে যাবি, পড়ে যাবি, রোয়াক থেকে নীচে পড়ে গেলে ইটে কেটে—আঃ!

—আউভাজা খা না—ও বাবা?

মতিলাল ছেলের হাত ধরে রোয়াকের ধার থেকে টেনে নিয়ে এল দেওয়ালের দিকে। ছেলে ঘাড় বেঁকিয়ে চোখের তারা একপাশে নিয়ে এসে মতিলালের দিকে চেয়ে বল্লে—ঠিক বলেচ—

এ কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অবান্তর। ঐ কথাটা ছেলে সম্প্রতি শিখেচে সুতরাং স্থানে অস্থানে সেটা বলতে হবেই। মতিলাল ছেলের কথার দিকে মন না দিয়ে খড়ের চালার একটা বাঁশের রুয়োর দিকে চেয়ে আপন মনে বলতে লাগলো—এঃ, উই লেগেচে দেখো—বর্ষাকালে যেটা তুমি নিজে চোখে না দেখবে, সেটাই লোকসান হবে—

খোকা এবারও বল্লে—ঠিক বলেচ—

অবিশ্যি খোকার উক্তির প্রয়োগসাফল্য এখানে সম্পূর্ণ আকস্মিক।

মতিলাল বল্লে—যাঃ যাঃ—ঐ এক শিখেচে 'ঠিক বলেচ', তা ওর সব জায়গায় বলা চাই। তা খাটুক আর না খাটুক—থাম্‌—

খোকা ভাবলে, বাবা তাকে বকলে কেন? সে হঠাৎ বড় দুঃখিত হল। দেড় বছর মাত্র

ওর বয়েস, নাম টুনু, যেমন দুষ্টু, তেমনি বাচাল। মুখের বিরাম একদণ্ড নেই। বিষম পিতৃভক্ত, বাবা ছাড়া জানে না। সর্বদা বাবাকে চায়। ওর মা বলে, কাকে তুমি বেশি ভালবাসো খোকা ?

—বাবা মতিলালকে।

—আর মা অন্নপুন্নোকে নয় ?

—হুঁ-উ-উ।

—তবে ?

—বাবা মতিলালকে।

—তা তো সবই বুঝলাম। আমি বুঝি ভেসে এইচি ? আমি বুঝি ভালবাসার যুগ্যি নই, হ্যারে—এইবার বল্, কাকে ভালোবাসিস্ ?

—বাবাকে, বাবা মতিলালকে—

—বাঃ, বেশ ছেলে দেখচি। খোকন, সোনার খোকন, তুমি কার খোকন ?

—বাবা মতিলালের।

—আর কার খোকন ?

—মার।

—মার কি ভাগ্যি।

এই ধরণের কথা রোজই প্রায় হয়। এসব থেকে এইটুকুই বোঝা যায় যে, টুনু বাবার একটু বিশেষ রকমের ন্যাওটো। বাবা ছাড়া সে কাউকে চায় না বড় একটা, বাবার সঙ্গে নাওয়া, বাবার সঙ্গে খাওয়া, বাবার সঙ্গে ঘুমোনো।

মতিলাল এতে খুব সন্তুষ্ট নয়। তার হিসেবপত্রের খাতা মোটেই এগোয় না, এক দিনের কাজে তিন দিন লাগে।

বিকেলে মতিলাল হয় তো চাইচে নদীর ধারে কি কোনো বন্ধুর বাড়ী একটু বেড়িয়ে আসবে, ছেলে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে—ও বাবা, কি করচিস ?

—কিছুই করিনি। দাঁড়িয়ে আছি।

—বেরিয়ে চলো। আমি যাবো।

—না।

—আমি যাবো বাবা।

—না। যায় না।

খোকা ততক্ষণ মতিলালের কোঁচার কাপড় হাতের মুঠোর মধ্যে পাকিয়ে ধরে ঠোঁট ফুলিয়েচে। চোখে তার করুণ আবেদন ও আশার চাউনি। কে পারে তার কথা না শুনে ? মতিলালকে সঙ্গে নিতেই হয়। বাবার কাঁধে উঠে স্ফূর্তি তার। তখন সে জেনেছে, বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্চে সে অনেক দূরে কোথাও। তার পরিচিত জগতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে।

মনের আনন্দে সে বলে যাবে—ও বাবা, ও মতিলাল, কি করচিস ? বেরিয়ে চলো ? আমি যাই।

—কোথায় যাচ্ছিস রে ?

—মুকি আনতে।

—আর কি আনতে ?

—চিনি আনতে।

—আর কি আনতে ?

—মাছ।

—আর কি ?

খোকা ভেবে ভেবে ঘাড় দুলিয়ে বলে—আউভাজা—

—বেশ।

থানিকদূর গিয়ে খোকা আর বাবার কাঁধে থাকতে রাজি হয় না। তাকে পথে নামিয়ে দিলে সে গুটি গুটি হেঁটে চলে। দু-একবার পড়ে যায়, আবার ঠেলে ওঠে। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে খোকা আর চলে না। সামনের দিকে কি একটা জিনিস সে লক্ষ্য করে দেখচে।

—চল্ এগিয়ে, দাঁড়ালি কেন ?

খোকা ছোট্ট হাত দুটি প্রসারিত করে বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে—বিচন কাদা !

—কোথায় ভীষণ কাদা রে ? কাদাই নেই রাস্তায়—চল্—

—বিচন কাদা !…

—তবে নামলি কেন কোল থেকে ? আয় আবার কোলে আয়—

আবার চলতে শুরু করলো খোকা। বেশ খানিকটা গেল গুট গুট করে। একটা জায়গায় পথের পাশে একটা শুকনো কিসের ডাল পড়ে থাকতে দেখে থেমে গেল। আঙুল বাড়িয়ে বল্লে—বাবা—আটি—আমি নিই—

—যাতে তাতে হাত দিও না—

—বাবা আমি নিই—

—নাও—

খোকার একটা গুণ, বাবার বিনা অনুমতিতে সে কোন একটা কাজ হঠাৎ করতে চায় না। এইবার সে তুলে নিলে লাঠিটা। আশপাশের গাছপালার গায়ে সপাসপ মারতে লাগলো। ওর বাবা বলে—ফেলে দে—ও খোকা, এইবার ফেলে দাও লক্ষ্মীটি—

—ও মতিলাল ?

—কি ?

—কি করচিস ?

—বেড়াতে যাচ্ছি বাবা। লাঠিটা ফেলে দে—লক্ষ্মী খোকা, লাঠি ফেলে দে—

খোকা লাঠিটা রাস্তার পাশে ফেলে রেখে আবার দিব্যি গুটু গুটু করে চলে। এক জায়গায় রাস্তার দু-পাশে ভাঁটুই গাছ বর্ষাকালে খুব বেড়েচে। রাস্তার দু-পাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাঁটুইবন।

খোকা হঠাৎ দুহাত প্রসারিত করে বল্লে---কি ধান! কি ধান!

—ধান কই রে? ও হল—

—কি ধান! কি ধান!

মতিলাল ভেবে দেখলে, অতটুকু ছেলে ধান এবং ভাঁটুইয়ের পার্থক্য কি করে বুঝবে।

—ও বাবা, কি ওতা?

—কই রে?

—ওই—বসে আছে—

মতিলাল খোকার আঙুলের দিগ্‌দর্শন অনুসরণ করে দেখলে, সামনের গাছের ডালে একটা কাঠবেড়ালি বসে আছে। খোকা আর যায় না, সে দাঁড়িয়ে গিয়েচে এবং ভয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে একদৃষ্টে সেটার দিকে। বাবার দিকে দুহাত বাড়িয়ে বল্লে—বাবা, কোলে—

—কোলে আসবি?

—ভয় কর্‌বে—

—কিসের ভয় রে? এটা হল কাঠবেড়ালি—ও কিছু বলে না। ভয় নেই—চল্—

মতিলাল যে বন্ধুটির বাড়ী গেল, তারা ওকে এক পেয়ালা চা খেতে দিলে। মতিলালের ছেলেকে দিল একটুকরো মিছরি। খোকা মিছরি একটু মুখে দিয়েই মুখ থেকে বার করে নিয়ে মতিলালের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লে—বাবা, খা--

এখন এ ব্যাপারটার ভেতরের কথা এখানে বলা এ সময়েই দরকার। ছেলের বয়স যখন আরো কম, দশ-এগারো মাস কি বছরখানেক, তখন থেকেই সে নিজের মুখে কোনো জিনিস মিষ্টি লাগলেই বাবার মুখের দিকে হাত বাড়িয়ে বলবে—বাবা, খা—

মতিলালেরও বিশেষ আপত্তি থাকত না তাতে।

অবশ্য একটিবার বাদে।

একবার মাতৃস্তন্য পান করতে করতে খোকা নিকটে উপবিষ্ট মতিলালকে বলেছিল—বাবা, মিস্ত খা—

মতিলালেরা স্বামী-স্ত্রী মিলে খুব হেসেছিল।

নিজের মুখে যা ভাল লাগবে, তাই সে দেবেই বাবার মুখে এবং মতিলাল তা খেয়েও এসেচে, মুশকিলে পড়ে যেতে হয় ওকে, লোকজন থাকলে।

এখানে যেমন হল।

মতিলাল সলজ্জভাবে বল্লে—না, না—আমি আবার কি, খাও না—

খোকা বাবার রাগের কারণ খুঁজে পেলে না, রোজ যে খায়, আজ খাচ্ছে না কেন? নিশ্চয়ই রাগ করেচে।

সে দ্বিগুণ উৎসাহে বাবার মুখের আরো কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বল্লে—বাবা, খা—

—না না। তুমি খাও—

—বাবা, খা না—

খোকার এবার কান্নার সুর। অমন মিষ্টি জিনিসটা বাবাকে সে খাওয়াবেই।

মতিলাল ধমক দিয়ে বল্লে—আঃ খাওনা? আমার মুখে কেন?

—বাবা, খা না—

এবার বোধ হয় সে কেঁদেই ফেলবে। অগত্যা মতিলাল খোকার হাত থেকে মিছরির টুকরোটা নিয়ে খাবার ভান করে আবার ওর হাতে দিলে। খোকাকে ভোলানো অত সহজ নয়। সে বাবার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, মিটি?

—খুব মিষ্টি।

—আবার খা—

—না রে বাপু, বিরক্ত করলে দেখচি—

বন্ধুর বাড়ীতে অনেকে বসে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বল্লে—খোকা কি বলচে?

মতিলাল বল্লে, মিছরি দিচ্ছে খেতে—

ওর বন্ধু বল্লে—ও খোকা, বাবাকে কি দিচ্চ? মিছরি? তুমি খাও।

এই সব স্থূলবুদ্ধি লোকে কি বুঝবে—খোকা তাকে কতখানি ভালবাসে বা সে খোকাকে কতখানি ভালবাসে। এদের কাছে কিছু বলে লাভ নেই। পিতাপুত্রের সেই সূক্ষ্ম অবিচ্ছেদ্য ভালবাসার গূঢ় তত্ত্ব, যা মুখে বলা যায় না, যার বলে এক বছরের শিশু তার অত বয়সে বড় বাপের মনের ভাব বুঝতে পারে, সে জিনিসের ব্যাখ্যা যার তার কাছে করে কি হবে?

মতিলাল বল্লে—খাও তুমি—

খোকা হাত বাড়িয়ে বল্লে—খা না বাবা—

মতিলাল খোকাকে কোলে নিয়ে বন্ধুর বাড়ী থেকে উঠলো। খোকার মনে বার বার কষ্ট দেওয়াও যায় না, অথচ ওদের সামনে খোকার মুখ থেকে বের করা তার লালঝোলমাখা মিছরি খায়ই বা কি করে?

ওরা পথে নামলো।

টুনুর ক্ষুদ্র জগতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। আশপাশের পথে, বনে, ভাঁটুইবনে অন্ধকার নেমেচে। জোনাকি জলচে কালকাসুন্দে গাছের ঝোপের আশেপাশে, ষাঁড়াগাছের নিবিড় পত্র-পুষ্পের মধ্যে, বনমরচে লতার চারু অগ্রভাগে। অন্ধকারের গহ্বর থেকে যেন ফুটে উঠচে একে একে জ্যোতির্লোক, নীহারিকালোক।

মতিলাল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—ও কি জলচে রে?

—জোনা পোকা। নিয়ে এসো বাবা—

—তুই নিবি একটা?

—হ্যাঁ।

খোকা হেঁটেই যাচ্ছিল, অন্ধকার বনঝোপের দিকে তাকিয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ।

—কি হল রে ?

—বিচন কাদা !

—না মোটেই কাদা নেই, শুকনো পথ—

—ছিয়াল !

—কোথায় ? কোথাও নেই, চলো—

—কোলে কর্—নে—ভয় কব্‌বে—

—এসো তবে—

খানিকটা গিয়ে খোকা বল্লে—বাবা !

—কি ?

—ও বাবা—আমি মুকি খাবো—

—বেশ

—সন্দেশ খাবো—

—বেশ

—ও বাবা !

—বোকো না—চুপ করো।

—ও বাবা মতিলাল !

—কি বাবা ?

—কি করচিস্ ?

—কি আবার করবো ? পথ হাটচি।

—মা কোথায়—মা ?

—বাড়ীতে আছে।

—মার কাছে যাই—

—সেখানেই তো যাচ্চি—

মতিলালের স্ত্রী ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়েছিল। ছুটে এসে ছেলেকে কোলে নিয়ে বল্লে—ও আমার সোনার খোকন, আমার রুপোর খোকন, আমার এতটুকু একটা খোকন—কোথায় গিইছিলি রে ?

—খোকা হাত দিয়ে একটা অনির্দ্দিষ্ট বস্তু দেখিয়ে বল্লে—ওখেনে—

—ওখেনে ? বেশ রে, বেশ। হ্যাঁগো, যা-তা খাওয়াও নি তো ?

মতিলাল বল্লে—না না। কি দেবেই বা কে এ সব জায়গায়। একটু মিছরি খেয়েচে।

অন্নপূর্ণা ওকে দুধ খাইয়ে শুইয়ে দিলে। খোকা খানিকটা উসখুস করে বল্লে—বাবা কোথায় ?

—কেন ?

—ঘুম দেবে।

—আমি ঘুম দিচ্ছি।

—বাবা দেবে—বাবা দেবে।

মতিলালকে খোকার শিয়রে বসে বসে ঘুম পাড়াতে হয়। প্রতি সন্ধ্যাতেই এ রকম। আজ নতুন কিছু নয়। খোকা বলে—বাবা, জস্তি গাছটি—

কি ? জস্তি গাছটি ? তবে শোনো—

ওপারের জস্তি গাছটি জস্তি বড় ফলে—
গোজস্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে

খানিকটা পরে খোকা নিস্তব্ধ ও নীরব হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে মতিলাল যেমন বাইরে এসে বসে বসে তামাক ধরিয়েছে, খোকা এমন সময়ে কেঁদে উঠলো—ও বাবা, কোথায় গেলি ? ও বাবা—

মতিলাল তামাক খেতে খেতে হুঁকো নামিয়ে রেখে ছুটলো ছেলের কাছে।

অন্নপূর্ণা হেসে বলে—ও ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে পেছন দিকে হাত দিয়ে দেখে তুমি আছ কিনা। যদি বোঝে—নেই, তবে ওর ঘুম অমনি ভেঙে যায়—

বাইরের তামাকের ধোঁয়া পুড়ে পুড়ে শেষ হয়, মতিলালকে ঠায় বসে থাকতে হয় শিশুর শিয়রে।

পরদিন নাইতে যাচ্ছে তেল মেখে মতিলাল। খোকা বল্লে—আমি যাবো—বাবা—নদীতে যাই।

সে রোজই যায়। তাকে তেল মাখিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাঙায় দাঁড় করিয়ে রাখে। যে ঘাটে মতিলাল যায়, সেটাতে লোকজন বড়-একটা যায় না। বড্ড বনজঙ্গল। খোকা জলে নামবার জন্যে ব্যস্ত হয়।

মতিলাল ওকে কোলে করে জলে নামে। মহাখুশিতে দুহাত দিয়ে খোকা খলবল করে জলে। কিছুতেই উঠতে চায় না। ওকে দুটো ডুব দেওয়ায় মতিলাল। এক একটা ডুবের পর খোকা শিউরে আড়ষ্টমত হয়, নাকে মুখে জল ঢুকে যায়। খানিক পরে সামলে নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। নদীতে বর্ষার ঢল নেমেচে, বড় বড় শেওলা, কচুরিপানা টোপাপানার দাম তীর-বেগে ভেসে চলেচে।

খোকা বলে—ও কি বাবা ?

—শেওলা।

—ও বাবা, গান করি, গান করি—

—করো।

—এ-এ-এ-এ, ঘঠি বধনন—

খেলারাম বাবাজি বাবাজি—

—বেশ। বেশ গান। এবার জল থেকে ওঠো। হ্যাঁরে, তোকে ও গান শেখালে কে রে ?

—ফুছু।

—হ্যাঁ—যতো সব কাণ্ড ! আবার গান করো তো ?

—ঘটি বধনন--

খেলারাম বাবাজি—

—বেশ গান শিখিচিস—জয় যদু-নন্দন, ঘটীবাটি-বন্ধন,

তুলোরাম খেলারাম বাবাজি—

খোকার বহু আপত্তি সত্ত্বেও মতিলাল খোকাকে গা মুছিয়ে ঘাটের ওপরে কুলগাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে নাইতে নামলো। ঢল-নামা বর্ষার নদীতে কামট-হাঙরের ভয়, জেলেরা প্রায়ই দেখতে পায়। কুমীর তো কাল না পরশু একটা দেখা দিয়েছিল বেলেডাঙার বাঁকে। খোকাকে বেশিক্ষণ জলে রাখা ঠিক নয়। ডাঙার কুলতলা থেকে বাবাকে জলে ডুব দিতে ও হাত-পা ছুঁড়তে দেখে খোকা খুব খুশি। ক্রমে খোকাকে খুশি করবার জন্য মতিলাল খরস্রোতা বর্ষার নদীতে সাঁতার দিতে শুরু করলে।

খোকা ডাঙা থেকে ডাকলে—ও বাবা—বাবা—

দূর থেকে মতিলাল উত্তর দিলে—কি ?

—আমি যাই—

—না, আর নদীতে নামে না। ঠিক থাকো।

—ও বাবা—

—থাক্ দাঁড়িয়ে ওখানে—

খানিকটা পরে বাবাকে আদৌ আর না দেখতে পেয়ে খোকা ডাকতে লাগলো—বাবা—বাবা—

কোনো সাড়া নেই।

—ও বাবা—ও মতিলাল—

কোনো দিকে মতিলালের দেখাও নেই।

—ও মতিলাল, ভয় কব্‌বে—

খানিকটা চুপ করে থেকে সে ভয়ের স্বরে বল্লে—ছিয়াল ! বাবা, ও বাবা—

অনেকক্ষণ পরে কে-একজন তরকারিওয়ালা নৌকো পার হবার জন্যে এসে দেখে, কুলতলায় একটা ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কাঁদচে। অনেক দূর থেকেই সে শিশুকণ্ঠের আর্ত্ত কান্না শুনতে পেয়েছিল। সে কাছে এসে বল্লে—কে গা ? কি হয়েচে খোকা ? তুমি কাদের ছেলে ? এখানে কেন ?

খোকা আকুল কান্নার মধ্যে হাত বাড়িয়ে নদীর দিকে দেখিয়ে বলে—বাবা

মতিলাল—ভয় কর্‌বে—

এ আজ পাঁচ ছ' বছরের কথা।

মতিলাল সান্যাল বাজিতপুরের ঘাটে বর্ষার নদীতে কুমীর বা কামটের হাতে প্রাণ হারান, তখন তাঁর শিশুপুত্র একা নদীর ঘাটে কুলতলায় বসে 'বাবা মতিলাল' বলে কাঁদছিল, এ কথা অনেকেই জানেন বা শুনে থাকবেন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট পর্য্যন্ত শুনে দেখতে এসেছিলেন জায়গাটা। কেউ কেউ খোকার ফোটো তুলি নিয়ে গিয়েছিল সেই ঘাটের সেই কুলতলায় তাকে আবার দাঁড় করিয়ে। তার পিতৃহারা প্রাণের আকুল কান্না বাইরে কতটুকু বা প্রকাশ হয়েছিল। তিনদিন পরে মতিলালের অর্ধভুক্ত দেহ পাওয়া যায় সর্ষেখালির বাঁকে মাছধরা কোমরজলে। পুলিসের হাতে দেওয়া হয় মৃতদেহ।

খোকা আজ কোথায়, এ প্রশ্ন অনেকে করবেন জানি।

টুনু নেই। এক বছর পরে সেও বাবার সন্ধানে অজানা পথে বেরিয়ে পড়ে।

অন্নপূর্ণা আছেন। গাঁয়ের লোকে দেখাশুনা করে, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের কলমের জোরে গবর্ণমেণ্ট মাসিক কিছু বৃত্তি দেয়।

জাল

ঘুরতে ঘুরতে কি-ভাবে আমি যে রামলাল ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে পড়েছিলাম, তা আমি এখনো বলতে পারি না। হাজারিবাগের জঙ্গলে ঘুরছিলাম, জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায়। সামান্য অবস্থার গৃহস্থের ছেলে, ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে অর্থ উপার্জ্জনের ব্যাপারে কত জায়গায় না গিয়েছি। কে যেন বলেছিল, হর্তুকী আমলকী বয়রা চালান দিলে অনেক লাভ হয় তারই সন্ধানে ঘুরছি, রামগড় থেকে দামোদর নদ পার হয়ে—ক্রমোচ্চ মালভূমির অরণ্যসঙ্কুল পথে পথে।

জল খাবো। বেজায় তৃষ্ণা। সে পাহাড়ের আর বনের অপূর্ব্ব শোভার মধ্যে, বনজকুসুম-সুবাস ভেসে আসতে পারে বাতাসে; কিন্তু জলের সঙ্গে খোঁজ নেই।

রাঁচির লাল মোটর-সার্ভিসের বাসগুলো মাঝে-মাঝে পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছিলো। এক-জায়গায় একটা বড় বাড়ী দেখলাম রাস্তা থেকে কিছুদূরে বনের মধ্যে। বিস্মিত যে না হয়েছিলাম এমন নয়। এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে অন্তত দু'লক্ষ টাকা খরচ ক'রে বাড়ী করলে কে? তার আবার মস্ত-বড় তোরণ, সাঁচীস্তূপের তোরণের অনুকরণে। তার ওপরে হিন্দীতে লেখা—'ভরহেচ্‌ নগর'।

সে কি ব্যাপার?

নগর কোথায় এখানে? একখানা তো বড় বাড়ী ঐ অদূরে শোভা পাচ্ছে।

যাক্ গে। আমার তৃষ্ণার জল এক ঘটি পেলেই মিটে গেল।

ভরহেচ্ নগরের বিশাল তোরণ অতিক্রম ক'রে প্রশস্ত রাজপথে পদচারণা করতে-করতে প্রাসাদের মর্ম্মর খচিত প্রশস্ত অলিন্দে গিয়ে সোজা উঠে পড়ি। এত-বড় নগরীতে জনসমাগম তেমন যে খুব বিপুল তা নয়। এ-পর্য্যন্ত পুড়িয়ে খেতে একটি প্রাণীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় নি।

এখন দেখছি, ওই যে একটি বুড়োমত মানুষ বৈঠকখানায় ব'সে আছে বটে···

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লাম, থোড়া জল পিনে মাংতা।

বৃদ্ধলোকটি আমার দিকে চেয়ে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো—ও, আপ্ পানি পিয়েঙ্গে? এই ভগীরথ, ই-ধার আও—আপ্ আইয়ে বৈঠিয়ে—আপ্ বাঙালী? আসুন, আসুন—বসেন। আমার বড়বাজারে কারবার ছিল। বাংলা জানি, বসেন।

এইভাবে রামলাল ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

—এই ভগীরথ, থোড়া পানি তো আগে পিলাও বাবুজিকো। চা খান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এই ভগীরথ, সাবিত্রীকে বোলো, চা বানানেকে লিয়ে। ভালো হয়ে বসুন। আপনার নাম কি আছে?

—আমার নাম হিতেন্দ্রনাথ কুশারী—দেশ বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা।

—কুশারী? ব্রাহ্মণ আছে তো? না কি আছে?

—ব্রাহ্মণ, রাঢ়ীশ্রেণী।

—ঠিক আছে। নোমোস্কার। আমিও ব্রাহ্মণ আছি, আমার নাম রামলাল ব্রাহ্মণ, দেশ ভরহেচ্ নগর, বিকানীর।

—ও, তাই বুঝি···

—ঠিক ধরিয়েছেন। বাঙালী-জাত বড় বুদ্ধিমান আছে। কথা গিরনেসে মালুম করলেতা হ্যায়—এ জায়গাটা আচ্ছা লাগে। বন আছে চারদিকে। গোলমাল নেই। তুলসীজি বলিয়েছেন, দণ্ডক-বনের শোভা কি রকম আছে?—

শোভিত দণ্ডক বন কি রুচি বনী
ভঁতিন ভাঁতিন সুন্দর ধনী

কুছু বুঝলেন? দণ্ডক-কাননের বড় শোভা আছে। বৃচ্ছ, ফল, পাত্তিসে, খুব সুন্দর। রামায়ণের কথা আছে। তা এই জায়গাটা তেমনি লাগে হামার। দেড়শো বিঘে লিয়েছি এখানে বহুৎ সুবিস্তাসে। তিশ্ টাকা বিঘা।

—বলেন কি!

—কেন না হোবে? বাঘ ভালু ছাড়া এখানে বাস করবে কে?

—কার জমি?

—শিরোহির এক মৌজাদারের। ধরতীনারান মুন্সি, পুরুলিয়ার কারবার-ভি আছে। ওখানেই থাকে।

জল এলো। আমি বাইরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে জল পান করলাম। শরীর ঠাণ্ডা

হল। শুধু-জল নিয়ে আসার জন্যে শুনলাম রামলাল ব্রাহ্মণ চাকরকে তাড়না করছে খাঁটি ঠেট হিন্দিতে, যার মর্ম হল—তোমার মগজে কোনো বুদ্ধি নেই। চবুতারায় ভদ্রলোক এলো, তুমি শুধু এক লোটা পানি…কেন, এক মুঠো শুখা বুটও কি ছিল না ঘরে? এই রকম আদব শিক্ষা হচ্ছে তোমার দিন-দিন। মাইজিকে কিংবা রংধারীমাইকে জিগ্যেস করলে না কেন?

আমি জল খেয়ে ঘরে ঢুকতেই বৃদ্ধ কথা বন্ধ ক'রে দিলে চাকরের সঙ্গে। আমার দিকে চেয়ে বল্লে—আউর পিয়েঙ্গে? নেহি? ঠিক আছে।…পান?

—পান চলে, তবে থাক্ সে এখন।

—আচ্ছা, থোড়া মিঠাই তো খা-লিজিয়ে! ও সাবিত্রী—

সাবিত্রী কোনো বড় মেয়ের নাম নয়। আট-নয় বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো একটা থালায় সাত-আটটা বড়-বড় লাড্ডু নিয়ে, বুঁদের লাড্ডু।

লাড্ডুগুলোর চেহারা এমন লোভনীয়, গা থেকে ঘি যেন ঝ'রে পড়ছে—কিশমিশ বাদাম দেখা যাচ্ছে লাড্ডুর গায়ে। বৃদ্ধ আমাকে পাঁচ-ছ'টা লাড্ডু খাইয়ে তবে ছাড়লে। ওর ভদ্রতা আমাকে মুগ্ধ করলো; আমি বাইরের লোক, সম্পূর্ণ অপরিচিত, জল খেতে চেয়েছিলাম এই-মাত্র সম্বন্ধ।

এইবার আমি বিদায় নিতে উদ্যত হোলাম, বৃদ্ধ সে-কথায় কানও দিলে না।

—আরে কোথায় যাবেন আপনি? নেহি যাইয়ে-গা আজ। জংলী পথ, শেরকা বড় ডর। আজ-তো নেহি জানা চাহিয়ে।

—সে কি! আমি যাবো না?

—থোড়া নাস্তা কর্‌লেন, দাল-রোটি খান, গপ্‌সপ্‌ করুন। যাবেন। আমার মোটর আপনাকে পৌঁছিয়ে দেবে হাজারীবাগ্‌মে।

মোট কথা এই যে, আমার সেদিন যাওয়া হল না। বিকেল-বেলা আমাকে নিয়ে বৃদ্ধ ওদের ভরহেচ্‌ নগরের পশ্চিমপ্রান্তে বেড়াতে গেল। কি অপূর্ব্ব শোভা চারিদিকে। কম্‌ব্রিটাস-লতার সাদা পাতার গুচ্ছ বড় বড় শালগাছের মাথায় এমনভাবে সাজানো, যেন দূর থেকে মনে হয় ওরা প্রাচীন শালতরুর পুষ্পস্তবক। পাহাড়ের পেছনে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, নিঃশব্দে বনভূমিতে দূরে-দূরে রহস্যময় অন্ধকার নেমেছে। বনের মধ্যে ধনেশ-পাখী কু-স্বরে ডাকছে, বড় সম্বর হরিণের রব শোনা গেল একবার মাত্র। কি নির্জ্জন চারিধার…মুক্তরূপা ধরিত্রীর জ্যোৎস্না, সূর্য্যাস্ত ও অরুণোদয় এখানে এক-একটি কাব্য। শুধুই সবুজ বনশীর্ষ, শুধুই ধূসরবর্ণ পাথরের তৈরী শিখরদেশ, অস্ত-দিগন্তের সিঁদুর ছোঁয়া…

রামলাল ব্রাহ্মণ বল্লে, এখানে বহুত জমিন আমি লিয়েছে। কলকাত্তা-মে বড়া ধকল আউর ঝিক্কি। এখানে জমিন লিয়ে বাড়ী করিয়েছে, কিন্তু ভালা আদমি নেই। বাঙ্গালীলোক আনেসে হাম জমি মুফৎ-সে দে-দেঙ্গে। আপনারা আসবেন?

—তা আমি ব'লে দেখতে পারি।

হ্যাঁ, জরুর দেখিয়ে গা। এক পয়সা দাম হাম্ নেহি লেঙ্গে। তিন-তিন বিঘা দে-দেঙ্গে হর-এক ফ্যামিলিকো।

—বেশ। আপনাদের এখানে কতজন লোক থাকে?

—এই দশ-বারোঠো আদমি রহ্তা হ্যায়। নৌকর চাকর লে-কর-কে। লোক নেই, ঐ আমার বড় দুঃখু আছে।

—আমি ব'লে দেখবো, আসতে পারে, অনেকে জমি তো পাচ্চেই না। দশ-বিশগুণ দাম দিয়ে জমি কিনেচে।

—একপয়সা নেহি দেনে হোগা। যেত্না জমি মাঙ্গে, ও হাম দে-দেঙ্গে। আপনি আস্থন না? আপনি এলে পাঁচ-বিঘা জমি দেবো।

আমি জমি কি করবো এখানে? অবস্থা এমন কিছু ভাল নয় যে, জমি কিনে বাড়ী করবো। কাকে নিয়েই-বা ঘর পাতবো? আমি হচ্চি ভবঘুরে ক্লাসের লোক। জমি-বাড়ী আমার জন্যে নয়। কথাটা বলেই ফেল্লাম।

বৃদ্ধ বল্লে—আপনি সাদি করেন নি?

—না।

—ঘরমে কৌন্ হ্যায়?

—কাকা আছেন, তাঁর ছেলেরা আছে।

—মা-বাপ-ভি নেহি?

—কিছু না।

—এখানে কোথায় যাচ্চেন?

—কোথাও না। ব্যবসা করবো ব'লে দেখে বেড়াচ্ছি।

রামলাল হেসে বল্লে—কুছু-কুছু লিখাপড়া তো জানেন?

—তা জানি।

—ব্যস! তবে মিটেই গেল-তো। আপনি আমার এখানে আস্থন।···সম্‌জা?

—কি সম্‌জাবো? এখানে কি ক'রে থাকবো, থাকলে পেট চলবে কোথা থেকে? খাবো কি?

বৃদ্ধ হে-হো ক'রে হেসে উঠে বল্লে—খাবার কুছ তকলিফ নেই হোবে, আমি খেতে দেবো। আপনাকে আমি রেখে দেবো এখানে। মৌজ-মে থাকবেন। খাবেন। আজসে রহ যাইয়ে। বড় খুশি হবো। দো-মনা মাৎ কিজিয়ে। একঠো ঘর আপ্‌কো দে-দেঙ্গে বাসোকে লিয়ে। থাকতেই হবে আপনাকে।

ভবঘুরে আমি সেইদিন থেকে ভরহেচ্ নগরে স্থায়ী নাগরিক হয়ে পড়লাম।

বৃদ্ধ রামলাল ও আমি কখনো বৈঠকখানায়, কখনো বনের প্রান্তে ব'সে ভবিষ্যতের ছবি আঁকতাম। ভরহেচ্ নগর মস্ত জায়গা হবে···এখানে হবে সিমেণ্টের কারখানা···ওখানে

হবে কাঁচের কারখানা···এখান দিয়ে রাস্তা বেরুবে···বাসিন্দা- ভদ্রলোকদের জমি ওইদিকে হবে···কোনো-কোনো জমিতে তরি-তরকারির আবাদ হবে, ইত্যাদি। সবটাই আকাশ-কুসুম। কেউ আসবার কোনো আগ্রহ দেখালে না এখানে। দেখাবেও না, তা বেশ বুঝলাম।

ক্রমে আমি এদের পরিবারের সব খবর জানলাম। রামলাল ব্রাহ্মণের তিনটি পুত্র। কলকাতায় ওই বৃদ্ধের বড় কারবার ছিল, সে-সব বেচে দিয়ে এই ভরহেচ্ নগরের পত্তন হয়েচে। ব্যাঙ্কে এখনো অনেক টাকা। ছেলেরা কেউ রাঁচি, কেউ বিকানীরে থাকে। বড় ছেলের পুত্র দরিরাম এই ভরহেচ্ নগরেই বাস করে। সাবিত্রী ব'লে ছোট্ট খুকী তারই মেয়ে। পুত্রবধূর নাম অনসূয়া, খুব মোটা, মাঝে মাঝে ঝোলা ঘোমটা দিয়ে মোটরে কখনো রাঁচি, কখনো হাজারীবাগ যায়। রামলালের স্ত্রী নেই, অনসূয়া বাঈ খুব সেবা করে। আরও তিন-চারটি নাতি-নাতনী আছে, তারা ঠাকুরদাদার বড় একটা ঘেঁষ নেয় না।

অনসূয়া বাঈ আমাকেও আড়াল থেকে বেশ আদর-যত্ন করে, সেটা আমি বুঝতে পারি। লোক এরা খারাপ নয়। ঘি, পুরী, চাটনি, বড়-বড় লঙ্কার আচার, বজরার রুটি, হালুয়া, কিশমিশ-মিশ্রিত দুধ, খুব খেয়ে পনেরো দিনের মধ্যে আয়নায় নিজের মুখ আর নিজে চিনতে পারিনে। একদিন খেতে বসেচি, অনসূয়া বাঈ আড়াল থেকে ব'লে পাঠালে, আমি অত কম খাই কেন?

আমি বল্লাম—সে কি! কত খাবো? খুব খাচ্চি।

খবর এলো—না। রাত্রে ওই ক'খানা পরোটা খেয়ে মানুষ বাঁচে? আরো বেশি খেতে হবে।

—মাসীমাকে বলো, তাঁর কথার ওপর আমি কথা বলতে পারিনে। তিনি যা বলবেন আমি করবো।

—বাঙালীরা খুব মছলি খায়, এখানে মছলি যখন মেলে না, তখন দুধ ঘিউ তার বদলে খুব খেতে হবে।

—যতটা পারি নিশ্চয় খাবো।

অনসূয়া বাঈয়ের যত্ন আমি ভুলবো না। যদিও কখনো আমার সামনে সে বেরোয় নি, তবু আমার সব-রকম সুখ-সুবিধা আড়াল থেকে এমন তদারক করতেও আমি কাউকে দেখিনি।

এরা সত্যি একটি অদ্ভুত ভালো পরিবার।

এ ধরনের মানুষের দল যে এই স্বার্থপর পৃথিবীতে এ-সব দিনেও বর্ত্তমান আছে, তা জানতাম না। আমাকে ওরা জমি দিয়ে বাস করাবে, আমার উন্নতি ক'রে দেবে—রামলাল ব্রাহ্মণ এ-সব আশ্বাস কত দিতো আমাকে। রামলালের স্বপ্ন ভেঙে দিতে আমার কষ্ট হত। আমি বেশ দেখতে পেতাম ভরহেচ্ নগরের পরিণাম। এই বুড়ো যতদিন বেঁচে, ততদিন এই নগরীর আয়ু। তার পরেই এই ভরহেচ্ নগরের রাজপথে ছোটনাগপুর অরণ্যের নাম-করা

বাঘের দল বায়ু সেবন করবে। অরণ্য তার পূর্ব্ব-অধিকার আবার পত্তন করবে। ওর ছেলেরা বিলাসী-যুবক, এই জঙ্গলের মধ্যে এসে বাস করবার জন্যে তাদের রাত্রে ঘুম হচ্চে না!

কেউ এসে এখানে বাইরে থেকেও বাস করবে না।

কারণ, যারা আসবে, তাদের উপজীবিকা হবে কি এ নির্জ্জন অরণ্যে? ভরহেচ্ নগর তো তাদের খেতে দেবে না। রামলালের মত ব্যাঙ্কে টাকাও থাকবে না তাদের। এই প্রস্তর-সঙ্কুল মালভূমিতে চাষবাস করবে কিসের? আর যারা সত্যিই রামলালের মত ধনী, তারা শহরের শত সুখবিলাসের মোহ কাটিয়ে এই পাণ্ডববর্জ্জিত স্থানে আসতে যাবে কেন? ওর ছেলেরাই তো আসে না।

রামলাল মাঝে-মাঝে আমায় বলে—তোমার কি মনে হচ্চে? লোক কতদিনের মধ্যে এখানে হবে।

—শীগ্‌গির হবে।

—এক-একজন গৃহস্থকে কতটা জমি দেওয়া দরকার?

—কতটা মোট জমি আপনার?

—দেড়শো বিঘা। দরকার হোনসে আউর বন্দ্‌বস্ত করেঙ্গে।

—ধরুন, পাঁচ বিঘে।

—তিন বিঘা হাম ঠিক কিয়া।

—জলের কি ব্যবস্থা হবে?

—ইন্দারামে ইলেকট্রিক ও পাম্প বসা দেগা, তামাম জায়গামে পানি সাপ্লাই হোগা—কুছ্-ভি নেহি—ওসব ঠিক হো যায়গা।

—ঠিক আছে।

—তোমার সব দেখাশুনো করতে হবে।

—নিশ্চয় করবো। আনন্দের সঙ্গে করবো।

এ ধরণের কথা প্রায়ই হত।

মুখে যাই বলি, বুড়ো রামলালের জন্যে আমার দুঃখ হয়। মনে যা আসে কখনো মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারিনি।

অনসূয়া বাঈ একদিন খাবার সময় ব'লে পাঠালে—থোকা-ফলের তরকারি খাবে?

—সে আবার কি?

—বিকানীরে হয়। শুকনো ফল দেশে থেকে এসেচে, ভিজিয়ে রেখে তরকারি হবে। খেয়ে দেখো, খুব ভালো।

—মাসীমা যখন বলচেন, নিশ্চয়ই খাবো।

ওদের তরকারি কোনোটই আমার ভালো লাগে না। অন্য-ধরণের রান্না, বাংলাদেশের মত খেতে নয় কোনোটাই। তবে, ঘি আর দুধের প্রাচুর্য্যে সব মানিয়ে যেতো। দিনকতক পরে ভাবলাম, এখানে ব'সে ব'সে খাচ্চি কেন, এদের কি উপকার আমি করচি এর বদলে?

ওরা আমায় যে কাজের জন্যে রেখেচে, সে কাজ কোনদিনই তো হবে না এদের।

রামলালকে বল্লাম—আমি কি করবো, বলুন?

—কামকা-ওয়াস্তে ঘাবড়াও মাৎ, বহুৎ কাম মিল যায়গা।

—সাবিত্রীকে কেন পড়াই না?

—কি পড়াবে?

—ইংরিজি, বাংলা।

—হাঁ, ও হোনেসে বহুৎ আচ্ছা। পঢ়াও।

অনসূয়া বাঈ খুব খুশি। মেয়েকে খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে। আমি মন দিয়ে তাকে পড়াতে শুরু করি। মুখে মুখে ইতিহাস শেখাই, গ্রহনক্ষত্রের কথা বলি। সাবিত্রী তেমন বুদ্ধিমতী নয়, পড়াশুনোর দিকে মন নেই তার। অনিচ্ছার সঙ্গে ব'সে ব'সে কথা শুনে যায়, শুধু ঘাড় নাড়ে। ওদের একটি ছেলের একবার অসুখ হয়েছিল, রাঁচি থেকে ডাক্তার নিয়ে এলাম, ওষুধ নিয়ে এলাম। নানারকম চেষ্টা করি ওদের সেবা করতে।

সারা বছর এইভাবে কেটে গেল।

ভরহেচ্ নগরের জনসংখ্যা আমি এসে সেই যে বাড়িয়েছিলাম, তারপর আর বাড়লো না।

একদিন অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাত্রে নগর-তোরণের পাশে প্রস্তর-বেদিকায় ব'সে আমি একা-একা, এমন সময় দেখি, অনসূয়া বাঈ প্রশস্ত রাজপথে পদচারণা করতে-করতে তোরণের কাছে এসে, আমায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে থতমত খেয়ে গেল।

আমি বেদী থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার ক'রে বললাম—মাসীমা?

অনসূয়া হিন্দীতে বললে—এখানে একা ব'সে যে?

—এই একটু ব'সে আছি।

—খাওয়া হয়েচে, পেট ভরেচে তো?

—দেখুন তো! আপনি প্রায়ই অমন ব'লে পাঠান, আমার লজ্জা করে।

—এখানে আছো, তোমার মা নেই কাছে, আমাদের দেখতে হবে না?

—মায়ের জাত আপনারা। ঠিক কাজ আপনাদের।

—সাদি করোনি কেন?

—কি খাওয়াবো বলুন? আমি তো আপনাদের দয়ায় খেয়ে বেঁচে আছি।

—বেটা, এ-রকম কথা বোলো না, শুনলে কষ্ট হয়। তুমি কি আমাদের পর? আমাদের ঘরের একজন।

—সে আপনাদের দয়া।

—কিছু না বেটা। তোমাকে সাদি দিয়ে এই ভরহেচ্ নগরে বাস করাবো।

আবার সেই আকাশকুসুম। আবার ভরহেচ্ নগরের কথা। ওদের মন কি সুন্দর! কত জায়গায় গেলাম, এদের মত মন কোথাও পেলাম না। অনসূয়া বাঈ হেসে চ'লে গেল,

আমাকে ব'লে গেল—ঠাণ্ডায় আর বেশিক্ষণ ব'সে থেকো না, বোখার এসে যাবে। তা-ছাড়া এত রাত্রে ফটকের বাইরে ব'সে থাকাও নিরাপদ নয়, বাঘ না আসে, ভালুক আসতে পারে।

আমি পেছন থেকে ডেকে বল্লাম—শুনুন, ও মাসীমা! বাঘ দেখেচেন এখানে কোনোদিন?

—দু-তিন দিন। বড়কা বাঘ। রাঁচি থেকে আসবার পথে দেখেচি, মোটরের হেড-লাইটের সামনে। এই ফটকের বাইরে এই রাস্তার ওপরে সন্ধের পর দেখেচি। তুমি চলে এসো—'শোনো আমার কথা।'

—যাচ্চি এখুনি।

অনসূয়া চ'লে গেল, কিন্তু আমি তখনি উঠতে পারলাম না। নির্জ্জন জ্যোৎস্না-রাত্রের শোভার সঙ্গে মিশে গেল হারানো-মায়ের কথা। মেয়েরা হচ্চে, আসলে মা, তারপর অন্য-কিছু। কি ভালো লাগলো সে-রাত্রে অনসূয়া বাঈয়ের স্নেহসিক্ত ওই সামান্য দুটি কথা।

তারপর আমি একা কতক্ষণ তোরণের বহির্ভাগে সেই বেদিটায় ব'সে রইলাম। হু-হু বাতাস বইচে, সপ্তপর্ণ-পুষ্পের উগ্র সুবাস ভেসে আসচে বনের দিক থেকে, হৈমন্তীজ্যোৎস্নাস্নাত এই বনান্তস্থলী স্বপ্ন-পুরীর মত মায়া বিস্তার করেচে এই বৃদ্ধ রামলালের মনে, অনসূয়া বাঈয়ের মনে, সাবিত্রীর মনে…

কিন্তু আমার এ বিলাস কেন? ওরা বড়লোক, ওদের সব সাজে, সব মানাবে। আমি এখানে প'ড়ে থাকবো, ওদের মায়ায়, ভরহেচ্ নগরের নাগরিকের অধিকার নিয়ে—তাতে কি আমার পেট ভরবে?

বাড়ীতে আমার আত্মীয়স্বজন আছে, আমায় বিয়ে-থাওয়া ক'রে সংসার করতে হবে… মেয়ের বিয়ে, ছেলের পৈতে, ছেলের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা, সবই করতে হবে আমাকে। এখানে দুটি বেলা শুধু উদর পূরণের জন্য প'ড়ে আছি, বেতনের দাবী করবো কোন্ মুখে। কোনো কাজই এখানে করি না, কেবল সাবিত্রীকে একটু-আধটু পড়ানো ছাড়া। তার বদলে তো এরা রাজভোগ দু'বেলা জোগাচ্চে।

যেতাম হয়তো একদিন।

কিন্তু বড় জড়িয়ে পড়েচি এদের সকলের মায়ায়। বৃদ্ধ রামলাল ব্রাহ্মণকে আমার বুড়ো বাবার মত মনে হয়। সেইরকম খামখেয়ালী, সেইরকম স্নেহশীল। সাবিত্রীকে ছোট বোনের মত লাগে। অনসূয়া বাঈ নিতান্ত সরলা মহিলা, তেমনি স্নেহময়ী। মা মারা যাওয়ার পরে এমন স্নেহযত্ন আমি নিজের মামার বাড়ী পাইনি, কাকার বাড়ী পাইনি, কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী পাইনি। অনাত্মীয়-জগতের নির্ম্মমতার মধ্যে যেতে ইচ্ছে হয় না, আর শুধু সেইজন্যেই যাই-যাই ক'রেও এতদিন যাওয়া হয়নি।

অনেক রাত্রে এসে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে-সঙ্গে গাঢ় নিদ্রা। এই ভাবেই দিন কাটে। আলস্য এসে জোটে, কোনো সঙ্কল্পই দানা বাঁধে না—কাজে পরিণত করা তো দূরের কথা।

রামলাল আমায় বল্লে—আরে, তোমায় একখানা ডেরা করিয়ে দেবো ?

দু'জনে সকালে বৈঠকখানায় ব'সে কথা হচ্ছিল।

—কেন ?

—নিজের ঘর না হোলে মন টেঁকে না।

—আপনাদের ঘর কি আমার ঘর না ?

—ও তো একটা কথার কথা হোলো।

—মোটেই কথার কথা নয়, আমি তাই ভাবি।

—সে তো বহুৎ আচ্ছা। তাহোলে একঠো সাদি করিয়ে আনো।

—বাবারে! নিজের চলে না, আবার সাদি।

—তুমি করিয়ে নিয়ে এসো, আমি যতদিন আছি, সব-কিছু করিয়ে দেবো। সে ভাবনা আমার।

—আমাকে এখানে বরাবর রাখতে চান ?

বৃদ্ধ রামলাল বিস্ময়ের সুরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে—নেই রহিয়ে-গা তো যায়গা কাঁহা ? ইস্‌কো মানে ক্যা হ্যায় ? তুমি তো আছই এখানে।

—কেন, নিজের দেশে যাবো ?

—কাহে যায়গা ? জমি আমি করিয়ে দেবো, ঘর-ভি তৈয়ার করিয়ে দেবো। সাদি-উদি করিয়ে, বহুকো ইঁহাপর লেকে আওগে।

—সে বেশ মজার কথা।

—যো কুছ্ বাত বলবো, তো মজাকা কথা ছোড়-কর দুস্‌রা তরহ্ বাত মুখ থিকে বাহার নেই হোবে। কেৎনা রোজ তুম্ হিঁয়াপর হ্যায় ?

—দু বছর হবে সামনের ফাল্গুন মাসে।

—ব্যাস্! তব্ তো হইয়ে গেলো। তুমি আমাদের আদমি বন্ গেলো। দু বছর যখন এখানে থাকা করিয়েসে, তখন তোমাকে এখানে ঘর বানানে পড়েগা, সাদি-ভি করনে পড়েগা।

কথা শেষ করেই বৃদ্ধ রামলাল খিল্ খিল্ শব্দে হেসেই খুন! এও একটি আস্ত পাগল। বাইরের জগতের কোনো সন্ধান রাখে না, নিজের মধ্যেই আত্মসম্পূর্ণ হয়ে বেশ একটি মায়ার নীড় রচনা ক'রে ঊর্ণনাভের মত তার কেন্দ্রে ব'সে আছে। কি চমৎকার, কি সুন্দর জালটি বুনেচে। নাঃ, বড় ভালো এরা।

সে ফাগুন মাসও কেটে গেল। সেই জনহীন মালভূমির বনে বনে পলাশের ফুল আগুনের বন্যা নিয়ে এলো, মহুয়া ফুল নিয়ে এলো মাতাল-মধুর বন্যা। কুরচি আর করঞ্জা নিয়ে এলো সুগন্ধের বন্যা। অথচ কেউ দেখলো না সেই অপরূপ ঋতু-উৎসব, কোনো দিকে তার খবর গেল না—খানিকটা দেখলে বুড়ো রামলাল, আওড়ায় রামচরিত-মানস থেকে—

শোভিত দণ্ডক কি রুচি বনী—

আর, অবিশ্যি খানিকটা দেখলুম আমি।

কিন্তু সেই বসন্তে যেমন প্রাণ চঞ্চল হল, মনও উতলা হল আমার। চ'লে যেতে হবে এখান থেকে আমাকে। আমি বুড়ো রামলাল নই, অনসূয়া বাঈয়ের মত বড়লোকের বৌ নই—আমার ভবিষ্যৎ আছে, এখানে যতই ভালো লাগুক, আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে এখানে থাকলে।

অনসূয়া বাঈ আমাকে ব'লে পাঠালে, তার সঙ্গে মোটরে রাঁচিতে যেতে হবে। এর আগেও দু'একবার হাজারিবাগে গিয়েচি! যেবার সঙ্গে টাকাকড়ি বেশি থাকে, সেবার আমাকে নেয়।

একবার ঠিক করলাম, রাঁচি গিয়ে পালাবো।

তারপর কি কাণ্ডটাই হল। রাঁচি বড়-পোস্ট অফিসের সামনে আমি গা-ঢাকা দিলাম! অনসূয়া বাঈ তার দেওরের গদিতে গিয়েচে কি কাজে—মোটর ওখানেই ছিল। ফিরে এসে দেখলে, আমাকে ওর চাকর ও ড্রাইভার খোঁজাখুঁজি করচে। ও ধরে নিলে, আমি গেঁয়োলোক শহরে এসে হারিয়ে গিয়েচি। গদিতে গিয়ে জানিয়ে তোলপাড় করলে—টাকাপয়সা পুলিস ও লোকজনের সাহায্যে রাঁচি শহর। মা যেমন হারানো সন্তানকে খোঁজে, তেমনি ক'রে অনসূয়া বাঈ খুঁজলে তাদের অর্থবল ও লোকবল দিয়ে আমাকে। খুঁজে বারও করলে রাঁচি-চক্রধরপুর-সার্ভিসের বাস্ থেকে। এর কৈফিয়ৎ দিতে হল নানা রকমে বানিয়ে। ঘটনার দুতিন সপ্তাহ পর পর্যন্ত এ নিয়ে অনসূয়ার কত কথা আমার সঙ্গে। অনসূয়া বলতো—রাস্তা চিনতে পারলে না?

—না।

—তখন কি করলে? আমাদের গদির ঠিকানা মনে এলো না?

—নাঃ।

—আহা, তখন তোমার মনে কি হল! আমি জানতাম না তুমি ওরকম। আর কখনো তোমাকে রাঁচি নিয়ে আসবো না।

—তাইতো।

—মোটরবাসে উঠেছিলে কেন?

—ভাবলাম, ভরহেচ্ নগরে যাই। ভুল হয়ে গেল সেখানেও।

অনসূয়া বাঈ ও ওরা এই ঘটনার পরে যেন আমাকে বেশি ক'রে জড়িয়ে ধরলে। আমিও ওদের আঁকড়ে ধরলাম। এত যখন ওদের স্নেহ, তখন আর কোথাও ওদের ছেড়ে যাবো না। যা ঘটে ঘটুক ভবিষ্যতে, রইলাম এখানেই।

বৈশাখ মাসের শেষ।—ভীষণ গরমের পর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে কুরচিফুলের সুবাস ভেসে আসচে বন থেকে।

রামলাল আমায় ডাকিয়ে বল্লে—পেট-মে থোড়া দরদ উঠা হ্যায়, দেখো তো ই-ধার আ-কর—

রামলালের মুখ-চোখের অবস্থা যেন কেমন-কেমন। রাত্রে কিছু খেতে বারণ করলাম। বুড়ো বয়সের অসুখ···ক্রমেই পেটের ব্যথার বৃদ্ধি···তার সঙ্গে জ্বর।

সে রাত্রে বুড়ো আমায় বল্লে—বেটা, তুমি এখানে রইলে। সব ভার তোমার ওপর। এ জায়গাতে লোক বসাবে। বড় সুন্দর জায়গা এটা। তোমরা ছেড়ো না।

—আপনি মনে ভয় খাচ্চেন কেন? অসুখ সেরে যাবে। আমি রাঁচি চলে যাচ্চি এখুনি। ডাক্তার আনি—

—ও-সব বাত ছোড়ো। আমার বড় সুখ চৈন সে দিন বীত গিয়া এই বনের মধ্যে। তুলসীজি বলিয়েসেন—শোভিত দণ্ডক কি রুচি বনী—

—আচ্ছা থাক্ ও-সব কথা। এখন আমাকে ডাক্তার আনতে যেতে হবে।

শেষরাত্রে রামলাল শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর দু ঘণ্টা আগে, নয়তো ও ঠিক ভরহেচ্ নগরের কথা বলতো।

এর পরের কথা খুব সংক্ষিপ্ত। অনসূয়ার স্বামী এসে এদের নিয়ে গেল। অত-বড় বাড়ীতে চাকর-বাকর ছাড়া কেউ রইলো না। আমি ছিলাম, বৃদ্ধ রামলালের মৃত্যুর সময়ের ছবি মনে ক'রে। অনসূয়া বাঈ আমাকে থাকতে বলেছিল। থাকতাম হয়তো, দুমাস পরে ভরহেচ্ নগর বিক্রি হয়ে গেল ওদের ফার্ম্মের দেনার দায়ে। বন আবার নগরীকে গ্রাস করেচে।

আবির্ভাব

দুলালদের বাড়ীর পেছনে একটা বড় বাঁশবাগান। তার পেছনে ক্রোশখানেক ডাঙা মাঠ। এই মাঠে বহুকাল থেকে চাষবাস হয় না, নীলকুঠির আমল চলে যাওয়ার পর থেকে এই সব মাঠ অনাবাদি পড়ে আছে—এই মাঠের পর ভাবনহাটি নামে একটি ক্ষুদ্র চাষা—গাঁ।

দুলাল কলকাতায় থাকে, ভবানীপুরে তাদের নিজেদের বাড়ী। কিন্তু আজ ক'মাস কি যেন একটা হয়েচে, বাড়ীর সবাই এসে আছে দেশের বাড়ীতে।

বেশ লাগছে সবারই। এমন সময় নামলো ভীষণ বর্ষা। দিনরাত একঘেয়ে বৃষ্টি হচ্চে সমানে। মাঠে ঘাটে থৈ-থৈ করচে বর্ষার জল। তোড়ে জলস্রোত নেমে চলেচে নাবাল জমি বেয়ে মাঠের দিকে। পুবে হাওয়ায় শীত করচে সবারই, ছেঁড়া ভিজে কাপড় গায়ে দিয়ে চাষা মজুর ক্ষেতে ধান পুঁতচে।

অমনি দুলালের জ্যাঠাই-মা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

—বাবা গো, না খেয়ে মনু কলকাতায়, না কয়লা, না কিছু। সেও ছিল ভালো। এখানে আমার মাছ দুধে দরকার নেই, ঢের হয়েচে। এদিকে যাই জোঁক, উদিকে যাই মশা, সাপ, কাদা। একটু বেড়াবার জায়গা নেই, দুটো লোকের মুখ দেখবার জো নেই। সিনেমা দেখিনি আজ চার মাস। না একটা সিনেমা, না কিছু। এমন পোড়ারমুখো দেশে মানুষ থাকে!

জ্যাঠতুতো বোন কমলা বলে—সত্যি মা, কত ভালো ভালো ছবি যে হয়ে গেল কলকাতায়। 'ওরে যাত্রী' 'বঞ্চিতা' 'সর্ব্বহারা'—চমৎকার চমৎকার ছবি।

তার ছোট বোন নমিতা বল্লে—কেন, 'উমার প্রেম' ?

—'উমার প্রেম' তো আগেকার। আমি আনকোরা ছবির কথা বলচি—

—তা যদি বলতে হয় দিদি, তবে মীরা সরকার আর আরতি দাস যে ছবিতে নামে, সে ছবির চেহারাই হল আলাদা—

—আর জহর গাঙ্গুলী ?

—সে তো আছেই। আর একজনের কথা বলি। 'দুঃখীর ইমান' ছবির মধ্যে—

দুলালের জ্যাঠাইমা বল্লেন—বাদ দে ওসব তক্কো। যা এখান থেকে। ওদিকে হুড়ুহুড়ু করা হয় এখানে আসবার জন্যে, আবার এদিকে ছবি হয়ে গেল, ছবি হয়ে গেল। হয়ে গেল তা কি হবে ? চল্ সব কলকাতায়। এখানে বর্ষাকালে মানুষ টেকে !

দুলাল কিন্তু বলে উঠলো—জ্যাঠিমা, তোমার ভালো লাগচে না কেন জানিনে। আমার কিন্তু যাবার ইচ্ছে নেই।

জ্যাঠাইমা অপ্রসন্নমুখে বল্লেন—কি জানি বাপু, তোমাদের সব ইংরেজী মেজাজ। আমরা সেকেলে লোক, আমাদের পক্ষে শহরই ভালো। তোমরা থাকো তোমাদের দেশ নিয়ে।

কমলা বল্লে—দুলালদা, আমাকেও রেখে এসো।

—সবসুদ্ধু চলো রবিবারে ঝেড়ে রেখে আসি।

নমিতা বল্লে—আমাকেও ? বাবা শুনলে বকবেন। তা আমার মন খারাপ হবে না ? মনের ওপর জোর নেই।

দুলাল বল্লে—চলো রেখে আসবো বলচি তো।

কিন্তু জ্যাঠতুতো ভাই বিমল ছিল তার মা-ভগ্নীদের চেয়ে একেবারে আলাদা। সে বিকেলে জলবৃষ্টির মুষলধারার বর্ষণের মধ্যে এসে বল্লে—চলো দুলালদা—

—কোথায় ?

—মাছ ধরতে।

—তুই যাবি নাকি ?

—আলবৎ যাবো। চলো বেরিয়ে পড়ি, ভাবনহাটির পদ্মবিলে মাছ উঠচে।

—বিলে তো মাছ থাকেই—

—বেনে জেলে এইমাত্র ছুটলো। হাতে রয়েছে—কি যে বলে ঐ—ঐ—

—পোলো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পোলো পোলো। ওই কথাটা ওরাও বলছিল বটে। পোলো।

—ও দিয়ে মাছ ধরা তোমার-আমার সাধ্যি নেই।

দুলাল ও বিমল ছুটলো। ওরা কলকাতার ছেলে। মাছ ধরা দেখা একটা নতুন জিনিস ওদের কাছে।

তখনও ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির পড়ছে। ধারা-শ্রাবণ। বৃষ্টির বিরাম বিশ্রাম নেই।

বিমল বললে—রাস্তা চেনো দুলালদা ?

—ঠিক নিয়ে যাবো, চলো।

—বেশি জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেও না দুলালদা, সাপ আছে।

কিন্তু জঙ্গলের দিকেই ওদের যেতে হল। তারপর ফাঁকা জমি ও ষাঁড়বৈচির ঝোপ। অনেক দূরে বিল দেখা যাচ্চে। ফাঁকা মাঠে বর্ষার দরুন অনেক জল বেধেছিল। বড় বড় ঘাস মাঠের মধ্যে। জলে জলাকার চারিদিক। বিমল খানিক দূর মাঠ দিয়ে যেতেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—সাপ! সাপ!

তারপর লাফিয়ে উঠলো মাটি থেকে হাত-দুই। সে কি বেজায় লাফ রে বাবা!

দুলাল বল্লে—কি? কি? কোথায় সাপ?

—আবার সাপ—সর্বনাশ! ও মা, ও বাবা, মেরে ফেললে—কিল্‌বিল্‌ করচে সাপ!

—দেখি—এত সাপ কোত্থেকে আসবে—দেখি—

দুলাল পল্লীগ্রামে অনেকবার এসেচে, এত সাপের ভিড় ফাঁকা মাঠে, বিশ্বাস তো হয় না। মাথা নিচু করে জলের মধ্যে চেয়ে দেখেই দুলালের সারা গা যেন কেমন করে উঠলো, ওগুলো কি রে বাবা! অত সাপ? ঘাসের মধ্যে দুলাল ভালো দেখতেই পাচ্ছিল না।

বিমল ততক্ষণ দৌড়ে গিয়ে আর এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে মাঠের মধ্যে।

দু সেকেণ্ড দাঁড়াবার পরে সেখান থেকেও লাফিয়ে উঠলো। চেঁচিয়ে উঠলো—সাপ! সাপ! আমায় কামড়ে দিয়েচে—দুলালদা রে, মেরে ফেলেচে আমাকে—

দুলালের সন্দেহ হল। ভয় চলে গিয়েচে ততক্ষণে, তারও পায়ে কামড়েচে, পায়ের তলা দিয়ে তখনও চলে যাচ্চে। এত সাপ কোথা থেকে আসবে?

চেয়ে দেখলে ঘাসের মধ্যে ঘাড় নিচু করে। জলের মধ্যে ভালো দেখা যায় না। ঘোলা জল অনেক জায়গায়। একস্থানে দূর্ব্বাঘাসের বনের ওপর অগভীর চওড়া স্থানে জল বেধেছে। সেখানে পৌছে চেয়ে দেখে দুলাল অবাক হয়ে গেল।

চোখকে বিশ্বাস করা যায় না।

মুখ তুলে বল্লে—বিমল, বিমল, দৌড়ে—শীগ্‌গির অ্যাখ্‌ এসে—

বিমল সাপের ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার বিশ্বাস হয়েছিল, তাকে একটা নয় অসংখ্য সাপে কামড়েচে। সে আর নেই। সে পঞ্চভূতে মিশে যাওয়ার প্রথম ধাপে।

দুলাল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বল্লে—শীগ্‌গির আয় হতভাগা—

দুজনে ঘাড় নিচু করে ঘাসের মধ্যে দেখতে লাগলো—জল সেখানে অগভীর, কিন্তু দশ বিশ গণ্ডা বড় বড় কৈ মাছ সারবন্দী ভাবে সেই জল পার হয়ে চলেচে উত্তরমুখো। তার পাশে আর এক জায়গায় তেমনি দশ বিশ গণ্ডা।

দুলাল হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে, বিমল যেখানটিতে দাঁড়িয়ে সর্পদষ্ট হয়েছিল, সেখানে পৌছে জলের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে বললে—উঃ রে মাছের ঝাঁক! কত মাছ রে! দু পাঁচ শো!

বিমলও এসে দেখলে। দেখবে কি, পাগলের মত হয়ে উঠলো দুজনে।

এ কি মাছের বিপর্যয় ভিড়! এত লম্বা, এত ঘন মাছের ঝাঁক যে পৃথিবীতে থাকে, মেছোবাজারের বাইরে যে এত মাছ জীবন্ত অবস্থায় চলে বেড়ায়—এসব কথা কে জানতো ?

মাছ! মাছ! যেদিকে চাওয়া যায়, শুধু কৈ মাছ। কার মুখ দেখে আজ ওরা সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল!

দুলাল বল্লে—এত মাছ ধরবার কি করা যাবে তাই ভাবো—

—আমার জামাটা খুলে ফেলি। তাই দিয়ে ছেঁকে মাছ ধরো—

যে কথা সেই কাজ।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দুই অনভিজ্ঞ শহুরে বালক বুঝতে পারলে এ রকম উপায়ে মাছ ধরা চলবে না। এত মাছ রাখবার স্থান নেই, ছোট জামায় ছেঁকে এ বিরাট মৎস্যবাহিনীর কতটুকু ভগ্নাংশ কাপড়ে বাঁধবে ?

দুলালই প্রথমে সে কথা বুঝল।

বুঝে বল্লে—আয় গাঁয়ের মধ্যে খবর দিই মাছের ঝাঁকের। গাঁয়ের কত গরীব লোক মাছ খেতে পাবে এখন। আমরা যা মাছ ধরেচি ওই তো নিয়ে যেতে পারব না। বরং এগুলো পৌঁছে দিয়ে বাড়ী থেকে আলাদা পাত্র নিয়ে আসি—

দু'জনে কুড়ি দুই মাছ কাপড়ে বেঁধে নিয়ে ছুটলো বাড়ীর দিকে।

বিমল বল্লে—গরীব দুঃখীদের বাড়া বাড়ী খবর দাও দুলালদা—চার টাকা মাছের সের—প্রাণ পুরে মাছ খাক্—ওদের কিনে খাবার সাধ্য নেই।

ওরাও বড় ভাঁড় নিয়ে বাড়ীর মজুর কৃষাণের সঙ্গে এসে পড়লো মাঠে। এতক্ষণে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েচে সারা মাঠটা। শুধু হাত দিয়ে চেপে ধরে কৈ মাছ ধরচে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। যত বা ধরে, তত বা আবার ওঠে। অফুরন্ত কৈ মাছ উঠচে বিলের জল থেকে।

বুড়ো হৃষিকেশ বুনো বললে—ষাট বছর বয়েস হল, এমন তাজ্জব কাণ্ড কখনো দেকিনি বাবু—উজোন জলে কৈ মাছ হাঁটে শুনতাম—আজ চক্ষি দ্যাখলাম—

গাঁয়ের লোক—মুচি, ডোম, বাগ্দী, জেলে, ব্রাহ্মণ, কুমোর কেউ বাকি ছিল না। কেউ এক কলসী, কেউ এক ঝুড়ি, কেউ দু'কলসী, কেউ এক থলে, কেউ এক ছোট ভাঁড়—যে যা এনেচে তা ভর্ত্তি করে মাছ নিয়ে গেল বাড়ীতে।

কেউ রেখে আবার নতুন ভাঁড় বা কলসী হাতে ছুটে ফিরে এল।

দামোদর সা বল্লে—ধরচো মাছ, ভাই সব, আড়াই টাকা তেলের সের সে কথা মনে রেখো। না খাও তো নষ্ট করো না—মাছ ছেড়ে দিয়ে যাও জলে—

কে একজন বল্লে—না খাই তো বিলিয়ে দেবো—বন্ধু-কুটুম্ব আছে—এ কি ছেড়ে দিয়ে যেতে আছে ভায়া ?

বুদ্ধিমান মধু ঘোষ বল্লে—কৈ মাছ জ্যান্ত কতদিন থাকে জল দিয়ে জীইয়ে রাখলে জানো? দু'মাস। যত ইচ্ছে ধরো, তবে বাড়ী নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রেখো, মরে না যায়।

দুলাল বল্লে—বল্ দিকি বিমল, একে মাছের 'কি' বলবি—এই আক্রা চড়া মাছের বাজারের দিনে ?

বিমল বললে—কি ? 'প্রাচুর্য্য' ?

—না।

—তবে 'প্রাদুর্ভাব' ?

—না, 'আবির্ভাব'। দেবতার আবির্ভাবের মতই আন্‌এক্‌স্‌পেক্টেড কিনা।

মানতালাও

সে বল্লে, খুব জানি, মানতালাও খুব বড় তবে ধারে বড় জঙ্গল। ভালুকের ভয় আছে, পাহাড় আছে, বাঘও আছে।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। অসহ্য গরম। বেলা চারটে বেজে গিয়েছে। ভাবলুম, এই অসহ্য উত্তাপে বিহারের এমন সুন্দর হ্রদে স্নান করা সৌভাগ্যের কথা।

সে প্রস্তাবে সবাই রাজী হল। আমার মন প্রথমত সায় দেয় নি। কি জানি কেমন তালাও ? মিথ্যেই দেরি হয়ে যাবে গয়া পৌছতে।

কিন্তু যখন মোটরটি হ্রদের সামনে পৌছলো—হঠাৎ এসে পৌছলো একটা বনের বাঁক ঘুরেই—তখন হ্রদের সেই অপূর্ব্ব রূপ আমাকে এত বিস্মিত করে দিলে যে আমি করণ সিংকে বল্লাম—কি জন্যে তুমি এর কথা আগে বল নি ?

—কেন বাবুজি ?

—এমন চমৎকার একটা জায়গা—!

—বড় জঙ্গল, ভালুক বাঘের ভয় আছে।

তা হোক, এমন অপূর্ব্ব একটি জলাশয় আছে, যার ধারেই পশ্চিম তীরে সমান্তরাল নীচু শৈলমালা ও শালের জঙ্গল, উপর তীরে মাইলটাক দূরে পুনরায় শৈলমালা এবং ঘনসবুজ শালবন—কেবল পূর্ব্ব ও দক্ষিণে পাহাড় নেই, বনও নেই—দিব্যি সবুজ তৃণভূমি, একদম ফাঁকা ও সমতল, ফুটবল খেলার ভাল মাঠ হয়। এই মাঠের মধ্যে এদিকে ওদিকে দু-চারটি হরীতকী, শিব বৃক্ষ, শাল ও আসান গাছ। দক্ষিণ কোণে চমৎকার অ্যাস্‌বেস্টসের ছাদ বাঁধা ছোট বাংলো। বাংলোর ঠিক সামনাসামনি একটি পাথরের মোটা মোটা সোপানযুক্ত কারুকার্য্যবিহীন বাঁধা ঘাট—তারই ঠিক বগলে বড় বড় তক্তা জুড়ে হাত দশ-বারো জলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—অনেকটা সুইমিং পুলের জাম্পিং বোর্ডের মত। সেই তক্তাগুলোর প্রান্ত মোটা মোটা শালের খুঁটিতে আবদ্ধ। যেখানে তক্তাগুলো শেষ হয়েছে সেখানে একখানা ধূসর-রংকরা জাহাজের লাইফ-বোটের মত গড়নের বোট বাঁধা।

মোটরে হাজারিবাগ থেকে গয়া যেতে যেতে এই অদ্ভুত হ্রদটি পড়লো। 'মানতালাও'

অবিশ্যি স্থানীয় অধিবাসীদের দেওয়া নামটা। নামে কিছু আসে যায় না, এই অতি সুন্দর হ্রদ যে এমন এক বনাঞ্চলে আছে, গয়াগামী পিচঢালা রাস্তা থেকে তার কিছু বুঝবার উপায় নেই, যদি না হাজুদা রাস্তার পাশের একটা সাইনবোর্ডের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতো। সাইন-বোর্ডের গোড়ার দিকে ও দক্ষিণ পাশে একই সরলরেখায় একটি তীরের ফলা—হ্রদের অবস্থানবিন্দু নির্দেশ করচে।

এই রকম হল বিজ্ঞাপনটা :

মানতালাও হ্রদ,

আসুন!

এখান হইতে দু ফার্লং দূরে বনের মধ্যে সুন্দর একটি হ্রদ আছে। স্নান ও ভ্রমণের জন্য বনবিভাগ হইতে একটি প্রস্তর-বাঁধানো ঘাট ও নৌকাভ্রমণের জন্য একটি নৌকার ব্যবস্থা আছে। জ্যোৎস্নারাত্রে এই হ্রদ বিশেষরূপে উপভোগ্য। ভ্রমণেচ্ছুদের জন্যে হ্রদের ধারে যে বাংলো আছে চৌকিদারের নিকট উহার চাবি মিলিবে।

দর্শনী—এক টাকা

নৌকাভ্রমণ ফি—॥০ আনা ঘণ্টা পিছু

বাংলো ভাড়া, দৈনিক—৫ টাকা

এম্. রাও

ডি এফ. ও.,

গয়া ডিভিশন

কখনো নাম তো শুনিনি মানতালাও হ্রদের। অবিশ্যি কি করেই বা শুনবো, ক'দিনই বা এদিকে এসেছি। দুজনেই আমরা নবাগত পশ্চিম সফরে। ড্রাইভার করণ সিং এ অঞ্চলের লোক, বিহার ট্রানস্পোর্টের বাসগুলিতে অনেকদিন কাজ করচে, তাকে বল্লাম—তুমি জানো করণ সিং, কি তালাও আছে এখানে?

খুব চওড়া হ্রদটা—আঁকাবাঁকা হ্রদটা বনের ও-মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে—নির্মল নীল জল, এবং হয়তো বল্লে বিশ্বাস করবেন না—তীরের কাছে কি চমৎকার সবুজ জলা ঘাস ও পান-কলস শেওলার বন—ঘাসে ফুল ফুটেচে নীল রঙের, পান-কলসের ফুল ফুটেচে সাদা সাদা 'বাটার কপ' ফুলের মত। আর, কি অজস্র ফুটে আলো করচে বনপ্রান্ত, সেই পড়ন্ত বেলায় কি ঘন সুবাস সদ্যফোটা কুড়চিফুলের—সাদা বনভূমি মাতিয়ে ফেলেছে তুই সুবাসে, যেদিকেই চাও, সেদিকেই থোকা থোকা কুড়চিফুল দুলচে বাতাসে। কি শোভা এই অপরিচিত অজ্ঞাত জলাশয় ও তার বন্য পরিবেশের! কি অদ্ভুত নির্জ্জনতা এর চারিপাশের! কোথাও একটি মানুষের চুলের টিকি দেখা যায় না। কেবল শোনো বিহঙ্গকাকলী, বন্য হনুমানের উপ আপ্ শব্দ দূরে বনের মধ্যে, আর জলাশয়ের বড় বড় ঢেউ ছুপ্ ছুপ্ করে সেই

তক্তা-বাঁধা জেটির গায়ে এসে লাগবার শব্দ।

আমাদের বন্ধু ললিত প্রকৃতিকে দেখবার চক্ষু হারায় নি। সে দেখে-শুনে বলে উঠলো—শুধু এখানে বসে থাকো—ব্যস্, আর কিছু না।

—তা খাওয়া?

—সে হয়ে যাবে।

বলে সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে কি যে নির্দেশ করলে, কেউ বুঝতে পারলে না।

বল্লাম—বোট চড়বে?

—হ্যাঁ ভাই। কিন্তু সন্ধ্যায়, জ্যোৎস্না উঠলে। কি বলো?

—রাত্রে তাহলে এখানে থাকতে হবে।

—থাকলাম।

—খাওয়া?

—সে হয়ে যাবে।

বলে সে আবার পূর্ব্ববৎ অর্থহীন ইঙ্গিত করলে হাত নেড়ে। আমার ইচ্ছা যে একেবারে না ছিল তা নয়। মোটর থেকে সবাই নেমে পড়লাম। বাংলোর চৌকিদারকে ডাকাডাকি করা গেল, কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আমরা বাংলোর বারান্দায় জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে সেখানে বসলাম। উদ্দেশ্য, চা তৈরি করার চেষ্টা দেখা। ললিত শীঘ্রই শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে নিয়ে এসে চা চড়িয়ে দিলে। করণ সিং চৌকিদারকে ডাকতে গেল।

চা খাওয়া শেষ হল। সূর্য্য অস্ত গেল ওদিকে পাহাড়শ্রেণীর ওপারে। চমৎকার ছায়াভরা প্রান্তর ও বনানী। বনানীপ্রান্তস্থ এই বিরাট সরোবর। পাহাড়ের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেচে নির্ম্মল কাকচক্ষু জলের পশ্চিম কোণে। পাখি-পাখালির কলরব ভেসে আসচে পাহাড়ের দিক থেকে।

এমন সময় করণ সিং চৌকিদারকে নিয়ে এলে দেখা গেল যে চৌকিদার একটি ষোল-সতেরো বছরের ছেলে। নাম তার ট্যাম্পা।

আমরা বল্লাম—কোথায় গিয়েছিলি?

—হাটিয়া মে।

—কাঁহা কা হাটিয়া?

—গবিন্দপুর, দো মিল্ ইঁহাসে। পাহাড় কা বগল মে।

—রাত মে হাম্‌লোক বাংলো মে ঠহরনে সেকেগা?

—জী। কাহে নেহিঁ? রহ্ যাইয়ে আপলোক। মগর হামারা পাস্ চাভি তো হ্যায় নেহি।

—চাভি কাঁহা গিয়া?

—মেরে চাচাকে পাস্ হ্যায় মকান্ মে। হাম্ যায় গা, মাগায় গা।

—তব যাও, আউর মাগাও—

—আপ্ লোগোঁকো খানা-কি ক্যা হোগা ?

—তুম্‌কো বানানে পড়েগা। সকেগা নেই ?

—কাহে নেই হুজুর! মগর হিয়ঁা কুছ নেহি মিলেগা। না চাল, না দাল।

—ঘাবড়াও মাৎ। সব চিজ হ্যায় হামলোগোঁকা গাড়িমে। তুম্ একঠো মুরগী মাগাও হাটিয়া সে—হাঁ ?

—দিজিয়ে দো রুপেয়া। গাঁও সে মাগায়েঙ্গে।

—বোট কা চাভি কাঁহা!

—ও খুলা হুয়া হ্যায়। লে যাইয়ে। একঠো খাতামে সহি করণে হোগা।

—খাতা লাও--

ট্যাম্পা খাতা সই করিয়ে চাবি আনতে চলে গেল। আমরা করণ সিংকে জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করে বোট ছেড়ে দিলাম।

সরোবরটি সব জায়গায় সমান চওড়া নয়, বোট নিয়ে যত আমরা ওর দৈর্ঘ্য ধরে এগিয়ে চল্লাম, তত বাঁদিকের প্রস্থ বাড়তে লাগলো—শেষে এমন হল যে ওপারের গাছপালা ছোট দেখাতে লাগলো, ওপারের পাহাড় হঠাৎ যেন বহুদূরে চলে গেল। হ্রদের জলে ছোট ছোট ঢেউয়ের সৃষ্টি করে পাহাড়ের দিক থেকে বাতাস বইচে। ললিত বল্লে—ভাই, স্নান করা দরকার। বোট লাগাও কোন এক জায়গায়।

আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল ওপারের অপূর্ব্ব বন-সৌন্দর্য্য। এপারের তীরে তৃণভূমিই বেশি, মাঝে দু-চারটা বড়-ছোট গাছ। ললিতকে বল্লাম—চলো ওপারে বোট নিয়ে। ওখানে যাওয়া যাবে।

ক্ষুদ্র বীচিসঙ্কুল হ্রদটি পার হতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগলো। এইখানেই হ্রদটির প্রস্থ সর্বাপেক্ষা বেশি। পাহাড়ময় তীরভূমি যত কাছে আসতে লাগলো, ততই তার ঘন সবুজ রূপ আমাদের বাঙালী মনকে টানতে লাগলো ওর দিকে—এসব মরুভূমির মত ঊষর দেশের কঙ্করময় রুক্ষতার মধ্যে শ্যামল বনানীর বৈচিত্র্য চোখ জুড়িয়ে দেয় কি ভাবে, তা উপলব্ধি করার বস্তু, শুধুই কানে শুনে বা বইয়ে পড়ে তা বোঝা সম্ভব নয়।

ওপারে আমরা যখন পৌছে গেলাম তখন দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ। একটু পরেই একাদশীর চাঁদের জ্যোৎস্না ফুটে উঠলো জলে, বনে, পাহাড়ে সর্বত্র।

ওপারে পৌছে ডাঙায় নেমে দেখি, তীরভূমি কি সুন্দর! পাষাণময় আগাগোড়া, সমতল **laterite** পাথরের বেদী যেন মস্ত বড়। ঠিক পেছনেই বন শুরু হয়েচে, একেবারে অনতি-দূরস্থ শৈলসানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বনভূমি। পাষাণময় চত্বরের দৈর্ঘ্য একশো হাতেরও বেশি, চওড়ায় প্রায় দশ-বারো হাত। আমাদের স্নান ও বিশ্রামের জন্যে প্রকৃতি যেন পাথরের ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছে। কি ঠাণ্ডা জায়গাটি, বনের কি সুন্দর স্নিগ্ধ হাওয়া, কুড়চিফুলের কি ঘন সুবাস জ্যোৎস্নামাখা বাতাসে।

আমরা জলে নামলাম। যতদূর যাই পায়ের তলায় শুধুই পাথর, যেন সিমেন্ট বাঁধানো

সমতল চত্বর। জল ঈষত্তপ্ত, কিন্তু কাকচক্ষুর মত নির্মল। জলে পড়েচে চাঁদের জ্যোৎস্না, পাহাড়ের ওপর বন্যকুক্কুট ডেকে উঠলো রজনীর প্রথম যামের শুরুতে, সেই সঙ্গে ডেকে উঠলো শেয়ালের দল।

ললিত বল্লে—কি চমৎকার জায়গা ভাই!

—এমন যে জায়গা আছে তাই জানতাম না।

—অথচ কেউ আসে না। জানলে ভিড় জমে যেতো না এই গরমের দিনে?

—তুমিও যেমন! আমাদের দেশে এ সব জিনিস দেখবার শখ আছে ক'জনের? কে আসচে লেক্ দেখতে।

আমাদের পিছনে রহস্যাবৃত বনভূমি জ্যোৎস্নায়-অন্ধকারে অত্যন্ত গভীর ও বিপদসঙ্কুল বলে মনে হচ্ছে। করণ সিং ভালুকের কথা তো বলেছিলই, বাঘের অস্তিত্বের সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছিল, তাও অর্থপূর্ণ।

কিন্তু আমার মন ছিল না বনের বিপদের দিকে। সারাদিন প্রখর রৌদ্রতাপ, ধুলো ও ঘামের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এই বনানী-বেষ্টিত নির্জ্জন বিশাল জলাশয়ের গভীর জলে অবগাহন স্নান করবার আনন্দ আমার সব ভয়কে ছাপিয়ে উঠেচে। হ্রদের ধারে ধারে জলজ ঘাসে নীল ফুল ফুটে আছে—হাওয়ায় দুলচে ঘাসগুলো, উচ্ছে-লতার মত কি একটা লতা ঝুলে পড়েচে জলে, পাথরের ওপর দিয়ে সাপের মত সেটা চলে এসেচে জঙ্গলের দিক থেকে।

দুজনে পাষাণ তীরভূমিতে উঠে সাবান মাখলাম আরাম করে, তারপর আবার নামলাম জলে। চাঁদের ছায়া ভেসে ভেসে যাচ্ছে জলের ভেতর, বুকে মুখে লাগছে ঢেউ, পাষাণময় তটে মৃদু শব্দে ছলাৎ ছলাৎ করচে, তাল খাচ্ছে, চারি-ধার নিঃশব্দ নির্জ্জন—কি সুন্দর রাত্রি, কি সুন্দর দেবলোকের সরোবরের মত অগাধ জলরাশি! তিড়িং করে একটা ছোট মাছ লাফিয়ে উঠেই আবার জলে পড়ে গেল! জল! জল! জীবনদায়িনী সুধার প্রবাহ! ভগবানের কি অদ্ভুত সৃষ্টি এই জল!

কিন্তু এই জলকে ঠিকমত ভোগ করতে হলে এমনিধারা অগাধ জলের সরোবরে বা নদীতে এমনি ছায়ানিবিড় বনকূলের ধারের ঠাণ্ডা জলে অবগাহন স্নান করা চাই—সারাদিনের পরিশ্রম, ধূলো ও দুর্দ্দান্ত গ্রীষ্মের পরে। কলকাতার আঁট-সাঁট বাথরুমে জলের কল খুলে স্নান করে কিছুতেই বোঝা যাবে না জলের কি মহিমা, অবগাহন স্নানের কি আস্বাদ! তার ওপর যদি জ্যোৎস্নারাত হয়, আর এমনি জনহীন সরোবরটি পাওয়া যায়, তবে সৃষ্টির আনন্দের অনেকখানি স্নান করে উঠে নিয়ে আসা যায়—দৃষ্টির সাহায্যে ওর ফটো তুলে।

স্মৃতির পটে এই ফটো চিরদিন থেকে যাবে এবং জীবনের মহাসম্পদ হয়ে থাকবে।

স্নান করে স্নিগ্ধ হয়ে আবার আমরা বোট বেয়ে অজানা রহস্যলোকের দিকে এগিয়ে চলি পশ্চিম তীর ধরে। আমাদের বাঁ দিকের বন ও পাহাড় ধরে ধরে অনেকদূর বেয়ে চলেচি ডাঙার কাছে—কোথাও বনের মধ্যে অজানা বনকুসুমের গন্ধ, কোথাও ঝিঁঝির

সমস্বরে ঐকতান, কোথাও ঝরা পাতার ওপর অজানা কোন্ নিশাচর জন্তুর দ্রুত পাদচারণের খস্ খস্ ধ্বনি, কোথাও ডালপালা কাঁপিয়ে বাতাস ওঠার শব্দ—সমস্ত বনভূমিতে ততক্ষণ জ্যোৎস্না নেমেচে, কেবল নিবিড় ঝোপঝাপ কিংবা পাহাড়ের খাঁজগুলো বড় অন্ধকার দেখাচ্ছে তখনো।

ললিত বল্লে—এ লেকের দেখচি সীমা নেই—কতদূর বাইবো?

—চলো, আজ সারারাত বাইবো বোট।

—এবার বাংলোতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা যাক।

—একরাত্রি না-ই বা খেলুম, চলো দেখা যাক।

এক জায়গায় ডাঙায় মস্ত বড একটা হর্তুকী গাছ, তার ডালে ডালে আলোকলতা দুলে দুলে ঝুলে পড়েচে জলের উপর। বড় বড় পাথরের চাঁই সেখানটাতে জল পর্য্যন্ত নেমে এসেচে—সমস্তটাতে জ্যোৎস্না পড়ে কি অপূর্ব্ব দেখাচ্চে।

আমরা আবার সেখানে বোট বেঁধে পাষাণের উপর জ্যোৎস্নায় বসলাম। কাছেই কত কি বন্য লতাপাতার ঝোপ, কটুতিক্ত গন্ধ উঠচে বাতাসে। রাত দশটা বেজেচে। দিনের গরম অনেকক্ষণ কেটে গিয়ে রাত্রির শীতল বাতাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্চে আমাদের সঙ্গে গায়ে দেবার কোনো মোটা জামা বা কাপড নেই।

ললিত বল্লে—এ দেখচি, কম্বল আনা উচিত ছিল—

—বেশ ঠাণ্ডা। সত্যি ভাই—

—চলো ফিরি।

হঠাৎ দুজনেই অবাক হয়ে জ্যোৎস্নালোকিত জলরাশির দিকে চেয়ে দেখলাম একদল বুনো হাঁস পাহাড় থেকে নেমেচে জলে, দিব্যি সাঁতার দিচ্চে—দূর থেকে দেখাচ্চে যেন একদল শুভ্রা নারী জলকেলি শুরু করেচে। গা ছম ছম করে উঠলো দুজনেরই। বাংলো থেকে অনেকদূর এসে পড়েচি, রাত্রিও গভীর, পেট চুঁই চুঁই করচে খিদেয়, ঠাণ্ডা বাতাসে শীত ধরে গিয়েচে দুজনেরই।

বোট বেয়ে ফিরতে লাগলাম কূলের দিকে।

চাঁদ ঘুরে গিয়েচে। যেন মনে হল পথ হারিয়েচি, দিক নির্ণয় করতে পারচিনে—সমস্ত অঞ্চলটা যেন মায়াময় হয়ে গিয়েচে—যেন পৃথিবী থেকে বহুদূরে মহাব্যোমের অন্য কোন অজানা গ্রহে নির্জ্জন বন-বেষ্টিত হ্রদের আমরা দুটি নিঃসঙ্গ প্রাণী, কোনো অজানা উপগ্রহের জ্যোৎস্নায় বিভ্রান্ত হয়ে পথ হারিয়ে ঘুরচি, আমাদের সে পরিচিত পৃথিবীর আত্মীয়-স্বজন থেকে চিরবিচ্যুত অবস্থায়। কতকাল যেন ছেড়ে এসেচি সে-সব পরিচিত পথরেখা, তারায় তারায় পরিব্যাপ্ত আকাশ আর জ্যোৎস্না-ভরা জলরাশির দিকে চেয়ে সে অনুভূতি আরও দৃঢ় হল মনে।

খানিক দূর এসে বাঁ দিকের পাহাড়ে স্পষ্ট একটা শব্দ শোনা গেল, যেন করাত দিয়ে তক্তা চিরচে।

ললিত বল্লে—ভাই! শোনো—

—বড় বাঘ। রয়েল বেঙ্গল গয়ার জঙ্গলে যথেষ্ট।

—তাড়াতাড়ি চলো—

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সে আওয়াজ। খুব গম্ভীর আওয়াজ নয়, ঠিক তক্তা চেরার শব্দ। করাতের কারখানায় বড় কলের করাতে তক্তা চিরচে। আমি বড় বাঘের এ ডাকের সঙ্গে সুপরিচিত।

যখন আবার আমরা ফিরে এলাম বাংলোর ঘাটে, তখন রাত আড়াইটে। করণ সিং ঘরের দরজা বন্ধ করেচে বাঘের ভয়ে। তার ভয় যে অমূলক নয়, তার পরিচয় কিছু আগেই পেয়েচি।

ডাকাডাকি করতে করণ সিং ও আর-একটা লোক দোর খুললো। অন্য লোকটা আমাদের সেলাম করলে। করণ সিং জানিয়ে দিলে, এ সেই বালক চৌকিদারের চাচা।

বল্লাম—ক্যা নাম তুম্‌হারা?

—মুনেশ্বর মাহাতো, হুজুর।

—ঠিক হ্যায়। ভাত পাকায়া?

—হুজুর, ও তো দশ বাজনেকো অন্দর মে পাকায় লিয়া। ভাত আউর মাস। খানা ঠাণ্ডা হো গিয়া হুজুর।

—কোই হরজ নেই। লে আও—

—টেবুল মে পারস কর্ লে হুজুর?

—করো। করণ সিং, তুম্ খানা খায়া?

—হাম্ তো চূড়া খা লিয়া। আউর কুছ নেহি খায়েঙ্গে।

আকণ্ঠ খাওয়া গেল। শেষ রাত্রে মাংস আর ভাত। তারপর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। মুনেশ্বর বল্লে—হুজুর, এ-সব জায়গায় ভোরে তাড়াতাড়ি দোর খুলবেন না। অনেক সময় বাঘ ওৎ পেতে থাকে দোরের কাছে, যেমন দোর খোলা হয় অমনি মানুষকে নিয়ে পালায়। একবার হয়েছিল এ বাংলোয়।

করণ সিং বল্লে—বাজে গল্প করো না। মানুষখেগো বাঘ না হলে অমন করে না। আমি বিহার ট্রান্সপোর্টে কাজ করচি 'বিশ বছর। কত পাহাড় জঙ্গল ঘুরেছি। কখনো শুনিনি এমন কথা।

মুনেশ্বর রেগে বল্লে—আপ লোক ক্যা জানতা? মোটর সে ঘুম্‌তা হ্যায়, জঙ্গল কা হালচাল ক্যা মালুম হ্যায় আপলোগোঁকা? ছোড় দিজিয়ে ও বাৎ—আপলোক রহিয়ে ইঁহা পর দো পাঁচ রোজ, আপকো নেহি দেখলানে সকেঙ্গে তো জুর্মানা দেঙ্গে দশ রুপৈয়া—জরুর—

বেলা আটটায় দুজনে উঠলাম। তার আগেই মুনেশ্বর উঠে দোর খুলেচে, সুতরাং বাঘের ফাঁড়া থাকলেও কেটে গিয়েচে।

চা তৈরী করলে ললিত।

আমরা রওনা হবার আগে হ্রদের জলে স্নান করে নিলাম। জল অত্যন্ত শীতল। শরীরে যেন নতুন বল পেলাম, নতুন আনন্দ, নব-জীবন। সামনে আবার আজ যখন পড়বে বিহারের দুর্দ্দান্ত গরম, লু বইবে দুপুরের দিকে, বালির ঝড়ে দিক অন্ধকার হয়ে যাবে, তখন দোর বন্ধ করে খাটিয়ায় শুয়ে মনে পড়বে এই অদ্ভুত মায়াময় হ্রদটি, এই অগাধ স্নিগ্ধশীতল জলরাশি, এই শ্যামল-বনাকীর্ণ উপত্যকা। গত রাত্রে জ্যোৎস্নালোকিত হ্রদবক্ষের স্মৃতি হয়ে পড়বে তখন দূরকালের স্বপ্নের মত অবাস্তব।

বিদায়, অজানা সরোবর, বিদায়!

আবার এ পথে এলে দেখা হবে নিশ্চয়।

বে-নিয়ম

রাম চাটুয্যের স্ত্রী খুব বিপদে প'ড়েই প্রতুলকে খবর দিলেন। রাম চাটুয্যে পাথুরে লোক ছিলো সবাই জানে। প্রতুলের যখন আঠারো উনিশ বছর বয়েস তখন এ সংসারে সে এসেছিলো রাম চাটুয্যের বাসের কণ্ডাক্টর হিসেবে। দু'বছর পরে কি কারণে তার জবাব হয়ে যায়। সে আজ পাঁচ-ছ'বছর আগের কথা।

আজ তিন বছর রাম চাটুয্যে নিমোনিয়া রোগে মারা গিয়েছেন। দু'খানা বাস চলছিলো চাকদা থেকে রাণাঘাট হয়ে শান্তিপুর। মাসে হাজার খানেক টাকা আয় ছিলো দু'খানা বাসে। রাম চাটুয্যের মৃত্যুর পর তা এসে দাঁড়ালো দু'শো টাকায়। একখানা বাসের এঞ্জিনে নাকি কি গোলমাল হয়েছে—হাজার টাকার দরকার তা সারাতে। বর্ত্তমানে দু'খানা বাসই বন্ধ।

সময় পেয়ে নানা আত্মীয় বন্ধু এসে জুটেছে। তারা সবাই হিতাকাঙ্ক্ষী। নানা রকম সৎ-পরামর্শের চাপে রাম চাটুয্যের স্ত্রীর রাত্রে ঘুম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। প্রত্যেকে কিছু না কিছু বাগিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে। ইতিমধ্যে বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে, হাতের টাকাও অর্দ্ধেকের ওপর গিয়েছে। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্যে এক মাসের কড়ারে টাকা নিয়ে বেমালুম গা-ঢাকা দিয়েছে। কেউ ব্যবসার জন্যে টাকা নিয়ে আজও গিয়েছে কালও গিয়েছে, আর দু'টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা যে কতো গিয়েছে তার লেখাজোখা নেই। ওবেলা দিয়ে যাবো, কাল বিকেলে দিয়ে যাবো ভাই—এই ধরণের সব কড়ার। আপনা আপনির মধ্যে, না দিয়েও পারা যায় না। রাম চাটুয্যের স্ত্রী এখন অনেক কিছু বুঝতে পেরেছেন, খুব আত্মীয়-স্বজনের মিষ্টি কথাও আর বিশ্বাস করেন না। তাঁর জ্যাঠতুতো বোনের স্বামী একদিন এসে ধরে পড়লো—দিদি, ন'শো টাকা না দিলে নয়। হুণ্ডির ওয়াদা মেটাতে হবে কাল সকালে। বুধবারে নিজে এসে কিংবা হরিমতীকে আর বৃন্দাবনকে দিয়ে পাঠিয়ে

দেবো। তুমি ছাড়া আর কার কাছে যাবো বলো? এমন গঙ্গাজলে ধোয়া মন আর কার আছে?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে ভগ্নীপতির দেখা আর কোনদিন পান নি তারপরে। অবিশ্যি টাকাও পান নি।

সেদিন রাম চাটুয্যের নাবালক পুত্র হারাধন এসে মাকে বল্লে—মা, হাটে বেগুন সস্তা হয়েছে, কাল শুনেছি। আজ থেকে আর বেগুনের বাজরা বাসে যাবে না।

—কেন?

—হরিপদ প্রত্যেক বাজরা পিছু চার আনা ক'রে জলপানি নেয়, ওরা আমাদের বাসে না গিয়ে লাহিড়ী কোম্পানীর বাসে যাচ্ছে।

—তুই হরিপদকে বল্লি কিছু?

—আমার কথা শোনে না। তুমি ডেকে বরং বলো।

এই হরিপদই এক হাজার টাকা চেয়ে রেখেছে বাসের এঞ্জিন সারাবার দোহাই দিয়ে। রাম চাটুয্যের স্ত্রী অনেক ভেবে দেখলেন। বাপের ব্যবসা যদি চালাতে হয়, তবে এ সব লোক দিয়ে হবে না। হরিপদ সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর কানে গিয়েছে। পুলিশকে দিতে হবে ব'লে দু-দু'বার সে মোটা টাকা নিয়েছে, কিন্তু পুলিশকে দেয় নি। যদিও দিয়ে থাকে খুব কম, নিজে মেরে দিয়েছে টাকাটা। বিশেষ ক'রে আজকাল যেন হরিপদ কি রকম হয়েছে। কেবলই পাঁচ টাকা লাগবে, কাল আশি টাকা লাগবে, বাসের ভাড়ার টাকা ঠিকমতো আদায় দেয় না—হিসাব চাইলেই চ'টে যায়। অর্থাৎ ব্যাপার এই, ও বুঝেছে ওকে ছাড়া আর চলবে না, বাসের কাজ আর কেউ জানে না, রাম চাটুয্যের স্ত্রীকে যদি বাসের ব্যবসা বজায় রাখতে হয়, তবে হরিপদ ভিন্ন কাজ চলবে না। কাজেই হরিপদর মেজাজ চড়বারই কথা।

হরিপদকে ডেকে বেগুনের বাজরার জলপানির কথা বলতেই সে চ'টে গেল। দু'এক কথার শেষে সে বল্লে—অনেক কিছু ঝুঁকি ঘাড়ে ক'রে নিয়ে লাইন বজায় রেখেছিলাম, কিন্তু আপনাদের অলক্ষ্মীতে ধরেছে বুঝতে পেরেছি। এ লাইন যাতে পাল কোম্পানী কিংবা লাহিড়ী কোম্পানী পায়, সে চেষ্টা আমি করবো। দেখি আপনাদের কতো ইয়ে হয়েছে।

হরিপদ চ'টে বেরিয়ে গেল। সেই থেকে বাস বন্ধ। সেই থেকে নগদ টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই থেকে সংসারের অবনতির সূত্রপাত। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে আর কতদিন থাকে?

দুপুরবেলা বারাসত থেকে প্রতুল এলো। রাম চাটুয্যের স্ত্রীকে প্রণাম ক'রে বল্লে—খুড়ীমা, ভালো আছেন? হারাধন ভালো আছে?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী বল্লেন—এসো, এসো বাবা। ভালো আছো? বেঁচে থাকো বাবা।

—বাসের কাজ কেমন চলছে?

—সে সব অনেক কথা। বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হরিপদ রাগ ক'রে চলে গিয়েছে।

তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম এই জন্যেই। খাওয়া-দাওয়া করো, সব কথা বলছি।

প্রতুলকে ভাত দিলেন টক-ডাল ও কাঁচকলা ভাজা দিয়ে। অসময়ে আর কিছু ছিল না ঘরে। খেয়ে-দেয়ে উঠে প্রতুল বিশ্রাম করলে। তারপর উত্তরের বারান্দায় ব'সে রাম চাটুয্যের স্ত্রীর মুখে হরিপদর কীর্ত্তিকলাপ সব শুনলে।

হারাধন এসে বল্লে—প্রতুলদা, আমাদের এখানে থাকবে তো ?

—তাই তো ভাবছি।

—তোমাকে ছাড়ছি নে।

—বেশ, কাকীমা বল্লে কি না থেকে পারি ?

—মা সেজন্যেই তো তোমায় আনালে। তুমি ছাড়া আর চলবে না। হরিপদ তো আমার কথা একেবারেই শোনে না, মার কথাও শোনে না, যা ইচ্ছে তাই করতো আজকাল। আমাকে বল্লে দশটা টাকা দাও, চামড়ার ব্যাগটা সারাতে হবে। দিলাম। এখন দেখি যেমন ব্যাগ তেমনি আছে, গেল টাকাটা। জান্‌কি মুচি বল্লে, কই আমার কাছে তো কেউ ব্যাগ সারাতে দিয়ে যায় নি। আমি দশ টাকা সারাবার জন্যে নেবো, তা বলিও নি।

প্রতুল বল্লে—ঠিক ঠিক। দাঁড়াও, দেখি। কাকীমার মুখে সব শুনি, কি বলেন। আমার পোষাবে তবে তো থাকবো ? বারাসতে আমি ব'সে ব'সে শুধু টাইম-কীপারী করি, আধ ঘণ্টা কাজ, মধ্যে একঘণ্টা টিফিন, পঞ্চাশ টাকা মাইনে। তোমার মা কী দেবেন আগে বুঝি।

বোঝাবুঝি সেদিনই সব হয়ে গেল। প্রতুল কাজে লাগলো পরের দিন থেকে। হারাধন নির্বিঘ্নে স্কুলে পড়তে লাগলো। ওর মায়ের মনের উদ্বেগ ও সন্দেহ সামান্য কিছু কমলেও একেবারে কমলো না, স্বামীর মৃত্যুর পর জগৎটাকে তিনি যে চোখে দেখতে পেয়েছেন তাতে কমবার কথাও নয়।

প্রতুল গ্যারেজ থেকে বাস বার করতে গিয়েছে সকালে, পাশের পানের দোকানী বলরাম বল্লে, কি, প্রতুলবাবু যে! এলে কবে ?

—এই যে—ভালো ? কাল এসেছি।

—বাস বেরুবে নাকি ? হরিপদর জায়গায় তুমি বুঝি এলে ?

—হ্যাঁ। হরিপদও আসবে। সে এ লাইনে সাত আট বছর কাজ করছে, সে না এলে চলে ?

দিন তিনেকের মধ্যে বাজারের রামদুলাল স্বর্ণকার, বোস কোম্পানি ঘড়িওয়ালা, টুনু চক্কত্তি চায়ের দোকানী, কপিল আলুওয়ালা—মানে বাজারের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা দেখে অবাক হয়ে গেল রাম চাটুয্যের বাস সার্ভিস আবার চালু হয়েছে এতদিন পরে, বেশ দু'পয়সা আসছেও নিশ্চয়।

প্রতুলের চিঠি পেয়ে হরিপদ এলো। বল্লে—আমার তো কোন অনিচ্ছা নেই, তবে হারাধনের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা আমি শুনতে রাজী নই। আমি চাটুয্যে-মহাশয়ের পুরনো,

লোক, আমার সঙ্গে সেই রকম কথা বলো, আমি সব করতে রাজী। তা বলে—

প্রতুল বল্লে—হরিপদদা, হারাধন ছেলেমানুষ। তুমি আমি যা করবো তাই হবে। ওর কথায় চট্‌তে আছে—ছিঃ!

দিন সাতেকের পরে একদিন ক্যাশ বুঝিয়ে দিতে গিয়ে হরিপদ বল্লে একটু নীচু সুরে—সাতানব্বই টাকা তেরো আনা ক্যাশ। আমার কতো, তোমার কতো?

—মানে?

হরিপদ চোখ টিপে বল্লে—মানে তুমিও জানো, আমিও জানি। তুমি কি আর এখানে পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে খাটতে এসেছ, না আমি খাটতে এসেছি! যা হবে সে তো তুমিও—

—না দাদা, নাবালকের সম্পত্তি। আমি এসেছি ওরা ডেকেছে বলে! ওদের জিনিস বজায় রাখতে হবে, তবে তোমারও দু'পয়সা।

—সে পয়সাটা আসছে কোথা থেকে?

—কমিশন থেকে। আমি গিন্নিমার সঙ্গে কথা বলবো এ নিয়ে। আগে সাত পার্সেণ্ট পাওয়া যেতো কর্ত্তার আমলে। এখন তুমি যা বলো।

—আরে তুমিও বুঝলে না। নিজের হাতে কলকাটি, আবার পরের খোশামোদ করতে যাবে কেন? কমিশন-টমিশন, পর্সেণ্টেজ-ফার্সেণ্টেজের কে ধার ধারছে? যা করবো তুমি আর আমি। গিন্নিমা আবার এর মধ্যে আসছেন কোথা থেকে?

হরিপদর এ অদ্বৈতবাদ প্রতুল বুঝতে পারলে না। কি জানি কেন গিন্নিমার অসহায় কান্না ওর অন্তর স্পর্শ করেছিল। নইলে সে বোকা নয়, দু'জনে মিলে লুটেপুটে খেলে যে কমিশনের চেয়ে বেশি পয়সা হয় তা সে জানে। প্রতুল ক্রমে ক্রমে হরিপদর মনের ভাব বদলে দেবার চেষ্টা করলে। কিছু টাকা রোজ দিতে লাগলো রাম চাটুয্যের স্ত্রীর হাতে। অনেকদিন টাকার মুখ দেখতে পান নি তিনি।

একদিন প্রতুল বল্লে হরিপদকে—আচ্ছা দাদা, চাকদা-বনগাঁ রুট্ তোমার কেমন মনে হয়?

—নতুন রুট্। কেউ তো এ পর্যন্ত চালায় নি। প্যাসেঞ্জার হবে কি না-হবে—

—করে দেখতে দোষ কি? লাগিয়ে দিই দরখাস্ত, কি বলো? ও রুটে কম্‌পিটিশন নেই। যে আগে অ্যাপ্লাই করবে তারই হবে।

—দেখতে পারো।

—তুমি অনেক অভিজ্ঞ আমার চেয়ে এ কাজে। তুমি কি বলো?

—নতুন দু'খানা বাস কিনতে হবে, টাকা পাবো কোথায়? কম্‌সে কম চল্লিশ হাজার লাগবে।

—ডিস্‌পোজালের চ্যাসিস্ কিনে এঞ্জিন কিনে বডি তৈরী করে নিলে সস্তায় পড়বে। ভালো আমেরিকান লরীর ফ্রেম যদি কিনি—তুমি কি বলো?

—মন্দ না। এঞ্জিন দেখেশুনে কিনতে হবে। এ রুটে বড় কম্পিটিশন। বাইশ-চব্বিশ-খানা বাস চলচে, ভাবো! এ ঠেঙিয়ে বিশেষ উন্নতির কোনো আশা দেখছিনে।

—আচ্ছা বারাকপুর-কাঁচরাপাড়া রুট্?

—বহু টাকার খেলা। দু'খানা বাসে হবে না। আবার তেমনি কম্পিটিশন। তুমি বরং চাকদা রুটের জন্যে চেষ্টা করে দেখতে পারো।

—হয় যদি, তবে তোমাকে নতুন রুটে যেতে হবে হরিপদদা। ওটাকে গ'ড়ে তুলতে হলে তুমি ভিন্ন আর কেউ পারবে না। বাঁধা আসরে তো সবাই গাইতে পারে!

প্রতুলকে খুব পরিশ্রম করতে হল নতুন পথের সন্ধানে। ধানবাদে গিয়ে ওরা ডিসপোজাল থেকে আশানুরূপ জিনিস খুঁজে পেলে। নারকেলডাঙ্গার বসাক মোটর ওয়ার্কস থেকে বডি তৈরি করিয়ে নিয়ে এলো। রুটের লাইসেন্সের জন্যে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি, কারণ ও রুটে কোনো খদ্দের উপস্থিত ছিল না আদৌ। আপত্তি একটুখানি উঠেছিল কাজিপাড়ার ওসমান গনি মিঞার দিক থেকে। ওরা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার, ওদের কোন জামাই নাকি বছর দুই পূর্ব্বে লীগ মন্ত্রিত্বের সময় এ রুটের একটা লাইসেন্স পেয়েছিল, কিন্তু বাস চালায় নি, কারণ তখন পেট্রল এবং অন্যান্য মোটরের উপকরণ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল। প্রতুল নিজে বড় তরফের জমিদার সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে সব মিটিয়ে ফেলল। ঠিক হল, ভবিষ্যতে যদি কখনো ওদের জামাই বাস চালানোর ব্যবসায়ে নাবে, তবে এরা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী গহনা বন্ধক রেখে কিছু টাকা যোগাড় করলেন, শেষ পর্য্যন্ত বসতবাড়ী বাঁধা পড়লো কুণ্ডুদের কাছে। পাশের বাড়ীর অনেকে এসে নানা রকম কথা বলতে লাগলো। এ ভাবে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া কি উচিত হল পরের কথা শুনে? হলই বা বিশ্বাসী পুরনো লোক।

কানাই দত্ত রাম চাটুয্যের পুরনো বন্ধু। তিনি স্থানীয় সম্ভ্রান্ত দোকানদার ও প্রবীণ ব্যক্তি। সেদিন এসে বল্লেন—ও বৌদিদি, শুনলাম নাকি প্রতুল ছোঁড়াটার হাতে অনেক টাকা তুলে দিচ্ছো? ব্যাপারটা কি?

—এসো বোসো ঠাকুরপো। তোমরা তো আর দেখলে না। ওই ছোঁড়াটা দেখতে এসেছে ব'লেই আজ না-হয় তোমরা সৎ-পরামর্শ দিতে এসেছো।

—একশোবার গালাগাল দেও, মারো বৌদিদি। ঠিক কথা। আমার কথা যদি বলো, হাঁপানিতে আমার হাড়সার করেছে বৌদিদি। বড় ছেলেটা দোকান দেখাশুনো করে। গোবরা, ছোটটা, মাল গস্ত করে বড়বাজারে। আসবার দেখবার ইচ্ছে থাকলেও পেরে উঠিনে।

—কি বলছিলে?

—বলছিলাম, দেনা মহাজন মর্টগেজে—এ সব কি শুনছি? রাম দাদার আমলে কখনো এ কেউ শোনে নি। কেন পরের হাতে নাচছো? দেনা ক'রে কেউ কখনো ব্যবসা করে,

তাও পরের হাতে ?…হারাধনকে নিয়ে পথে পথে বেড়াতে হবে শেষে। আমরা শুধু ব্যবসাদার, আমার কথা শোনো।

সন্ধ্যাবেলা প্রতুল এসে বল্লে—টাকার কদ্দুর খুড়ীমা ?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী বল্লেন—টাকার যোগাড় তো হয়েছে। কিন্তু সকলে যে বড় ভয় দেখাচ্ছে প্রতুল !

—কোনো ভয় নেই খুড়ীমা আপনি টাকা দিয়ে দিন আমার হাতে। দেখুন দুটো মাসে আমি কি করি।

—বেশ গ্যাখো। আমি কারো কথা শুনলাম না। তুমি যা হয় কোরো। তবে তুমি কিছু মনে কোরো না, আমার ছেলে এ কাজ করতে গেলেও তাকে আমি ঠিক এমনি কথাই বলতাম। যাও, মা মনসার পুজো দেবো ভবানীচকের বাজারে। মুখ তুলে চান যদি !

—একটা ভালো দিন দেখে সত্যনারায়ণের পূজো দিন খুড়ীমা। সেদিন থেকে কাজ আরম্ভ করবো। দত্ত বুড়োকে নেমন্তন্ন করবেন।

সত্যনারায়ণের সিন্নিতে গ্রামসুদ্ধ লোকে রাম চাটুযোর বাড়ী দুখানা লুচি, নানা রকম কাটা ফল, কাঁচা সিন্নি, সন্দেশ ও রসগোল্লা খেয়ে গেল। কেউ বল্লে, গিন্নীর মন খুব ভালো। কেউ বল্লে, পরের হাতে খেলছে, এইবার পথে বসবে আর কি।

নতুন বাসের লাইন খুললো।

প্রতুল নিজে বাসে চ'ড়ে চাকদা থেকে বনগাঁ পর্য্যন্ত গেল। মুখে ভেঁপু দিয়ে একটি ছোকরা চীৎকার করতে করতে চলল—নতুন লাইন খুলেচে ! চাকদা থেকে বনগাঁ ! ভাড়া দশ আনা বেলের বাজার ! এক টাকা বনগাঁ ! দু'খানা বাস সারাদিনে যাবে ! দুবেলা ছাড়বে ! চাকদা থেকে কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দেওয়া হবে ! তরকারির ভেণ্ডারদের অত্যন্ত সুবিধে ক'রে দেওয়া হচ্ছে—!

মাত্র সাতজন হল প্রথম দিন। সপ্তাহের শেষে উঠলো বাইশ জন।

হরিপদ বল্লে—অতগুলো টাকা শেষে জলাঞ্জলি না যায়। একজন ভেণ্ডারও তো হ'ল না।

প্রতুল বল্লে—হরিপদদা, বেলের হাটের দিন আমরা আর বনগাঁ পর্য্যন্ত যাবো না। শুধু তরকারির বাজার তুলবো—এদিকে চাকদা, ওদিকে রাণাঘাট।

—রাণাঘাট গেলে পুলিশ ধরবে ও রুটের লাইসেন্স তোমার কই ?

—সে তুমি ভেবো না দাদা। তোমার বাপ-মার আশীর্বাদে চালিয়ে নেবো।

সত্যিই হরিপদ ঠিক বলেছিল। পুলিশ ধরলে, থানায় নিয়ে গেল, প্রতুলের কোনো কথা শুনলে না, কেস্ কোর্টে দেবার জন্যে তৈরি হল। ওদের দুজনকে একরাত্রি থানায় হাজতে বাস করতে হল। প্রতুল রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে বল্লে—বড্ড মশা, হরিপদদা—

—তোমার কথা শুনে এ কি নাকাল আমার ! জীবনে কখনো হাজত-বাস করি নি।

—বিনা লাইসেন্সে গাড়ী চালিয়েছি তা হাজত-বাস করতে হবে কেন ? আমরা চুরি করি নি তো।

—সে তুমি বোঝো। তুমি এত জানো, এত বোঝো, তাহলে নিশ্চয় এটাও জানো।

—কাল সকালে দেখবো।

—আমাকে ওভারটাইমের মাইনে দিতে হবে হাজত-বাসের জন্যে তা ব'লে দিচ্ছি। তোমাদের গাড়ীতে খাটতে এসেছি ব'লে চোরের মত হাজত-বাস করতে আসি নি তা ব'লে দিচ্ছি।

—নিও, দেবো। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাই আগে। মশায় খেয়ে ফেলে দিলে!

—বুদ্ধি তোমার বড্ড সরু কি না! একশোবার বলি নি?

পরদিন সকালে প্রতুল অনেক কৌশলে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এলো। খরচ বাদে নগদ চল্লিশ টাকা লাভ এই একদিনে।

সেই থেকে প্রতি হাটবারে রাণাঘাট যাতায়াত করে প্রতুল বাস নিয়ে। পুলিশের কলকাটিতে সব দিক ঠাণ্ডা আছে। ওদের হাজত-বাস আর করতে হয় না।

আর একটা গোলমাল খুব শীগগির বাধলো। সেটা খুব মারাত্মক রকমের গোলমাল।

মাস দুই পরে যখন চল্লিশ জন গড়ে যাত্রী হচ্ছে, মালপত্রও ভালো হচ্ছে—সেই সময় একদিন হরিপদ বল্লে—প্রতুলদা, এ-রাস্তায় বাস চলবে না। লজ্‌ঝড় রাস্তা, টায়ার কতবার বদলাবে? এঞ্জিন খুব ভালো তাই, আমেরিকার এঞ্জিন, কিন্তু এ ধাক্কা কতদিন সইবে? বর্ষা প'ড়ে গিয়েছে, একবার দেখে এসো একদিন।

প্রতুল একদিন নিজের চোখে দেখতে গেল। বাবাঃ, এই রাস্তার অবস্থা! ওর চোখ কপালে উঠলো আর কি। কে জানতো বর্ষার সময়ে রাস্তা এমন হবে? এখানে গর্ত্ত, ওখানে এঁকেবেঁকে চালাতে গিয়ে একদিন হরিপদ এক গাছের গায়ে গাড়িসুদ্ধ মারলে তাল। বনেট্ বেঁকে দুমড়ে গেল। কারবুরেটরের ভীষণ ক্ষতি হল। হরিপদর বাঁ হাতখানা জখম হল।

আরও মুশ্‌কিল। বোঝাই গাড়ী, সেদিন ছিল বেলের হাট, পটল ও বেগুনের বাজরা ছিল কুড়িটা। গরুর গাড়ীতে রাণাঘাট নিয়ে যাওয়ার খরচ বাইশ টাকা দিতে হল, টিকিট সব ফেরৎ দিতে হল, হরিপদকে মিশন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। সবসুদ্ধ একশো ন' টাকা লোকসান এদিকে, বনেট-ও কারবুরেটরের প্রশ্ন বাদ দিয়ে। দু'শো আড়াইশো টাকা সবসুদ্ধ।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী সব শুনে বল্লেন—আমার সময় খারাপ পড়েছে। তোমাদের কোনো দোষ নেই প্রতুল। নইলে হরিপদই বা গাছের গায়ে তাল মারতে যাবে কেন? সে তো পুরনো ড্রাইভার। রাস্তা খারাপ, আগে দেখনি কেন?

—তখন এমন ছিল না সত্যি বলছি খুড়ীমা। বর্ষার আগে বুঝতেই পারিনি।

—কি করবে এখন? ও রাস্তায় আর গাড়ী চালিও না। গাড়ী দু'খানা ভাঙলে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে।

—লাইসেন্স নেওয়া রুট বন্ধ করা ঠিক হবে খুড়ীমা? বেশ প্যাসেঞ্জার হ'তে শুরু হয়েচে। এখন যদি ছেড়ে দিই—

—কি করবে তবে ?

—আমাকে আরো দু'হাজার টাকা দিতে হবে খুড়ীমা।

—সে কি কথা বাবা ?

—হ্যাঁ, আমাকে দিতেই হবে। আমার মতলব শুনুন। ও রাস্তা আমি মোটর কোম্পানীর পক্ষ থেকে তৈরী করে নেবো। দু'হাজার আমরা দেবো, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আর রোড বোর্ড থেকে কিছু বার করবো। বাস ও-রাস্তাতে চালাবোই।

—তা তো বুঝলাম, টাকা দেবো কোথা থেকে ?

—তাও আমি ভেবেছি। অন্য লাইনের বাস মর্টগেজ রাখতে হবে। তাহলে টাকা সবাই দেবে। নয় তো রুট সার্ভিস মর্টগেজ করা যেতে পারে—যতদিন দেনা শোধ না হয়, তাদের নিজের লোক থাকবে আমাদের গাড়ীতে ব'সে। ক্যাশ নেবে নিজের হাতে। তারও লোক আছে—আপনার হুকুম পেলেই আনি।

—যা ভালো বোঝো করো বাবা, তবে দেখো, হারাধন তোমার ছোট ভাই, সে যেন পথে না বসে।

এত সহজে কিন্তু কাজ মেটে নি।

এই কথা কি ভাবে গাঁয়ের মধ্যে প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে রাম চাটুয্যের স্ত্রীর কাছে বড় বড় বাড়ী থেকে মেয়ে, গিন্নি, কর্ত্তারা উপদেশ দিতে আসতে যেতে লাগলেন ! কানাই দত্ত বল্লে—চোখের ওপর এ কি সর্ব্বনাশ করছো বৌদিদি ? ছেলেটা তো পথে বসেছে, আর বাকি কি আছে ? আমার কথা শোনো, ও ছোঁড়াটাকে দাও হাঁকিয়ে বিদায় ক'রে। তুমি না পারো আমি দিচ্ছি।

অনেক কিছু ব্যাপার হয়ে গেল। অনেক কথা কাটাকাটি, এমন কি ঝগড়া পর্য্যন্ত। তবুও প্রতুল দমল না। হারাধনকে ডেকে বল্লে, তোমার মাকে বোঝাও হারাধন। তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি বুঝবে। মেয়েছেলেকে বোঝানো এক মস্ত দায়, রাস্তা বানাতেই হবে আমাদের।

মাসখানেক চাকদা-বনগাঁ সার্ভিস একদম বন্ধ রইল এই সব নানা গোলমালে। শেষ পর্য্যন্ত প্রতুল জিতে গেল। দু' হাজার টাকা তার হাতে তুলে দিলেন রাম চাটুয্যের স্ত্রী। চোখের জল দু'ফোঁটা পড়লো টাকা দেবার সময়।

প্রতুল রোড-বোর্ডের দু'একজন হোমরা-চোমরার কাছে চিঠি নিয়ে গিয়ে তাঁদের ধরলে। তাঁরা বললেন—ও রাস্তা মার্চ থেকে পি. ডব্লউ. ডি-র হাতে যাবে। তারাই দেবে। আমাদের কি স্বার্থ আছে ওতে ? জেলা বোর্ডও সেই উত্তর দিল। নদীয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে খুব বেশি ক'রে ধরতে তিনি বল্লেন—তুমি একলা মুভ করলে কিছু হবে না। ঐ অঞ্চলের স্কুলের ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং সাধারণ অধিবাসীদের সইওয়ালা এক দরখাস্ত দাও বোর্ডে। দেখি কি করতে পারি।

অনেক জল বেড়াবেড়ির পরে মাস-খানেক ধ'রে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে নদীয়া

জেলা বোর্ড তাদের সীমানার মধ্যের রাস্তাটুকু মেরামত ক'রে দিতে রাজী হ'ল। তাও ঠিক হল, নারানপুর ও আকাইপুর হাই স্কুলের ছেলেদের অর্দ্ধেক ভাড়ায় যাতায়াত করতে দিতে হবে। চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ড কিছুতেই রাজী হ'ল না, অত বড় জায়গায় গিয়ে ধরাধরি করতে পারলেও না প্রতুল। রাম চাটুয্যের স্ত্রী বল্লে—লাইন তো বন্ধ রাখলে, রাস্তার কতদূর হল?

—যেখানে খুব খারাপ, সেখানে হয়ে গিয়েছে। চব্বিশ পরগণা না ক'রে দিলেও চ'লে যাবে একরকম। কিন্তু একটা কথা—

—কি?

প্রতুল মাথা চুলকে বল্লে—আর পাঁচশো টাকা দিতে হবে। আপনার পায়ে পড়ি খুড়িমা, আমাকে ভুল বুঝবেন না। টাকার দরকার হয়েছে কেন, বলি শুনুন। বেলের হাটের সামনে ব্যাপারীদের জিনিস রাখবার জন্যে একটা টিনের চালা তৈরী না ক'রে দিলে ওদের বড় অসুবিধে হচ্ছে। যদি আমাদের তৈরী টিনের চালাতে বসে, তবে আমাদের গাড়ীতেই যেতে হবে। তরকারির বাজরাতেই তো পয়সা। এ-বাদে একটা সাঁকো সারাতে হবে। তাতেও শ'খানেক টাকা খরচ হবে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী খয়ে-বন্ধনে পড়েছেন বিবেচনা করলেন।

এ টাকা না দিলেও চলবে না, আগের টাকাগুলো জলাঞ্জলি যায় তাহলে। দিতেই হবে। এ কি মুশ্‌কিলের কথা, প্রতুল কেবলই বলে টাকা দাও। ওকে এনে কি শেষ পর্য্যন্ত ভুল ক'রেই বসলেন? কানাই দত্ত কি তাহলে ঠিক কথাই বলেছিল?

শেষ পর্য্যন্ত টাকা দিতে হল রাম চাটুয্যের স্ত্রীকে। বড় কষ্টেই এ টাকা দিলেন তিনি। সোনাদানা ঘরে আর এক কুঁচোও রইল না।

দু'মাস ধ'রে বহু চেষ্টার পরে লাইন খুললো। অনেক দিন ধ'রে বিজ্ঞাপনের ফলে লোক জানাজানি হয়েছিল বেশ, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর ভিড় হ'তে লাগলো। হাটের চালা ক'রে দেওয়ার ফলে তরকারির ব্যাপারীদের এই বর্ষাকালে খুব. সুবিধে হয়েছে। তারা সবাই বাসের খদ্দের হয়ে উঠলো।

সকাল বেলা। রাম চাটুয্যের স্ত্রী স্নান করে উঠে আহ্নিকে বসবেন এমন সময়ে প্রতুল এসে দাঁড়ালো সামনে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রীর বুক কেঁপে উঠলো। আবার বুঝি টাকা চায়!

প্রতুল পকেট থেকে একশো টাকার নোট বার ক'রে ওঁর পায়ের কাছে রেখে বল্লে—এই নিন্। কাল প্রথম দিন লাইন খুলেছি। দিনের ক্যাশ।

—এক দিনের?

—আরও বাড়বে। সামনের মাস থেকে বোধ হয় দেড়শো টাকা ক'রে দিতে পারবো। হাটের ব্যাপারীদের খুব ভিড় হচ্ছে। সামনের বছরে আর একখানা বাস কিনতে হবে টাকা

দেবেন—তাহলে দিন দু'শো টাকা বাঁধা রইলো। হারাধনকে মোটর এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে দিতে হবে খুড়ীমা। আমাদের আপিসের কর্ত্তা হ'তে হলে মোটর এঞ্জিনিয়ার হ'তে হবে।

আমরা এক বৎসর পরের কথা বলছি। গত চৈত্র মাসে একবার আমরা রাম চাটুয্যের নতুন-কাটা পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। ৺রাম চাটুয্যের নামে তাঁর স্ত্রী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেছেন, গ্রামে জলের কষ্ট ছিল খুবই। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে যে একটা নতুন বাড়ী খানিকটা উঠে বন্ধ আছে সিমেন্টের অভাবে—রাম চাটুয্যের নতুন বাড়ী সেটা, প্রতুল ও হারাধন অনেক খাটছে বাড়ীটার পেছনে।

প্রতুলকে আমি কখনো দেখি নি। ওর সমস্ত গল্পটাই আমি শুনেছি স্থানীয় লোকদের কাছে। আজকালকার এই অসাধুতার যুগে প্রতুলের কাহিনী আমার খুব ভালো লেগেছিল, অদূর ভবিষ্যতে একবার আলাপ করবার ইচ্ছে আছে ওর সঙ্গে।

অভিমানী

কাশী থেকে মোগলসরাই এলাম একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায়।

এর ছ'মাস আগে আমি মুঙ্গেরের পিসিমার বাড়ী থেকে কাশী আসি এমনি নিঃসম্বলে। মুঙ্গেরে পিসিমার বাড়ীও এসেছিলাম নিঃসম্বলে নিজের দেশ যশোর জেলার এক অজ পাড়াগাঁ থেকে। উদ্দেশ্য, চাকরি খোঁজা। মুঙ্গেরে পিসেমশায় ও পিসতুতো ভাইয়েরা আশা দিয়েছিল চাকরি জুটিয়ে দেবে। তারা তা পারে নি কিংবা করে নি। পিসিমা কেবলই স্তোকবাক্য দিতেন, থাকো না বাপু দু'দিন। দেশ থেকে এয়েচ, জলে তো আর পড়ে নেই তুমি। এমন কিছু নয় যে ঘরে তোমার ছেলেমেয়ে কাঁদচে। বলে, আপনি আর কপ্‌নি। কিসের ভয় তোমার, একটা পেটের জন্যে? না চাকরি জোটে, পিসিমার কুঁড়েতে দুদিন রইলেই বা।

একথা আমার ভাল লাগলো না। কেনই বা আমি পরের বাড়ীতে বরাবর থাকতে আর খেতে যাবো? তা হবে না। চাকরি না পাই, চলে যাবো এখান থেকে। চাকরি যদি না করবো, তবে দেশে কাকার সংসারে থাকলেই তো হত! কিছুতেই যখন কিছু হল না, তখন একদিন কাউকে না বলে মুঙ্গের থেকে রওনা দিলাম। কাশী এসে অবিশ্যি পত্র দিয়েছিলাম পিসিমাকে, আমি কাশী চলে এসেচি এবং ভালই আছি, তিনি না ভাবেন।

কাশীতে এই ছ'মাস থেকেও কিছু জোটাতে পারি নি। ছত্রে ছত্রে খেয়ে বেড়িয়েছি, যাত্রীদের মুটেগিরি করেচি, কখনো বা হোটেলে বাসন মাজার কাজ করেচি—কিন্তু স্থায়ী চাকরী কিছুই জোটাতে পারি নি। এখন এমন দশায় এসে পড়েচি যে আর কাশী থেকে

কোন লাভ নেই, খেতে পাবো না।

আজ সকালে কাশী থেকে হেঁটে এসেচি মোগলসরাই।

বাংলাদেশেই ফিরবো। সকালে একমুঠো ছাতুর দলা খেয়ে পেট-ভরে জল খেয়েছিলাম। সন্ধ্যের সময় ডাউন পার্সেল এক্সপ্রেসে উঠবো ঠিক করে বসে আছি—অনেকে বল্লে ও ট্রেনে নাকি ভিড় কম হয়। আগে চার পাঁচখানা ট্রেনে ভিড়ের জন্যে উঠতে প্যারিনি। ভুল করে একখানা মিলিটারি স্পেশালে উঠে বসেছিলাম, হাত ধরে জোর করে নামিয়ে দিয়েচে। তখন বেলা আড়াইটে।

বেজায় খিদে পেয়েচে। সন্ধ্যের বেশি দেরি নেই। আমি প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে বসে আছি। আমার কাছেই প্ল্যাটফর্মের নীচে কয়েকজন পশ্চিমা লোক আটা মাখচে ও ডাল বাছচে।

ওদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক, রোগা, কালো, মাথায় একটা ময়লা নেকড়ার পাগড়ী জড়ানো—হিন্দিতে আমায় জিগ্যেস করলে, কোথায় যাবে ?

—বাংলাদেশে।

—মকান ?

—ওই বাংলাদেশেই।

—কোথায় এসেছিলে ?

আমি সংক্ষেপে ওদের কাছে আমার কাহিনী সব বললুম।

ওদের মধ্যে আর একজন ছোকরামত লোক বল্লে, কিছু খাও নি সারাদিন ?

—ছাতু খেয়েছি ওবেলা।

—এবেলা কি খাবে ? হাতে পয়সা আছে কিছু ?

—না।

ওদের মধ্যে কি কথার বিনিময় হল। একজন দল ছেড়ে উঠে কোথায় গেল, মিনিট পনেরো পরে ফিরে এসে বল্লে, "বন্ হো গৈল বা।"

ওরা সকলে মিলে আমার মুখের দিকে চাইলে। কি বন্ধ হয়ে গেল, কি ব্যাপার, ওদের জিগ্যেস করলাম। যে লোকটি উঠে গিয়েছিল সে বল্লে, এখানে ছত্র আছে, মুসাফিরদের জন্যে আধসের আটা আর আধপোয়া ডাল সেখান থেকে দেয়। তোমার জন্যে আনতে গিয়েছিলাম। তা বন্ধ হয়ে গিয়েচে।

সেই পাগড়ী-বাঁধা লোকটি বল্লে, গিয়েচে গিয়েচে। তুমি আমাদের এই খাবার থেকে খেয়ো এখন।

আমি বল্লাম, না না, তা হয় না! তোমরা খাও, তোমাদের খাবারে আমি ভাগ বসাবো কেন ?

ওরা সকলে একযোগে আপত্তি করলে। রামজীর লীলা, তিনিই আমাকে ওদের সঙ্গে পরিচিত করিয়েচেন। তারা যদি না দিয়ে যায়, তবে ধর্ম্ম থাকবে কোথায় ?

আমার আপত্তির পেছনে যে খুব জোর ছিল, তাও নয়। ওরা হাতে চাপড়ে মোটা মোটা চাপাটি তৈরী করলে এবং একটা মাটির ভাঁড়ে কাঠ-কয়লার টিমে আঁচে অড়রের ডাল চাপিয়ে দিলে। আধ-ঘণ্টা পরে রান্না নামিয়ে আমায় দু'খানা চাপাটি এবং সেই চাপাটিরই ওপর খানিকটা অড়রের ডাল ঢেলে দিয়ে বল্লে, খা লিজিয়ে।

ওদের মধ্যে একজন বল্লে, জুঠা মাৎ কিজিয়ে, ঠাহরিয়ে থোড়া। এক গো নিম্‌কি লিজিয়ে।

নিম্‌কি অর্থাৎ একখণ্ড লেবুর আচার আমার চাপাটির এককোণে ফেলে দিলে ওপর থেকে, পাছে এঁটো করে থাকি এই ভয়ে।

সবাই একসঙ্গে ভোজন আরম্ভ করা গেল। ওদের ভদ্রতায় মুগ্ধ হলাম। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, জাত নয়, জ্ঞাতি নয়, আমার জন্যে কি মাথাব্যথা? মানুষের মধ্যেই দেবতা বাস করেন, এ সেদিনও বুঝলাম, এর আগে কাশীতে নিঃসম্বল অবস্থাতেও কয়েকবার বুঝেছিলাম।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ওদের মধ্যে একজন বল্লে, বাবুজি, আপ যায়গা হামলোককো সাথ?

—কোথায় যাবো?

—জিলা চম্পারন, থানা রামনগর, গাঁও মনিয়ারি।

—সেখানে গিয়ে কি করবো?

—তোমাকে আমরা থাকতে দেবো, খেতে দেবো, তুমি বাঙালী বাবু, আমাদের ছেলেদের ইংরিজি পড়াবে।

—বেশ, যাবো। মনে ভাবলুম আমার আবার কি, যেখানে ভাত জোটে সেইখানেই আমার বাড়ীঘর।

ওদের গাড়ী এল, আবার কাশীর দিকে যেতে হল। কাশী থেকে গোরখপুর, সেখান থেকে খেয়ায় গণ্ডকী নদী পার হয়ে ও-টি রেলওয়ের গাড়ীতে উঠে পরদিন রাত ন'টায় নামলাম নারকাটিয়াগঞ্জ। সেখান থেকে আবার ব্রাঞ্চ লাইন গেল রামনগর। রামনগর থেকে হাঁটা-পথে ওদের গ্রাম মনিয়ারি প্রায় বারো মাইল, মধ্যে সেচ বিভাগের খাল পার হতে হয় দু'বার।

দিন-তিনেক লাগলো সবসুদ্ধ। কিন্তু এখানে এসে বেশ লাগলো। বড় সুন্দর জায়গা। আমি যখন ওদের গ্রামে পৌছেচি, তখন বেলা তিনটে। দূরে একটা সাদামত জিনিস পাহাড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। আমি মনিয়ারি ক্যানাল পার হবার সময় থেকে পর্য্যন্ত চেয়ে দেখচি।

বল্লাম, কি ওটা?

ওটা বল্লে, বর্ফ। ও হিমালয় গিরি না হ্যায়? হিমালয়মে যো বর্ফ্ গিরতা হ্যায়—

ঐ বরফাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য? কখনো দেখি নি। অমন দেখায় নাকি? কি অদ্ভুত!

কি সুন্দর! এদেশে আমি না খেয়েও পড়ে থাকবো।

দিন দুই কাটলো। ওদের মধ্যে পাগড়ীপরা আধাবয়সী লোকটির নাম মধোলাল। অতি ভদ্রলোক, অবস্থাও বেশ ভালো। পাড়াগাঁ অঞ্চলের বড় চাষী গৃহস্থ। পঁচিশ ছাব্বিশটা দুগ্ধবতী গরু বাড়ীতে, দুধ দেয় প্রায় এক মণ। ধান ও গম যথেষ্ট।

মাধোলালের বাড়ীতে ওর মেয়ে রাখনি আমাকে বড় যত্ন করে। কেমন সুন্দর মেয়ে, আর কি শান্ত মুখশ্রী। এদেশের সকলের মুখেই সারল্য ও নিষ্কলুষতার ছাপ। স্থানটি সভ্য জগৎ থেকে অনেক দূরে, হিমালয়ের পাদপ্রান্তে অরণ্যভূমির প্রান্তদেশে। মাছ মাংস ডিম খুব মেলে। তবে এখানে মাছ বা মাংস সাধারণ লোক খায় না। দুধ ঘি প্রচুর—আগের চেয়ে এখানে এখন আক্রা হয়ে গেলেও অন্যদেশের তুলনায় যথেষ্ট সস্তা।

এখানে এসে যেন একটা অদ্ভুত মায়ারাজ্যে এসেছি বলে মনে হল। যেমন সকালের রোদে তেমনি বিকালের রাঙা সূর্য্যালোকে দূরের তুষারাবৃত হিমালয় কি অদ্ভুত দেখায়! আমি গ্রাম থেকে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বনের ধারে পাহাড়ী নদী কুসমাইয়ের ধারে শিলাখণ্ডে বসে থাকি। নদীটার ভাল নাম কি কুসুমবতী? এ যদি হয়, তবে ওর নাম সার্থক বটে। কত কি পুষ্পিত বন্যলতা ও গাছ যে ঝুঁকে পড়েছে কাঁচ-স্বচ্ছ জলের ওপর। যেখানে সেখানে শিলাখণ্ড ছড়ানো, যেখানে খুশি বসে থাকো। খুব বড় শিলাখণ্ড আছে, যার ওপরে আট দশ জন লোক স্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারে। সেখানে ছায়ায় বসতাম আপন মনে। ঘন জঙ্গল ও দূরের তুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গের দিকে চেয়ে কত কি ভাবতাম নির্জ্জনে।

খেতে পেতাম না কাশীতে। তার আগেও কাকার সংসারে কি হেনস্থা, কি লাঞ্ছনা না গিয়েচে। হাতে পয়সা না থাকলে সবাই নীচুচোখে দেখে। এখানে এসে আনন্দ পেয়েচি, শান্তি পেয়েচি। মাধোলাল আমায় ছেলের মত যত্ন করে, আমি ওকে কাকা বলে ডাকি। এ কাকা আর আপন কাকার কি তফাৎ তাই ভাবি। দু-চারটি ছেলে-মেয়েকে ইংরিজি পড়াই। সারা গ্রামে মুন্সী চমনলাল আর আমি, এই দুটি মহাজ্ঞানী পণ্ডিতব্যক্তি বিদ্যমান। বাকী যারা, তারা কায়ক্লেশে নাম সই করতে পারে।

রাখনি সন্ধ্যায় বলে, বাঙালী বাবু, আমি আজ তোমার জন্যে ভাওরা পাকাবো। খাবে তো?

—সে কি?

—ভাওরার নাম শোনো নি?

রাখনি খুব অবাক হয়ে যায়। এ আবার কোন দেশের লোক, যে ভাওরার নাম শোনে নি! সে হাত নেড়ে দেখিয়ে বল্লে, আটার হয়, এমনি গোল গোল। ঘুঁটের আগুনে পোড়াতে হয়। ঘি জবজবে, আলুর চোখা দিয়ে খেতে হয়।

—আলু ভাতে দিয়ে ভাল লাগে?

—খুব। খেয়ে দেখো। আর বাঙালী বাবু—

—কি

—তুমি বাপজীকে বলো, তোমার কাছে আমি আংরেজি পড়বো।

—আজই বলবো।

তারপর রাখনি আমার সঙ্গে বসে গল্প করে। বাঙালী বাবু, এখানে থাকো, কোথাও যেতে দেবো না। মাঠা খাওয়াবো, ছাতুর লাড্ডু খাওয়াবো, মালাইমিঠা খাওয়াবো।

—তা না হয় খেলাম, কিন্তু মাছ? মাছ না খেলে বাঙালীর শরীর টিকবে কত দিন?

রাখনি খিল খিল করে হেসে ওঠে। ঝক্ ঝক্ করে ওর মুক্তোর মত দাঁতগুলি—চৌদ্দ পনেরো বছরের সুশ্রী মেয়ের মুখের প্রাণখোলা হাসি।

বলে, মছলি কত আছে কুস্‌মাইয়ে, পাটনডণ্ডীর নহরে মাছ ধরতে যাবে?

—সে গবর্ণমেণ্টের খাল। সেখানে ওদের লোক বসে আছে। মাছ ধরতে দেবে কেন?

—আমি ধরবো। তোমাকে ধরে দেবো। মেয়েমানুষকে নহরের চৌকিদার কিছু বলবে না।

এবার আমি হেসে ফেলি। বল্লাম, গবর্ণমেণ্টের চৌকিদার মেয়ে পুরুষ বাছবে না রাখনি। চুরি যে করে তার আবার মেয়ে-পুরুষ। দুজনেই খুব হাসি। আমোদ লেগেচে দুজনেরই।

রাখনি এত ভালো মেয়ে, তার আপন-পর জ্ঞান ছিল না। আমি ওদের বাড়ীতে কেউ না, অন্নদাস বলা যেতে পারে, রাখনি কিন্তু আমাকে বড় আপনার জন ভাবতো। তার সর্ব্বদা চেষ্টা ছিল যাতে আমি অভুক্ত না থাকি, খেয়ে আমার পেট ভরে। এজন্যে তার কত যত্ন, কত অসম্ভব হাস্যকর প্রয়াস।

আমি বলতাম, রাখনি, আমি বিদেশী লোক। আজ এয়েচি কাল চলে যাবো। তুমি আমাকে অত ভালোবাসো কেন? আমি চলে গেলে কষ্ট পাবে।

রাখনি বলতো, ইস্। চলে যাবে বইকি!

—তবে কি?

—বিয়ে করবো তোমাকে। দুজনে বাস করবো আমাদের বাড়ীর পাশে।

—চলবে কিসে?

—বাবার কাছ থেকে জমি চেয়ে নেবো। তুমি জমি চাষ করবে।

ওইটুকু মেয়ের কি বুদ্ধি। আমার এমনি হাসি পেতো। এর মধ্যে সব ঠিকঠাক করে বসেচে। রাখনিকে আমারও বড্ড ভাল লাগতো। ওর স্নেহ-যত্ন ভোলবার নয়। অবিশ্যি ওর বাবাও খুব ভালো, একদিনের জন্যেও আমার প্রতি তাঁর অযত্ন দেখি নি।

আমি ওখানে মাস ছয়েক থাকবার পরেই এক ঘটনা ঘটলো।

একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে এসে দেখি বাড়ীর সকলের ব্যস্ত চঞ্চল ভাব, মুখ গম্ভীর। শোনা গেল মাধোলালের স্ত্রীর প্লেগ হয়েচে। প্লেগকে ওখানকার লোক বড্ড ভয় করে। বাড়ীতে লোকজন আসা বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামের চৌকিদার এগারো মাইল দূরবর্ত্তী থানায়

খবর দিতে ছুটলো। পরদিন সন্ধ্যায় মাধোলালের স্ত্রী মারা গেল, মাধোলালকে ধরলো প্লেগে। তৃতীয় দিনে মাধোলালও মারা গেল। একই সঙ্গে মাধোলালের এক বৃদ্ধা পিসিও দেহ রাখলেন। ছ'সাত দিনের মধ্যে মাধোলালের বাড়ীর সকলেই কাবার হলো—রাখনি বাদে। প্লেগ তখন আশেপাশের দু একটি বাড়ীতেও ধরেছে। ইতিমধ্যে একদিন ডাক্তার এসে সকলকে প্লেগের টিকেও দিয়ে গেল।

বেঁচে গেলাম আমি ও রাখনি। আধমরা অবস্থায় বাঁচা। আমার তখন কোনো জ্ঞান-চৈতন্য নেই এমন অবস্থা। এমন দুর্দ্দিনের মুখ কখনও দেখিনি, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েচি। মৃত্যুর সে কি করুণ দৃশ্য দেখেচি চোখের সামনে! রাখনিকে নিয়ে আরও মুশকিল—তাকে সান্ত্বনা দেব কি, নিজের চোখের জল থামে না।

যখন সব মিটে শেষ হয়ে গেল, প্লেগ থামলো, তখন ওদের বাড়ীতে আমি আর রাখনি আর ভক্তদাস বলে ওদের এক পুরনো চাকর—এই তিনজনে টিম্ টিম্ করচি।

কয়েকদিন কেটে গেল। সরকারী লোকেরা এসে ঘরদোর ধুয়ে ধোঁয়া দিয়ে ওষুধ ছড়িয়ে দিয়ে পুরনো কাপড়চোপড় পুড়িয়ে দিয়ে গেল। আমার আর ভাল লাগচে না, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তাম, কিন্তু রাখনিকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাই—এই হয়েচে মহাসমস্যা।

এ আবার কি বিষম বন্ধনে ভগবান আমায় জড়ালেন তাই ভাবি। বেশ ছিলাম স্বাধীন, খাই না খাই কোনো বন্ধন বা দায়িত্ব ছিল না।

গ্রামের লোক বলে, তুমি রাখনিকে বিয়ে করে ওদের বাড়ী থাকো। অবস্থা ওদের সত্যিই ভালো। যথেষ্ট জমিজমা, গরুবাছুর, গোলাভরা ধান, গম, যব, সর্ষে। এ সবের মালিক হয়ে থাকা বড় কম কথা নয়। ভেবে ছাখো বাংগালী বাবু, এ বড় চাট্টিখানি কথা নয় আজকার দিনে।

রাখনি? তার কথা কি বলবো। সে তো আমাকে বেশ ভালোবাসে। দিনরাত কান্নাকাটি করে, আমি তাকে বোঝাই, সান্ত্বনা দিই।

একদিন রাত্রে হল কি, সেই কুসুমবতী নদীর ধারে বসে আছি, রাত বেশী নয়—সবে সন্ধ্যা উৎরেছে, ঘুলি-ঘুলি অন্ধকার ঘন গাছের তলায়—এমন সময় রাখনি সেখানে এসে পেছন থেকে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালো।

চমকে উঠে বল্লাম, কে রে? ও। তুমি! এমন করে আসতে হয়? ভয় করে না আমার?

—ভয় কিসের?

—ভূতের।

—তুমি তো ভূত মানো না বাবুজি—

—মানি নে, আবার ভূত না মানলেও ভয় করে এই অন্ধকার রাত্রে। বসো রাখ্নি, একটা কথা।

ও-বসলো আমারই পাশে। বসে বল্লে, কি ?

—আমি ভাবচি, এখান থেকে চলে যাবো। অনেকদিন হল এসেচি।

—যাবে ? আর আমি ? আমাদের বাড়ীঘর ?

—ভক্তদাস তো রইল। ও তোমার দেখাশুনো করবে। আমিও মাঝে মাঝে সময় পেলে এসে দেখে যাবো।

—আমি যাবো তোমার সঙ্গে—

—কোথায় যাবে ? তা ছাড়া—ঘরবাড়ী, গরুবাছুর, গোলা, জমিজমা, এসব কি হবে ?

—ওসব ভক্তদাস নিক্। আমার ওতে দরকার নেই। সত্যি বলচি বাবুজি। কি হবে গরুবাছুর আর ঘরদোরে ? তুমি যাকে হয় বিলিয়ে দিয়ে যাও। আমি এখানে থাকবো না—আমার ভাল লাগবে না—

কথা শেষ করে ও মিনতির স্বরে আমার হাত দুটি ধরে বল্লে—আমায় ফেলে কোথাও যেও না বাবুজি! বলো, যাবে না ? আর যদি যাও আমায় নিয়ে যাবে ? এখানে থাকবো কার কাছে তা বলো ?

—কেন, ভক্তদাস ?

—না, আমি থাকবো না। ভক্তদাস মরে গেলে তখন কার কাছে থাকবো ?

—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখন।

—না, ব্যবস্থাতে দরকার নেই বাবুজি! আমি তোমার সঙ্গে যাবোই।

আমি পড়ে গেলাম মহা ফাঁপরে ওর কথা শুনে। এতক্ষণ নির্জ্জনে বসে এই কথাই কিন্তু আমি ভাবছিলাম। রাখনিকে নিয়ে কি করি এই হয়েচে আজকাল আমার বড় ভাবনার কথা। আমি চুপ করে আছি দেখে রাখনি বল্লে, শুনবে বাবুজি আমার একটা কথা ?

—কি ?

—আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। আমাকে শাদি করতে হবে না তোমাকে। চলো তুমি আর আমি কোথাও গিয়ে ভগবানের নাম করি। কি হবে এখানে থেকে ? ভালো লাগে না।

আমি ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চাইলাম। পনেরো বছরের মেয়ের মুখে এ কথা সত্যিই আশ্চর্য্য। রাখনি এই বয়সে সংসার-বিরাগিণী হয়ে উঠলো কি ভাবে!

আমি বল্লাম—সত্যি ? যাবে ?

ও জোর করে বল্লে—নিশ্চয়ই যাবো। নিয়ে চলো আমাকে। এখানকার বিষয়-আশয় বিলিয়ে দাও কাউকে, নয়তো ভক্তদাসকে দাও, ও থাকুক এ বাড়ীতে। ভগবানের নাম করিগে চলো।

গেলাম একদিন সত্যিই ওকে নিয়ে চলে। এলাম গণ্ডক নদী পার হয়ে, গোরখপুর হয়ে, কাশী। সঙ্গে ছিল প্রায় চার পাঁচশো টাকা আর রাখনির মায়ের অনেক সোনার গহনা। কাশী থেকে গেলাম হরিদ্বার। এদিকে তখন আমার মনে ভয় হয়েচে নাবালিকা মেয়েকে

নিয়ে চলে এসেচি—পুলিশে হয়তো উৎপাত করতে পারে।

এক ধর্ম্মশালায় উঠে দিন-তিনেক থেকেই রাখনিকে নিয়ে কনখলে গেলাম। এক পাণ্ডার বাড়ী ওকে রাখলাম। রাখনি বলে, তোমার কাছে থাকবো, এখানে কেন? তুমি জায়গা ঠিক কর। আমরা দুজনে সেখানে থেকে ভগবানের নাম করবো।

দিন দিন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করতে লাগলাম। হরিদ্বারে এসে পর্য্যন্ত ভগবানের পথে যাবার জন্যে ওর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগলো।

এক বাঙালী সাধুর সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল গঙ্গার ধারের ঘাটে। তাঁর নাম স্বামী বাসুদেবানন্দ। তার আশ্রমেও আমরা গেলাম। কনখলে গঙ্গার ধারে একটা পুরনো দোতলা বাড়ীতে তিনি থাকেন। স্থানটি নির্জ্জন, বাঁধানো ঘাট পুরনো বাড়ীর নিচেই, পুরনো মন্দির ঘাটের ওপরই। কিভাবে আলাপ হল তা বলি।

আমরা সেই পুরনো ভাঙা ঘাটে গিয়ে বসেছিলাম। সন্ধ্যেবেলা। ওপারে কি একটা পাহাড়, পরে নাম শুনেছিলাম চণ্ডীর পাহাড়। রাখনির বেশ গলা, ও গুন গুন করে ওর বাবার মুখে শেখা একটা রামজীর ভজন ধরলে। দেখি ওর চোখ ছলছল করচে।

বল্লাম—রাখনি, আর একটু জোরে গাও, বেশ লাগচে—

—না, গাইবো না।

—মার খাবে জোরে না গাইলে।

দুজনেই হেসে উঠি।

সত্যি, কি সুন্দর কেটেচে এই হরিদ্বারের গঙ্গার ধারের দিনগুলি মনে মনে তাই ভাবি। কি সুন্দর সন্ধ্যা, কি চমৎকার জ্যোৎস্নার আলো গঙ্গার নীলধারার ওপর।

আমরা বসে আছি, এমন সময়ে ঘাটের ওপরের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমরা ঘাট থেকে উঠে আরতি দেখতে গেলাম। সুন্দর কৃষ্ণমূর্ত্তি। আরতির পরে বৃদ্ধ পূজারী আমাদের হাতে প্রসাদের বাতাসা বিতরণ করলেন। স্বজাতীয় চেহারা দেখে মনে হল তিনি বাঙালী। দেখলেই ভক্তি হয়। রাখনি বল্লে, জিগ্যেস করো না উনি কি এ মন্দিরে থাকেন?

আমি বিনীত ভাবে বল্লাম—আচ্ছা, আপনি কি বাঙালী?

তিনি হেসে বল্লেন, হ্যাঁ। তুমিও তো বাঙালী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোথায় উঠেচ এখানে?

—এক পাণ্ডার বাড়ী।

আমি তাঁকে রাখনির বিবরণ সব খুলে বল্লাম। রাখনিও ছলছল চোখে দেহাতি-হিন্দিতে তার মনের কথা খুলে বল্লে। আমরা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। তাঁর আশ্রমে আমাদের স্থান দিলেন।

রাখনি কি খুশি! সাত দিনের মধ্যে সে সাধিকা সন্ন্যাসিনী ব'নে গেল, পনেরো বছরের মেয়ে!

কি তার ভজনগানে নিষ্ঠা! মন্দির-মার্জ্জনা করতে লাগলো যেন প্রাণ ঢেলে দিয়ে। বিগ্রহের পূজোর সমস্ত আয়োজন, ফুল তোলা, পূজোর বাসন ধোয়া মাজা, ধূপধুনো দেওয়া—সব ও করবে কি একাগ্র মনে, কি ভক্তির সঙ্গে! এখানে এসে ও ভাবতে লাগলো যেন নিজের স্থানটিতে এসে পৌঁছেচে এতদিনে।

বাসুদেবানন্দ সন্ধ্যাবেলা ওর মুখে হিন্দি ভজন শুনে বড় খুশি। একটি না দুটি মাত্র ভজন সে জানে, তার বাবার মুখে শোনা। তার মধ্যে একটা হল তুলসীদাসের ঃ

"পঙ্গু চঢ়ে গিরি'পর গহন মূক করে বাচাল"

বাসুদেবানন্দ ওর পিঠ সস্নেহে চাপড়ে বলতেন—পাগলি, আর জন্মে তুই ব্রজের গোপী ছিলি। এই বয়সে এত কৃষ্ণভক্তি এল কোথা থেকে তাই ভাবি।

তার ফুলের মত পবিত্র বালিকামনটি সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে এতটুকু ভক্তির আলো পাবার জন্যে। মন্দিরের বিগ্রহের অমন প্রাণঢালা সেবা দেখে স্বামীজি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। রাখনির চেহারা দিনে দিনে বদলাচ্চে। সে যেন ওই মন্দিরে চিহ্নিত দেবদাসী কত-কাল থেকে।

রাখনি আর আমার সঙ্গে কথা বলে না। দিন দিন সে মন্দিরের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্চে। ও দূরে সরে যাচ্চে ক্রমশই আমার কাছ থেকে।

একদিন ওকে বলি, রাখনি, আমি ভাবচি এখান থেকে চলে যাবো।

ভেবেছিলুম, ও বোধ হয় বলবে, আমাকেও নিয়ে চলো।

কিন্তু ও নির্ব্বিকার ভাবে বল্লে—কবে?

—দু একদিনের মধ্যেই।

—আবার কবে আসবে?

—দেখি।

এতেও ও কিছু বল্লে না। রাখনির মন অন্যদিকে চলে গিয়েচে। আমায় আর ও চায় না। বড় দুঃখ হল মনে। মনে পড়ল কুসুমবতীর তীরে সেই সব সন্ধ্যার কথা। কি মধুর হয়েই আছে সেগুলির স্মৃতি মনের কোণে। কতদূরে চলে গিয়েচে সে-সব দিন। আর কোনোদিন ফিরবে না। বেশ বুঝতে পারি আর ফিরবে না।

এক এক সময় ভাবি, ভুল আমিই করেচি। রাখনিকে বিয়ে করে ওদের গ্রামেই বাস করতে পারতাম। সকলেই বলেছিল, রাখনিও বলেছিল। কারো কথা শুনি নি।

একদিন কাউকে কিছু না বলে কনখল থেকে রওনা হলাম। আজ সাত আট মাস হয়ে গেল, আর যাই নি, চিঠিপত্রও দিই নি।

যাবোও না।

আশা করি রাখনি সুখী হয়েচে।

তবুও ভুলতে পারিনে কুসমাইয়ের ধারের সেই অপূর্ব্ব সন্ধ্যাগুলি। রাখনি আমার হাত ধরে বলেছিল, কোথায় চলে যাবে বাবুজি? যাও তো আমায় নিয়ে যেও।

পেছনের দিন পেছনেই পড়ে থাকে, আর কোনোদিনই সামনে এসে এগিয়ে দাঁড়ায় না।

আমি এসে আবার কাকার বাড়ী ঢুকেচি। কাকার গরুবাছুর বাঁধি, হাটবাজার করি, খুড়ীমার মুখনাড়া খাই, সঙ্গে সঙ্গে দুটো ভাতও। নয়তো এ বাজারে ভাত পাচ্ছি কোথায়।

শিকারী

জংলী দেহাতি বালক মাগনিরাম। রামজীর কাছে মেগে ওকে নাকি কোলে পাওয়া গিয়েছিল। এরা ভগবানের কাছে ও মানুষের কাছে বিনয় প্রকাশ করতে অভ্যস্ত, তাই বৈশ্য-বণিকদের মত কুরুচি প্রদর্শন করে না ছেলের 'লাখপতিয়া' 'দৌলতরাম' প্রভৃতি নাম রেখে।

ঝাঁপড়িশোল গ্রামে ওর বাড়ী।

মোটরের রাস্তা থেকে বাঁ-দিকে বেরুনো সরু রাস্তা। এই রাস্তার কিছু দূরে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের শিমূল গাছের আবাদ। প্রায় তিন চার একর জমিতে শুধু দেড়শো দুশো শিমূল গাছ। ফাল্গুন চৈত্রে ফুল ফুটলে কি অদ্ভুত দেখায় রাস্তা থেকে, নিষ্পত্র বড় বড় গাছগুলিতে আগুন-রাঙা পাপড়ি জ্বলচে শিমূল ফুলের।

শিমূল গাছের আবাদ পার হয়ে একটা নদী, নাম বরজোর নালা, বড় বড় শিলাখণ্ডের পাষাণ-বাঁধানো তটভূমির ওপর ছায়ানিবিড় বনপাদশ্রেণী, তাদের তলা দিয়ে বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে দ্বিগুণ হয়ে বরজোর নালা ছুটে চলেচে অদূরবর্ত্তী শঙ্খনদীর দিকে। শঙ্খনদী আবার মহাডাল পাহাড়শ্রেণীর তলায় গিয়ে মিশেচে মহানদীর সঙ্গে। সেটা কোথায় গিয়েচে, ঝাঁপড়িশোল গাঁয়ের লোক অত খবর রাখে না। বরজোর নালা পার হয়ে চুকুরদি-তুরুকদি রিজার্ভ ফরেস্ট। চুকুরদি একটা খ্রীষ্টান গ্রামের নাম, গ্রামের মধ্যেই ওদের পুরু কর্কশ সাবাই ঘাসে ছাওয়া ধাওড়া চালাঘরের গীর্জ্জা। দেওয়ালের শালকাটির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলে দেখা যাবে একখানা মাত্র টিনের ভাঙা চেয়ার গীর্জ্জাঘরের একমাত্র আসবাব। বগোদর থেকে মাসে একবার পাদ্রি সাহেব এসে এদের নিয়ে উপাসনা করেন ও শাস্ত্রকথা বলেন, তাঁর জন্যেই এই চেয়ারখানা যোগাড় করা আছে।

চুকুরদি গ্রাম পেরিয়ে মহাডাল পাহাড়ের তিনশো ফুট একটা শাখা পার হয়ে, একটা বৃদ্ধ মাদার গাছ পার হয়ে বনবেষ্টিত বনকাটি গ্রাম। মাত্র ছাব্বিশ ঘর লোকের বাস, কোল ও মুণ্ডা জাতীয় লোক, এরা খ্রীষ্টান নয়।

গ্রামের বাইরে এদের বড় বড় শালগাছের মধ্যে বোঙ্গাপূজার স্থান।

মারাং বোঙ্গা অর্থাৎ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এখানে মুরগী বলি দেওয়া হয়, গাঁয়ের সবাই বছরে একদিন রেঁধে খায়। হাঁড়িকুঁড়ি ফেলে যায় বোঙ্গাতলার এক পাশে। বছর বছর জমেচে পুরনো হাঁড়ির পাহাড়।

বনকাটি গ্রামের পরে মাঙ্গনবেড়া, মাঙ্গনবেড়ার পরে ঝাঁপড়িশোল।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, ঝাঁপড়িশোল গ্রাম যে রিজার্ভ ফরেস্টের ছায়াময় নিবিড়তার কোথায় কতদূরে লুকোনো, সেটা বোঝা যাবে।

এই গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইলে দেখা যাবে, চক্রাকারে নীল শৈলমালা, মহাভাল, কাটুচুরি, নানকাঁসবাহাল, সয়ছুরি ও চুকুরদি পাহাড় (যেটার উচ্চতা আগেই বলা হয়েচে) এ ক্ষুদ্র গ্রামকে ঘিরে রেখেচে। জারুল ফুল ফোটে বর্ষাকালে, করমগাছের হলদে ফুল ঝরে পড়ে থাকে বনতল বিছিয়ে, ধনেশ পাখী ডাকে, কেকারব করে বনশীর্ষে ময়ুরের দল।

মাগনিরাম ষোল বছরের ছেলে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে রোগা শরীর। এই সব জংলী গ্রামে বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া একবার যাকে ধরে, তাকে একেবারে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে! এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের কিন্তু সুন্দর সুগঠিত দেহ, পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তির মত। মেয়েরা পুরুষদের চেয়েও সুঠাম, সাবলীল—অধিকাংশ মেয়ের মুখই যেমন সরল, তেমনি সুন্দর।

মাগনিরাম আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সর্ব্বদা। নিজের অসুখের জন্যেই বোধ হয়।

বন্ধু নন্‌কুয়া এসে বল্লে—চল্ মাছটা ধরে আনি—

মাগনিরাম রাগের সঙ্গে বল্লে—নাই যাবো—

—কেনে ?

—উদাস লাগচে মাথাটা।

—দুখাচ্চে ?

—না হে, উদাস লাগচে। উ কথায় তোর কি কাম ? নাই যাবো, ভাগি যা!

—কেনে ভাগবে ? ইঃ!

—দিখাবো তোকে ? দিখ্‌বি ?

—কাঁড় ধরবার হাত্তি নি, দিখাবি কুথা থিকে ? উ অত সোজা ?

—ভাগি যা!

—নাই যাবো।

মাগনিরাম রাগের সঙ্গে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলে। নন্‌কুয়া হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল। পালিয়ে ঠিক নয়, চলে গেল বলাই সঙ্গত। ম্যালেরিয়া-জীর্ণ মাগনিরামকে কে বা ভয় করবে ওদের মধ্যে!

মাগনিরাম সেই দুঃখেই উদাস মনে থাকে আজকাল।

বরজোর নালা ঘুরে ঝাঁপড়িশোলের নিকট দিয়েই গিয়েচে, সিকি মাইল দূরে একটা বন পার হলেই। এই নালার ধারে বনের ওপারে গ্রামের লোকেরা বর্ষাকালে কান্দা আলু তুলতে যায়। কান্দা আলুর বড় লতা শাল আসান-অর্জ্জুন গাছের গা বেয়ে অনেক উপরে উঠে যায়, সেই অত উঁচুতে যেখানে বনের ময়ুর নৃত্য করে বর্ষার মেঘ পাহাড়ের শিখরে জমলে—সেখানে ফুটে থাকে কান্দা-আলুলতার নীল ফুল।

মাগনিরাম সে ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু অত উঁচুতে উঠে ফুল সংগ্রহ করতে পারে না

বলে গ্রামের মেয়েরা তাকে ক্ষেপায়, দোষ ধরে, মানুষ ব'লে ভাবে না।

তারা বলে—কমজুরী লোকটা হে, উ উসব কামের লয়—

ও উত্তর দেয়—গায়ের জুর লা আছে তো কি করচে। তুদের মনটা নেই যে হে—

বুধ্‌নি হেসে বলে—মনে কি করবে?

—উ তোদের বুঝাতে লারবো। জাহিল লোকদের বুঝাবো কি হে?

—উঃ, ভারি জাহিল জাহিল করতে এসেছে, বড় পণ্ডিতটা আছে তাই দিখাতে এসেছে—ভাগি যাঃ!

—তু ভাগি যা।

ওরা রাগ করে বলে—তুর ঘরে চাউল সিঝাই না মকাই মাগ্‌নি করি যে ভাগি যাবো?

এবার মাগনিরাম হাসে। মেয়েদের রাগ দেখে ওর হাসি পায়। বলে—যা যা হুজুমে চালাকানা—ঠ্যাঙাকানা দো—

এ কথার মানে, না গেলে লাঠি মারবো। মেয়েরা রেগে গালাগালি করে আরো। ও হাততালি দিয়ে হাসে। বলে—বিজলি চম্‌কাও কানা দো—

অর্থাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে। ও চমৎকার গান বাঁধে সেদিনটা বিদ্যুৎ চমকানো নিয়ে। নিজেই গায়। এবার মেয়েরা মন দিয়ে শোনে। ওর ওপর তাদের রাগ ও বিতৃষ্ণা অনেকখানি চলে যায়। বোঙ্গা পরবের সময় ও নিজের বাঁধা ছড়া ও গান নিজের বন্ধু নন্‌কুয়া ও ছোট বোন রতুকে শেখায়।

আসলে মাগনিরাম হল কবি।

কবির বংশও বটে, ওর বাবা জাতে সাঁওতাল, কিন্তু রাঁচি শহরে কিছুদিন ছিল। সেই জন্যেই ওর ছেলের নাম মাগনিরাম নতুবা সাঁওতালের ছেলের নাম মাগনিরাম হত না। রামভক্তি সে বিদেশ থেকে এই নিবিড় বনপ্রদেশে আমদানি করেছিল।

ওর বাবা এদেশে একজন বিখ্যাত লোক। রাঁচি শহরে সে মোটর গাড়ী দেখেচে, টেলিফুঁক দেখেচে, বিজলি বাতি, বিজলি পাখা, কলের গান—কত কি দেখেচে। আজ বছর সতেরো আগেকার কথা। সতেরো বছর ধরে সেই গল্প ভাঙিয়ে খাচ্চে বাড়ী বসে। গ্রামের লোকদের সে অবজ্ঞার চোখে ছাখে, বলে—সে তুনিয়াটার কি দেখলি রে? কুথা না গেলি, শরীরটার সক্ত হবে কুথা থেকে হে? মনের সক্ত হবে তবে তো শরীরটাতে লাগবে।

ওর কাছে সবাই আশ্চর্য্য গল্প শুনতে আসে। কত রকম পরামর্শ করতে আসে। ছেলেটিও বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে। তুনিয়া সংসারের কোনো কাজে লাগে না। বসে বসে কবিতা বানায় আর গান বাঁধে। এদিক থেকে সে বাপের চেয়ে এক কাটি সরেস হয়েচে, বলাবলি করে গ্রামের লোকেরা। অবিশ্বি নিন্দা হিসাবেই বলে, প্রশংসা করে নয়।

মাগনিরামের মন ওড়ে কান্দালতার নীল ফুল যেখানে ফুটেচে, সেই বনের মাথার ওপরে। বাবাকে সে বড় মানে; বাবা একজন কত বড় লোক। কত দেশ ঘুরেচে। এখানকার জাহিল লোকেরা কি করে বুঝবে তার বাবা কত বড়?

সে যদি জ্বরে না ভুগতো তবে অনেকদূর চলে যেতো এতদিনে—একবার সে গরমিণ্টোর শিমূল গাছের আবাদ দেখতে গিয়েছিল, সেখানে তার কয়েকদিন আগে গরমিণ্টো এসেছিল আবাদ তদারক করতে। গরমিণ্টো মিঠাই ফেলে গিয়েছিল, বিলাইতি মিঠাই, লাল নীল রং, কাগজে মোড়া। সে কুড়িয়ে প্রথমে ভাবলে, কি এগুলো ?

আবাদের চৌকিদার দেখে বল্লে—ও বিলাইতি মিঠাই। খেয়ে লাও—

সে মুখে দিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমন সে জীবনে কখনো খায়নি। গরমিণ্টোর মিঠাই ভারি চমৎকার লাগে খেতে।

এ সব ফেলে সে চলে যেতো যে দেশে ঐ রকম আশ্চর্য্য জিনিস আছে, কিন্তু বাবার জন্য মন কেমন করলে দূরে কি করে যাওয়া হয় ? তা ছাড়া, শরীরে অসুখ তো লেগেই আছে, যে জন্যে সে গাছের ওপরে উঠতে পারে না, কাঁড় ধরতে পারে না, পাহাড় ডিঙিয়ে বড় ঝোপের বনে যেতে পারে না। কিন্তু বাবার মত সে নাম-করা লোক হতে চায়, বাবার মনে সুখ দিতে চায়।

বর্ষার বাজরাক্ষেতে যেমন প্রতি বছর পাহাড় থেকে বন্যহস্তিযূথ নামে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না।

ঘাটোয়ালী কাছারি থেকে ঢেঁটরা দিয়ে গেল, এবার মস্ত বড় পাগলা হাতি নেমে বন্য গ্রামগুলির অত্যন্ত ক্ষতি করচে। যে হাতী মারতে পারবে, তাকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

গ্রামের মধ্যে জোয়ান শিকারীর দল চঞ্চল হয়ে উঠলো, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে পরামর্শ করে না, পাছে তার মতলব অপরে আত্মসাৎ করে।

ঢেমন সাঁওতাল বনকাটি গ্রাম থেকে এসে একদিন সবাইকে ডেকে বল্লে—এ বছরের হাতীটি তুরা মারতে লারবি।

সবাই বল্লে—কেনে হে ?

—উ মাদী হাতী আছে। মারতে লারবি।

একজন যুবক শিকারী বল্লে—কাঁড় টেনে হাতী মারা নেই যাবে ? তুমি শিখাতে এসেচ ? মাদী হাতীটা কি হাতী লয় ?

—ই সে হাতী লয়। দেখে লিবি আমার কথা। এ বছর দু'তিন আদমি মরবেই সব বস্তির। ঘাটোয়ালী কাছারির লোক টাকা দেবে সিধা বাত শুনে ? তা দিবে না। দেখে লিবি।

ঢেমন বড় শিকারী এ অঞ্চলের। একা বাঘ মেরেচে কাঁড় দিয়ে। বিষাক্ত ফলা চালিয়ে হাতী মেরেচে। তার কথা অগ্রাহ্য করবে এমন লোক এ দিকের কোন গ্রামে নেই।

মাগনিরাম সেখানে উপস্থিত ছিল। সে ঢেমন সাঁওতালের সুগঠিত চেহারার দিকে চেয়ে দেখলে প্রশংসার দৃষ্টিতে। মরদ বটে একজন ? আজ তার যদি জ্বর না হত, সেও অমনি

হতে পারতো। তার বাবা বুড়ো হয়েচে। বাবার হাত থেকে কাজ নিতে হবে এবার তাকে। বাবাকে সুখে রাখতে হবে।

মাগনিরাম কবির দৃষ্টিতে জগৎটাকে দেখে। বাবাকে সাহায্য করতে হবে, সুখী করতে হবে, এটা হল কল্পনা-প্রবণ হৃদয়ের কথা। কিন্তু বাইরের দুনিয়াটা শুধু কল্পনাতে চলে না। কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করবার কৌশলও শেখা দরকার। মাগনিরাম সেখানে নিজেকে অসহায় বোধ করে।

কতদিন একলা বসে বসে কি ভাবে সেই জানে।

বাবা কত বড় হয়ে যাবে একশো টাকা পেলে! কাড়া কিনবে। কাড়ার দুধ খাবে। গরমিণ্টোর মিঠাই আনিয়ে খাবে দুজনে। তার মা কবে মারা গিয়েচে ছেলেবেলায়, তার মনেও পড়ে না। বাবা তাকে মায়ের মত করে মানুষ করেছিল। এখন সে যদি বাবাকে না দেখে, কে দেখবে?

সেদিন সে শুনলে নিমপুরা আর বরজোর নালার ধারে রোজ রাত্রে পাগলা হাতীটা নামচে। মাগনিরাম কাউকে কিছু না বলে বিকেলের দিকে একাই চলে গেল বরজোর নালার ধারে।

বর্ষায় বরজোর নালার কূল ছাপিয়ে জল উঠেচে এপারে বাজরা ক্ষেতে। ওপারে পাহাড় সুতরাং জল সেদিকে না বেড়ে এই কূলকেই ভাসিয়েচে। বাজরা ক্ষেতে হাতীর পায়ের দাগ সর্ব্বত্র, ক্ষেত তচনচ করেচে হাতী।

সুমুখ জ্যোৎস্না রাত। মাগনিরাম ঢেমন সাঁওতালকে অনেক খোশামোদ করে দুটি বিষমাখা শলা সংগ্রহ করেচে। বাঁশের চোঙায় ফুঁ দিয়ে সেই বিষমাখানো শলা কি ভাবে ছুঁড়তে হয় সেটা সে দু-একবার দেখে নিয়েচে বটে, কিন্তু নিপুণ হাতে চালায় যারা, তারাই শলা চালাতে ইতস্তত করে, আনাড়ি মাগনিরামের কথা তো অনেক দূরের।

মাগনিরাম বরজোর নালার ধারের একটা কুলগাছে উঠে বসে রইল সন্ধ্যার আগে থেকেই। আপন মনে গুন্ গুন্ করে গান করতে লাগলো। যদি আজ হাতীটা নামে।

অনেক রাত্রে সত্যি নামলো পাগলা মাদী হাতীটা। হাতী নয়, সাক্ষাৎ শমন। আজই সন্দেবেলা এই খানিক আগে নিমপুরার একটি বুড়ো ক্ষেতপাহারাদারকে খুন করে এসেচে, তার শুঁড়ে তখনো টাটকা রক্তের দাগ।

মাগনিরাম উত্তেজিত হয়ে উঠলো। একশো টাকা রোজগার করে বাবাকে আনন্দ দেবার চরম মুহূর্ত্ত সমাগত। দেরি করলে চলবে না।

ঠিক যখন হাতীটা বরজোর নালার ধারে কুলগাছের পাশে এসেচে, মাগনিরাম বাঁশের চোঙে ফুঁ দিয়ে শলা ছুঁড়লো।

এর পরের ঘটনা টের পাওয়া গেল সকালবেলা।

বাজরা ক্ষেতের মধ্যে তিন জায়গায় মাগনিরামের দেহের তিনটি রক্তাক্ত থেঁৎলানো

টুকরো কিন্তু মাগনিরামের বাবাকে একশো টাকা দিয়েছিল ঘাটোয়ালী কাছারি থেকে।

কেন, তা বলি।

বরজোর নালার ওপারে সরকুন্দা জঙ্গলের কিনারায় প্রকাণ্ড পাগলা হাতীটা মরে পড়ে আছে—আবিষ্কার হল তিনদিন পরে। হাতীটার নাকের দুপাশে তখনো দুটো শলা গিঁথে ছিল। ঢেমন সাঁওতাল বীর শিকারী, শলা দেখে বল্লে—ই তো আমার হাতের শলা আছে হে! বাহুড়ির ছেলেটা আমার কাছ থেকে লিয়েছিল সেদিন। ওর মনে ই ছিল, সেটা কি ক'রে জানচি হে?

ঢেমন সর্দ্দারের সাক্ষ্যের বলে ঘাটোয়ালী কাছারির পানিকর মাগনিরামের বাবাকে কাছারিতে ডেকে চারজন সাক্ষীর সামনে টিপসই নিয়ে নগদ দশ টাকার দশখানা নোট ওর হাতে তুলে দিয়ে বল্লে—বাপের বেটা তো ইকে বোলে! চোখের জল না ফেল্‌বি, উ তোর বেটা ছিল না, তোর বাবা ছিল হে!

পরিহাস

অনেক বছর ব্যবধানে মানবজীবনে যে নাটক অভিনীত হয়, যে সূক্ষ্ম আবেদনের সৃষ্টি করে, এ গল্পটি তারই গল্প।

রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মারা যান, ১২৬৫ সালে, তখন তাঁর সম্পত্তি বেশ ভালোই ছিল কুড়ুলগাছিতে। রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী-পুত্র ছিল না। তিনি তাঁর সম্পত্তি ছোট ভাই রামগতিকে দিয়ে গেলেন। সন্ধ্যার সময় ছোট ভাইকে ডেকে বল্লেন—কিছু মনে করিস নে রামা—অনেক মামলা করেছি তোর সঙ্গে বিষয় নিয়ে। সব তো রেখে যেতে হল। সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারলাম না। এখন সব বুঝতে পেরেছি ভাই, কিছুই কিছু না। নকলের জন্যে আসল হারিয়ে বসে আছি। একটা কথা বলি শোন্। উঠোনের ঐ জবাতলায় আমার শ-পাঁচেক টাকা পোঁতা আছে। তুলে নিস্—

রামগতির সঙ্গে দাদার মুখ-দেখাদেখি ছিল না বহুদিন থেকে। কেউ কারো বাড়ীতে যেতো না, যদিও পাশাপাশি বাড়ী।

রামগতি কেঁদে ফেলে বল্লেন—দাদা, তুমি কি বলচো, আমি যশাইকাটি থেকে নীলমণি কবিরাজকে কাল সকালেই নিয়ে আসবো। কোনো ভয় নেই দাদা, তুমি ভালো হয়ে উঠবে।

রামতারক ম্লান হেসে বল্লেন—এদিকে আয়, আশীর্ব্বাদ করি—

নীলমণি কবিরাজকে আর আনতে হয়নি। শেষরাত্রের টাল আর সামলে ওঠেনি বৃদ্ধ রামতারক।

দাদার শ্রাদ্ধ-শান্তি রামগতি পল্লীগ্রামের হিসেবে ভালোভাবেই করলেন। লোকে তাঁকে ভালোই বল্লে। এতদিন দাদা মামলা-মোকদ্দমা করে ছোট ভাইকে নাস্তানাবুদ করেছিল, অনেক ফাঁকি দিয়েছিল বুড়ো। রামগতি ভালো প্রতিশোধই নিয়েচে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পরে একদিন রামগতি তাঁর চাকর হারাধনকে ডেকে বল্লেন—হারাধন, একটা কোদাল নিয়ে চল্ তো আমার সঙ্গে দাদার বাড়ী।

—কেন গো ছোটবাবু? কি হবে কোদাল?

—চল্ না বলচি।

দাদার বাড়ীর উঠোনে পৌছে হারাধনকে বল্লেন—এই জবাগাছের তলায় খোঁড় দিকি ভালো করে।

—কেন?

—দাদা বলে গিয়েছিল, টাকা পোঁতা আছে ওর তলায়।

—তুমিও যেমন পাগল! টাকা পুঁতে রেখে গিয়েচে তোমার জন্যি?

—তুই খোঁড় দিকি ভালো করে! বকিস্ নে।

হারাধন এ সংসারের বিশ্বাসী পুরনো চাকর। অনেকদিন থেকে রামগতির কাছে আছে। মনিবের ওপর অনেক সময় সে হুকুম চালায়। ভালোমানুষ রামগতি হাসিমুখে সহ্য করে।

অনেকক্ষণ ধরে খোঁড়া হল, কিছুই পাওয়া গেল না। রামগতি বল্লেন—উত্তর দিকে খোঁড় দিকি—

আবার খানিক পরে বল্লেন—পেলি নে? আচ্ছা, দক্ষিণ দিকে খোঁড়—

ছঘণ্টা খোঁড়াখুঁড়ির পরেও কিছু পাওয়া গেল না। রামগতি এই টাকার ওপর নির্ভর করে দাদার শ্রাদ্ধে কিছু বেশী খরচ করে ফেলেছিলেন। হারাধন বল্লে—তখুনি বল্লাম ছোটবাবু, ওঃ—বড়বাবুর আর খেয়ে দেয়ে কাম নেই—আপনার জন্যি ট্যাকা পুঁতে রেখে যাবে!

—তাই তো! বল্লে যে দাদা মৃত্যুর কিছু আগে?

—অমন বলে। রোগের সময় কে কি বলে তাই কি আর দেখতি গেলি চলে?

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রামগতির মৃত্যু হল। রামগতির একমাত্র শিশুপুত্রের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর।

রামগতির বিধবা পত্নী ছেলেটিকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় তার বাপের বাড়ী চলে গেল। যাবার সময় প্রতিবেশীদের বাড়ী বাসন-কোসন, পিঁড়ি, খাট, বালতি রেখে চলে গেল।

চুয়াডাঙ্গায় রামগতির স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে শুধু তার এক ভাই ছাড়া আর কেউ ছিল না। ভাইটি মূর্খ এবং গুলিখোর। অবস্থা ভাল নয়। অতিকষ্টে সংসার চলে।

গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াতেই রামগতির স্ত্রীর ভাজ উঁকি মেরে বল্লে—কে গা? ওমা, এ যে ঠাকুরঝি! আহা, এসো এসো—এ বুঝি খোকন? এসো বাবা—

রামগতির স্ত্রীর চোখে জল এল। সে যে সংসারে বধূরূপে ঢুকেছিল সেখানকার অবস্থা এদের চেয়ে অনেক সচ্ছল, অনেক ভালো। রামগতির অংশে ত্রিশ বিঘে জমি ছিল প্রজাবিলি। কিছু খাজনা এবং কিছু ধান পাওয়া যেতো। খাওয়া-দাওয়ার অবস্থাও ছিল অনেক ভালো।

কিন্তু রামগতির স্ত্রী শিশুপুত্র নিয়ে সেখানে থাকতে সাহস করে নি বলেই দাদার আশ্রয়ে এসে পড়লো। গোড়া থেকেই সে ভুল করেছিল।

গুলিখোর দাদার ঘরে সবদিন চাল থাকে না। মামীমা রামগতির ছেলে সতুকে বলে—তোর মামার কাছে গিয়ে বল্, ঘরে চাল নেই—নইলে খাওয়া হবে না—

সতু গুলির আড্ডার দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলতো—ও মামা ?

কেউ কথা বলে না। আড্ডার রকম দেখে সতুর মুখ দিয়েও কথা বেরুতে চাইতো না। সেখানে দেওয়ালে হেলান দিয়ে সারি সারি লোক বসে আছে—মুখে তাদের লম্বা প্যাকাটির নল, কলসীর কানাভাঙার ওপর বসানো থেলো হুঁকোর সঙ্গে সেই নল লাগানো। কারো বিশেষ হুঁশ নেই। চোখ বোজানো অবস্থায় গল্প চলচে ওদের মধ্যে—সতু বুঝতে পারতো না সে সব গল্পের মানে। তখন তার বয়স আট ন' বছর হবে।

মামাকে আবার ডাকতো—ও মামা ?

মামা আস্তে আস্তে চোখ চেয়ে বল্তো—কে রে ?

—আমি সতু। মামীমা পাঠিয়ে দিলে। ঘরে মোটে চাল নেই।

—চাল নেই ? আচ্ছা বোস্। এমন চাল খাওয়াবো তোর মামীকে বুঝতে পারবে চাল কাকে বলে।

আবার আধ ঘণ্টা। মামার সাড়াসংজ্ঞা নেই। বেলা হয়ে যাচ্চে, মামী ভাত চড়াবে কখন ? তারও খিদেতে পেট জ্বলচে। সে আবার ডাক দিলে—ও মামা ?

—কে রে ?

—আমি সতু। চালের পয়সা দাও মামা। ঘরে চাল নেই কিচ্ছু।

—দাঁড়া। হাতী বিক্রি করি আগে। হাতীটা বিক্রি করেই তোকে চাল তো চাল—

ঘরের মধ্যে ও-কোণ থেকে কে একজন টেনে টেনে বল্লে—হাতী কেন দাদা, আমবাগানটা বিক্রি করে দ্যাও না—

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সতু ডাকলে—ও মামা ?

—কি রে ?

—চালের পয়সা দাও—

মামা ট্যাঁক থেকে দু আনা পয়সা বার করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে—যা—আর নেই। ওই দিয়ে চালাতে বল্‌গে যে করে হোক্—

এই রকম ছিল মামাবাড়ীর সংসার।

মামী খুব ভাল লোক ছিলেন না। ভাত দুটো দিতেন বটে, কিন্তু হাজার মুখনাড়া দিয়ে আর হাড়ভাঙা খাটিয়ে নিয়ে।

সতুর মা ইতিমধ্যে একবার কুড়ুলগাছিতে গিয়ে দেখেন তাঁদের জমিজমা অপরে দিব্যি দখল করে ভোগ করচে। তাঁর হয়ে কথা বলে এমন লোক পাওয়া গেল না। মামলা করা একা মেয়েমানুষের কর্ম্ম নয়। দেখে শুনে তিনি আবার বাপের বাড়ী চলে এলেন। সতু গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিখে দু' ক্রোশ দূরবর্ত্তী চুয়াডাঙ্গার হাইস্কুলে ভর্ত্তি হল। কয়েক বছর অতি কষ্টে পড়াশুনো করে সে দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করলে। তার বয়েস তখন আঠারো বছর। এই সময় সতুর মা পরলোকগমন করলেন। সতুর মামীমা ওকে বল্লেন—এইবার একটা চাকরি-টাক্‌রি দেখে নাও বাবা। সংসার আর চলে না। তোমার মামাও বুড়ো হয়েচেন। আর তাঁর ক্ষমতা নেই চালাবার।

মামাতো ভাই দুটি ছিল অজমূর্খ, বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত তাদের হয় নি। পরের গাছের আম কাঁঠাল চুরি, মাছ ধরা, এই ছিল তাদের কাজ। সতুর চেয়ে বয়সেও ওরা ছোট ছিল; সুতরাং সতুর ওপর পড়লো গোটা সংসারের দায়িত্ব।

একদিন ওর মামী বল্লেন—সতু, একবার যা কুড়ুলগাছিতে। ঠাকুরজামাইয়ের অনেক সম্পত্তি ছিল, ঠাকুরঝি অনেক বাসন-কোসন পরের বাড়ী রেখে এসেছিল শুনতাম। দেখে আয় দিকি বাবা—

সতুর মাও তাকে মরবার সময় এ কথা বলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—অমুক অমুকের বাড়ী বাসন আছে। রূপোর খাড়ু আছে। দাদার তো এই সংসার, কখনো আনতে ভরসা পাই নি। উড়ে যেত এতদিন। তারা খুব বিশ্বাসী। আমার নাম করে জিনিসগুলো ফেরত নিবি তাদের কাছ থেকে। বৌমাকে তো দেখতে পেলাম না, বৌমাকে দিয়ে বলবি, আমি দিইচি তাকে।

অনেক দিন পরে সতু এল কুড়ুলগাছিতে। পাঁচ বছর বয়সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল, সে কথা কিছুই মনে নেই। বাবার কথা মনে পড়ে ওর চোখে জল এল। হারানো শৈশবের কত আবছায়া অস্পষ্ট স্মৃতি মনে জাগে। যেন ওই জানলায় ধারে রোয়াকের কোণে কবে বাবা তাকে কোলে নিয়ে আদর করেছিল, সেই মুখখানা যেন আজও মনে পড়ে।

পুরনো বাড়ীতে ঢোকা যায় না। ঘন জঙ্গলে উঠোন ঢেকে ফেলেচে। ছাদের কার্নিসে জিউলি গাছ মস্ত বড় হয়ে, আঠা ঝরাচ্চে। বটগাছ গজিয়ে ফল প্রসবের অবস্থায় এসে পৌঁছেচে।

তবুও সে পরের বাড়ী থাকলো না।

জন ধরে বনজঙ্গল কাটিয়ে এবং একটা ঘর পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে সেখানেই থাকলো।

সঙ্গে এনেছিল একটা ছোট বিছানা, মশারি, বালিশ।

যাদের নাম মা করেছিল মৃত্যুর আগে—সে সব জায়গায় গিয়ে বাসন চাইলে সতু।

তারা বল্লে—হ্যাঁ বাবা, সেকি কথা! আমাদের কাছে বাসন? সে কবে নিয়ে গিয়েচে তোমার মা! সে কি আজকের কথা বাবা? না, না, থাকলে যে দেব না, তেমন অধর্ম্ম কাজ কখনো হবে না আমার হাড়ে। না বাবা, সে সব তোমার মা নিয়ে গিয়েছিল।

কেউ কিছু দিলে না। অথচ তাদের অবস্থা ভাল, কোঠা বাড়ী—দু একজনের দোতলা বাড়ী। সবাই হাসিমুখে মিষ্টি কথায় ফাঁকি দিলে ওকে।

দুটো বাঁশ ঝাড় গ্রামের শ্যাম চক্কত্তি দিব্যি ভোগ-দখল করচেন খবর পেয়ে সেখানে যেতে বৃদ্ধ শ্যাম চক্কত্তি হেসে বল্লেন—এসো বাবা, এসো। ও বাঁশঝাড় আমারই। সীমাছাড়া হয়ে পড়েছিল বলে তোমার বাবার সঙ্গে গোলমাল হয় ওই নিয়ে। গাঁয়ের পাঁচজনকে জিগ্যেস করে দেখো। ও আমার পৈতৃক আমলের বাঁশঝাড়।

মিটে গেল।

সতু ছেলেমানুষ, বিষয়-সম্পত্তির কিই বা বোঝে, কিই বা জানে, ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ফাঁকি দিল ওকে।

কেবল মুড়োরপাড়ার জীবন ডাক্তারদের বাড়ী ও সত্যিকারের স্নেহ পেলে খানিকটা। জীবন ডাক্তারের স্ত্রী ওকে বল্লেন—তুই তখন এতটুকু, এখানে আসতিস। তালশাঁস দিতাম হাতে, খেতিস বসে বসে। আহা তোর মা'র তো আর মরবার বয়স হয় নি, অল্প বয়সে মারা গেল! অল্পভুগী লোক—বোস, দুটো মুড়ি খা।

কে একজন একদিন ওকে এসে বল্লে—বাবু, আপনাকে ডাকচে আপনাদের পুরানো চাকর হারাধন। সে উঠতে পারে না বিছানা থেকে, আপনি এসেছেন শুনে ক'দিন কেবল আমাকে বলচে আপনাকে ডাকতে। তা আমার সময় হয় না—

সতু হারাধনের নাম শুনেছিল তার মায়ের মুখে। ছেলেবেলায় দেখলেও সে কথা তার মনে ছিল না।

লোকটা ওকে একটা ভাঙা কুঁড়েঘরে নিয়ে গেল। উঠোনে একটা কামরাঙা গাছে পাকা পাকা কামরাঙা ঝুলচে। ঘরের দাওয়ায় একটা মাছ-ধরা ঘুনি উপুড় করা আছে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকারে মেঝের ওপর বিছানায় একটা লোক শুয়ে ছিল। সতু ঘরে ঢুকতে লোকটা বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করলে। মুখের দিকে চোখ চেয়ে চেয়ে বল্লে—কে, খোকন? আমার খোকন-সোনা? আয়, কাছে আয়, ভালো করে দেখি—কোলে পিঠে মানুষ করেচি রে তোরে।

লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। সতু তো অবাক। চুপ করেই রইল সে।

লোকটা বল্লে—বাবা, তোমারে ডেকেচি কেন বলি। আমি মহাপাপ করেছিলাম। তোমার কাছে সেটা বলি। আমার সব গায়ে ঘা হয়েচে, তার ওপর জ্বর। খেতে পাইনে, কেউ একটু জল মুখে দেবার লোক নেই। তোমার জ্যাঠামশাই মরবার সময়ে তোমার বাবারে বলে, তাদের উঠোনে জবাতলায় পাঁচশো ট্যাকা পোঁতা আছে। আমারে সে ট্যাকা

তুলতে বলে তোমার বাবা। আমি মাটি খুঁড়ে দ্যাখলাম একটা পেতলের বোগনোর কানা দেখা যাচ্ছে। আমি তার ওপর অমনি মাটি চাপা দিয়ে ফেল্লাম। কুবুদ্ধি চাপলো মাথায়। তোমার বাবাও দ্যাখলে না। ভাবলে, আমি অনেক দিনের বিশ্বাসী লোক, আমি কি আর ফাঁকি দেবো? রাতারাতি সেই ট্যাকার বোগনো আমি তুলে নিয়ে গিয়ে—তোমার কাছে বলতি লজ্জা করে—আমার একবিটি ইয়ে ছিল—তার হাতে নিয়ে গিয়ে দেলাম। সে ট্যাকা আমার ভোগে হয় নি বাবা। সেই মেরে দেলে ট্যাকাটা। দিন পনেরো পরে ট্যাকা নিয়ে সে গঙ্গার ওপারে তার বোন-ভগ্নিপতির কাছে চলে গেল। তোমরাও এখান থেকে চলে গেলে। আমার সেই থেকেই খারাপ অবস্থা, এখন আর খেতে পাইনে। যতদিন শরীরে শক্তি ছেল, জন খেটে পেটের ভাত চালিয়েচি। এখন বুড়ো হয়ে গিইচি, রোগগ্রস্ত, আর খেতে পাইনে। আমার এমন হবেই যে, বিশ্বেসঘাতুকি কাজ করিচি, পুরনো মনিবের ট্যাকা চুরি করিচি, আমার এমন হবে না তো কার হবে বাবা! আজ তোমার কাছে বল্লাম, যদি তাতে পাপের বোঝা কমে···আর, আমার হয়ে এল, খোকন, বড্ড জোর দুটো একটা মাস—তোরে যে দ্যাখলাম মরবার আগে—

সতু কিছুক্ষণ সেখানে বসে দু একটা সান্ত্বনার কথা ওকে বল্লে। তারপর পকেটে হাত দিয়ে যা কিছু ছিল, ওর বিছানার পাশে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এল।

জওহরলাল ও গড্

সেদিন হাওড়া স্টেশনে সকাল হইতেই ভিড় হইবে এই রকম একটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় বড় করিয়া খবর বাহির হইয়াছিল জওহরলালজি সেদিন বম্বে মেলে কলিকাতায় আসিতেছেন। আরও একটি খবর বাহির হইয়াছিল, ভগবান স্বয়ং পাঞ্জাব মেলে কলিকাতা আসিতেছেন, হিমালয়ের কোন একটা স্থান হইতে।

এই পর্য্যন্ত। টাইম টেবিল দেখিয়া জানিলাম উভয় ট্রেন আসিয়া পৌছিবে দুঘণ্টার ব্যবধানে। বম্বে মেল আগে আসিবে, বেলা সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে।

গিয়া দেখি হাওড়া স্টেশন পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্ট্র্যাণ্ড রোডের পর হাওড়া পুলের দিকে এক পা-ও বাড়ানো সম্ভব নয়। মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান ও জওহরলাল একই দিনে যখন কলিকাতা আসিতেছেন, তখন এমন ভিড় হওয়া স্বাভাবিক বটে।

জওহরলালজি আসিবার কথায় তত বিস্মিত হই নাই, কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বেও কলিকাতায় আসিয়াছেন। কিন্তু ভগবান কখনও কোথাও আসেন না, তিনি নিরাকার, এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহ দেখে নাই বলিয়াই শুনিয়াছি। তিনি হঠাৎ অদ্য পাঞ্জাব মেলে কেন যে

কলিকাতা আসিতেছেন, কিছু বোঝা গেল না। কোথা হইতে আসিতেছেন, তাহাও জানি না।

ভিড়ের মধ্যে দেখি একদল সংকীর্ত্তন পার্টি চলিয়াছে, বোধহয় ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সংকীর্ত্তন পার্টি কি হইবে? কারো গঙ্গাযাত্রার সময় সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হয় জানি, কিন্তু ভগবান যখন স্বয়ং হাওড়া স্টেশনে আসিতেছেন, তখন এর অপেক্ষা ভালো ব্যবস্থা কি করা যাইত না?

অতি কষ্টে প্ল্যাটফর্মের ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখভাগে আগাইবার চেষ্টা করিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে জওহরলালজির ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল।

ইহার পর স্টেশন ভাঙিয়া পড়ে আর কি, বহুবিধ শ্লোগানের সমবেত উচ্চকণ্ঠের উচ্চারণে। সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফারের দল দেখিতে দেখিতে পণ্ডিতজিকে ঘিরিয়া ফেলিল। তারপর সেই বিরাট জনতা তাঁহাকে লইয়া পথে নামিল এই পর্য্যন্ত দেখিলাম—ইহার পর কি ঘটিল না ঘটিল বলিতে পারিব না, কারণ আমি জওহরলালজির সে বিশাল শোভাযাত্রায় যোগদান করি নাই, ভগবানকে দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মেই ছিলাম।

দল চলিয়া গেল।

প্ল্যাটফর্ম প্রায় খালি।

সেই সংকীর্ত্তন পার্টি ছাড়া ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কেহই উপস্থিত নাই গোটা প্ল্যাটফর্মে। একজন রোগা, গোঁপদাড়িকামানো লোক আমার কাছে আসিয়া বলিল—মশায়, আজ নাকি ভগবান আসচেন?

—এই রকমই তো কাগজে লিখেচে।

—কোন্ প্ল্যাটফর্মে, জানেন?

—পাঞ্জাব মেলে তো আসচেন। এন্‌কোয়ারি আপিসে একবার জিগ্যেস করে আসুন না?

—উঃ মশাই, যা ভিড়ের কাণ্ড! কি কষ্টে যে হাওড়া পুলটুকু ছাড়িয়ে এসেচি!

—প্রসেশন কতদূর গেল?

—জওহরলালজির মোটর তো স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে হাইকোর্ট-মুখো চলে গেল দেখলাম—আর কিছু বলতে পারি নে। বসুন, এন্‌কোয়ারি আপিসে জিগ্যেস করে আসি।

লোকটা সেই যে চলিয়া গেল, আর ফিরিল না। অন্তত আমি আর তাহাকে দেখিলাম না।

মিনিট কুড়ি পরে পাঞ্জাব মেল আসিয়া সশব্দে স্টেশনে প্রবেশ করিল। বিশেষ কোনো দলকে আগাইয়া যাইতে দেখিলাম না, সেই ক্ষুদ্র সংকীর্ত্তন পার্টি ছাড়া, তাহারা ততক্ষণ খোল ও খঞ্জনীর সাহায্যে উদ্দণ্ড রেড়ো কীর্ত্তন জুড়িয়া দিয়াছে।

প্ল্যাটফর্মময় ফুল ও ছেঁড়া ফুলের মালা ছড়ানো। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পণ্ডিতজির উদ্দেশে যে

বিরাট পুষ্পবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহারই চিহ্ন। একগাছা মালা কেন সংগ্রহ করিয়া আনিলাম না ভগবানের জন্য, ভাবিয়া মায়া হইল সে বেচারীর উপর। সংকীর্ত্তনের দল কি মালা আনিয়াছে? আনিতে পারে।

হুড় হুড় করিয়া লোক নামিয়া গাড়ী খালি হইয়া আসিল। বাঙালী, বিহারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, পাঠান যাত্রীর দল নিজের নিজের জিনিসপত্র কুলীর মাথায় চাপাইয়া, ব্যাগ ও টিফিন-ক্যারিয়ার নিজের নিজের হাতে ঝুলাইয়া গেটের দিকে চলিয়াছে। স্থানে স্থানে স্তূপাকার বাক্স ও হোল্ড-অল-বাঁধা বিছানাকে কেন্দ্র করিয়া মেয়েরা বালক-বালিকাসহ দাঁড়াইয়া আছে, সঙ্গের পুরুষেরা কুলীদের সঙ্গে দরদস্তুর করিতেছে। খুব একটা ব্যস্ত-ত্রস্ততার ভাব চারিদিকে।

কিন্তু—ভগবান কই?

ফার্স্ট ক্লাস দেখিলাম, সেকেণ্ড ক্লাস দেখিলাম। দুই তিনটি বাঙালী পরিবার একটি সেকেণ্ড ক্লাসের কামরা হইতে নামিয়া কামরার সামনেই মালপত্র নামাইয়া জটলা করিতেছে। এঞ্জিনের সামনে ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাস কম্পোজিট বগিখানিতে মিলিটারি বোঝাই। তাদের সঙ্গে বহু মালপত্র। কুলিরা ঠেলাগাড়ী আনিয়া মাল বোঝাই করিতেছে। এখানেও তো ভগবানের আসিবার কথা নহে।

সংকীর্ত্তন পার্টি কীর্ত্তন থামাইয়াছে। তাদের কাছে গিয়া বলিলাম—মশায়, ভগবানকে খুঁজে পেলেন?

উহাদের একজন বলিল—না মশায়, আমরাও তো খুঁজচি।

—পেছন দিকটা দেখে এসেচেন?

—সব দিকে দেখা হয়ে গিয়েচে।

—ইন্টার ক্লাসটা দেখা হয়েচে?

কোনো ক্লাসই বাদ দিই নি আমরা। কোথাও তো তেমন কোনো লোককে দেখলাম না মশাই। আমরা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ থেকে আসচি।

আরও খানিকটা অপেক্ষা করিবার পর আমি নিরাশ মনে প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলাম। কি মনে করিয়া ট্রাম না ধরিয়া হাওড়া পুল ধরিয়াই চলিয়াছি, হঠাৎ চোখে পড়িল একজন লোক পুলের মাঝামাঝি রেলিং ধরিয়া অন্যমনস্ক ভাবে গঙ্গার জলের দিকে চাহিয়া আছে।

আমি পাশ দিয়া যাইতেছি, লোকটি হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল। লোকটির চেহারায় কি যেন ছিল, দীন-দুঃখীর মত অকিঞ্চন ভাব মুখে, অথচ চোখ-দুটিতে অতলস্পর্শ গভীরতা ও বালকোচিত সারল্য একসঙ্গে মাখানো। আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম ওর এই মুখভাবের আশ্চর্য্য পবিত্রতা ও সরলতায়। বলিলাম—কোথায় যাবেন?

লোকটি গঙ্গার দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই নতুন পুল বুঝি?

—হ্যাঁ।

—বেশ পুল করেচে। সাহেবেরা করে ভালো।

—আপনি কোথায় যাবেন? অনেকদিন আসেন নি বুঝি কলকাতায়?

—আমি ভগবান। কলকাতায় এসেচি এই ট্রেনে। হাওড়া স্টেশনে কেউ তো আমায় অভ্যর্থনা করবার জন্যে যায় নি?

কি সর্ব্বনাশ, লোকটা বলে কি! ভগবান? এই লোকটা? এ'কে তো নিতান্ত অভাজন বলিয়া মনে হইতেছিল—যদিও কি গুণে লোকটা মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে বটে।

আমি পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলাম। বলিলাম—আপনি?

—হ্যাঁ। বলি, ওরা আমাকে কেউ স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এলো না কেন?

—ওরা জওহরলালজিকে এগিয়ে নিয়ে গেল কিনা—তাই—

—আর আমার বেলা কেউ বুঝি এলো না?

ভদ্রলোক দেখিলাম ছেলেমানুষের মত ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানের সুরে কথা কয়টি বলিলেন। আমার দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। ভগবান এত ছেলেমানুষ!

সান্ত্বনার সুরে বলিলাম—তা কেন, গৌড়ীয় মঠের বাবাজিরা কীর্ত্তন পার্টি নিয়ে এসেছিলেন তো? তা, বোধ হয় আপনাকে তাঁরা চিনতে পারেন নি। আপনার কোনো ফটো তো ইতিপূর্ব্বে কোনো খবরের কাগজে বার হয় নি, চেনাই যে দায়।

ভগবান আমার কথায় ছেলেমানুষের মতন অল্পে সান্ত্বনা পাইয়া বলিলেন—তা বটে। চিনতে পারে নি তা কি করবে। শোনো, আমার একটা ফটো তুলিয়ে খবরের কাগজে ছেপে দিতে পারবে?

—আজ্ঞে বলেন—আজ্ঞে আমি—ফটো আমি তুলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কোনো খবরের কাগজের লোকের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। কাগজে ফটো ছাপাবার ব্যবস্থা তো করতে পারিনে—

ভগবান নিরাশ ভাবে বলিলেন—ও!

আমার আবার মায়া হইল। তাঁর এই অসহায় বালকের মত কণ্ঠের 'ও!' শুনিয়া বলিলাম—চলুন না কেন, এই কাছেই বর্ম্মন স্ট্রীটে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আপিসে, ওরা আপনার ফটো নিশ্চয়ই যত্ন করে ছাপবে আপনার নাম শুনলে—চলুন সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্চি—

ভগবানের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল দেখাইল। আগ্রহের সুরে বলিলেন—চলো, চলো—তাই চলো—এইবার ফটো ছাপালে সামনের বারে অনেক লোক আসবে।

তারপর যেন খানিকটা আপন মনেই বলিলেন···লোক চেনে না তাই, না চিনলে—

আমি কিন্তু যে কথাটা ভাবিতেছিলাম, সেটা তাঁহাকে বলিলাম না। ফটো ছাপানো হয় না বলিয়া চিনিবার অসুবিধার জন্য যে তাঁহার অভ্যর্থনা হয় নাই তাহা তো কথা নয়, আসলে প্ল্যাটফর্মে তখন লোকজনই ছিল না তিনি যে সময় আসিলেন।

হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়াতে কথাটা বলিলাম যে তিনি কোথায় উঠিবেন ঠিক করিয়াছেন?

তিনি বলিলেন—কেউ তো আগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে না, কোথায় উঠবো কি জানি!

—যদি কিছু মনে না করেন, আমার একখানা ঘর আছে দোতলায়। ভাড়াটে ঘর, একলাই থাকি। সেখানেই যদি আজ রাত্রে থাকেন—

—তা বেশ। যাবো এখন।

—আপনার খাওয়া-দাওয়ার তো কোনো—মানে ওখানে সব আঁষ, মাছ-মাংস খাই। অবিশ্যি নিরামিষ যদি খান, তার ব্যবস্থা করে দেবো এখন।

ভগবান হাসিয়া বলিলেন—আমার আবার ওসব কি? যা দেবে, তাই খাবো। আমি কি বোষ্টম গোসাঁই?

অপ্রতিভ সুরে বলিলাম—আজ্ঞে, ক্ষমা করবেন। বৈষ্ণবেরা নিরামিষ ভোগ আপনাকে নিবেদন করে দেন কিনা তাই বলছিলাম—

—আবার অন্যলোকে মাছ-মাংস দিয়ে ভোগ দেয়—মুরগি বলি দেয়, গরু মহিষ ছাগল কাটে—তাও খাই। আমার এক অবতারে আমি ভক্তের দেওয়া শূকরের মাংস খেয়ে রোগগ্রস্ত হয়ে নরদেহ ত্যাগ করি।

—আজ্ঞে জানি, বুদ্ধ অবতারে।

—ব্যাপার কি জানো, আদিম নীহারিকাটা ঘুরিয়ে দেবার পরে বিশ্বসৃষ্টি আপনা-আপনি হচ্ছে, আমার কোনো কাজ নেই। আজ কোটি কোটি বৎসর ধ'রে বেকার বসে আছি। ঘুরে ঘুরে বেড়াই, কোথায় কি হচ্ছে দেখি। এখন আমি শুধু দ্রষ্টা ও সাক্ষী মাত্র। জগতে দেখতে পাই আমায় কেউ চায় না, কেউ বোঝে না—একা একা থাকি। সর্ব্বত্রই আছি অথচ কেউ ফিরে চেয়েও দেখে না। কেউ মানে না আজকাল আর, বলে উনি তো বেকার। জগৎ আপনা-আপনিই চলচে, ওঁর আবশ্যকতা বা কি?

কষ্ট হইল বেচারীর জন্য। এমন সুরে কথা বলিলেন, তাঁর উপর কেমন একটা মায়াও হইল।

মানুষ বেকার হইত, চেষ্টা যত্ন করিয়া একটা কাজ যোগাড় করিয়া দিতাম। ভগবানের বেকার-সমস্যার সমাধান করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।

সামনেই চিৎপুর রোড। বড় ট্রাফিকের ভিড়।

পিছনে ফিরিয়া বলিলাম—আসুন, এই সামনেই 'আনন্দবাজার আপিস'—আপনার ফটোটা তাহলে—

আহ্লাদের সুরে বলিলেন—বেশ, চলো চলো—ওদের আমার পরিচয়টা দিয়ে দিও—

নাঃ, বড্ড সরল ও ছেলেমানুষের মত। এত ছেলেমানুষি কেন ভগবানের মধ্যে? আহা, কেন লোকে ওঁকে মানে না, গ্রাহ্য করে না, না মানিয়া মনে কষ্ট দেয়!

চিৎপুর রোড পার হইয়া ওপারের ফুটপাথে উঠিয়া পিছন ফিরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া দেখি, তিনি নাই। ভিড়ের মধ্যে কোথাও হারাইয়া গেলেন নাকি? কলিকাতায় চলাফেরা অভ্যাস নাই তো!

তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া গেলেন, না অভিমান করিয়া আবার তাঁহার স্বধামেই ফিরিয়া গেলেন—কি করিয়া বলিব।

গল্প নয়

আমি এ গল্পটি শুনি যেভাবে তাও বলি।

গাড়ীতে বড় ভীড়, ইণ্টার ক্লাসও নেই, সেকেণ্ড ক্লাসও নেই। অতি কষ্টে একখানা গাড়ীতে ভীষণ ভিড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে কোনরকমে উঠলাম। উঠে ঠিক বোঝা গেল না গাড়ীর মধ্যে কোথাও জায়গা আছে কি নাই। এক জায়গায় কায়ক্লেশে একটু স্থান করে নিয়ে কোনরকমে নিজেকে গুঁজলাম দুজন মানুষের মাঝখানে। আমার বাঁ-ধারে যে লোকটা বসে ছিল, তাকে অন্ধকারের মধ্যে দেখে মনে হল গরীব উড়িয়া, কারণ আসছিলাম কটক থেকে। একটু অবজ্ঞার স্বরে বললাম—কোথায় যাউছন্তি?

আমার উড়িয়া ভাষার জ্ঞান বার-দুই পুরী আসবার অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এটা এখানে বলা আবশ্যক। যে লোকটির গায়ে হাত দিয়ে কথা বল্লাম, সে বিরক্তির স্বরে পরিষ্কার বাংলায় বল্লে—এ রকম বলাটা এটিকেট নয় মশায়—

আমি অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম। বাঙালী ভদ্রলোক জানলে কখনই আমি এ রকম বলতে সাহস করতাম না। হাতজোড় করে বললাম—মাপ করবেন মশাই। আমি বুঝতে পারিনি—

—না না কিছু না। আপনিও কিছু মনে করবেন না।

ক্রমে খুব আলাপ জমে গেল ওঁর সঙ্গে। নাম বল্লেন জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী, বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। বয়স সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু এখনো বেশ শক্ত-সমর্থ। সাধু সন্ন্যাসী ধরনের লোক। তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে বেড়ানোই কাজ। আগে রেলে কাজ করতেন। গত পনেরো বিশ বছর ধরে তীর্থ ভ্রমণ ছাড়া কোনো বৈষয়িক কর্ম্মে মন দেন নি।

রাত তখন ন'টা। এই সময় থেকে রাত তিনটেয় সময় খড়্গপুর আসা পর্য্যন্ত দীর্ঘ পথে আমরা দুজনে শুধু গল্পগুজব করেচি। আমি বেশি গল্প করি নি, বেশির ভাগ গল্প করেচেন তিনি।

একটা অসাধারণ ধরণের গল্প এখানে করি। শুনে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর কথাতেই বলি।—

—সংসারটা অসার। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তীর্থে তীর্থে বেড়াতে লাগলাম। বুঝলেন না? কিছু ভাল লাগে না।

—আপনার স্ত্রী?

—স্ত্রী থাকে বাড়ীতে।

—দেখাশুনো করে কে ? ছেলেরা ?

—ছেলে নেই। তিনটি মেয়ে। বিয়ে থাওয়া হয়ে গিয়েচে, শ্বশুরবাড়ী ঘরকন্না করচে। কাজেই আমার কোনো পিছুটান নেই মশায়। কেন বেড়াবো না। নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে দেশবিদেশে বেড়িয়ে। একটা বড় অভিজ্ঞতা হয়েচে কি জানেন, ভগবানের নামের অনেক গুণ। বড় মজা।

—কি রকম ?

—সেবার চৈত্র মাসেই বড় গরম পড়ে গেল। কাটোয়া স্টেশনে নেমে দু-ক্রোশ তফাতে অজয় নদের বাঁধ, বেশ চওড়া, দুধারে কাশবন। সেই বাঁধ বেয়ে আরও ক্রোশ-দুই গেলে তিলজুড়ি গাঁয়ে আমার এক শিষ্যের বাড়ী। সেখানেই যাচ্চি। যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নির্জ্জন স্থান, মানুষজন নেই কোনোদিকে—নিকটবর্ত্তী গ্রামও দু ক্রোশ দূর। এমন সময় মশায়, দেখি যে চারজন ষণ্ডামার্কা জোয়ান লোক বাঁ-দিকের কাশবন ঠেলে বাঁধের উপর এসে উঠলো। হাতে তাদের মোটা মোটা বাঁশের লাঠি—আমার দিকে এগিয়ে এসে সামনের লোকটা দুহাতে লাঠি তুললে আমার মাথা লক্ষ্য করে। মাথায় লাঠি মারে মারে—আর বেশি দেরি নেই! ভবলীলা সাঙ্গ হল, হল কি, হয়ে গিয়েছে—এমন সময় আমার মনে কে যেন কি বলে দিলে, আমি লোকটির দিকে চেয়ে বল্লাম—বাপু হে, হরিনাম করো। হরিবোল বলো। কেন আমাকে খুন করে ব্রহ্মহত্যার পাতক ঘাড়ে নেবে ? টাকা চাও, এই নাও ব্যাগ। সামান্য যা কিছু আছে, ব্যাগে আছে। মানুষ খুন করবে কেন ? পাপ কেন করবে ? হরিবোল বলো। হরিবোল বলো—

আমি বল্লাম—আপনি যখন বলেছিলেন একথা, আপনার মনের ভাব কি রকম হচ্ছিল ?

—মনে ভয়ও ছিল না ভরসাও ছিল না। অসাড় হয়ে গিয়েছিল মন। মরে যাই, যাবো। এই রকম মনের ভাব। কে যেন কি বলচে মনের মধ্যে বসে। কি আশ্চর্য্য ভাব—কে যেন বলচে—ওকে বলো, ওকে বলো। কি বলবো ? যা মুখ দিয়ে বেরুবে।

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বল্লাম—তারপর ?

—তারপর, যা আশা করি নি, তাই ঘটে গেল হঠাৎ। লোকটি লাঠি নামিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। বল্লে—আপনার নাম কি ? আমি নাম বল্লাম। সে আরও এগিয়ে বল্লে—দিন ব্যাগটা আমার হাতে। আমি ওর হাতে ব্যাগটা তুলে দিয়ে ভাবলাম টাকাগুলো নিয়ে লোকটা আমায় ছেড়ে দিলে বুঝি। কিন্তু তারপর দেখি লোকটা আমার পিছু পিছু আসচে। তিলজুড়ি গ্রামের কাছে এসে পৌছেচি, ঘরবাড়ী দেখা যাচ্চে, তখন সে বল্লে—ঠাকুর, আপনার ব্যাগটা ধরুন। কথার সুরে মুর্শিদাবাদের টান। পেছনে চেয়ে দেখি বাকি তিনটি লোক নেই, কখন সরে পড়েচে লক্ষ্য করি নি। তারপর সে ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বার করে নীচু হয়ে আমার পায়ের ওপর রেখে উপুড় হয়ে প্রণাম করলে। বল্লে, পায়ের ধুলো নেবার যুগ্যি নই, আমি জাতে বাগ্দী। আমার বাড়ী ডহরাপাড়া, কাটোয়া ইস্টিশান থেকে সাত ক্রোশ পশ্চিমে। আমার নাম সতীশ বাগ্দী। আপনাকে একটা কথা

দিতে হবে ঠাকুর, বলুন যে আমার বাড়ী একদিন পায়ের ধুলো দেবেন? আমি অতি নীচ জাত। তবু নীচকেও তো উদ্ধার করতে হবে? নীচ জাত যাবে কোথায়? বলুন, কিরূপা করবেন তো?

আমি বল্লাম—যাবো। আজ যাও। আর, হরিমন্ত্রে তোমায় দীক্ষা দিলাম। ওটি ভুলো না।

সে চলে গেল। যখন যাচ্চে তখন আমি স্পষ্ট শুনলাম সে হরিনাম করতে করতে গেল। আপনি অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু আমি স্বকর্ণে শুনেচি।

আর একটা কি হল জানেন, যখন ও চলে যাচ্চে তখন আমার মনে সে কি অপুর্ব্ব ভাব! আমি ওর দিকে চেয়ে আছি, ও ক্রমে দূরে সরে যাচ্চে, আমার মনে যেন কে বলচে—আহা, কষ্ট পাচ্ছিল, উদ্ধার হয়ে গেল উদ্ধার হয়ে গেল। ভগবানের নাম মহাপুণ্য। সেই পুণ্য আজ ওর হল। বেঁচে গেল লোকটা, বেঁচে গেল। কে দয়া করে এই ঘটনাটির যোগাযোগ ঘটালে কি জানি! এই সন্ধ্যাবেলা আমাকে উপলক্ষ্য করে কে যেন এই পাপীতাপীকে হরিনাম বিলিয়ে উদ্ধার করে গেল।

এইবার আমার পালা।

বল্লাম—সতীশ বাগ্দীর বাড়ী গিয়েছিলেন?

—শুনুন বলি। সেই শ্রাবণ মাসে অবসর পেয়ে ভাবলাম ডহরাপাড়া গ্রামে যাবো। কাটোয়ার বাজারে একটা দোকানে বসে ওই গ্রামের নাম বলতে একজন বল্লে—সে গ্রামে কোথায় যাবেন? আমি বল্লাম, সতীশ বাগ্দীর বাড়ী। সে লোকটা বল্লে—লেঠেল সতীশ বাগ্দী?

—তা হবে।

—তাকে আপনি চিনতেন?

—একর্বার আলাপ হয়েছিল।

—সতীশ নেই। মাস দুই হল কলেরায় মারা গিয়েচে।

মনে মনে সতীশের আত্মার মঙ্গলকামনা করে কাটোয়া স্টেশনে ট্রেনে চড়লাম।

সীতানাথের বাড়ী ফেরা

সীতানাথ আজ দুমাস পরে বাড়ী যাচ্চে। ট্রেন ছাড়তেই সে আনন্দে একটা গান ধরলে গুন গুন করে। কিন্তু তখনই মনে হল, উঃ, খোকার কাছে পৌঁছুবে সে কি আজ? বাবাঃ, আজ সারা-রাত ট্রেনে কাটবে। এ দুমাস সে যে কি করে ছিল, সেই জানে। যখন সে চলে আসে, বাড়ীর কাছে ইস্টিশান, আড়াই বছরের খোকা পিটু তার জামা আঁকড়ে ধরে বল্লে—বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—তুই যাবি, তবে তোর মা যে কাঁদবে ?

—কাল আসব ন'টার গাড়ীতে।

খোকার কাছে যত গাড়ীই যায়, সব ন'টার গাড়ী। আর ভবিষ্যৎ কাল মাত্রেই 'কাল'।

—বাবা, তুই ন'টার গাড়ীতে যাবি ?

—হ্যাঁ।

—আমি যাবো কাল।

—মার কাছে থাকবে কে ?

—কাল আসবো।

ওর মাও ওকে বুঝিয়ে বলেছিল—খোকা, তুই যাবি আমি কার কাছে থাকবো ?

—কাল আসবো।

—না, আমি থাকতে পারবো না।

—তোমার জন্যে মূকি (মুড়কি) কিনে নিয়ে আসবো।

যেদিন আসে, সেদিন সকাল থেকে খোকা ব্যস্ত হয়ে মাকে বলতে লাগলো—মা, আমার জামা দ্যাও।

—কেন রে ?

—বাবার সঙ্গে যাবো।

—কোথায় যাবি ?

—কলকাতা।

—আবার আসবি কবে ?

—কাল আসবো।

কিছুতেই ছাড়লে না খোকা, জামা গায়ে দিয়ে ইস্টিশানে এল। গাড়ী এলে বাবার কোল আঁকড়ে জামা টেনে ধরে রাখলো। এঞ্জিনটা সশব্দে প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাবার জামা মোক্ষম এঁটে ধরলে—খানিকটা এঞ্জিনের ভয়ে, খানিকটা বাবা পাছে পালায় ওকে ফেলে সেই ভয়ে। তখন সে দিশাহারা হয়ে বলচে—ও বাবা, আমি যাবো আমি ন'টার গাড়ীতে যাবো—আমি তোর সঙ্গে যাবে বাবা।

গাড়ী বাঁশি দিলে। কত বোঝালে সীতানাথ, খোকার এক বুলি তার আকুল কান্নার মধ্যে—আমি তোমার সঙ্গে যাবো বাবা—আমি ন'টার গাড়ীতে যাবো—

গাড়ীর লোক এবং স্টেশনের লোক হাসতে লাগলো ব্যাপার দেখে। সীতানাথ নির্ম্মম ভাবে খোকার হাত জোর করে ছাড়িয়ে দিলে এবং খোকাকে তার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের মেয়ের কোলে দিয়ে ছুটে এসে ট্রেনে উঠলো। ধীরে ধীরে ট্রেন স্টেশন ছাড়লো। খোকা আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে আর্ত্তনাদ করচে বীণার কোলে—ও বাবা, আমাকে নিয়ে যা, আমি ন'টার গাড়ীতে যাবো—আমায় নিয়ে যা—

গাড়ীতে উঠে পেছন দিকে সীতানাথ চেয়ে দেখলে খোকাকে।

ক্রমে ওর মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। স্টেশন দূরে চলে গেল।

সীতানাথের চোখ জলে ভরে এসেচে। পাছে গাড়ীর লোক টের পায়, সে জানলার বাইরে চেয়ে রইল! একজন কে বল্লে—আপনার ছেলে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

অপরিচিত লোকের সঙ্গে এ নিয়ে বেশি আলোচনা করবার ইচ্ছে নেই সীতানাথের। তা ছাড়া তখন কান্নায় তার গলার স্বর আড়ষ্ট। সে তাড়াতাড়ি জানলার বাইরে চেয়ে যেন মনোযোগের সঙ্গে আকাশের মেঘ লক্ষ্য করতে লাগলো। নইলে তার চোখের জল সবাই টের পেয়ে যাবে। সকলে ভাববে, ছেলেকে ফেলে রেখে আসতে হল বলে অত বড় মানুষটা কাঁদচে! এরা কি কিছু বুঝবে তার মনের ব্যথা ? এরা কি বুঝবে খোকাকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে কাল সারারাত তার ভালো ঘুম হয়নি ! কাল সারাদিন খোকাকে সে কাছছাড়া করেনি, খোকাও তার কাছছাড়া হয়নি। কেবল বলেচে—বাবা, কাল তোর সঙ্গে আমি ন'টার গাড়ীতে যাবো। নিয়ে যাবি তো ?

—কেন, তুই মার কাছে থাকবি।

—না, তাহলে আমি কাঁদবো।

—তোকে না দেখলে তোর মা কাঁদবে।

—কাল আসবো!

—রাত্রে কার কাছে শুবি ?

—তোর কাছে।

—খাবি কি ?

—মুকি।

দুতিনটে স্টেশন গেল সীতানাথের কান্না সামলাতে। ওকে না দেখে খোকা এই দু মাস কেমন করে থাকবে ? ওই বা কেমন করে থাকবে খোকাকে না দেখে ? চাকরিতেও ছুটি পাবে না, বা তেমন অবস্থাও নয় যে অতদূর থেকে খোকাকে সে দেখতে আসবে।

এ দু মাসের প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা মুহূর্ত্ত সে খোকার কথা ভেবেচে। এক এক সময় বড্ড অসহ্য হত, হাতের কলম ফেলে দিয়ে সে চোখের জল চাপতে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো সে সময়। একদিন তার মুখ দিয়ে যন্ত্রণার চোটে উঃ শব্দ বেরিয়ে গিয়েছিল। পাশে নলিনী গুহ বসে, সে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কি হল ?

ও বল্লে—পেটে বড় যন্ত্রণা হচ্চে ভাই।

—পেটে ? কি খেয়েছিলেন ?

—ইলিশ মাছ।

—তাই। নরেশবাবুর কাছ থেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এক ডোজ খেয়ে আসুন না ? বড্ড কষ্ট হচ্চে ?

—এখন একটু কম।

মহা মুশকিল। কিছু ভাববারও জো নেই লোকের মাঝখানে বসে। খোকার কথা ওদের কাছে বলে লাভ নেই। ওরা কিছুই বুঝবে না। তার মনের সে নিদারুণ কষ্ট—শুধু দাঁত বের করে হাসবে।

খোকা অত ভালবাসে কেন তাকে ? খেলা করবে, নিজের বয়সী ছেলেমেয়ে কত এসেচে—তাও বলবে, বাবা খেলা করবি আয়—

—তোরা খেল্।

—না বাবা—আয়, খেলা কর্‌বি।

ওর কাপড় ধরে টেনে নিয়ে খেলায় নামিয়ে তবে ছাড়বে। খাবার সময় তার হাতে ভিন্ন খাবে না। কোথাও যেতে দেবে না। জামা গায়ে দিলেই অমনি হেসে বলবে—বাবা, বেড়াতে যাবি ? আমায় নিয়ে যাবি তো ?

—চলো।

—আমায় বকবি নে তো ?

একবার খোকাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে কি কারণে ওকে এক চড় মেরেছিল। খোকা সেই কথা মনে করে রেখে দিয়েচে। বাবার সঙ্গে বেরুবার আগেই বলবে—আমায় বক্‌বি নে তো ?

—না বকবো না, চল।

—আমায় মুকি কিনে দিস।

—দেবো।

—এক পয়সার মুকি।

—আমায় কি কিনে দিবি ?

—এক পয়সার মুকি কিনে দেবো। কাল কিনে দেবো।

—তাই দিস।

কতদূর গাড়ী এল ? মোটে বারহারোয়া ? গাড়ী যেন আর চলচে না। ঘুমুবার চেষ্টা করে দেখলে সীতানাথ। ঘুমুলেই অমনি খোকা এসে হাসিমুখে সামনে দাঁড়ায়। ওর মুখ যেন স্পষ্ট মনে হয় না। যেন ভুলে গিয়েচে খোকার মুখ। কতক্ষণে গাড়ীটা গিয়ে পৌছবে ?

আজ পনেরো-কুড়ি দিন দেশের চিঠি পায়নি। কেন এমন হল, দু'তিনখানা পত্র দিয়েচে তারও কোনো উত্তর পায় নি। এমন তো কখনো হয় না।

ওঃ এ ক'দিন সাহেবগঞ্জে কি ছটফট করেই কেটেছে !

রোজ ভেবেচে। দিন গুনেচে। আর ক'দিন আছে ? আর সাতদিন। আর ছ'দিন। আর পাঁচদিন। দিন যেন আর যেতে চায় না।

এক একটা দিন এত লম্বা হয় কেন ?

আগে তো দিনগুলো আসতো আর যেতো—তত বোঝা যেতো না যে দিনগুলো এত লম্বা হয়। তারপর গতকাল রাতে যখন সে বিছানায় শুতে গেল—তখন সে শুধু প্রতীক্ষা

করেচে কতক্ষণে সকাল হবে। ভালো ঘুম হয় নি। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখেচে ঘুম ভেঙে উঠে। একবার উঠলো, তখন ঘড়িতে টং টং করে বাজলো দুটো। একবার উঠলো, তার কিছু পরে বাজলো তিনটে।...এক ঘুমে রাত ভোর হয় অন্য দিন—আজ এমন হয় কেন? আবার ঘুমুলো। তখন চেয়ে দেখলো জানালা দিয়ে বাইরে চমৎকার জ্যোৎস্না। প্রথমটা জ্যোৎস্না বলে বোঝা যায় নি, ভোরের আলো বলে মনে হল...ওর বহুপ্রতীক্ষিত প্রত্যূষটি...যেদিন ও বলতে পারবে, আজ আমার খোকার কাছে যাওয়ার দিন। কিন্তু না, ওটা শেষরাতের জ্যোৎস্না...সকালের এখনো বিলম্ব আছে। টং টং করে বাজলো চারটে একটু পরেই। এইবার সে ঘুমুবে—এইবার উঠে দেখবে সকাল হয়ে গিয়েচে...দু'মাসের আকুল প্রতীক্ষার সেই সকালটি, যে সকাল কোনদিন আসবে বলে বিশ্বাসই হয় নি ওর। যে সকাল ছিল কামনার সপ্ত সমুদ্রের পারে—তা এল ওর চোখের সামনে রূপ ধরে, সত্যিকার পাখীডাকা সেই অপরূপ সকালটি।

তারপর কত কষ্টে সকাল হল।

আজ সে রওনা হবে খোকার কাছে।

পৃথিবীতে এমন অপূর্ব্ব সকাল নামে!

ট্রেন কতদূর এল? গাড়ীর মধ্যে বড্ড গরম। ঘুম আসে কই? সীতানাথ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো নৈহাটি থেকে খোকার জন্যে নিতে হবে লেবেঞ্চুস, খেজুর। কোন একটা খেলনা। একটা জামা। স্ত্রীর জন্যে একখানা কাপড়। খোকা কেমন বলতো কোন জায়গা থেকে ফিরলে—বাবা, কোথায় গিইলে?

—অমুক জায়গায়।

—আমার জন্যে কি আনলি? মুকি?

ভালো কথা। ও মুড়কী বড় ভালবাসে, মুড়কি কোথা থেকে নেবে ওর জন্যে? রাণাঘাটের মুড়কি ভালো, সেখান থেকেই নেবে।...

আর কি খাবার নেওয়া যাবে? খোকার জন্যে কিছু রসগোল্লা।

আবার সীতানাথ ঘুমিয়ে পড়লো।...

নৈহাটি পৌঁছে গেল গাড়ী। রাণাঘাটের ট্রেনের এখনো অনেক দেরি। হাত-মুখ ধুয়ে সে চা খেয়ে নিলে। তারপর খোকার জন্যে বাজার করলে। ট্রেন এল বেলা ন'টায়। তখুনি সে উঠে বসলো।...ট্রেনগুলো আজকাল এমন আস্তে আস্তে যায়? স্বাধীনতা-লাভের পর সব গোলমাল হয়ে গিয়েচে। আগেকার ট্রেন অনেক জোরে চলতো। এক একটা স্টেশনে যদি বা দয়া করে থামে—ছাড়তে আর চায় না। তাড়াতাড়ি ঘণ্টা দিয়ে দে না কেন বাপু? এত কি তোমাদের কাজ?

"চাই কেক্, ভাল কেক্? এতে আছে মাখন, ডিম, কিশমিশ, বাদাম, পেস্তা। বাজারে যার দাম দু আনা, আমাদের কোম্পানী প্রচারের জন্যে তাই দিচ্চে এক আনায়। বাড়ীতে

ছেলেমেয়েদের জন্যে নিয়ে যান, আগে খান পরে দাম। ভাই সকল! ভালো কেক্, প্রতুল কোম্পানীর ইংলিশ কেক্!"

—এই কেক্! এদিকে এসো। কত দূরে? ভালো হবে তো?

—নিয়ে যান না মশায়। এই গাড়ীতে আজ এক বছর ধরে আমি কেক্ বিক্রী করচি। সবাই আমায় জানে। প্রতুল কোম্পানীর কেক্ বল্লে সবাই চেনে। ভালো না লাগে লাইনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিন, দাম ফেরৎ দেবো—

—আচ্ছা দাও চারখানা। চোদ্দ পয়সা দিই—

খোকা এ জিনিস কখনো খায় নি। পাড়াগাঁয়ের শিশু—সে চিনেচে শুধু মুড়কি। বড় খুশি হবে। এ কোন্ স্টেশন? এখনো মদনপুর আসে নি? নাঃ, এদের নিয়ে আর পারা গেল না! এঞ্জিনের কয়লার আঁচ কি নিবে গেল নাকি?

রা-ণা-ঘা-ট!···

তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো সে। ওদিকের লাইনের গাড়ীর কত দেরি? আচ্ছা আগে মুড়কি-টুড়কি কেনা যাক না? পাকা কলা বিক্রী হচ্চে। খোকা কলা খেতে ভালবাসে। একবার খোকা বলেছিল—আমাকে একটা পয়সা দিও।

—কেন রে খোকন?

—আমি তোকে কলা কিনে দেবো!

হায়রে! খোকা, তুই জানিস নে, এক পয়সায় আজকাল কোন্ জিনিসটা পাওয়া যায়? তুই সেকেলে সরল শিশু, কিছুই বুঝিস নে। সাড়ে তেরো আনা গেল মুড়কি আর কলা কিনতে। তাও মাত্র চারটি পাকা কলা খোকনের জন্যে। পাঁচ পয়সা করে এক একটি কলা।

মুশকিল হল টিকিট করতে এসে। ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। বন্যার জলে হরিনারানপুরের নীচে কোদলা নদীর পুল ভেঙে গিয়েচে—লাইনের ওপর জল। ট্রেন চলাচল আজ তিন দিন বন্ধ আছে। কবে খুলবে তা কেউ বলতে পারলে না। দেশ বন্যাতে নাকি ভেসে গিয়েচে।

সর্ব্বনাশ! সীতানাথের কান্না এল প্রায়। 'এখন সে কি করে? তিন দিন সে থাকবে কোথায়? তাকে তাহলে আবার সাহেবগঞ্জে ফিরে যেতে হবে।

কত জিনিস যে খোকার জন্যে কিনেছিল। মুড়কি, কলা, লেবেঞ্চুস। সে সব কি হবে?

একজন লোকের সঙ্গে হঠাৎ ওর দেখা হয়ে গেল। তার মুখে ও শুনলে চূর্ণী নদীর ঘাট থেকে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায় ওদিকে যাওয়ার জন্যে। সে নিজে যাবে কোলা-কুলবেড়ে গ্রামে। সীতানাথের গ্রাম কুলবেড়ে থেকে কোলা-কুলবেড়ে পাঁচ ছ' ক্রোশ উত্তরে। একখানা নৌকো ওরা ভাড়া করলে চূর্ণী নদীর ঘাট থেকে।

বেলা ন'টার সময় নৌকো ছাড়লো। মাঝির মুখে শুনলে তাদের গাঁয়ের দিকে বন্যা নেই। হরিনারানপুরের নীচে পুল ভেঙেচে কোদলা নদী ও ভাঙড় নদীর বানে। মাঝিকে বল্লে—কতক্ষণে কুলবেড়েতে ভেড়াতে পারবে?

—তা কি বলা যায় বাবু। জলের কাণ্ড। সাঁজ হতি পারে।

চূর্নী নদীর জলে ঢল নেমেচে। রাণাঘাট টাউন ছাড়িয়ে দুধারে পাড়াগাঁ। ভাদ্রের নদী কূলে কূলে ভর্ত্তি, বাবলা গাছে হলদে ফুল ফুটেচে, বুনো কচুর লম্বা লম্বা ফুল ফুটেচে জলের ধারে। আউশ ধান কাটচে চাষীরা নদীর দুধারে হলদে ক্ষেতে। সীতানাথ চূর্নী দিয়ে নৌকো করে জীবনে প্রথম এল এদিকে। মাঝে মাঝে গ্রামের ঘাটে মেয়েরা ঘড়া ভরে জল নিয়ে ভিজে কাপড়ে ডাঙায় উঠচে, বাঁশবনের পথে অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে। ওর বেশ লাগছিল। কালকাসুন্দির ফুলে নদীর ধার ছেয়ে গিয়েচে এক এক জায়গায়। কাশের ফুল বর্ষার হাওয়ায় দুলচে। সাদা কাশফুলে বনবনানী নদীতীর যেন শুভ্র বর্ণের হাসি হাসচে! নীল আকাশ। গাং-চিল ছোঁ মেরে মাছ ধরচে। জেলেরা দোয়াড়ী পাতচে জলে নেমে।

ও জিগ্যেস করলে—কি মাছ হবে হ্যাঁগা?

—চিংড়ি। নৌকো কোথাকার?

—রাণাঘাটের।

—কনে যাবে?

এবার সীতানাথকে কথা বলতে না দিয়ে মাঝি ধমক দিয়ে বল্লে—তোমার সে খোঁজে দরকার কি? যেখানেই যাই।

লোকটা অপ্রতিভের সুরে বল্লে—ওমা, তা জিগ্যেস করলিও দোষ!

ক্রমে বেলা পড়ে গেল। বাঁশবনে সোনার সড়কির মত নতুন বাঁশের কোড় নীল আকাশে ঠেলে উঠচে চারিদিকে। বনধুঁধুলের হলুদবরণ ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে প্রজাপতির নৃত্য। বনসিমের নীল ফুল ঝোপের মাথায়! অনুকূল স্রোতে তরতর বেগে নৌকো চলে যাচ্ছে। মাঝির জন্যে এক গাঁ থেকে ওরা মুড়ি কিনে দিলে, নিজেরাও দুটো খেয়ে নিলে।

—হ্যাঁ মাঝি, কুলবেড়ে আর কতদূর?

—এখনো দূর আছে। পানাচতের বাঁওড়ে গিয়ে পড়বো! তারপর কুলবেড়ে।

—সন্দে হবে?

—সন্দের পর একদণ্ড রাত্তির.হবে।

একটা গাঁয়ের পাশে কি গাছে মাকাল লতার ফল পেকে টুকটুক করে দুলচে। হঠাৎ ওর মনটা কেমন করে উঠলো। সেবার ওদের গ্রামে পুরনো ডুমুরগাছে মাকাল ফল পেকে অমনিধারা লাল টুকটুক করছিল। তখন পিটু আরো ছোট। ও বল্লে—ওই ছাখ খোকা। ইবু (লেবু)।—

খোকা বল্লে—ইবু দিবি বাবা?

—দাঁড়া পাড়ি।

—পাড়ো। আমি কাল ইবু দিয়ে ভাত খাবো।

—খেও।

—আমায় বকবি না তো?

—না।

—কাল ইবু দিবি?

—এখনই দিচ্চি, আবার কাল কেন। দাঁড়া। একটা কঞ্চি পাচ্চি নে—বড্ড উঁচু।

মনটার মধ্যে কেমন করে উঠলো। মাঝিকে বল্লে—গোটাকতক পাকা মাকাল ফল নিলে হত—থামাও নৌকো—

—ও কি হবে বাবু?

—কিছু না। ছেলেপুলেরা খেলা করবে।

—চলুন, আগে অনেক আছে। এখন বেলা পড়ে গিয়েচে, বন-ঝোপের মধ্যে নামে না।

মনে পড়লো কোন দোষ করে ফেলে খোকা ওর কাছে এসে ভয়ে ভয়ে বলতো (যেমন সেবার ওর হাতঘড়িটা নিয়ে নাড়তে গিয়ে হঠাৎ হাত থেকে ফেলে দিয়ে এবং মায়ের বকুনি খেয়ে)—বাবা, আমি দুত্তু করি নি—আমি ভালো?

—খুব ভালো। তুমি দুত্তু করনি তো? কে দুত্তু করে তবে?

—না। রবি দুত্তু করে, চন্দন দুত্তু করে। বাবা, আমি ভালো?

—খুব ভালো। ঘড়িটা কে ভেঙেচে?

—মা।

—ও, বটে।

একবার খোকার টাইফয়েড হয়েছিল। জ্বরের ঘোরে সে কেবল বলতো—বাবা, অসুখ সেরে গেলে ভালো তেল মেখে নদী থেকে নেয়ে আসবো—

সীতানাথের বুক কেঁপে উঠতো। নদীতে নাইবার কথা বলচে কেন? এটা কি খারাপ লক্ষণ?

জ্বরের ঘোরে কেবল ডাকতো—বাবাই—ও বাবাই—

—এই যে খোকা—

—বাবাই, আমার কাছে বোস্। কোথাও যাস নে।

আবার খানিক পরে বালিশ থেকে মুখ উঠিয়ে বলতো—বাবাই, রয়েচ তো?

—আছি।

—শুয়ে রয়েচ নাকি?

—বসে আছি!

—থাক্। আমি ঘুমুই—

—ঘুমোও!

কি একটা দুর্গন্ধ বেরুলো হঠাৎ। মাঝি ও তার সহযাত্রী নাকে কাপড় দিলে। বল্লে—কিসের গন্ধটা হে?

মাঝি কিছু না বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। ডাঙার দিকে শিমূলতলায় জলচুড়ির দামে একটা মড়া আটকে রয়েচে। পাখানা উঁচু হয়ে আছে আকাশের দিকে। হাঁটু মুড়ে যেন দুপুরের আহারের পর বিশ্রাম করচে। একটা চওড়া ঘাসের ডগা ওর দাঁতে ছাতা-ধরা হাঁ-করা মুখের মধ্যে। মড়াটার ওপরকার ডাঙার শিমূল গাছটাতে শকুনি বসে।

ওর মনটা ছাঁৎ করে উঠলো। এসব বড় অলক্ষণ। কেন ওটা দেখলে সে? এই ভরা সন্দেবেলাতে ওটা দেখবার কি দরকার ছিল?

বামে শব শিবা কুম্ভ,
দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ।

আচ্ছা মড়াটা যখন প্রথম দেখলো তখন মড়াটা ওর কোন্ দিকে ছিল। বাঁ দিকে। বাঁ দিকে—না ডান দিকে? না, বাঁ দিকেই।

—এই বাবু চন্দনতলার ঠাকুরবাড়ীর ঘাট।

—সে কি! তাহলে তো বেশি দূর নেই!

মনে মনে সে চন্দনতলার জাগ্রত কালীঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনা করলে। খোকা যেন ভালো থাকে, গিয়ে যেন ওকে ভালো দেখতে পায় সে। আর বেশি দূর নেই। ওর বুকের কাছে কি যেন দুলে উঠলো। আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অগ্নিরেখা বিরাট প্রশ্ন নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এসে গেল ওদের গ্রামের ঘাটে। এবার খোকার সঙ্গে দেখা হবে।

কতদিন খোকাকে সে দেখেনি। ওর মুখ যেন আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। খোকার মুখ যেন সে ভুলে গিয়েছে। খোকার মুখের কথা এতদিন যেন আরব্য রজনীর উপকথা ছিল—আজ তা কি এতকাল পরে বাস্তবে রূপ নেবে? সত্যিকার খোকা ওর সামনে এসে দাঁড়াবে? স্বপ্নের খোকা নয়, কত বিনিদ্র রজনীর স্বপ্নের সঙ্গে তার তফাৎ থাকবে তো? এই পরম মুহূর্ত্তটির জন্যে যেন বিশ্ব সৃষ্টি। সমস্ত বিরাট নভোমণ্ডলের ঘূর্ণ্যমান নেবুলারাজি, মৃগশিরা, সপ্তর্ষি, শুকতারা, কালপুরুষ, সব নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণশীল, শুধু তার এই পরম মুহূর্ত্তটি সম্ভব ও সার্থক করে তুলবার জন্যে। নইলে ওসব অসার, মিথ্যে, অর্থহীন। প্রেম নেই যে-বিশ্বে, সেটা আবার কি একটা বিশ্ব? সে ধূমভস্ম হয়ে মহাব্যোমে মিলিয়ে যাক না, কে দেখচে! কিসের সার্থকতা ওর অস্তিত্বের? সর্ব্বংসহা ধরিত্রীমাতার কোলে যাপিত এই মধুর মুহূর্ত্তগুলি প্রেমের বাণী দিক্ থেকে দিগন্তরে, নীহারিকা থেকে নীহারিকান্তরে, এক নাক্ষত্রিক দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে পড়চে, তাই বিশ্ব বেঁচে আছে, বিশ্ব দীর্ঘজীবী হয়ে আছে। নতুবা বিশ্ব নাভিশ্বাস তুলে খাবি খেতো।

ওদের পাড়ার ঘাটে নৌকো লাগলো। কচুবনে ঝিঁ ঝিঁ ডাকচে। অন্ধকার বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে পথ। শেয়াল ডাকলো কেন? শেয়াল ডাকা কি ভালো? জোনাকি জ্বলচে তেলাকুচোর ঝোপে।

নিমাই জেলের সঙ্গে দেখা, সে জাল কাঁধে নিয়ে নদীর দিকে যাচ্চে। বল্লে—কেডা যায়?

ও বল্লে—আমি সীতেনাথ। নিমাই ভালো আছ?

—কে, খুড়োমশায় আলেন? ভালো আছেন?

নিমাই যেন দ্রুতপদে চলে গেল। আর কোনো কথা বল্লে না কেন? বাড়ীর সবাই ভালো আছে তো? নিমাই অত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন? যেন সামনে থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে! হয়তো তা নয়—হয়তো ওর মাছ ধরবার সময় বয়ে যাচ্চে, এই জন্যেই সে ছুটেচে নদীর দিকে।

এই তো কাঁটালতলা দিয়ে রাস্তা। সামনে শম্ভু চক্কত্তির বাড়ী। শম্ভুদা চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়িয়ে ছিল। বল্লে—কে? সীতেনাথ? বাড়ী এলে? নৌকোয়?

—হ্যাঁ দাদা!

—আচ্ছা যাও।

আর কিছু বল্লে না কেন শম্ভুদা? বাড়ীতে খোকা কেমন আছে এ কথা জিগ্যেস করতে সাহস হল না ওর। আচ্ছা, শম্ভুদার মুখে একটা—কি একটা ঢাকবার চেষ্টা করচে বলে মনে হল না?

বামে শব শিবা কুম্ভ,
দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ।

মড়াটা তখন কোন্‌দিকে ছিল, যখন ও প্রথম মড়াটাকে দেখলে?

ঐ তো বাড়ী। অন্ধকার মত কেন? আলো জ্বলছে না কেন রান্নাঘরে? ওর পা বেজায় ভারী হয়ে গিয়েচে। পা আর চলচে না। গলা আড়ষ্ট হয়ে আর স্বর বার হচ্চে না। বাড়ীতে সুধা আর খোকা আর একটা ঝি ছাড়া আর কেউ থাকে না! কার নাম ধরে ডাকবে? ঝিয়ের না সুধার? না খোকনের?…

…না। পা এত ভারী কেন? ডাকতে গিয়ে গলা দিয়ে স্বর বার হয় না কেন? সারা পথ সাহেবগঞ্জ থেকে আজ দুদিন একরাত্রির আকুল প্রতীক্ষার পরে নিজের ঘরের দোরে এসে প্রাণের ধারা শুকিয়ে গেল কেন? কি হয়েচে বাড়ীতে? নিমাই জেলে কথা বল্লে না কেন? শম্ভু চক্কত্তির সঙ্গে এতকাল পরে দেখা, সেও ভাল করে কথা কইলে না কেন?

বাঁশবন, তেঁতুল গাছের নীচে অন্ধকার বাড়ীটা ওর আড়ষ্ট মুখের ও মরা ছাগলের চোখের মত অর্থহীন চোখের দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

কোনো কথা বল্লে না।

তেঁতুলের ডালে লক্ষ্মী-পেঁচার কর্কশ আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ঝট্‌পট্ করে উড়ে যাওয়ার শব্দ।

চমকে শিউরে উঠলো সীতানাথ।

এমন সময়ে পথের ওপর আলো এসে পড়লো। কারা আসচে ওদিক থেকে। গলার স্বর শোনা যাচ্চে।

সুধার গলা যেন ?

পরক্ষণে বিনোদের মা ঝি লণ্ঠন নিয়ে পথের সামনে এসে পড়লো। পেছনে সুধা ও তার কোলে খোকা। লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল স্পষ্ট। বিনোদের মা চেঁচিয়ে বলে উঠলো—ও মা, এ যে দাদাবাবু অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে! আমরা গিইলাম রায়-বাড়ী সত্যনারানের সিন্নির পেসাদ পেতে বাড়ী চাবি দিয়ে—

আর কোন কথা ওর কানে গেল না।

খোকা হঠাৎ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে দেখছিল। পরক্ষণেই সে মার কোল থেকে নেমে দৌড়ে হাত বাড়িয়ে ওর দিকে ছুটে আসতে আসতে বল্লে—বাবা—ও বাবা—তুই কোথায় গেইলি ? আমার জন্যে মুকি এনেচ ?···ও বাবা—

তারপরে ওর গলা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো, সীতানাথ নীচু হয়ে ওকে কোলে তুলতে গেল। খোকা আদরের সুরে বল্লে—বাবাই—মুকি এনেচ বাবাই ?

হরিকাকা

হরিকাকার আসল নাম ছিল হরিপ্রাণ মুখুজ্জে। নামটা শুনতে ভক্তের মত হলেও হরিকাকা আদৌ ভক্ত ছিলেন না। ছিলেন অত্যন্ত দুঁদে, মাতাল, প্রবল-প্রতাপান্বিত, কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য, পরপীড়নদক্ষ, আরও কত কি। অল্প কিছু জমিদারী ছিল, তারই আয়ে দিন চলে যেত। স্বর্গে মর্ত্যে হরিকাকা কাউকে গ্রাহ্য করতেন না, অথচ তাঁর দাপটে মেদিনী কাঁপতো।

রাস্তা দিয়ে কেউ হয়তো টেরি কেটে গাঁন গাইতে গাইতে চলেচে, হরিকাকা হুকুম দিতেন—ধরে নিয়ে এসো তো ব্যাটাকে। এই, কে যাচ্চ, শোনো ইদিকি।

রায় জেলের ছেলে শ্যামাচরণ। আজকালকার ছেলে বলে সে একটু শৌখিন মেজাজের, একখানা রাঙা গামছা কাঁধে, পান চিবুতে চিবুতে সে যাচ্ছিল সৌরভী জেলেনীর বাড়ী আড্ডা দিতে।

হরিকাকা বল্লেন—কে, শ্যামাচরণ ? টেরি কেটে রাগিণী ভেঁজে যাচ্চ কোথায় ? বাপের পয়সাটা কি আজকাল বেড়েচে ?

শ্যামাচরণ নিরুত্তর।

—বলি, কানে কথা গেল না ? উত্তর দাও।

শ্যামাচরণ অধোমুখে দণ্ডায়মান।

—টেরি ভাঙো আমার সামনে? মুখ বুজে চলে যাও আস্তে আস্তে। কখনো আর অমন না দেখি।

শ্যামাচরণের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

একবার গ্রামের বৃদ্ধ প্রসন্ন রায়ের কাছ থেকে হৃদয় ঘোষের ছেলে বাবুরাম দু'টাকার বাঁশ কেনে। প্রসন্ন রায়ের অবস্থা খুব খারাপ, তার ওপর তিনি চোখে ভালো দেখেন না। বাঁশের টাকার জন্যে বাবুরামের বাড়ী হেঁটে প্রসন্ন রায়ের পায়ে ব্যথা হয়ে গেল, তবুও টাকা আদায় করা গেল না। আজ বলে কাল দেবো, কাল বলে শনিবার দেবো। দুমাস এভাবে কাটাবার পরে একদিন প্রসন্ন রায় লাঠি ধরে অতি কষ্টে তার বাড়ী গিয়ে তাগাদা করতেই বাবুরাম রেগে উঠে বুঝি বলেছিল—যান যান ঠাকুর, অত তাগাদা কেন? দুট্যাকার বাঁশ নিয়ে মুই তো আর পেলিয়ে যাই নি। মোর যখন হাতে হবে তখন ট্যাকা দেবো। যান আপনি—

এর উত্তরে প্রসন্ন রায় দু এক কথা কি বলে থাকবেন।

তখন সে প্রায় মারে আর কি প্রসন্ন রায়কে। চেঁচিয়ে উঠে বলে—যাও ঠাকুর, তোমার এক পয়সা ধারিনে! কি করবে করগে যাও।

প্রসন্ন রায় এসে হরি রায়ের দরবারে অভিযোগ জানালেন। হরিকাকা অঘোর মুচিকে হুকুম দিলেন—ধরে নিয়ে এসো তো ব্যাটাকে। দেখি ওর কতদূর প্রতাপ হয়েচে।

অঘোর মুচি বিখ্যাত লাঠিয়াল, সে হুকুম পেয়ে ঘাড় ধরে নিয়ে এল বাবুরাম ঘোষকে। হরিকাকা বল্লেন—তুমি প্রসন্নদার বাঁশের টাকা ধারো?

বাবুরাম তখন ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপচে। সে বল্লে, আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

—তবে দাও নি কেন?

—আজ্ঞে হাতে নেই।

—তবে গরিব ব্রাহ্মণের বাঁশ কিনতে গিয়েছিলে কেন?

—আজ্ঞে ভুল হয়ে গিয়েচে।

—ও সব বাজে কথা ছাড়ো। আজ তুমি ওঁকে যা তা বলেচো কেন? বড্ড নবাব হয়ে গিয়েচো নাকি? কানমলা খাও।

তখুনি বাবুরাম কানমলা খেলে বিনা প্রতিবাদে।

—আচ্ছা যাও, এই দু'টাকা আমি এখুনি দিয়ে দিচ্চি। তুমি আমাকে কাল সন্দের মধ্যে যেখান থেকে পারো টাকা দিয়ে যাবে। যাও চলে যাও।

এই রকম ছিল হরিকাকার বিচার।

গ্রামের বিপদে আপদে হরিকাকা সকলের আশ্রয়স্থল ছিলেন। পর-পীড়নে যেমন দক্ষ, পরোপকারেও তেমনি অগ্রণী। গায়ে শক্তি ছিল অসাধারণ। চামটার বিল করার সময় জমিদারের পক্ষ হয়ে নিজে লাঠি ধরে প্রতিপক্ষ মুসলমানদের হটিয়ে দিয়েছিলেন শোনা যায়। মুসলমানরাও খুব মানতো হরিকাকাকে। তাদের পারিবারিক বিবাদে হরিকাকা সালিশি

করে গোলমাল মিটিয়ে দিতেন। পাঁচ গ্রামের মোড়লরা তাঁর কাছে এসে পরামর্শ করতো, খেতে না পেলে এসে ধান নিয়ে যেতো। এমনও হয়েচে অভাবগ্রস্তদের ধান বিলিয়ে দিয়ে নিজের গোলা শূন্য করে ফেলেছেন হরিকাকা, তখন অপরের ওপর জুলুমবাজি করে ধান নিয়ে এসেচেন, দাম দেন নি। পরের স্ত্রী বা পরের মেয়ের দিকে একবার কেউ আড়চোখে তাকিয়েচে ঘাটের পথে, কিংবা, টপ্পা গানের এক কলি গেয়ে উঠেচে, অমনি সেই মেয়ের কর্ত্তপক্ষের অভিযোগে সেই হতভাগ্য প্রণয়লোভী যুবককে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের বকুলতলায় যেদিন আগাগোড়া জুতোপেটা করে ছাড়লেন—সেই দিনই হয়তো গ্রামের কুমোরপাড়ার কেষ্ট কুমোরের বিধবা মেয়ে কুসীর ঘরে তাঁকে মদ খেয়ে ডুগিতবলা বাজাতে শোনা গেল রাত একটা পর্য্যন্ত।

একদিন হয়তো দেখা গেল কুসীকে নিয়ে নৌকোয় হরিকাকা হার্মোনিয়াম বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে মহকুমা শহরের দিকে বাচ্ খেলে চলেচেন—সঙ্গে অবিশ্যি বন্ধুবান্ধব দু'চারটি আছে। সেই বন্ধু আবার কেমন? হরে মাইতি, বনোদর ঘরামির বড় ছেলে হাফেজ, রস্কে মাল, দীনু সর্দ্দার ইত্যাদি।

নবীন চক্কত্তি গ্রামের পুরোহিত ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি শুনে ঘাড় নেড়ে বলতেন—নাঃ, রামপ্রাণ দাদার ছেলে। অমন নিষ্টেকাষ্ঠা হিন্দু এ দিগরে ছিল না। তার ছেলে কিনা মুচি মোচনমান এয়ার নিয়ে মাইফেল করে বেড়াচ্চে! লজ্জাও করে না।

এর এক হপ্তা পরেই পড়লো দুর্গাপূজা। বারোয়ারী তলায় দুর্গোৎসবের ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ, নৈবেগু সাজানো, ভোগ রাঁধা, বলিদানের ব্যবস্থা, প্রসাদ বণ্টন, মায় আরতির আয়োজন, সমাগত মহিলাদের মধ্যে শেতলের ফলমূল বিতরণ প্রভৃতি সমস্ত কাজের মধ্যে রাঙা গামছা মাজায় বেঁধে ঘর্মাক্ত দেহে কে ঐ দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, পৈতে-গলায়-মালা-করে-পরা লোকটি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে সকাল থেকে রাত ন'টা পর্য্যন্ত?

হরিকাকা।

দীননাথ মুখুজ্জের মাতৃশ্রাদ্ধে ঐ রাঙা গামছা মাজায় বেঁধে, ঐ পৈতে মালা করে গলায় পরে সারাদিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের সারিতে ভীষণ খেটে পরিবেশন করচে কে? সামান্য একটু চিনির পানা খেয়ে?—হরিকাকা।

হরিকাকার এই অবস্থা দেখে কে বলবে ইনি কর্ম্মী ও ভক্ত-পুরুষ নন!

মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া হরিকাকার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। যে কোনো মোকদ্দমায় যে কোনো বিষয়ে সাক্ষী দিতে ওঁর মত ওস্তাদ বড় কেউ ছিল না গ্রামে। মহকুমার কোর্টেও সবাই ওঁকে চিনতো। প্রতিপক্ষের উকিলের সাধ্য কি জেরা করে হরিকাকাকে দমিয়ে দেয়। সেই জন্যে মিথ্যে সাক্ষী দিতে সবাই ডাকে ওঁকে। সকলের কাছে খুব আদর। বেশ কিছু আয়ও হয়, আর বিষ্ণু ময়রার দোকানে গরম লুচি, তরকারী, সন্দেশ, পেট ভরে খাওয়াও চলে।

সারাজীবন এইভাবে কাটিয়ে হরিকাকার এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এল আটচল্লিশ বৎসর বয়সে। সেই কথাটা বলবার জন্যেই হরিকাকার এই ইতিহাসের অবতারণা।

আমাদের গ্রাম থেকে দুক্রোশ দূরে নিবান্ধা-মদনগঞ্জের বাঁওড়। এখানে অনেক দিন থেকে এক পুরনো শিবমন্দির আছে। সেবার সংবাদ রটে গেল কোথা থেকে এক ভৈরবী এসে বাঁওড়ের ধারের মন্দিরে রয়েচেন। এও রটে গেল ভৈরবীর বয়স কম, এবং নাকি সুন্দরী। এই গুজব চাউর হবার পর দলে দলে লোক রওনা দিতে লাগলো, ভৈরবীর দর্শনের আশায়।

ভৈরবীর কাছে লোক-যাতায়াতের ফলে কথাটা আরো বেশি রটে গেল যে ভৈরবীটি তরুণী, রূপসী!

হরিকাকা মাছ ধরতে যেতেন নৌকো করে নিবান্ধার বাঁওড়ে। তাঁরা বর্ষার প্রথমে, গাঙে ঘোলা আসবার প্রথম সপ্তাহে, ভীম মাঝির সতেরো পদ ডিঙি ভাড়া করে রাম পাল এবং ছিবাস কর্ম্মকারের সঙ্গে তামাক, টিকে, হুঁকো, কল্কে, ছিপ, হুইল, বোতল ইত্যাদি আয়োজন ও উপকরণ সমভিব্যাহারে প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে নিবান্ধা-মদনগঞ্জের খেয়াঘাটের বাঁ পাশে একটা পুরনো জামগাছের তলায় মাছ ধরতে বসতেন। এবারও গিয়েছিলেন। গিয়ে সুন্দরী ভৈরবীর কথা শুনেছিলেন নিশ্চয়।

হরিকাকা নাকি একাই একদিন মন্দিরে যান ভৈরবীকে দর্শন করতে। যাঁরা হরিকাকাকে জানেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন হরিকাকার সেখানে যাওয়াটার মধ্যে আধ্যাত্মিক কৌতূহল ততটা ছিল না, যতটা ছিল একটি নিঃসহায় সুন্দরী নারীকে ভালো ক'রে দেখবার ও ফাঁদে ফেলবার দুষ্ট মতলব।

কিন্তু এই যাওয়ার ফল কি হয়েছিল, সেটা এ অঞ্চলের লোকের কাছে এখনো মানুষের জীবনের একটি রহস্যময় ঘটনা হিসেবে বিখ্যাত।

এই সময়টা আমি মহকুমার বড়স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে স্কুলের বোর্ডিংএ চলে যাই। পূজোর ছুটিতে বাড়ি এসেচি, হরিকাকার মস্ত বড় চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দিয়ে আসবার সময় দেখি বকুলতলায় লোকজন নেই, চণ্ডীমণ্ডপের আগড় বন্ধ, বকুলতলায় কাঠের বেঞ্চিগুলো পাতা নেই—যেন ভোঁ ভোঁ—ব্যাপার কি?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবচি, এমন সময় বাড়ীর মধ্যে থেকে একটা কাঠা হাতে রাঙা খুড়ীমা বার হয়ে এলেন। আমাকে সদর রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বল্লেন—কে, নিপু? বাবা এলি? ভালো আছিস? আর বাবা, কি দেখচো, আমার যা হবার খুব হয়ে গিয়েচে—

আমি এত অবাক হয়ে গিয়েচি যে প্রণাম পর্য্যন্ত ভুলে গেলাম। রাঙা খুড়ীমার তো বিধবার বেশ নয় দেখচি। তবে কান্নার কারণ কি? বল্লাম—কি হয়েচে খুড়ীমা? কাকা কোথায়?

—সে সব শুনবে বাড়ী গিয়ে। সবাই জানে। আর বাবা, আমার কপালে যা হবার ছিল, খুব হল।

বাড়ী গিয়ে প্রথমেই মাকে জিজ্ঞেস করলাম—হরিকাকার কি হয়েচে মা? রাঙা খুড়ীমা কাঁদছিলেন কেন?

—ভালোই হয়েচে তো রাঙাদিদির মিথ্যে কান্না।

—কি হয়েচে?

—সন্নিসি হয়ে গিয়েচে।

—কোথায়?

—তা কে জানে। সন্ধান নেই।

—সে কি!

—অনেক সন্ধান করা হয়েচে। কেউ কিছু জানে না।

—হরিকাকা সন্নিসি হয়েচে, একদম নিরুদ্দেশ, কদ্দিনের কথা এসব?

—মাস দুই হল একদম নিরুদ্দেশ।

—তার আগে কোথায় ছিলেন?

—নিবান্ধার সেই ভৈরবীর নাম শুনে গিয়েছিলি?

—মনে হচ্চে কথাটা।

—সেই ভৈরবীর ওখানে পড়ে থাকতো।

—ভৈরবী কোথায়?

—নিবান্ধার মন্দিরেই আছে। কালও আমাদের পাড়া দিয়ে ভিক্ষে করে গেল। রূপে গাঁ আলো করে গেল একেবারে। হরি ঠাকুরপো ভৈরবীর কাছে মন্ত্র নিয়ে না কি নিয়ে ভগবান জানেন, একদম উধাও। রাঙাদিদি কেঁদে কেঁদে খুন—একটা কথাও বলে যায় নি বেচারীকে। একে ছেলেপুলে নেই, কি বিপদে যে পড়েচে!

না, কেউ কোনো অপবাদ রটাতে পারে নি হরিকাকার নামে, গাঁয়ে সকলের মুখেই এক কথা। ধন্য ভৈরবীর ক্ষমতা! এমন লোকের এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন বুড়ো বয়সে। সারা জীবন মদ-ভাং খেয়ে। সুন্দরী ভৈরবী তো এখানেই রয়েচে! কারো কিছু বলবার উপায় কি? ধন্য ধন্য করচে সবাই এবং আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, রাঙা খুড়ীমার ওপর কারো তেমন সহানুভূতি নেই। বেশ তো, একটা অসৎ লোকের যদি সৎ পথে পা দেবার প্রবৃত্তি হয়ে থাকে, তাতে রাঙাদিদি দুঃখ না করে বরং আহ্লাদ করুন—ভাবটা এই রকম সাধারণের মনের।

ক্রমে ক্রমে সব শুনলাম ঘটনাটা। তবে একটা কথা, এই সব ঘটনার পক্ষে সাক্ষী কেউ ছিল না। ভৈরবীর সঙ্গে হরিকাকার সাক্ষাৎকারের ইতিহাস চিরকাল লুপ্ত থেকে যেতো, যদি না সেখানে আরামডাঙার মধু হাড়ি উপস্থিত থাকতো। জনকয়েক লোক সব সময়েই ভৈরবীর ওখানে জুটতো গাঁজা খাওয়ার লোভে।

প্রথম দর্শনের ঘটনাটা এই রকম ঘটে—

ভৈরবী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে হরিকাকার দিকে।

হরিকাকা খানিকটা অবাক হয়ে চেয়ে ছিলেন ভৈরবীর দিকে। মুখে খানিকক্ষণ কথা ছিল না।

ভৈরবী বল্লে—কোথা থেকে আসা হচ্চে?

—আজ্ঞে, কইখালি থেকে।

—ও।

—আপনাকে দর্শন করতে এলাম।

—বোসো বাবা।

—বসি।

—কি কর?

—আজ্ঞে, বিষয়-কর্ম্ম করা হয়।

—ব্রাহ্মণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কুলীন ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ মা, আমার নাম হরিপ্রাণ মুখুজ্জে, তিনপুরুষে ভঙ্গী। সদানন্দ মুখুজ্জের সন্তান। গাঁওন-ঘাটি গাঁই।

—আমাকে প্রণাম করলে কেন বাবা, তুমি কুলীন ব্রাহ্মণ? আমি তোমার কত ছোট! বলেই ভৈরবী নাকি হরিকাকাকে গড় হয়ে প্রণাম করেছিল।

হরিকাকা নীরবে সেখানে বসে ছিলেন অনেকক্ষণ, এমন কি মধু হাড়ির দল যখন সন্ধ্যার আগে সেখান থেকে উঠে চলে এল—তখনো হরিকাকা সেখানে চুপ করে বসে আছেন। অনেক রাত্রে সেদিন তিনি বাড়ী এলেন, চোখে কেমন যেন ফ্যালফেলে দৃষ্টি। রাঙা খুড়ীমার মুখে একথা শোনা। সারারাত হরিকাকা কেবল নাকি পায়চারি করেছেন আর বার বার বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসেচেন। জিগ্যেস করলে বলেছিলেন, বড্ড গরম হচ্চে। সকালে উঠেই কোথায় চলে গেলেন—দুপুর গড়িয়ে গিয়েচে তখন বাড়ী এলেন। কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাব। খুড়ীমাকে বল্লেন—দশটা টাকা দিতে পারো?

—কেন গা?

—ঠাকুরের পূজো দেবো।

—কি ঠাকুরের?

—নিবান্ধার মন্দিরে যে ঠাকুর ছিল, এ্যাদ্দিন কেউ জানতো না। ভৈরবী জাগ্রত করেচে সেই ঠাকুর।

—ভৈরবী তোমায় তুকগুণ করেনি তো?

—পাগল!

—আমার ভয় করচে কিন্তু।

—যেদিন বুঝবে সেদিন আর ভয় করবে না। ভয় কিসের? কোনো ভয় নেই।

এর কয়েক মাস পর পর্যন্ত হরিকাকা রোজই বাড়ী আসতেন, কিন্তু ক্রমশ তাঁর ধরন-ধারণ বদলাতে লাগলো। অন্য কোনো বাইরের পরিবর্ত্তন—গেরুয়া বস্ত্র ধারণ, বা নিরামিষ আহার—এসব নয়। মদ খাওয়া একদম বন্ধ হল। বাজে লোক নিয়ে আড্ডা আদৌ দেন না।

পরকে শাসন করা, চোখ রাঙানো ভুলেই গেলেন।

একদিন ঘাটের পথে নির্জ্জন বাঁশ বনে সন্ধ্যার কিছু আগে রামযাদু জেলের বিধবা অল্পবয়সী পুত্রবধূ তার আড়াই বছরের ছেলের সঙ্গে নদীর ঘাট থেকে ফিরচে—এমন সময় হঠাৎ হরিকাকাকে সামনে দেখে মেয়েটি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। হরিকাকার ভয়ে পাড়ার ঝি-বৌয়েরা অনেকদিন থেকে একা নদীর ঘাটে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, একথাটি আগে বলা দরকার।

মেয়েটি থমকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সর্ব্বনাশ! হরি মুখুজ্জে যে এগিয়ে আসেন তার দিকে! খোকা পিছিয়ে এসে ততক্ষণ মায়ের আঁচল মোক্ষম জড়িয়ে ধরেচে, তার ভীত দৃষ্টি হরিকাকার মুখের দিকে নিবদ্ধ।

হরিকাকা কিন্তু মেয়েটির কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহ সুরে বল্লেন—মা, ভয় কি? নির্ভয়ে ঘাটে পথে বেরিও মা। এই খোকাকে কষ্ট দিয়ে কেন সঙ্গে এনেচ? ও কি এতটা পথ হাঁটতে পারে? ছিঃ—কোনো ভয় নেই। তুমি আমার মেয়ের সমান। আমি তোমার বাবা, বাবাকে দেখে ভয় কি মা? যাও।

মেয়েটি হেঁট হয়ে হরিকাকাকে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এসে পাড়ার মেয়েমহলে একথা জানায়। এর দুতিন দিন পরে রামযাদু একটা কাতলা মাছ হাতে হরিকাকার বাড়ী এসে তাঁকে দিয়ে বল্লে—আপনার মেয়ে পেটিয়ে দিয়েচে। বল্লে, মোর বাবাঠাকুরকে দিয়ে এসো। তা নেন দয়া ক'রে।

হরিকাকা চণ্ডীমণ্ডপে বসে তেল মাখছিলেন, কাছে নিরু গোয়ালিনী বসে দুধের হিসাব করছিল, চোখ তুলে বল্লেন—কি? কিসের মাছ?

—আপনার মেয়ে পেটিয়েচে। জেয়ানাতে পেয়েলাম, আপনার মেয়ে বল্লে, বাবাকে দিয়ে এসো—

—ও হবে না।

—কেন বাবা ঠাকুর?

—গরিব লোকের মাছ আমি বিনি পয়সায় নিতে পারবো না।

এ ধরনের কথা এ অঞ্চলে কেউ কখনো বলে না, বিশেষ করে হরিকাকা তো এমন প্রকৃতির লোকই নয়। রামযাদু একটু অবাক না হয়ে পারলে না। তবুও মাছটা সে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল, হরিকাকা বল্লেন—না, শোন, ও রামযাদু, মাছ আমি নেবো না। ওর ন্যায্য দাম দেওয়ার আমার ক্ষমতা নেই। সুতরাং মাছও আমি নেবো না—

শেষ পর্য্যন্ত রামযাদুকে মাছ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হল। রামযাদুর স্ত্রী এর পর একসময়ে এসে খানিকটা কাটা মাছ রাঙা খুড়ীমার কাছে লুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

এই রকম দু'একটা নতুন ধরনের কাজ করার পর হরিকাকা একদিন সকালে উঠে ভৈরবীর মন্দিরে চলে গেলেন—আর ফিরলেন না। ভৈরবীর কাছে সন্ধান নেওয়া হয়েছিল।

সেখানকার সকলেই বল্লে ধোপার বাড়ী কাপড় দেবেন বলে তিনি সকাল সকাল উঠে চলে গিয়েছিলেন।

অনেক দিন কেটে গেল তারপর।

রাঙা খুড়ীমা আরো কিছুদিন পরে বাপের বাড়ী চলে গেলেন। বছর-দুই পরে তাঁর এক ভাইপো এসে এখানকার বিষয়-আশয় বিক্রী করে চলে গেল, তার মুখে শুনলাম রাঙা খুড়ীমার মৃত্যু হয়েচে।

জিনিসটা মিটে গেল। আমাদের গ্রামের মধ্যে হরিকাকার ইতিহাস একটা মনোহর কাহিনীতে পর্য্যবসিত হয়ে গেল। ওদের ভিটেতে ঘন জঙ্গল হয়ে গেল, দিনমানে সেখানে নাকি বাঘ লুকিয়ে থাকে, শুধু দাঁড়িয়ে রইল সিংহদরজাটা—কাঠ থামালের মাথায় দুটো বড় জিউলি গাছ আর একটা অশ্বত্থ গাছ নিয়ে। কাঠের কবাট দুটোও কারা খুলে নিয়ে গেল কিছুকাল পরে।

আমি কলকাতায় চাকরি করি, সস্তা ভাড়ায় দেশভ্রমণ করতে বেরিয়েচি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। সারনাথ যাবার পথে পাঁড়েপুর নেমেচি আমরা, সেখানকার বিখ্যাত ক্ষীরের পানতুয়া খাবার জন্যে। রামলীলা উৎসবের জন্যে পাঁড়েপুর চৌমাথার মোড়ে একটা উঁচু মাচা বেঁধেচে, সেটা রঙিন কাগজের মালায় সাজাবে, লোকজনও অনেক জমেচে তার চারিধারে। আমাদের টাঙাওয়ালা দুজন বল্লে—বাবুজি, টাঙা এগিয়ে গাছতলায় রাখি।

—কেন?

—ইঁহাপর বহুৎ ভিড় জমতা। লেকিন দেরি মাৎ কিজিয়ে আপলোগ, সাম হো যায়গা—

আধঘণ্টা পরে যখন পেট পুরে সস্তা ক্ষীরের পানতুয়া খেয়ে আমরা সাতজন বন্ধু টাঙার সন্ধান করলাম, টাঙা আর নেই! সে কি, টাঙা গেল কোথায়?

হরিধন বল্লে—এগিয়ে দেখা যাক আরো। গাছতলায় থাকবে বলেছিল—এই তো গাছতলা। দেখি কতদূর গেল।

রশি-দুই পথ এগিয়ে বাঁকের মাথায় টাঙা দুখানা দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল। সেইখানে গাছতলায় এক সাধুর আসনের চারপাশে অনেকগুলি লোক জুটেচে, টাঙাওয়ালা দুজনও সেখানে জমেচে।

আমরা বকাবকি করতে একজন টাঙাওয়ালা বল্লে—বাবুজি, বাঙালী সাধু হ্যায়!

সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। কোথায়, ওই সাধু নাকি? বাঙালী?

এইভাবে আবার হরিকাকার দেখা পেলাম।

আমি চিনি নি, তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লেন—বিষ্টু দাদার ছেলে অমল না?

আমি অবাক। বন্ধুরা অবাক। আমি কখনই এই অপরিচিত পরিবেশে এই জটাজুটধারী দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সাধুকে আমাদের সেই হরিকাকা বলে চিনে নিতে পারতাম না, দীর্ঘ তেরো

চোদ্দ বছর পরে। কিন্তু তাঁর গালের আঁচিল আমার অত্যন্ত পরিচিত, শৈশবের আবেষ্টনীতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে ফেললো। রাঙা খুড়ীমার কান্নাভরা চোখ মনে এল, কি জানি কেন ওঁদের সেই জঙ্গলে-ভরা সিংদরজাটার কথা মনে হল। আমিও দেশের বাড়ী ছেড়েচি পাঁচ ছ' বছর। হঠাৎ এভাবে বাল্যের হরিকাকার দেখা পেয়ে সারনাথ ভুলে গেলাম, বন্ধুবান্ধবদের ভুলে গেলাম, গণেশ মহল্লায় প্রসিদ্ধ রামলীলা উৎসবের কথা ভুলে গেলাম। বন্ধুদের বল্লাম—তোমরা সারনাথ যাও, আসবার সময় আমায় নিয়ে নিও—কিংবা আমি আজ না হয় পাঁড়েপুর থেকেই যাই—

ওরা বল্লে—কোথায় থাকবি এখানে?

—একটা হোটেল কিংবা সরাই—

—না, সে সবে দরকার নেই। আচ্ছা তুমি গল্প কর দেশের লোকের সঙ্গে। যাবার সময় যেও।

ওরা চলে গেল। নীল প্রশান্ত আকাশ। বড় আমগাছের ছায়াভরা বীথি। বুদ্ধদেবের চরণপূত সারনাথ কাছে। সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মাতাল হরিকাকা সন্ন্যাসী। কি অদ্ভুত লাগছিল আজকের এই দিনটা।

আমি আমতলায় বসে পড়লাম। বৃদ্ধ সাধু বল্লেন—তুমি এখানে কি ভাবে?

—সারনাথ যাচ্ছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে।

—কি কর?

—টেকনিকেল স্কুলে মাস্টারি করি বালিগঞ্জে। আপনি কি এখানে থাকেন?

—না। দিন পনেরো আগে এসেচি কাশী থেকে।

কত কথা মনে হচ্ছিল। কোন্‌টা আগে বলবো, কোন্‌টা জানতে চাইব? রাঙা কাকীমার মৃত্যুসংবাদ দিলাম। হরিকাকার মুখের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হল না। চুপ করে রইলেন। বল্লেন—তোমার বাবা কেমন আছেন?

—মারা গেছেন আজ সাত বছর।

—গাঁয়ের আর সবাইকার কি খবর?

মোটামুটি বললাম যতদূর সম্ভব। গত পাঁচ বছরের খবর আমিও ঠিকমত জানি না বললাম। বেশী কিছু কথা হবার পূর্ব্বেই বন্ধুরা পাছে এসে পড়ে—এই ছিল আমার ভয়। কোন্ কথাটা আগে জিগ্যেস করবো? হঠাৎ বল্লাম—কেমন আছেন হরিকাকা? হরিকাকা ধীরে ধীরে বল্লেন—খুব শান্তিতে, খুব আনন্দে আছি বাবা।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—অনেক অপরাধ করেছিলাম জীবনে না বুঝতে পেরে। তিনি দয়াময়, সব ক্ষমা করবেন। আমরা তাঁর সন্তান। তিনি না ক্ষমা করলে যাচ্ছি কোথায়।

—এখন এখানেই থাকবেন?

—বাবা, আমরা এখনো বহুদূর। কুটীচকে পৌঁছতে এখনো দেরি আছে। কবে কোথায় থাকি ঠিক নেই। তিনি যেখানে নিয়ে যান সেখানে যাবো। তিনি এখানে এনেছিলেন তাই তোমার সঙ্গে দেখা হল।

—গাঁয়ে ফিরতে ইচ্ছে হয় না কাকাবাবু?

—আগে আগে হত, এখন আর হয় না বাবা। তোমার খুড়ীমা চলে গিয়েচেন, এখন আর কোন বন্ধনই নেই। কি দেখতে যাবো?

—খুড়ীমা মারা গিয়েচেন আমার মুখে শুনলেন তো?

—না।

—কেউ চিঠি লিখেছিল?

—না। থাক সে কথা বাবা।

ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধবদের দল এসে পড়লো। হরিকাকাকে তারা পাঁড়েপুরের পানতুয়া কিনে দিলে এক ভাঁড়। হাসিমুখে গ্রহণ করলেন। আমরা সবাই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলাম। ওঁকে একা গাছতলায় ছেড়ে দিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না। আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করলেন। টাঙায় উঠবার সময় আমার চোখে জল এল।

পথিকের বন্ধু

মহকুমার টাউন থেকে বেরুলাম যখন, তখনই বেলা যায় যায়।

কলকাতা থেকে আসছিলাম বরিশাল এক্সপ্রেসে। বারাসাত স্টেশনে নিতান্ত অকারণে (অবশ্য যাত্রীদের ব্যাখ্যা-অনুযায়ী) উক্ত বরিশাল এক্সপ্রেস চল্লিশ মিনিট কেন যে দাঁড়িয়ে রইল দারুব্রহ্মবৎ অনড় অবস্থায় তা কেউ বলতে পারলে না। গন্তব্যস্থান বনগাঁয়ে পৌঁছে দেখি রাণাঘাট লাইনের গাড়ী চলে গিয়েচে।

বেলার দিকে চাইলাম। বেশ উঁচুতেই সূর্য্যদেব, লিচুতলা ক্লাবে খানিকটা বসে আড্ডা দিয়ে চা খেয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটে গেলেও এই পাঁচ মাইল পথ সন্ধ্যার আগেই অতিক্রম করতে পারা কঠিন হবে না?

রামবাবু, শ্যামবাবু, যদু ও মধুবাবু সবাই বেলা পাঁচটার সময় ক্লাবে বসে গল্প করছিলেন। আমায় দেখে বল্লেন—এই যে বিভূতি, এসময় কোত্থেকে?

—কলকাতা থেকে।

—বাড়ী যাবে? ট্রেনে গেলে না?

—ট্রেনটা ফেল হয়ে গেল, বরিশাল এক্সপ্রেস চল্লিশ মিনিট লেট।

—এসো, খুব ভাল হয়েছে এক্সপ্রেস লেট হয়ে। বোসো চা খাও।

তারপর গল্পগুজবে (যার বারো আনা পরনিন্দা) সময় হু হু করে কেটে গিয়ে কখন যে

গোধূলির পূর্ব্বমুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়েচে, তা কিছু বলতে পারি নে। যেতে হবে এখনো অনেকটা রাস্তা, আর দেরি করলে পথেই অন্ধকার হয়ে যাবে, বৃষ্টিও আসতে পারে, কারণ বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। বড় রাস্তায় উঠে সত্যিই দেখলাম আড্ডা দিতে গিয়ে সময়ের আন্দাজ বুঝতে পারি নি। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম, পশ্চিম আকাশে মেঘ করে আসচে।

চাঁপাবেড়ে ছাড়িয়েচি, রাস্তায় জনমানব নেই, পথের দুপাশে ঘন জঙ্গলে পটপটির ফুল ফুটেচে, গন্ধ ভেসে আসছে জোলো বাতাসে, শেয়াল খস্ খস্ শব্দ করে চলে গেল পাতার ওপর দিয়ে দিয়ে, বিলিতি চটকা গাছের ডাল বেয়ে ঝুলে পড়েচে মাকাললতা। কলকাতা থেকে হঠাৎ এসে বেশ লাগচে এই নির্জ্জনতা।

চাঁপাবেড়ের পুল ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েচি, এমন সময় দেখি একটি লোক কাঁধে বাঁক নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্চে।

আমার পায়ের শব্দে সে চমকে পিছন ফিরে আমার দিকে চাইলো।

ওকে এপথে একা দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়েচি। এ বনপথে এ সময় কেউ একা বড় একটা হাঁটে না।

বল্লাম—কোথায় যাবি?

—আজ্ঞে, গোপালনগরে।

—বাঁকে কি রে?

—দই আছে।

—এত দই কি হবে?

—নিবারণ ময়রার বাড়ী বায়না আছে। তেনাদের বাড়ী আজ খাওয়ান দাওয়ান।

—তোদের বাড়ী কোথায়? দই আনচিস কোথা থেকে?

—আজ্ঞে, বেনাপোল থেকে।

—বলিস কিরে, এই দশ মাইল দূর থেকে দই আনচিস! তা এত দেরি করে ফেল্‌লি কেন?

লোকটার কণ্ঠস্বরে মনে হয়েছিল ও আমাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে বাঁচলো এই সন্দে-বেলা। একা যেতে ওর নিশ্চয় ভয় করছিল।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সে গল্প জুড়ে দিলে কেন তার দেরি হল দই নিয়ে রওনা হতে। ওদের একটা গোরু হারিয়ে গিয়েছিল আজ পাঁচদিন। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। আজ দুপুরের পর হিজোলতলার বাঁওড়ে সেই গোরুকে চরতে দেখা গেল। তারপর ওরা দল বেঁধে বেরুলো গোরু আনতে। গিয়ে দেখে বাঁওড়ের ধারে একটা লোক বসে আছে, তার কাছেই ছ'টা গোরু একসঙ্গে চরচে। সবগুলোই বিভিন্ন গ্রামের হারানো গোরু, ক্রমে জানা গেল। লোকটা ত ওদের দেখেই দৌড়—ইত্যাদি।

এইবার বেশ সন্দে হয়ে এসেচে।

বাঁশ-আমবনের ভেতরে ভেতরে ঘুলি ঘুলি অন্ধকার।

সামনে একখানা শুকনো কাঠ উঁচু চটকা গাছের মাথা থেকে ভেঙে পড়তেই ও চমকে

উঠে বল্লে—ও কি ? আমি হাসি চেপে বল্লাম—চটকা গাছের ডাল। লোকটা আশ্বস্ত হয়ে বল্লে—ও।

—তোমার নাম কি ?

—নিধিরাম।

—বাড়ী ?

—কটক জিলা।

—সত্যি ? তুমি তো বেশ বাঙালীর মতো কথাবার্ত্তা বলচো।

—তা হবে না বাবু ? বেনাপোলের কাছে কাগুন্দিয়াতে আমার পনেরো বছর কেটে গেল। ওখানে আমার গোরুর বাথান। কুড়িটা গাই গোরু, পনেরো ষোলটা বক্‌না বাছুর, মস্ত বাথান। রোজ আধ মণ দুধ হয়। এঁড়ে বাছুর আমরা রাখিনে, শুধু বক্‌না বাছুর রেখে দিই। এঁড়ে বিক্রী করে ফেলি বাবু—

লোকটা একটু বেশি বকে। আমাকে পেয়ে ওর বকুনি আর থামতে চায় না। একা যাচ্ছিল, আমায় পেয়ে ও ভারি খুশি হয়েচে, ভরসা পেয়েচে, এই সন্দেবেলা।

বল্লে—বৃষ্টি আর হল না বাবু, কি বলেন ?

—সেই রকমই তো দেখচি।

—এবার বড় দুব্বচ্ছর। আমন ধানের রোয়া হল কই ? বীজপাতা ছিল দু কাঠা ভুঁই। সে বীজ লালচে হয়ে আসচে। ওই দেখুন, কেমন মেঘ করে আসছিল, আবার ফর্সা হয়ে এল। এবার আমাদের এদিকে খুব কম বৃষ্টি হয়েচে। আমন ধানের রোয়া হয়নি, চাষামহলে হাহাকার পড়ে গিয়েচে, ধানের দর ছিল চার টাকা মণ। এখন উঠেচে সাড়ে সাত টাকা মণ। গরিব দুঃখী লোকেরা এর মধ্যে উপোস শুরু করে দিয়েচে।

আমায় আবার বল্লে—গোরুগুলো অনেক কষ্ট করে মানুষ করা। এবার বিচুলি অভাবে মারা পড়বে বাবু।

—কাঁচা ঘাস কেটে খাওয়াবে। বর্ষাকালে কোনো গোরু বিচুলি খায় ? সবই কাঁচা ঘাস খেয়ে বাঁচে।

—বেত্‌না নদীর ধারে আগে আগে কত কাঁচা ঘাস পাওয়া যেতো, এখন সব আঁটি বেঁধে এনে এনে বনগাঁ শহরে বিক্রী করে। শহরে বাবুরা চার আনা চোদ্দ পয়সা এক আঁটি কিনচে। আমাদের গোরুর ঘাস নিয়েই মুশকিল। ওটা কি বাবু ?

এইবার লোকটা চমকে উঠে যেন আমার গা ঘেঁষে এসে থমকে দাঁড়ালো।

আমি বল্লাম—কই, কি ?

—ওই যে সাদা মত ?

চেয়ে দেখলাম, কিছুই না। মাকালতলার মোটা সাদা লতা গাছের ডাল থেকে ঝুলে দুলচে অন্ধকারে। লোকটা দেখচি বিষম ভীতু।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগলো।

আমায় ও বল্লে—বাবু, আপনি কোথায় যাবেন ?

—আমি একটু এগিয়ে ডান দিকের রাস্তায় নেমে যাবো। ওখানেই আমার গাঁ।

—গোপালনগর এখন কত দূর আছে ?

—তা দেড় মাইল।

—পথে কোনো ভয়-টয় নেই তো ?

আমি জোরে ঘাড় নেড়ে বল্লাম—না, ভয় কিসের ? এ অঞ্চলে বাঘ-টাঘ নেই। বুনো শূয়োরও নেই। সে বল্লে—আমি বাঘের কথা বলিনি বাবু—বলি এই—সন্দেবেলা আবার নাম করতে নেই—সেই তাঁদের—

—ও, ভূতপ্রেতের ?

—ও নাম করবেন না সন্দেবেলা। রাম রাম রাম রাম! ও নাম কি করতে আছে এ সময় ? রাম রাম রাম রাম—

আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে বল্লাম—ও, বুঝেচি। তবে একটা কথা, যখন তুমি বিদেশী লোক, তখন তোমাকে সব খুলে বলাই ভালো।

—কি বাবু ?

—দাঁড়াও এখানে। আমি তো এখুনি নেমে যাবো, তুমি একা যাচ্চ এতটা পথ—অন্ধকারে —পথে জনপ্রাণী নেই—। আমার বর্ণনার বহর শুনে লোকটা আরও আমার দিকে ঘেঁষে দাঁড়ায়। আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বল্লে—তারপর বাবু ?

—তারপর আর কি, তোমাকে বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করলে তখন না বলাটাও তো ঠিক নয়। বিশেষ করে একা যখন যাচ্চ। সঙ্গে নেই লোক। ওই যে একটা সাঁকো আছে রাস্তার ওপর বনের পাশে, ওই সাঁকোটা বড় খারাপ জায়গা।

—কেন বাবু ?

—ও জায়গাটাতে ভূত—মানে ওঁরা সব আছেন কিনা। পাশে যে বড় বাগান, ওটার নাম গলায়-দড়ের আমবাগান। বড্ড খারাপ জায়গা। অনেকদিন আগে তখন আমি ছেলেমানুষ, একবার একজন এই তোমার মতই বিদেশী লোক একা যাচ্ছিল গোপালনগরে, সন্দের পর। তার পরদিন সকালবেলা দেখা গেল কিসে তার ঘাড়টা ভেঙে মেরে ফেলে রেখেচে সাঁকোর তলায়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। কথাটা তোমায় বলা উচিত নয়, তবে যখন জিগ্যেস করলে, তখন চেপে রাখাও তো উচিত নয়। একটা বিপদ হতে দেরি লাগে না, তখন তুমি বলতে পারো—বাবু, আপনি জেনে-শুনেও আমায় বলেন নি কেন ? সন্দের পর কেউ ও পথে যায় না। প্রাণ হাতে করে যেতে হয়। আজ বছর দুই আগে এক রাখাল ছোঁড়া দিনদুপুরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সাঁকোর তলায়। যাক সে, তুমি রাম রাম বলতে বলতে চলে যাও, কোনো ভয় নেই।

—বাবু, আপনি কি নেমে যাবেন ?

—হ্যাঁ, আগে আমার গাঁয়ে রাস্তা নেমে গেল। আমি এইবার চলে যাবো।

—তাই তো বাবু, একা আমি কি করে যাবো?

—রাখে কেষ্ট মারে কে? মারে কেষ্ট রাখে কে? কপালে মৃত্যু থাকলে কেউ সামলাতে পারে না। না থাকলে কেউ মারতে পারে না। রাম রাম বলতে বলতে চলে যাও। দাঁড়াও, আজ আবার তিথিটা কি? চতুর্দ্দশী। তিথিটা ভালো নয়। অমাবস্তে, চতুর্দ্দশী, প্রিতিপদ এই তিথিগুলো খারাপ।

—কেন, কেন বাবু?

—সে আর তোমাকে বলে কি হবে? তুমি সন্দের অন্ধকারে একা রাস্তার ওপর—যেতে হবে এখনো তোমায় এক ক্রোশ পথ। ক্রমশ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আসচে। তবে তোমায় বলা আমার উচিত—বিদেশী লোক, তোমায় সব কথা খুলে না বলাটাও ঠিক নয়। একটা বিপদ হোতে কতক্ষণ? তখন তুমি আমায় দোষ দিতে পারো। এই সব তিথিতেই ভূত প্রেত—পিশাচ ব্রহ্মদত্যি—

লোকটা বলে উঠলো—রাম রাম রাম রাম—ও সব নাম করবেন না বাবু—

—মানে ওঁরা সব বার হয়ে থাকেন কিনা—

—তাই নাকি? তবে তো—

—আবার কি জান, এই চতুর্দ্দশী তিথিতে গলায় দড়ি দিয়ে অপমৃত্যু ঘটেছে এমন ভূতেরা বার হয়। আমি একবার বড় বিপদে পড়েছিলুম—

লোকটা আড়ষ্ট স্বরে বললে—কি বাবু?

একটা শ্মশানের ধার দিয়ে সেবার যাচ্ছিলাম। সেও এই ভূতচতুর্দ্দশী তিথি। দেখি যে অন্ধকারে গাছের ডাল থেকে কি একটা যেন ঝুলচে—কাছে গিয়ে দেখি একটা মেয়েমানুষ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে আর হিঃ হিঃ করে হাসচে—

লোকটা আঁৎকে উঠে বল্লে—কি সর্ব্বনাশ!

—যাক্, ওই আমার রাস্তা নেমে গেল। আমি চল্লাম এবার। যাও তুমি, একটু সাবধানে যাও. সাবধানের মার নেই।

কথা শেষ না করেই আমি আমাদের গ্রামের পথে নেমে পড়লাম।

ও কাঁদো-কাঁদো স্বরে বল্লে—বাবু, আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে সাঁকোটা পার করে ছান যদি—

আমি শিউরে বলে উঠি—আমি? আমার কম্ম নয়। আমাকে তারপর এগিয়ে দেবে কে? বাবারে, প্রাণ হাতে করে যাওয়া ওসব জায়গায়। একে আজ ভূতচতুর্দ্দশী—

—রাম রাম রাম রাম!

—তুমি চলে যাও একটু জোর পায়। আবার রাস্তাও তো কম নয়, তোমাকে যেতেও হবে একমাইল দেড়মাইল রাস্তা—আর এই অন্ধকার! আচ্ছা চলি—তুমি বিদেশী লোক, জিজ্ঞেস করলে তাই এত কথা বলা। নইলে কি দরকার?

আমাদের রাস্তায় নেমে কয়েক পা মাত্র এগিয়েচি, লোকটা দেখি ডাকচে—বাবু, বাবু,

একটা কথা শুনুন—ও বাবু—

পিছন ফিরে দেখি কাঁধের বাঁকটা একটি শিশুগাছের তলায় নামিয়ে দাঁড়িয়েচে।

বল্লাম—কি ?

—দইগুলো নিয়ে আমি এখন কি করি বাবু ?

—কি আর করবে ? বায়না রয়েচে, একমুঠো টাকা। দিয়ে এসো। রাত হয়ে গিয়েচে, ওদের খাওয়ানো দাওয়ানোর সময় হল। রাম ব'লে এগিয়ে পড়ো—সাবধানে যেও—। আর কোনো কথা না বলে আমি হন্ হন করে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

ও শুনলাম আবার ডাকচে—ও বাবু, ও বাবু—শুনে যান—একটা কথা, ও বাবু—! দূর থেকে ওর গলার স্বরটা যেন আর্ত্তনাদের মত শোনাচ্ছিল।

এমনিই হয়

আমার ছেলেবেলায় 'কামার-বাড়ী' বলতে আমাদের গাঁয়ে সাতু কর্ম্মকারের বড় কোঠাবাড়ীটা বোঝাতো।

অন্য যে সব কর্ম্মকার ছিল আমাদের গ্রামে, তাদের অবস্থা ছিল গাঁয়ের আর পাঁচজনেরই মত। কিন্তু ওদের ঘোড়ার গাড়ীর কারখানা ছিল, কলকাতায় বাড়ী ছিল। আমাদের গরিব গাঁয়ের লোকের পক্ষে স্বপ্ন।

ওদের বাড়ীটা বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় চাবি-বন্ধ থাকতো। এক-আধ মাসের জন্যে সাতকড়ি কর্ম্মকার স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ী করে বাড়ী আসতো।

এই বাড়ী আসার কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি।

সাতকড়ি ও নিবারণ দুই ভাই। তারা বছরের মধ্যে এগারো মাস কলকাতায় থাকে। বাধ্য হয়ে থাকতে হয়, ব্যবসার খাতিরে। কিন্তু তারা যে এ গাঁয়ের নামকরা, রাশভারী, অনেক লোকের চেয়েই বড়, সব বিষয়েই বড়লোক—এটা না দেখাতে পারলে গ্রামের লোকে বুঝবে কেন ?

কিন্তু তার অবসর মেলে না। মেলে বছরের মধ্যে মাত্র একটি মাস।

সুতরাং এই এক মাসের মধ্যে চালে চলনে, পোশাকে পরিচ্ছদে, আচারে ব্যবহারে, গ্রামের লোককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াই চাই যে ওরা বড়লোক। কলকাতায় তাদের কি আছে না আছে, গ্রামের লোক দেখতে যাচ্ছে না।

ওরা বেশ তৈরী হয়ে আসতো বড়-মানুষি দেখাবার জন্যে। যা দেখাবার এই একমাসের মধ্যেই দেখিয়ে যেতে হবে। ঐশ্বর্য্যের পাঁচিল তুলে গ্রামের রায় মশায়, গাঙ্গুলি মশায়, বোসজা, দত্ত মশায়, ননী পালিত, গদাধর বিশ্বাসদের সঙ্গে নিজেদের পৃথক করে রাখতে হবে এবং বুঝিয়ে দিতে হবে যে তোমরা গাঁয়ে বসে যতই জমি-জমা নাড়ো আর প্রজা শাসন করো

—আসলে তোমরা আমাদের তুলনায় কিছুই নয়।

এই ঘোষণা করবার আর্টটা ছিল ওদের চমৎকার। বিদেশে যারা অবস্থাপন্ন হয়ে বাস করে, তারা নিজেদের গ্রামে এসে নিজেদের বড়ত্ব প্রচার করবার যে সাধারণ প্রণালী অবলম্বন করে, সেটা হচ্ছে পূজোর সময় বাড়ী এসে ধুমধামে দুর্গোৎসব করা। কিংবা একটা পুকুর কাটা। কিংবা দুটোই একসঙ্গে।

এদের প্রণালী ছিল আরো সূক্ষ্ম। তত ব্যয়সাধ্য নয়, অথচ আবেদনের গুরুত্বে সফলতর।

স্টেশনে নেমে এরা দু'খানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে বাড়ী আসতো, সঙ্গে থাকতো দুটি চাকর, একটা ঠাকুর, একটা ঝি। দামী বিছানাপত্রের মোট ঘোড়ার গাড়ীর ছাদে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ঠাকুর-চাকরেরা বসে থাকতো ছাদে কোচম্যানের সঙ্গে। ওদের পরনে থাকতো ধপধপে ফর্সা কাপড়। একটা ঝুড়িতে নানারকমের ফল বোঝাই থাকতো। গাড়ী থেকে জিনিসপত্র নামাবার সময় নিবারণ হেঁকে বলতো—ওরে, ফলের ঝুড়িটা সাবধানে নামা। রাঁচির পেঁপেগুলো যেন নষ্ট না হয়ে যায়—আনারস ক'টা দেখেশুনে নামা—

চারিপাশে ইতিমধ্যে গাঁয়ের ছেলেপিলেরা ততক্ষণ ভিড় করত। দু-একজন পথ-চলতি লোকও হাঁ করে তাকিয়ে দেখতো ভিড়ের মধ্যে থেকে।

তাদের মধ্যে হয়তো কেউ বলতো—কর্ম্মকারমশাই বাড়ী আলেন ?

হয়তো সাতকড়ি বলতো—তা তো এলাম। কি যে কষ্ট, কলকাতা থেকে জিনিসপত্তর নিয়ে আসা, তবু তো সেকেণ্ড ক্লাশ রিজার্ভ করে এলাম। তাও মধুপুরের কুঁজোটা নামাতে গিয়ে ভেঙে গেল—ও ঠাকুর, এই বাক্সটা ধরে নামাও, কাঁচের বাসন আছে—

এ প্রণালীর আবেদন সূক্ষ্মতর, কিন্তু আদৌ ব্যয়সাধ্য নয়।

আমরা যে যার বাড়ী এসে ঘটা করে বর্ণনা করতাম আমাদের গরিব বাপ-মায়ের কাছে ওদের এই ঐশ্বর্য্যবহুল সাড়ম্বর গৃহ-প্রবেশ। লোকের মুখে মুখে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়তো।

তারপর ওরা যতদিন থাকতো, প্রতিদিনে নানা ঘটনায় ওরা বুঝিয়ে দিত ওদের সঙ্গে এ গ্রামের লোকের তফাৎ কতখানি।

সাতকড়ি ছিল বড ভাই, নিবারণ ছোট। নিবারণের ছেলে ছিল মাত্র একটি, তার নাম সতীশ। তখন তার বয়েস উনিশ-কুড়ি ; পড়াশুনো কতদূর করেছিল জানি নে, বাবা ও জ্যাঠামশাইয়ের ব্যবসায়ে শিক্ষানবিসি করতো সে সময়। সাতকড়ি ছিল নিঃসন্তান।

দুই বড়লোক ভায়ের এই এক ছেলে, তার কাপড় জামা জুতো যে ধরনের ছিল আমরা তেমন কখনো চক্ষেও দেখি নি।

হয়তো আমরা তাকে ঘিরে হাঁ করে ওদের বাড়ীর সামনে পথে দাঁড়িয়ে কলকাতার গল্প শুনচি, ওর জ্যাঠামশায় হেঁকে ডাক দিলে—ও সতে, লুচি জুড়িয়ে গেল যে, ঠাকুর কতক্ষণ বসে থাকবে তোমার খাবার নিয়ে—সকলের খাওয়া হয়ে গেল, তোমার কেবল গল্প—

আমাদের গ্রামের অনেকে ওদের বৈঠকখানায় গিয়ে বসতেন ওরা বাড়ী এলে।

সাতকড়ি দামী শাল গায়ে দিয়ে, আট আঙুলে দশটা সোনার আংটি পরে, রুপোর গড়গড়া টানতে টানতে তাঁদের সঙ্গে কলকাতার ব্যবসার গল্প করতো, তার মধ্যে লাখ দু'লাখের নীচে কোনো টাকার অঙ্কই ছিল না। আমাদের পাড়ার রায় মহাশয়, বিশ্বাস মশায়, গাঙ্গুলী মশায়রা হাঁ করে অবাক হয়ে শুনতেন, আর বোধ হয় ভাবতেন—এত টাকাও জগতে আছে ?

সাতকড়ি কর্মকার এই ভাবে গল্প শুরু করতো।

—আসুন গাঙ্গুলি দাদা, প্রাতঃপ্রণাম! বসুন। চা খাবেন ?

—না ভায়া, এখনো আহ্নিক হয় নি, থাক।

—তাহলে সন্দের সময় অবিশ্যি এসে চা খেয়ে যাবেন। ভালো চা। আমার এক খদ্দের চা-বাগানের মালিক, রায় বাহাদুর বটকৃষ্ণ দত্ত, লেবুবাগান। তিনিই পাঠিয়ে দেন ফি বছর। বাজারে এ চা নেই, এর নাম অরেঞ্জ পিকো—চা গাছের পাতার কুঁড়ি থেকে হয়—

অনিল চক্রবর্তী বল্লেন—তারপর, নিবারণ, কেমন কাটলো এবার কলকাতায় ?

নিবারণ গলা ঝেড়ে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বল্লে—কাটলো ভালোই। তবে খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে গিয়েচে। এখানে এসে একটু জিরিয়ে নিয়ে বাঁচলাম।

—কেন ?

—দাদা, সে কথা আর বলবেন না। পঞ্চাশ হাজার টাকার লোহা কিনে ফেলে রেখে এসেছিলাম পাটনায় এক হিন্দুস্থানী লোহাওয়ালার দোকানে। তারপর সে লোহা আর আসে না। তিনবার সেজন্যে ছুটোছুটি করলাম সেখানে। আমাকে পাটনার সকলেই চেনে, সকলে খাতির করে। বাজারে বেরুলেই বলবে, আসুন বাবু। বাবু ছাড়া নাম ধরে কেউ ডাকবে না। তারা বল্লে—এমন জুয়াচোরের ফাঁদেও আপনি গিয়ে পড়েচেন। সে-লোহা বেশি দাম পেয়ে ও অন্য জায়গায় বেচে দিয়েচে—

—তারপর ?

—তারপর নালিশ মোকদ্দমার ভয় দেখিয়ে, উকিলের চিঠি দিয়ে অনেক কাণ্ড করে তবে সে লোহা উদ্ধার করলাম। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল তাতে—

সাতকড়ি অমনি উঁচিয়ে বসে আছে। সে অমনি বলবে—টাকা খরচের কথা আর শুনে কি হবে ভায়া। আমাদের পড়তা পড়েচে খারাপ। শুধু বাজে টাকা-খরচ লেগেই আছে। পোস্তায় লঙ্কার মহাজন আছে এক মাদ্রাজী। তার হয়ে মাল গস্ত করতে গেলাম চাটগাঁয়ে। জুড়ন বণিক আর হারাধন বণিক চাটগাঁতে বড় আড়তদার। দুজনের আড়ৎ থেকে সত্তর হাজার টাকার লঙ্কা খরিদ করলাম। হুণ্ডিতে টাকা দেবো। হুণ্ডি বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে মাদ্রাজী টাকা পাঠায় না। আমি ঠায় চাটগাঁয়ে বসে। টেলিগ্রাম করলাম, জবাব নেই। তখন নিজে কলকাতায় এসে মহাজনের সঙ্গে দেখা করে খুব বকাঝকা দিলাম। তা বল্লে, বাবু, কসুর হয়েচে, ছেলের অসুখের খবর পেয়ে দেশে চলে গিয়েছিলাম, এই নিন্ টাকা।

আবার সেই টাকা নিয়ে চাটগাঁ ছুটি। টাকা দিতে যাবো, অন্য আড়ৎদারেরা ডেকে বল্লে, বাবু, মাল নেবেন না। বাজার পড়ে গিয়েচে। কলম্বো থেকে লঙ্কার অর্ডার একদম বন্ধ। বায়না যা দিয়েচেন, যায় যাক্। মহাজনের টাকা বাঁচান। আমি জুড়ন বণিকের সঙ্গে দেখা না করে সেই রাতেই চলে এলাম চাটগাঁ থেকে—

এইবার নিবারণ একটা কিছু বলবে ঠিক করে বসে ছিল কিন্তু চাকর এসে জানালে, ভেতরে তাকে মা কি জন্যে ডাকচেন। বাধ্য হয়ে তাকে উঠে যেতে হল।

সাতকড়ি কর্ম্মকার সম্বন্ধে একটা গল্প আজও আমাদের গ্রামে প্রচলিত আছে।

একবার ওরা বাড়ী এসেচে। সাতকড়ি রাস্তায় পায়চারি করচে গায়ের শাল বাড়ীতে খুলে রেখে এসে, এমন সময় পাশের গ্রামে বেলডাঙার হীরু বাগদি চুপড়ি মাথায় কই মাগুর বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছে। সাতকড়ি ডেকে বল্লে—এই, কি মাছ?

হীরু বাগদি ভিন্ গাঁয়ের লোক, সে সাতকড়িকে চিনতো না। গ্রামে সাধারণত ওরা মাছ বেচতে চায় না। কারণ গ্রামের লোকে ঠিক দর দিতে চায় না, তার ওপর দাম বাকী রাখে। তিন হপ্তা হাঁটাহাঁটি না করলে সে দাম আদায় হয় না। কাজেই সে বল্লে—মাছ হাটে নিয়ে যাচ্ছি, এখানে মুই নামাবো না।

—নামাও।

কণ্ঠস্বরে গম্ভীর কর্ত্তৃত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশে বোধ হয় ভয় পেয়েই হীরু বাগদি মাছের চুপড়ি রাস্তার ওপরে নামালো। অমনি চারিধারে ছেলের দল ছুটে গেল মজা দেখবার জন্যে।

সাতকড়ি হীরে-বসানো আংটি দিয়ে মাছ দেখিয়ে বল্লে—কত দর?

—দর কম হবে না বাবু! হাটের যা দাম তাই নেবো! মাগুর ন'আনা আর কই আট আনা—

সাতকড়ি আংটি নেড়ে বল্লে—দশ-বিশ হাজারে মরিনে, দশ-বিশ হাজারে মরিনে—যত মাছ আছে সবগুলো নামিয়ে দিয়ে যাও। হীরু বাগদি এতক্ষণ মানুষ চেনে নি। সামান্য এক আধ সের মাছ কিনতে গিয়ে দশ-বিশ হাজারের কথা বলে, এমন লোকও সে কখনো দেখে নি। মাছ নামিয়ে দিয়ে সে তখন পালাবার পথ খুঁজে পায় না।

বাইরে এসে আমাদের বল্লে—উনি কেডা গো?

আমরা বল্লাম—কামারবাড়ীর কর্ত্তা।

—তা কি আর মুই চিনি? বাবা! বলে কিনা, দশ-বিশ হাজারে মরিনে। মরা বাঁচার কথা মুই কি বল্লাম—মাছ কিনতি এসে অমন কথা বলবার দরকারডাই বা কি! মুই আর আসবো না ইদিকি মাছ বেচতি।

বছর দুই পরে ওরা সতীশের বিয়ে দিলে গ্রামে এসে মহাধুমধামে। ইংরিজি বাজনার দল এলো, গ্যাসের আলো এসে আলোয় আলো হয়ে গেল বাঁশবনের আমবনের মাথা। এ অঞ্চলে অমন জাঁকজমক কখনো দেখা যায় নি। খাওয়ালেও খুব ওরা গ্রামের সবাইকে। কলকাতা থেকে রাবড়ি এলো, বাগবাজারের রসগোল্লা এলো। শখের কেষ্ট-যাত্রার দল

একদিন গাইলে ওদের বাড়ীর উঠোনে। কলকাতা থেকে যে সব আত্মীয়বন্ধু এলো, তাদের সোনার চেন, ঘড়ি আর ডবল-ব্রেস্ট শার্টের বাহার দেখে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পুরুষ-মানুষ যে গলায় সোনার হার পরে, সেই আমরা প্রথম দেখলাম।

এসব হল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

তারপর বছর তিনেক কাটলো। সতীশ তখন ব্যবসায়ে ঢুকেচে। দেশের সম্পত্তি দেখাশোনার ভারও নাকি তার ওপর। সে উপলক্ষে সতীশ একটু ঘন ঘন দেশে আসতে লাগলো। আমাদের অনেক বড়, আমরা সমীহ করে কথা বলতাম। ও কখনো নিয়ে আসতো কলের গান—তখন নতুন জিনিস—এসব পাড়াগাঁয়ে আনকোরা নতুন। বৈঠকখানায় বসে যখন কলের গান বাজাতো, তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো।

কেউ হয় তো জিগ্যেস করতো—কলের কত দাম খোকাবাবু?

—সাড়ে তিনশো টাকা।

সতীশ সংক্ষেপে উত্তর দিয়েই আর একখানা রেকর্ড তুলে দিতো কলে। নরম বুরুশ দিয়ে আগের রেকর্ডখানা যত্ন করে মুছতো। আমাদের বলতো—কাছে এসে ভিড় কোরো না, দামী জিনিস সব। একখানা ভেঙে গেলে সাড়ে পাঁচ টাকার ঘাড়ে জল—

আমরা সভয়ে সরে যেতাম।

সতীশের গায়ে সিল্কের শার্ট, সব আঙুলগুলোতে আংটি, ঘাড়-কামানো বাবু-ছাঁট চুল, রুমালে বিলিতি এসেন্স, মুখে বার্ডসাই। তখনকার দিনে সিগারেটের ওই নাম ছিল।

আমরা বলতাম—ওর দাম কত সতীশদা?

—সাড়ে তিন টাকা কৌটো।

—তুমি রোজ রোজ খাও?

—তিন দিন যায় এক কৌটোয়। মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা লাগে।

এ অবস্থায় কিছু কিছু মোসাহেব জুটে গেল। তাদের নিয়ে যে ক'দিন বাড়ী থাকতো খুব হৈ-হৈ করতো। আজ নৌকোয় উঠে বাচ, খেলা, কাল দল বেঁধে বন-ভোজন। ওর বাড়ীতেও মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতো—মাংস লুচি দই মিষ্টি। আমরা অবিশ্যি বাদ পড়তাম, কারণ বড়লোকের ছেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ার আনুষঙ্গিক গুণ আমাদের ছিল না, বয়সও ছিল কম।

তারপর স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশুনো করতে ব্যস্ত হয়ে রইলাম।

ইতিমধ্যে সাতকড়িবাবুর মৃত্যু হল।

গ্রামে ধুমধাম করে তার শ্রাদ্ধ করলে নিবারণ এসে। ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ উপলক্ষে ওদের ব্যবসা নাকি খুব ভাল চলছে। বেশ মোটা টাকা লাভ হচ্ছে লোহার বাজারে।

তখন স্কুলে ওপর-ক্লাসে পাড়ি, মনে তত সঙ্কোচ নেই, একদিন নিবারণ কর্ম্মকারের কাছে গিয়ে বসলাম। যেমন হয়ে থাকে, তার বৈঠকখানায় গ্রামের অনেক লোক, কেউ চা খেতে, কেউ মন রাখতে।

আমি বল্লাম—কাকা, আপনাদের সেই মাদ্রাজী মহাজন আছেন ?

—তিনি নেই। তাঁর ছেলে এখন ব্যবসা দেখে। এই তো সেদিন বিয়ে হল, দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে।

—দেড় লক্ষ !

—সে কি আর এমন বেশি টাকা ?

—নাম কি মহাজনের ?

—কর্ত্তার নাম কে. বি. রামনাথন্ চেট্টি। সেই নামেই ফার্ম। মস্ত বড় কারবার। ঝাল, হলুদ, তেঁতুল, চাল এই সব চালান দেয়। বম্বে, কলম্বো, রেঙ্গুন আর সিঙ্গাপুরে ওদের ব্রাঞ্চ। আমি তো বড় ব্রোকার ওদের ফার্মের। এ বছর পঞ্চান্ন হাজার টাকার ঝাল কিনলাম পূর্ব্ববঙ্গের মোকাম থেকে। আমি না হলে ওদের কাজ চলে না। ঝাল খরিদ আর কেউ করতে পারে না, বড় শক্ত কাজ। সতীশকে লাগিয়েছি আমার কাজে। ওকে পাঠালাম দৌলত খাঁ মোকামে, আমি রইলাম বরিশালে। মহাজন বল্লে, যত পার কেনো। আমি টেলিগ্রাম করলাম, ঝালের বাজার এবার খারাপ, কিনবো না। সাড়ে পঞ্চান্ন হাজার টাকার মাল কিনলাম বাপ-বেটায়।

আমাদের গ্রামের ভদ্রলোকেরা সাড়ে পঞ্চান্ন টাকা এক জায়গায় কচিৎ কখনো দেখেচে, টাকার অঙ্ক শুনে শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকে।

একদিন দেখি সাতকড়ি বৈঠকখানায় বসে লোকজনের মাঝখানে কি একটা নক্সা বার করে সকলকে বোঝাচ্ছে। সেটা নাকি কলকাতার হবু বাড়ীর নক্সা। কটা ঘর হবে, কোথায় মোটরের গ্যারেজ হবে, এই সব বোঝাচ্চে সমবেত গ্রাম্য ভদ্রলোকদের।

এইভাবে চললো ওদের কাজ, আমার স্কুল ও কলেজের দিনগুলোতে। ভাগ্যলক্ষ্মী ওদের ললাটে নিজের হাতে তিলক এঁকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, নিজে শাঁক বাজিয়ে টাকার থলি তুলে দিয়েছেন ওদের কলকাতার বাড়ীর দামী লোহার সিন্দুকে।

এরপর অনেক দিন কেটে গেল।

বিদেশে বেরিয়েছি চাকরি করতে, গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ কম। ওদের খবর তত কানে পৌছোয় না। তবে এটুকু শুনেছি, সতীশের বাবা ঝালের ও লোহার কারবার ফেলে পরলোকে প্রস্থান করেচেন। সতীশই এখন কারবারের মালিক।

একবার পুজোর সময় দেশে এসেছিলাম সাত দিনের জন্যে। সতীশও সেবার এল তার স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঝকমকে এক নতুন মোটরে চড়ে কলকাতা থেকে। ছ'দিন মাত্র রইল। দুজন কলকাতার বন্ধুও সঙ্গে এসেছে। খুব হৈ-হৈ করলে।

সন্ধ্যাবেলা ওদের বৈঠকখানায় গেলাম। গিয়ে দেখি বন্ধুদের নিয়ে সতীশ মদ খাচ্ছে। আমাকে দেখে বল্লে, আরে এসো এসো রামলাল, আজকাল কোথায় আছ ?

—শিলিগুড়ি। ভাল আছ সতীশদা ?

—চলে যাচ্ছে।

—গাড়ী নতুন কিনলে ?

—হ্যাঁ। পুরনো অস্টিনখানা বেচে নতুন মডেলের নিলাম।

—মদ খাও নাকি ?

সতীশ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বল্লে—ও তো গায়ের ব্যথা মারতে। যে খাটুনি খাটি, সন্ধে বেলাটা একটুখানি না খেলে বাঁচবো কি করে ? এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্চেন বাবু কৃষ্ণপদ কুণ্ডু, হাটখোলায় গদি আছে, মস্ত বড়লোক। আর এঁর নাম কুমুদবন্ধু সরকার, হাওড়ায় রাইস্ মিল আছে—বড় ধনী ওখানকার—সাতখানা বাড়ী গঙ্গার এপারে—

বন্ধুটি বিনয়ের সঙ্গে বল্লে—না, না, শুনবেন না। ধনী না ইয়ে, ওসব বাদ দাও সতীশ। অন্য কথা পাড়ো।

—ব্রিজ খেলতে জানো রামলাল ?

—না সতীশদা।

—চা চলবে ? তোমার তো এসব চলবে না।

—চাও খাবো না। খেয়ে এলাম। তোমরা বোসো, আমি উঠি।

আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম, কারণ সে সময় বাড়ীর মধ্যে থেকে চাকরে ডিশভর্ত্তি খাবার নিয়ে এলো ওদের জন্যে।

তার পরদিন দেখি সতীশ নদীতে নৌকো করে বন্ধুদের নিয়ে বন্দুক হাতে পাখী-শিকারে বেরিয়েচে। সে যে বাড়ীতে বসে মদ খায়, এতে গ্রামের লোকে দেখলাম দোষ ধরে না। বড়লোক তো খাবেই, ওদের সব শোভা পায়, ভাবটা এই রকম। সতীশ পাখী-শিকার করে, বারোয়ারীর চাঁদা দিয়ে, ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে, গ্রাম গুলজার করে তার ঝকঝকে নতুন মডেলের অস্টিন হাঁকিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খুব আমোদ করে বেড়ালে এই পাঁচ ছ' দিন। ছ'টা দিনে ছ'-বছরের ফুর্ত্তি ওড়ালে। আমাকে বল্লে—একদিন যেও হে রামলাল, আমাদের কলকাতার বাড়ীতে।

—কবে যাবো সতীশদা ? সাতদিনের ছুটিতে এসেছি, আবার চলে যাবো। তুমি ক'দিন আছ ?

—আছি কই ? একটা থিয়েটার খুলবো ভাবচি। তা নিয়ে বড় ব্যস্ত। অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস ঠিক করতে হবে। অনেক কাজ।

—নতুন খুলবে ?

—হ্যাঁ ভাই। আর্ট থিয়েটার। একেবারে নতুন জিনিস। হয় যদি তবে একটা নতুন জিনিস হবে। ঝাল হলুদ নিয়ে আর ভালো লাগে না। এবার অন্য পথ ধরবো।

—আগের ব্যবসা একেবারে ছেড়ে দেবে ?

—না। সেও থাকবে। বিখ্যাত অ্যাক্টর শরৎবাবুর নাম শুনেচ ? তিনি হোলেন আমার এই বন্ধু কুমুদের শালা। কুমুদকে দিয়েই তাঁকে নামাবো আমার থিয়েটারে।

—তোমাদের সেই মাদ্রাজী মহাজন আছে ?

—তাদের সঙ্গে আমার একটু গোলমাল চলচে। জ্যাঠামশায় আর বাবাকে তারা খাটিয়ে নিতো। সে মেকদারে টাকা দিতো না। আমার সঙ্গে তো তা চলবে না। বাবা জ্যাঠামশায় ছিলেন সেকেলে মানুষ। তাঁরা অত শত বুঝতেন না।

—তা তো বটেই।

—আমি সিঙ্গাপুরের একটা ফার্মের সঙ্গে সরাসরি কারবার করবার চেষ্টা করচি। নিজে খরিদ করে অপরকে মুনাফা খাওয়াবো, বাবা জ্যাঠামশায়ের মত অত বোকা আমি নই।

—তা তো বটেই।

বড়লোকদের সঙ্গে মতভেদ তর্কাতর্কি আমাদের মত গরিব লোকের সাজে না। অন্য কথা পাড়লাম। সতীশ টিন খুলে সিগারেট ধরালে। ও কোথায় একটা জমি কিনচে, সেখানে ফুল আর টোমাটোর চাষ করবে, সে সব গল্প করলে। আমি বল্লাম—সতীশদা, ছেলেবলায় তুমি বার্ডসাই খেতে মনে আছে?

—তখন তাই ছিল। সে সব কি আজকের কথা! তখন আমার বয়েস কুড়ি কি বাইশ! এখন হল সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। মাথার চুলে পাক ধরেচে।

—এখানে লাগচে ভালো সতীশদা?

—আচ্ছা, বলতে পারো, ট্যাংরার বিল পর্য্যন্ত মোটর চলবে?

—এই বর্ষাকালে? না বোধ হয়। যাবে নাকি?

—যেতুম। সেখানে জলপিপি আর হাঁস বেশ পাওয়া যায়। জানো?

—আমি ও খবর রাখিনে। বলতে পারবো না।

দিন দুই পরে যথেষ্ট ফটো তুলে, যথেষ্ট শিকার করে, নতুন মডেলের অস্টিনে চড়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সতীশ চলে গেল কলকাতায়। আমিও চলে গেলাম আমার চাকুরিস্থল শিলিগুড়িতে।

এর পর প্রায় সুদীর্ঘ আঠারো-উনিশ বছরের পরে নানাদেশ ঘুরে নানা জায়গায় চাকরি করে আমি দেশে ফিরে এলাম। বাড়ীঘর ভেঙেচুরে গিয়েছিল, কিছু কিছু মেরামত করে নিতে হল। মাঝে মাঝে যে বাড়ী আসি নি তা নয়, সে খুব কম, বছর দুবছর অন্তর। ইদানীং তাও আসা ঘটতো না।

এসে দেখি সতীশ তার বাড়ীতে আছে।—কিন্তু এ কোন্ সতীশ?

সে সতীশ আর নেই।

তাকে প্রথম দিন বেলতলার মাঠে দেখে চিনতে পারলাম না হঠাৎ। রোগা হয়ে গিয়েচে, বুড়ো হয়ে গিয়েচে। পরনে আধ-ময়লা ছেঁড়া কাপড়। ময়লা গেঞ্জি।

সতীশ বল্লে—কে? রামলাল? আরে বেশ বেশ। শুনলাম তুমি বাড়ীতে আসবে।

—তোমার এরকম চেহারা হল কেমন করে সতীশদা?

—এক দিনে হয়নি, অনেক দিনে হয়েচে। তুমি অনেক দিন পরে দেখলে, তাই নতুন লাগচে।

—এখানে আছ নাকি আজকাল ?

—তা প্রায় আট-ন'বছর বাড়ীতে আছি। বড় কষ্ট পাচ্চি ভাই। কঠিন হাঁপানি রোগ। সেই সঙ্গে লিভারের বেদনা। যখন ধরে তখন শেষ করে দেয়। ইদিকে এসেছিলাম গরুটা খুঁজতে। তা পেলাম না। যেও সন্দেবেলা ?

সতীশের খবর মাঝে মাঝে বিদেশে আমার কানে যে একেবারে পৌছোয় নি তা নয়। শুনেছিলাম ওদের ব্যবসা নেই, কলকাতার বাড়ী বিক্রি হয়ে গিয়েচে। পাওনাদারেবা সব বেচে-কিনে নিয়েচে। থিয়েটার করতে গিয়েই সব গেল।

তবে সেই সতীশ যে একেবারে এমন অবস্থায় পৌছেচে তা বুঝিনি।

রাসবিহারী মুখুজ্যের কাছে কথাটা বলতেই রাসবিহারী বলে—ও, কে, সতীশের কথা বলচো ? এখনো কিছু বোঝো নি বাপু। সতীশের মা কি বৌ তোমার কাছে যায় নি ?

—কেন ?

—ওই ছাখো, আবার বলে 'কেন' ? ভিক্ষে করতে। নইলে পেট চলবে কি করে ?

—বলেন কি ? এতদূর হয়েচে, তা তো ভাবি নি।

—এখনো খবর পায় নি তুমি বাড়ী এসেচ। কাল সকালেই যাবে। আমরা তো বাপু বিরক্ত হয়ে গেলাম। বলে, নিত্যি নেই ছায় কে, আর নিত্য রোগী ছাখে কে ? ওর মা সর্ব্বদা যাবে, চাল দাও, পয়সা দাও, তেল দাও।

—ওদের অবস্থা এমন হল কেন ?

—আবার বলে, কেন। তা হবে না ? মদে বদখেয়ালে ইয়েতে বাপ-জ্যাঠার পয়সাগুলো ঘোচালে। থিয়েটার করতে গিয়ে বাড়ীখানা গেল কলকাতার। পাওনাদারেরা ডিক্রি করে যথাসর্ব্বস্ব নিয়েচে, এখানকার জমি-জমাও ক্রোক দিয়ে নিয়েচে। ক'বিঘে ধানের জমি বুঝি আছে, তাও সারা বছরের ভাত হয় না তাতে। এখন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো সেই গাঁয়ের ভিটে। আর যাবে কোথায় ? তা ছাড়া, ও বাঁচবে না। কঠিন রোগ, পথ্য নেই, চিকিচ্ছে নেই।

সতীশের বাড়ী সন্দেবেলা গিয়ে বসতাম। প্রায়ই যেতাম।

ছেঁড়া মাদুরে বসে হাঁপাতো। এই সময় নাকি হাঁপানির টান বাড়ে। আজ দশ বছর হল সতীশ গ্রামে বাস করচে, হিসেব করে দেখলাম। এই দশ বছরে দারিদ্র্যে অনাহারে আর রোগে ওকে এই অবস্থায় নিয়ে এসে ফেলেচে। পুরনো দিনের কথা আমি কিছু কিছু তুলতাম।

একদিন বল্লাম—তোমার বিয়েতে এ গাঁয়েতে ইংরিজি বাজনা এসেছিল, আর গ্যাসের আলো জ্বলেছিল, মনে পড়ে ?

সতীশ হাঁপাতে হাঁপাতে বলতো, আর ভাই! বাদ ছাও ওসব কথা। এখন গেলেই বাঁচি। আর সহ্য হয় না কষ্ট। সে সব মনে নেই ভাই।

—মনে নেই ?

—আর মনে থাকে! কোথা থেকে মনে থাকবে? রোজ একটা করে টাকা না হোলে সংসার চলে না। তাও নুন ভাত খেয়ে। কোথা থেকে মনে থাকবে? বলো কি!

—তা তো বটেই।

সকালে একদিন বাড়ী বসে আছি, সতীশের মা এসে বল্লেন—বাবা একটা কথা বলবো। আমায় চার আনা পয়সা দিতে পারো? আফিং চাই রোজ চার আনার। কাল যোগাড় করতে পারিনি। খোকা পেট ফুলে দম আটকে যায় আর কি। মা হয়ে দেখতে পারিনে—তাই তোমার কাছে এলুম বাবা।

আবার একদিন ওর বৌ।

আর একদিন ওর মা।

শুধু খোকার আফিঙের পয়সা চার আনা।

বাড়ীতে স্ত্রীকে বলে দিলাম, এরা এলে যেন ফিরিও না, চার আনাই দিও।

স্ত্রী বল্লে—তুমি শুধু ত্যাখো চার আনা। ভেতরের খবর তো জানো না! কামার বৌ এসে চায়ের দুধ নিয়ে যায়, চাল নিয়ে যায়। একখানা পুরনো শাড়ী দিলাম। বল্লে—পরবার কাপড় নেই, দিন, না হোলে মান যাবে। কি করি—দিলাম। ওরা নাকি খুব বড় লোক ছিল?

গৃহিণীকে বল্লাম পুরোনো দিনের কথা। আমি তখন বালক। সাতকড়ি ও নিবারণ কর্ম্মকারের শালের জোড়া ও দাসদাসীর বাহার। দশ-বিশ হাজারে মরতো না নিবারণ কর্ম্মকার।

একদিন ওকে দেখতে গেলাম। তখন আমি বছর খানেক হল দেশে এসেছি। সতীশ বল্লে—আর বাঁচবো না। একটা জিনিস খেতে বড্ড ইচ্ছে, খাওয়াবে?

—কি?

—বড্ড ভালবাসতুম মাংসের কাটলেট। কতকাল খাইনি!

—খাওয়াবো। তবে তোমার কিছু খারাপ হবে না তো?

ও হেসে বল্লে—আর আমার খারাপ আর ভালো! শোন, বৌটাকে একটু দেখো বুঝলে? ভালো মানুষের মেয়ে। বড় খোয়ার করলাম। কষ্ট হয়। তুমি বরং—

হাঁপের টানে ও আর বেশী কিছু বলতে পারলে না। আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—ও সব কি কথা! কিছু ভয় নেই তোমার।

কাটলেট খেয়ে খুব খুশি। বেশি খেতে পারলে না। দু-একখানা খেয়ে ওর স্ত্রীকে দিয়ে দিলে। বল্লে, আঃ, কতকাল খাইনি! আগে আগে—

একটু ম্লান হাসি হেসে চুপ করলে।

সতীশ আরো এক বছর ধুঁকতে ধুঁকতে টিকে গেল। হাঁপানিতে কষ্ট পায়, সহজে মরে না। ওর স্ত্রীও সেই বছরের মধ্যেই মারা গেল। গ্রামের লোক চাঁদা করে গঙ্গায় দিয়েছিল দু'জনকেই।

সতীশের মা কিন্তু আজও বেঁচে আছেন। কোন অসুখ নেই, দিব্যি শরীর! মুখুজ্যেবাড়ী বাসন মেজে আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রেখে সেখানে দুবেলা খেতে পান।

ঝড়ের রাতে

যাচ্ছিলাম রাজস্থান বই আনতে ভূপেনদের বাড়ী। পড়ি নীচের ক্লাসে, বয়েস বারো বছর। বই পড়ার বড্ড ঝোঁক। পাড়াগাঁ জায়গা, বই তেমন মেলে না। আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে—নাম তার ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বাড়ী নদীর ওপারে সুখপুকুর ঘাটবাঁওড়—একদিন বল্লে তার বাড়ী দু'তিনখানা বই আছে। নাম কি? ভেবে বল্লে, একখানার নাম রাজস্থান। মোটা বই, না সরু? মোটা, খুব মোটা।

আর যাবি কোথায়! রাজস্থান বইয়ের নাম আমার শোনা আছে। বই দিবি তো? হাঁ দেবে, যদি তার বাড়ী আমি যাই।

—কিন্তু তাহোলে সেদিন বাড়ী ফিরবো কি করে?

—কেন, সেদিন আমাদের বাড়ীতে থাকবে।

এই শর্তে রাজি হয়ে বই আনতে যাচ্ছি ভূপেনদের বাড়ী। নদীর ওপারে, আমাদের স্কুল থেকে পাঁচ মাইল পথ। সময়টা বোধ হয় পূজোর পর। দিন ছোট, নদী পার হোতে না হোতে বেলা গেল। সঙ্গে সঙ্গে নামলো বৃষ্টি। মেঘ অনেকক্ষণ থেকে জমে ছিল আকাশে।

দৌড়ে গিয়ে একটা আমগাছের তলায় দাঁড়ালাম। ছাতি আনিনি সঙ্গে। এটা বর্ষাকাল নয়, ওবেলা চমৎকার রোদ ছিল। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি নামবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি। আমতলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে বুঝলাম আমগাছের শাখাপত্র বৃষ্টির জল থেকে বাঁচাতে পারবে না। বাড়ীঘর আছে কিনা দেখবার আগ্রহে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি কিছু দূরে আমবাগানের ফাঁকে একটা পুরোনো কোঠাবাড়ী যেন বৃষ্টির মধ্যে আবছায়া দেখা যাচ্ছে।

এক দৌড় দিলাম বাড়ীটা লক্ষ্য করে এবং সর্ব্বাঙ্গ ভিজে জুবড়ি হয়ে হুড়মুড় করে বারান্দার দোর ঠেলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বাড়ী কাদের, কে আছে না আছে সেখানে, এদিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নেই।

কে যেন একজন বারান্দায় ও-কোণ থেকে রুক্ষস্বরে বলে উঠলো—কে হে?

চম্‌কে চেয়ে দেখি একজন বুড়ো মানুষ একটা মাদুরের ওপর ঝুঁকে বসে কি করছিল, মুখ ঈষৎ তুলে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করছে।

অপ্রতিভের সুরে বল্লাম—আমি একজন স্কুলের ছেলে। সুখপুকুর যাবো।

—সুখপুকুর যাবে তো এখানে কি?

—আজ্ঞে, বিষ্টিটা এল কিনা, ওই আমতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছিলাম।

—কোন্ আমতলায় ?

—ও রাস্তার ধারের।

—ভালো আম। বড্ড ভালো আম ওর।

এ কথাটা যেন আমি ছেলেমানুষ হোলেও কানে কেমন একটু অসংলগ্ন ঠেকলো। তবুও প্রবীণ ব্যক্তির কথার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর জন্যে বল্লাম—ও !

বৃদ্ধ রাগত ভাবে বলে উঠলেন—ও ? কি ও ? ও মানে কি ? ও ?

আমি অবাক ! চুপ করে রইলাম। অন্যায় কথা বলে ফেলেছি না কি ? 'ও' বলা উচিত হয়নি !

—তোমার নাম কি হে ?

—আজ্ঞে দুলালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—এঃ ! দুলাল ! আদরের দুলাল ! কোন্ ক্লাসে পড় ?

—সিক্স ক্লাসে।

—সিক্স ক্লাস ?

—আজ্ঞে হঁ্যা, সিক্স ক্লাসে।

কি আশ্চর্য্যের কাণ্ড, এই কথার পর বৃদ্ধের রাগী মেজাজ হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। নয়তো আমি সত্যি ভাবছিলাম বৃষ্টি একটুখানি থামলেই এখান থেকে চলে যাবো। যা থাকে কপালে। এমন রাগী লোকের ঘরে থাকবার কোনো দরকার নেই। বুড়ো শান্ত হয়ে বল্লে—সিক্স ক্লাসে পড়ো ? আচ্ছা এসে বোসো এখানে।

সিক্স ক্লাসে অধ্যয়নের অধিকারগর্ব্বে আমি গিয়ে মাদুরটার এক পাশে বসলাম।

—নাম কি ?

আবার বিনীত ভাবে নামটি বলি।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। বাইরে বেশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

বৃদ্ধ বল্লেন—খাবে কিছু ?

—আজ্ঞে—না।

—না কেন ? খাও না ! ওই কোণে উঠে গিয়ে ছাখো শুকনো নারকোল আছে। নিয়ে এসো, দা দিচ্ছি কেটে খাও।

—আমি ঝুনো নারকোল ঝুড়তে জানিনে।

—জানো না ? গেরস্ত ঘরের ছেলের সব জানা দরকার। তবে খাবে কি ? আর তো কিছু নেই।

—থাক গে। খাবো না কিছু।

—না না, তা কি হয় ! ছেলেমানুষ, খিদে পেয়েচে বই কি। ওবেলা তো কখন খেয়ে বেরিয়েচো। সুখপুকুর যাচ্ছিলে ?

—আজ্ঞে হঁ্যা।

—কেন ?

—একখানা বই আনতে।

—কি বই ?

—রাজস্থান বলে একটা বই।

বৃদ্ধ রাগের স্বরে বল্লেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজস্থান জানি। পড়েচি। অমন করে বলে নাকি ? একটা বই! ও কি রকম কথা ? রাজস্থানের নাম কে না জানে! তুমিই বুঝি সিক্স ক্লাসে পড়ো, আর কেউ কিছু জানে না ?

আমার এবার রাগ হল, ভয়ও হল। নাঃ, এখানে আর থাকা নয়। এ রকম বদ-মেজাজী বুড়োর কাছে কেউ থাকে ?

বুড়ো আবার তখুনি স্বর নরম করে বল্লে—যাক্ গে। ছেলেমানুষের সঙ্গে আর কি হবে বকে। এখন খাবে কি তাই বলো।

—আপনি যা বলেন।

—তাইতো, কিছুই ঘরে নেই।

—আপনি কি খাবেন ?

—আমি ? ওবেলার পান্ত ভাত আছে, নেবু দিয়ে তাই খাবো। এসো ভাগ করে দুজনে খাই।

সত্যিই আমার বড় খিদে পেয়েছিল। কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছিলুম বাড়ী থেকে। পান্ত ভাত, পান্ত ভাতই সই। বুড়ো আমাকে বড় খাটালে। হাঁড়ি পেড়ে আনলাম ওর কথায়, কলার পাতা কেটে আনালে, ভাত বাড়িয়ে নিলে। কিছু তরকারী নেই, শুধু নুন আর ভাত। গপ-গপ করে বুড়ো গিলতে লাগলো সেই ভাত। নেবু দিয়ে থাবে বলেছিল, তাই বা কই ? তা হোলেও তো হত। কোনো রকমে খাওয়া শেষ হল।

আমার তখন ভয় হয়েছে বৃদ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় আমার গলা টিপে না মারে। সুতরাং যখন বুড়ো বল্লে ঘুমুতে, তখন আমার মনে ভয় ও অস্বস্তি দুই-ই এসে জুটলো।

বল্লাম—শোবো কোন্ ঘরে ?

—ঘর ? ঘর তো মোটে এই একটা।

—এটা তো দালান।

—দালানও যা, ঘরও তাই। এখানে মাদুর পেতে নাও, ওই দেওয়ালের কোণে মাদুর আছে।

—আপনি শোবেন না ?

—না। আমি কাজ করছি দেখচো না ?

এতক্ষণ কিছুই দেখিনি লক্ষ্য করে। এইবার একটু কৌতুহলের সঙ্গে চাইতেই তিনি বল্লেন —যাও, শুয়ে পড়ো। এদিকে তাকাতে হবে না।

আমি ভয়ে ভয়ে শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু আমার চোখ-কান রইল বুড়োর দিকে। আমি

ঘুমুলাম না, ঘুম আমার হলও না—শুয়ে আড়-চোখে বুড়োর দিকে চেয়ে রইলাম।

বুড়ো কি যে করছে, অনেকক্ষণ অবধি আমি ঠাওর করতেই পারলাম না।

অবশেষে মনে হল, বুড়ো ছবি আঁকছে!

খুব মন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ছবি আঁকছে।

ভালো করে দেখবার সাহস আমার হয় নি। ছবি আঁকছে নিশ্চয়ই। সেটা বুঝতে পারলাম। আমারও ঘুম হল না। বুড়ো প্রায় রাত তিনটে পর্য্যন্ত ছবি আঁকলে, ভোরের কিছু আগে ঘুমিয়ে পড়লো। আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম।

জেগে উঠে দেখি রোদ উঠেচে। বুড়ো তখনো ওঠে নি। আস্তে আস্তে উঠে বুড়োর মাদুরের কাছে এসে দেখি মাদুরের ওপর মাটির খুরি অনেকগুলো সারি সারি সাজানো, তাতে নানা রং। সরু মোটা কতকগুলো তুলি একটা পিঁড়িতে কাতভাবে সাজানো, কতকগুলো তুলি মাদুরের ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে—আর সামনে একখানা তক্তার ওপর পেরেক দিয়ে আঁটা কাগজ কিংবা চটের ওপর একখানা যা ছবি!

ছবিখানা কোন একটি মেয়েছেলের।

কার এমন সুন্দর মুখ, এমন বড় বড় টানা চোখ—কি জানি?

আধখানা মাত্র আঁকা হয়েছে—তাও সব যেন হয় নি, কিছু কিছু বাকি আছে। কিন্তু এমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারে এ বুড়ো? এমন ছবি যে মানুষে আঁকতে পারে সে বিশ্বাস আমার ছিল না। ক্লাসে ইন্দু মাস্টারের দেওয়া আতা পাখী চেয়ারের ড্রইং আঁকি, তাও মনের মত হয় না। আমার নিজেরই। ভাবি আতা আঁকবো, হয়ে যায় যে জিনিস, তাকে বেলও বলা চলে, আমও বলা চলে, হয়তো কুমড়ো বলাও যেতে পারে। সুতরাং তলায় 'আতা' বলে লিখে দিতে হয়।

কিন্তু এই খিটখিটে মেজাজের বুড়ো, এ এমন ছবি আঁকতে পারে।

অবাক হয়ে গেলাম। বুড়োকে ডেকে বলবো সে কথা? দরকার নেই, ঘুমুচ্চে ঘুমুক। আমার বিদায় নেবার সময় হয়েচে। কিন্তু ঘুমন্ত বুড়োকে জাগাতেও সাহস হল না। না জানিয়েই বা যাই কি করে? আবার ভয় হল, বুড়োর ছবি দেখে ফেলেছি, একথা ও না জানে। যে বদরাগী আর খিটখিটে, কি জানি হয়তো মেরেই বসবে।

বাইরে আমগাছটার তলায় গিয়ে বসলুম। আধঘণ্টা পরে ঘরের মধ্যে শব্দ পেয়ে বুঝলাম বুড়ো উঠেছে। তখন আমি আস্তে আস্তে পা টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

বুড়ো মাদুরের ওপর বসে ছবিখানা দেখছিল, চমকে উঠে পেছনে চেয়ে বল্লে—কে?

—আজ্ঞে আমি।

—ও, তুমি এখনো যাও নি?

—আপনি ঘুমুচ্ছিলেন, না দেখা করে—

—ঠিক ঠিক। তুমি বেশ ছেলে। ভাল ছেলে।

—তা হোলে আমি যাই এখন?

—আমার ছবি দেখেছ ?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—আচ্ছা এসো, দেখবে।

আমি দেখলুম অনেকক্ষণ ধরে।

বুড়ো বল্লে—কি রকম হয়েছে ?

—খুব ভালো।

—ভালো লেগেচে ?

—আজ্ঞে, তা আর বলতে! কখনো এমন দেখি নি।

—আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো। দাঁড়াও, কি খাবে সকালবেলা ?

—আজ্ঞে কিছু না। আমি যাদের বাড়ি যাচ্ছি, সেখানে খাবো।

—না না, তা হয় না। পান্ত ভাত হাঁড়িতে ছিল ?

—আজ্ঞে না। সব খেয়েছি কাল দুজনে।

—নারকোল একটা নিয়ে এসো, কেটে দিই।

—আজ্ঞে আপনাকে কষ্ট দেবো না। আমি খাবো না কিছু।

বলেই হন্ হন্ করে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ী থেকে।

বুড়ো দেখি পেছনে ডাকছে—ও খোকা, শোনো! ও খোকা, যেও না—

আমি পেছন ফিরে চেঁচিয়ে বলি—আজ্ঞে, আমি নারকোল খাবো না।

সেই দিনই বিকালে বই নিয়ে আসবার পথে বুড়োর ওখানে যেতে বড় ইচ্ছে হল। বুড়োকে দেখবার জন্যই ঘরের জানালায় উঁকি-ঝুঁকি মারি।

বুড়োকে কিন্তু দেখতে পেলাম না। ঘুমুচ্চে নাকি ?

ফিরে আসচি এমন সময় কে ডাকলে—কে ?

বল্লাম—আমি।

—শোনো খোকা, শোনো।

গেলাম। বুড়ো বালিশ ঠেস্ দিয়ে চোখ বুজে বসে ছিল। আমায় বল্লে—আজ রাত্রে এখানে থাকো।

—থাকবো না।

—কেন ? থাকো। আজ তোমাকে নারকোল খাওয়াবো, চিঁড়ে খাওয়াবো।

কি স্নেহের সুর ওর কথার মধ্যে। সে রাতেও আমার থাকার ইচ্ছে সেখানে, কিন্তু আমার বাড়ীর লোকের ভয় ছিল, না বলে এসেচি। আমি বল্লাম—মা বকবে।

বুড়ো আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—ঠিক ঠিক। মা রয়েচেন ? তাহলে যাও। নারকোল খেয়ে যাবে না ?

—আমি নারকোল কাটতে জানিনে।

—আমার হাতে ব্যথা, নইলে আমি তোমাকে নিজেই নারকোল কেটে দিতাম।

আমি চলে এলাম বটে কিন্তু বুড়োর কথা ভুলতে পারলাম না কতদিন অনেকদিন কেটে গেল।

বালক থেকে আমি হয়ে উঠেচি যুবক।

পাথুরেঘাটার এক বড়লোকের বাড়ি যাতায়াত করি। সেখানে মস্ত বড় একখানা অয়েল পেন্টিং ছবি দেখে হঠাৎ চমকে উঠলাম। এই ছবি যার, তাকে আমি কোথায় দেখেচি? বাড়ীর লোককে বল্লাম—ইনি কে?

তারা বল্লে—এঁকে চেনেন নাকি? ইনি বিখ্যাত চিত্রকর দুর্গাচরণ সান্যাল। এঁকে নিয়ে খবরের কাগজে হৈ চৈ হয় খুব।

—দুর্গাচরণ সান্যাল?

—নামকরা লোক। বড় বৈঠকখানায় যত অয়েল পেন্টিং দেখবেন সব ওঁর করা। দেড় দু'হাজার টাকা নিতেন ছবি পিছু। সব বড় লোক খদ্দের ছিল। এ ছবি তাঁর নিজের, নিজেই এঁকেছিলেন। মেজবাবু বেঁচে থাকতে শিল্পীর নিজের ছবি অনেক টাকা খরচ করে আঁকিয়ে নেন। আপনি এঁকে চিনতেন?

—আমি কোথাও এঁকে দেখেচি ঠিক মনে করতে পারচিনে। ইনি থাকতেন কোথায়?

—থাকতেন কলকাতাতে। বরানগরে। শেষ বয়সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এত টাকা রোজগার ফেলে, বড় বড় মক্কেল ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে চলে গেলেন তার কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। সে আজ বিশ-পঁচিশ বছর আগের কথা। কেউ খুঁজে পায় নি। খবরের কাগজে হৈ চৈ হয় তাঁর অন্তর্দ্ধান নিয়ে। অত নামকরা আর্টিস্ট! সে এক রহস্য সেকালকার।

আমার হঠাৎ মনে পড়লো। চিত্রশিল্পী দুর্গাচরণ সান্যালের রহস্য আমি জানি। সুখপুখুর ঘাটবাঁওড়ের সেই বুড়ো। সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রি, সেই অপূর্ব্ব ছবি, আধ-আঁকা সেই ছবিখানা!

আর্টিস্ট

হঠাৎ অশ্বিনীকে দেখে শ্যামচাঁদগঞ্জের বাজারে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। আমাদের গ্রামের লোক অশ্বিনী। তবে আজ বহুকাল ও দেশছাড়া। অশ্বিনী আমাদেরই বয়সী হবে। ওর বাবা অভয় দাস ভিক্ষে করে সংসার চালাতো। আমাদের গ্রামে তাকে বলতো 'অবাই দাস।' অবাই দাস খঞ্জনী বাজিয়ে হরিনাম করে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করতো এ আমি নিজে দেখেচি। তারপর অবাই দাস কতকগুলি অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেল। ওর বিধবা স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল তা কেউ খোঁজ রাখে না।

ওদের বাড়ীঘর গ্রামের হরিনাথ চৌধুরী মহাশয় নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে সেখানে তরিতরকারীর বাগান করেছিলেন। অবাই দাসের স্ত্রী যখন এ গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তখন অশ্বিনীর বয়স হবে আট বছর। আমার সঙ্গে ওর বড় ভাব ছিল। অশ্বিনী সকালে এসে আমাদের বাড়ীর ডোবাতে কঞ্চির ছিপ ফেলে বসতো বর্ষার দিনে। আমরা জিগ্যেস করলে বলতো উক্কো মাছ ধরচে। কিন্তু সবাই জানি ও ডোবাটায় মাছের চিহ্নও নেই আর অশ্বিনীর ছিপেও না আছে সত্যিকারের সূতো, না আছে সত্যিকার বঁড়শি।

তারপর ষোল-সতেরো বছর চলে গিয়েচে। অশ্বিনীকে ভুলে গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। আমরা দু'ভাই পয়সা ওড়াতে লাগলাম, জমিজমা বিক্রি করে ফুর্ত্তি করতে লাগলাম। সেও আজ সাত বছর আগেকার কথা হবে—যে সময়ের কথা বলচি তখন বাবার তিনটি গোলা শূন্য করে ফেলেচি, অর্দ্ধেক ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি মৌরুসি দিয়েচি বা বিক্রি করেচি, মায়ের গহনাগাঁটি প্রায় সব বন্ধক পড়েচে। সুতরাং আমাদের ফুর্ত্তির সমুদ্রে কিছু ভাঁটা পড়ে এসেচে।

শ্যামচাঁদগঞ্জে গিয়েছিলাম ফুর্ত্তির সন্ধানে। খুব জাঁকের বারোয়ারি হয় শ্যামচাঁদগঞ্জে। অনেক রকম ফুর্ত্তির সন্ধান এখানে পাওয়া যাবে শুধু এই আশাতেই গিয়েছিলাম সেখানে। আমি একাই গিয়েছিলাম, দাদা আসেনি। কলাই বুনবার জন্য বাড়ীতেই আছে।

হঠাৎ অশ্বিনীকে এতদ্দিন পরে দেখে ভারি অবাক হয়ে গেলাম। অশ্বিনী আমাকে বল্লে —চিনতে পারেন বাবু?

—হুঁ! তুই তো অশ্বিনী, অবাই দাসের ছেলে।

—ঠিক চিনেচেন। এখানে কি মনে করে?

—যাত্রা শুনতে।

—যাত্রা শুনবেন? কিসে এলেন?

—তুই আপনি-আজ্ঞে ক'রে কথা বলচিস কেন অশ্বিনী? ভুলে গেলি নাকি আমাকে?

—না বাবু, এতকাল পরে দেখা। এখন আপনারা বড় হয়ে গিয়েচেন, এখন কি আর ছেলেবেলার মত কথাবার্ত্তা আপনার সঙ্গে শোভা পায়? এখন আর সেটা ভাল দেখায় না। কি করছেন আজকাল?

—বাড়ীতেই থাকি।

—তা আপনাদের ভাবনা কি। জমিদার মানুষ। কাকা বেঁচে আছেন?

—না। বাবা আজ আট ন'বছর মারা গিয়েচেন।

আমাকে দাঁড় করিয়ে অশ্বিনী কোথায় চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে এসে বল্লে—চলে আসুন আমার সঙ্গে।

—ও কি? মদ?

—ভাল জিনিস, আসুন।

আমি বিস্ময়ের সুরে বল্লাম—হ্যাঁরে, সে কি! তুই অবাই দাস বোষ্টমের ছেলে, তোর

বাবা হরিনাম না করে জল খেত না, তুই মদ খাস ? আমাদের কথা বাদ দে, আমরা তো উচ্ছন্ন গিয়েচি—

অশ্বিনী হেসে বল্লে—চলুন বাবু।

—এখন ও সব খাব না। আসরে ভিড় হয়ে গেলে জায়গা পাব না বসবার। এখানে আমাকে চেনে কে ? কেউ খাতির করবে না।

—বসবার জন্যে কোন ভাবনা নেই বাবু। সে ভার আমার উপর রইল !

—না, তুমি আমাকে মাপ করো। আমি এই বিদেশ বিভুঁয়ে এসে মদটা খাবো না। মা বাড়ী থেকে বেরোবার সময় বারণ করে দিয়েচে—মাইরি বলচি।

—আচ্ছা তবে খাবারের দোকানে আসুন। খানকতক সিঙ্গাড়া খাবেন চলুন—

খাবার-দোকানে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল। এদিকে আমি খেতে খেতেই দেখচি আসর লোকে ভর্ত্তি হয়ে গেল। সেখানে আমার মত বিদেশী লোককে কেউ বসতে জায়গা দেবে না। অশ্বিনী বড় গোলমাল বাধালে দেখচি। অশ্বিনীকে কথাটা বলতে সে হেসে বল্লে—কেন ভাবচেন বাবু। আমি যখন আছি, তখন আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। খুব ভাল জায়গায় আপনাকে না বসিয়ে দিতে পারি তবে আমি অবাই দাস বৈরাগীর ছেলে নই।

অশ্বিনীর এ আশ্বাস-বাণীতে আমার কিন্তু ভরসার উদ্রেক হল না বিন্দুমাত্রও। ও নেশার ঝোঁকে দায়িত্বহীন আবোল-তাবোল বকচে। ওকে কে পুছবে এত বড় আসরের মধ্যে ? আজ এত কষ্ট করে এত দূরে যাত্রা শুনতে আসা দেখচি নিরর্থক হয়ে গেল। কি হাঙ্গামা বাধালে অশ্বিনী।

অশ্বিনী আমার হাতে দুটো পান এনে দিয়ে বল্লে—খান, আমি জামাটা গায় দিয়ে আসি।

—আরও দেরি করবে অশ্বিনী ? আমার আজ আর যাত্রা দেখা হল না।

—না হয় তো জুতো খাব আপনার কাছে।

সে চলে গেল। আমি নিরুপায় হয়ে সেই পানের দোকানের সামনে বসেই রইলাম, কারণ তখন আমার একার কর্ম্ম নয় —এতবড় আসরে ভিড় ঠেলে ঢুকে জায়গা করে নেওয়া। যখন ও আবার ফিরে এল তখন আসরে কনসার্ট বাজনা শুরু হয়ে গিয়েছে। দেখি ও বেশ সেজেগুজে এসেচে। গায়ে একটা মটকার পাঞ্জাবী, মাথায় একখানা চাদর পাগড়ির মত করে বাঁধা, দিব্যি ফর্সা ধুতি পরনে। ও কি বিষয়-কর্ম্ম করে তাও জানিনে, একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল।

ওর পেছনে পেছনে আসরে ঢুকলাম। যেখানে যাত্রার দল বসে কনসার্ট বাজাচ্চে সেই ফটকে জনকয়েক ভলান্টিয়ার দাঁড়িয়ে ফটক পাহারা দিচ্চে। অশ্বিনী গিয়ে সেই ফটকে দাঁড়ালো। ভলান্টিয়াররা ভাবলো, আমরা যাত্রাদলের লোক। পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালো এক পাশে। তার একটু আগে প্রথম দফা কনসার্ট বাজনা থেমেচে সবে।

এমন সময়ে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো।

দলের পাখোয়াজ-বাজিয়ে হঠাৎ ফটকের দিকে চেয়ে অশ্বিনীকে দেখতে পেয়ে সচকিত-

ভাবে পাশের ফ্লুট-বাজিয়েকে বল্লে—অশ্বিনীবাবু—

—কে ?

—ঐ যে অশ্বিনীবাবু—

অমনি ফ্লুট-বাজিয়ে বাঁশিটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে অশ্বিনীর কাছে এসে হাতজোড় করে বল্লে—আসুন, আসুন অশ্বিনীবাবু, আসুন ! আপনি এখানে ?

অশ্বিনীর দিকে চেয়ে দেখি ওর গলার সুর ও মুখের ভাব বদলে গেচে। আমার সঙ্গে খানিক আগে যে-সুরে কথা বলছিল সে-সুর আর গলায় নেই, সে মানুষই আর ও নয়। গম্ভীর সুরে বল্লে —একটু কাজে এসেছিলাম এখানে—আপনি বোধ হয় দলের ম্যানেজার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার মত লোক আজ এখানে।

আমি মনে মনে ভাবচি, ব্যাপার কি ? অশ্বিনী কি কাজ করে ? এত বড় দলের ম্যানেজার স্বয়ং এসে ওকে অভ্যর্থনা করচে—নবাব খান্‌জা খাঁ হয়ে গেল নাকি অশ্বিনী, অবাই দাস বোষ্টমের ছেলে ?

অশ্বিনী আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে এসে বল্লে—ইনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু, ব্রাহ্মণের ছেলে, এঁকে একটু ভাল জায়গায় বসিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে—ইনি বসবার জায়গা পাচ্ছেন না।

আমি লক্ষ্য করছি, যাত্রাদলের বাজিয়েরা সকলে এ ওকে আঙুল দিয়ে অশ্বিনীকে দেখাচ্চে আর সকলেই কৌতূহলের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে। যেন কি দুর্লভ বস্তুর দর্শনলাভ আজ ঘটেচে ওদের ভাগ্যে, ভাবখানা এই রকম। আমি নিজেও আশ্চর্য্য হয়েছি মনে মনে। কেন অশ্বিনীকে এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করি নি যে ও কি করে ? না, সে আর জিগ্যেস করাই হবে না। ও-ই বা কি মনে করবে। আমাকে ত ওরা পরম যত্নে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালে, সেই সঙ্গে অশ্বিনীকেও।

দলের কে একজন আমার হাতে একটা সিগারেট দিয়ে বল্লে, খান।

অশ্বিনীকেও দিতে গেল, অশ্বিনী আমাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বল্লে—বাপ্‌রে, ওঁর সামনে খাইনে। আমাদের গ্রামের জমিদারের ছেলে।

এই সময় ম্যানেজার হাতজোড় করে অশ্বিনীকে বল্লে—এইবার আপনি একটু বাজান দয়া করে। আপনি এখানে বসে থাকতে কেউ পাখোয়াজে হাত দিতে সাহস করচে না।

—না না, তাতে কি। হোক, আমি শুনি। বেশ বাজান উনি।

মুরুব্বিয়ানা চালে এটা বল্লে অশ্বিনী।

—আজ্ঞে না, আপনি আসরে বসে থাকতে কারো সাহস হচ্চে না বাজাতে। একখানা বাজিয়ে দিন আপনি।

পাখোয়াজ-বাজিয়েও একবার এসে হাতজোড় করে বল্লে—আপনি আমাদের গুরুস্থানীয়, মাথার মণি। আজ্ঞে, আপনি এখানে থাকতে বাবু, আমাদের কি যন্তরে হাত দেওয়া সাজে ?

অশ্বিনী মৃদু হেসে (তাও মুরুব্বিয়ানা চালে, আগেকার সে অশ্বিনী যেন আর নেই) পাখোয়াজ ধরে এগিয়ে নিয়ে বসলো। কানে কানে কথা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, সাজঘর থেকে পর্য্যন্ত যাত্রা দলের লোক এসে ফটকের কাছে জড়ো হয়ে কৌতূহলে অশ্বিনীর বাজানো দেখতে ভিড় করলে। বাজনাও বটে অশ্বিনীর। বাপের বিষয় উড়িয়ে ফুর্ত্তি করবার সময়ে গানবাজনার দিকেও একটু-আধটু মন দিয়েছিলাম, খুব বেশি না বুঝলেও গানবাজনা সম্বন্ধে নিতান্ত অর্ব্বাচীন নই। পাখোয়াজ ধরে অশ্বিনী যখন ঘা দিতে লাগলো, তখন যেন মনে হল, গুরু গুরু শব্দে মেঘগর্জ্জন হচ্চে কোথাও আকাশে। মেঘে মেঘে তার ধ্বনি, ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি। আসর এক মুহূর্ত্তে জমে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল লোকজনের কোলাহল। সবাই উৎসুক নয়নে চেয়ে দেখচে, সবারই কানে গিয়েচে—এই যে-লোকটি পাখোয়াজ বাজাচ্চে, উনিই অশ্বিনীবাবু স্বয়ং। লোকের দৃষ্টিতে কি ঔৎসুক্য, কি আনন্দ, মুখে কি সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধা! আমি শিল্পী নই, কিন্তু ওস্তাদ শিল্পীর প্রতি এই মৌন শ্রদ্ধা আমার অন্তর স্পর্শ করলে। আমি নিজেও গর্ব্ব অনুভব করলাম যে, অশ্বিনী আমার বাল্যবন্ধু। এতক্ষণ একে ভিখিরি অবাই দাস বোষ্টমের ছেলে বলে মনে মনে যে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেছিলুম, তার স্থান অধিকার করলে ওর প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। এই বিস্ময়টা যেন আমি কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। এই সেই অশ্বিনী, অবাই দাসের ছেলে, দোচালা ঘরে বাস করতো, ভিক্ষে করে সংসার চালাতো ওর বাপ-মা।

অশ্বিনীর বাজনা থামলে পাখোয়াজ-বাজিয়ে ওর পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লে—আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার মত হাত হয়। ম্যানেজার গদ্‌গদ কণ্ঠে বল্লে—সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হয় হাত আপনার। দয়া করে একবার ডুগিতবলাটা—

অশ্বিনীকে এতক্ষণ দু'দিক থেকে দু'জনে পাখার বাতাস করেচে। আসরে বড় গরম। পাখোয়াজ-বাজনার শ্রমে অশ্বিনী ঘেমে উঠেচে। গ্রামের জমিদারের ছেলে আমি, ওর পাশে বসে নিজেকে নিতান্ত নগণ্য মনে করতে লাগলুম। পালা আরম্ভ হয়ে গেল। অশ্বিনী ওদের অনুরোধে বার-কয়েক পাখোয়াজ আর ডুগি-তবলা বাজালে। ওস্তাদের হাত দেখলুম বটে ওর সমস্ত বাজনার মধ্যে।

তৃতীয় অঙ্কের শেষে দুজনে বার হয়ে এলুম ফাঁকায়।

অশ্বিনী বল্লে—বাবু, এবার একটু চলবে?

—না ভাই। আমায় অনুরোধ কোরো না।

—কি খাবেন?

—কিছু খাবো না। চল একটু চা খাই।

—উঁহু, ওতে আমার মৌতাত থাকবে না। আপনি খান। আসরে ওরা বাজাতে বলবে। সাদা চোখে হাত খোলে না—

আমি কৌতূহলের সুরে বল্লাম—অশ্বিনী, আজ বড় আনন্দ পেলাম। কতদিন তোরা গ্রাম ছেড়েছিস, তোদের কোনো সংবাদও পাইনি—তুই যে এত বড় হয়ে উঠেছিস

তা আজ তোকে দেখে—

অশ্বিনী আমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। বল্লে—চলুন কিছু খেতে হবে।

—তা হবে না। আমি তোমাকে আজ খাওয়াব।

—তা কি হয়! আপনাদের খেয়ে তো আমরা মানুষ। আজ আমি খাওয়াব আপনাকে। আমি যেদিন আপনাদের বাড়ী যাবো, সেদিন খাওয়াবেন আপনি।

অশ্বিনীকে জোর করে খাওয়ালুম একটা খাবারের দোকানে সিঙ্গারা আর সন্দেশ। ও ছাড়লে না আমাকে খাওয়াতে।

বাল্যকালের কথা, আমাদের গ্রামের কথা ও অনেক বলতে লাগলো। ওর মা বেঁচে নেই। ছোট ভাইকে কোথাকার দোকানে কাজে ভর্ত্তি করে দিয়েচে। কালনার কাছে গোপীনাথপুরে অশ্বিনী বিবাহ করেচে। শ্বশুরের কাপড়ের দোকান কালনা বাজারে। একমাত্র মেয়ে, শ্বশুর চোখ বুজলে ওর স্ত্রীই সম্পত্তি পাবে।

বল্লাম—বাজনা শিখলে কোথায় ?

ও হেসে বল্লে—ঝোঁক ছিল ওদিকে। ওস্তাদের দয়ায় আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে। বাবা ছিলেন গাইয়ে-বাজিয়ে, তাঁর সেই গুণটা অর্শেচে আমাতে। ওস্তাদ পেয়েছিলাম যাত্রার দলের বড় বাজিয়ে দুর্লভরাম সাধুখাঁকে। তিনি আমাকে হাত ধরে শেখান। যজ্ঞেশ্বর নন্দীর কাছে তবলা শিক্ষা করি। আজ্ঞে, তা আপনার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে এমন সব ওস্তাদ পেয়েছিলাম, যাদের এক ডাকে লোকে চেনে। পয়সাও রোজগার করি। কেন মিথ্যে বলবো, যেদিন যে আসরে ঠিকে বাজাবো, তিন টাকা রাত; আর খোরাকী—দুধ আর ইয়ে—ওই যা বললাম—মৌতাত। তা, বায়না লেগেই আছে দাদাবাবু। মাসে একশ টাকা কেউ মারে না, রাজার হালে খাওয়া-দাওয়া—আর সে আর আপনাদের সামনে কি বলবো—খাতিরও কিছু করে লোকে।

এই ঘটনার পরে অনেক দিন হয়ে গিয়েচে। প্রায় পনেরা-বোলো বছর হবে।

অশ্বিনীর সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হয়নি।

গত বৈশাখ মাসে একদিন বাইরের ঘরে বসে আছি, একটি গরিব স্ত্রীলোক একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে আমাদের বাড়ীর নীচে ভিক্ষে করতে ঢুকলো। আমার অবস্থাও যথেষ্ট খারাপ হয়ে গিয়েচে, যৌবনের সে উদ্দাম স্রোত আমাকে এই শুষ্ক বালুচরে বসিয়ে কোন্ দিক দিয়ে যে নিঃশব্দে অন্তর্হিত হয়েচে তার সন্ধানও পাই নি।

বেশ একটু পরে স্ত্রীলোকটি আধখানা কুমড়ো আর কিছু চাল আঁচলে নিয়ে বাড়া থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

আবার বড় মেয়েকে জিগ্যেস করলাম ডেকে—ও কে ? ওকে তো কখনো দেখিনি ?

বড় মেয়ে যা বল্লে তার মোট মর্ম্ম এই, ওরা ওপাড়ার গৌরদাস বৈরাগীর বাড়া এসেচে। এই গ্রামেই আগে ওর শ্বশুরের বাড়ী ছিল। ওর স্বামীর নাম ছিল অশ্বিনী। যাত্রাদলে

বাজনা বাজাতো। ওর স্বামী মারা গিয়েচে আজ চার পাঁচ বছর। কিছু রেখে যায়নি, নেশাভাঙ করে সব উড়িয়ে দিয়ে গিয়েচে। কেউ কোথাও নেই ওদের। গৌরদাস ওই বৌটার কি রকমের ভাশুর, তাই ওদের আশ্রয়ে এসে উঠেচে। গৌরদাসেরও তো অবস্থা খারাপ, কাজেই ওকে ভিক্ষে করে চালাতে হয়—নইলে উপায় কি।

উপায় যে কিছু নেই, তা নিজেকে দেখেই আজকাল বেশ বুঝতে পারি।

সে কথা অবিশ্যি আর বড় মেয়েকে বল্লুম না।

শেষ খেলা

গৃহপ্রাঙ্গণে ভবনশিখী পাখা মেলে নেচে বেড়াচ্ছে অতিমুক্তলতার পাশে পাশে। কাল রাত্রে প্রমোদগৃহে যে জাতিপুষ্পের সুগন্ধি মাল্য ব্যবহৃত হয়েছিল, সেটা বাতায়ন-বলভিতে প্রলম্বিত। বোধ হয় পরিত্যক্ত। আর সেটার কি দরকার!

অতিমুক্তলতার ফাঁকে ফাঁকে দূরের নীল শৈলশ্রেণীর তুষার-মুকুট চোখে পড়ে। মাসটা চৈত্র, কিন্তু বেশ শীত।

সুন্দরী ভদ্রা প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হয়ে বহির্দ্বারের কাছে এসে তরুণ স্বামীর দিকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, রও, তুমি কখন ফিরবে বলে যাও।

নন্দকে অত্যন্ত অনিচ্ছায় যেতে হচ্ছে গৃহ ছেড়ে। তিনি যেতে আদৌ ইচ্ছুক নন। নবপরিণীতা সুন্দরী বধূ প্রাসাদ-অলিন্দে আলুলায়িত-কুন্তল অবস্থায় দণ্ডায়মানা, শাক্যবংশের প্রাসাদ একাই যেন আলো করেছে এই প্রভাতকালে, নবোদিত সূর্য্যের আলো ম্লান হয়েছে না ওর মুখের সপ্রেম চাহনির আলোয়!

রাজকুমার নন্দ একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। উপায় নেই, যেতেই হবে। কাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান জিন তথাগত ন্যগ্রোধারাম বিহার থেকে শাক্যদের প্রাসাদের কনিষ্ঠ নন্দের আলয়ে ভিক্ষা করতে এসেছিলেন।

দাদা কতকাল পরে আবার শাক্যদের প্রাসাদ আলো করেছেন ফিরে এসে। মহাপ্রজাপতি গৌতমী যদিও নন্দকে অঙ্কে পেয়েছিলেন প্রৌঢ় বয়সে, তবুও শাক্যকুলগৌরব ভগবান্ বুদ্ধকে তিনিই মানুষ করেছিলেন তাঁর মাতার মৃত্যুর পর থেকে। কুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ ক'রে যাওয়ার পরে তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। নন্দকে কোলে পেয়েছিলেন, তাই —নয়তো বাঁচতেই পারতেন না। সুন্দর, সুঠাম, সুশীল নন্দ। তাঁর চোখের পুতুল, তাঁর কতদিনের স্বপ্ন।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কৈশোরকালের নাম ছিল মায়া। যখন তিনি প্রথমে শাক্যরাজপ্রাসাদে আসেন নববধূরূপে, তার আগেই তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী মহামায়ার বিবাহ হয়েছিল এখানে। যখন মহামায়ার কোন পুত্রসন্তান হল না অনেকদিন পর্য্যন্ত, তখন প্রজারা

রাজা শুদ্ধোধনকে পুনরায় বিবাহ দিলে মহামায়ার বড়দিদি মায়ার সঙ্গে। তারপর মহামায়ার কোলে এলেন সিদ্ধার্থ। তার কতদিন পরে মায়া পেলেন আয়ুষ্মান নন্দকে নিজের ক্রোড়ে।

সেই নন্দ!

কপিলাবাস্তু নগরীর সমাজস্থান, চতুষ্পথ, হট্ট, ক্রীড়াস্থান অন্ধকার ক'রে যেদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ গভীর নিশীথে গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন, সেদিন এই নন্দই ছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের ও মায়ার একমাত্র ভরসা। নন্দ তখন বালক, দাদা গৃহত্যাগ করাতে তিনি কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। বড় ভালবাসতেন তিনি দাদাকে। কপিলাবাস্তুর রাজভবন, প্রাচীর, গোপুর ও চত্বর হাহাকারে ভরে গিয়েছিল সেদিন।

ইতিমধ্যে আয়ুষ্মান রাজকুমার নন্দ যৌবনাবস্থায় উপনীত হয়েছেন, জ্যেষ্ঠের গুণগান ও যশঃসৌরভ সুদূর কাশী, রাজগৃহ ও পাটলিপুত্র থেকে বাতাসে বহন ক'রে এনেছে কপিলাবাস্তুর চতুষ্পথে। ভগবান জিন দেবতা, তিনি মহাবাণী প্রচার করেছেন দিকে দিকে। রাজগৃহের নৃপতি ও শ্রেষ্ঠীদের শিরোভূষণ তাঁর সেই দাদার পদপ্রান্তে আনমিত হয়েছে—এ কথাও কত লোকের মুখে মুখে এসে পৌছেচে এখানে।

কতকাল পরে সেই তাঁর দাদা প্রত্যাগমন করেছেন কপিলাবাস্তুতে। আজ কত আনন্দের দিন শাক্যকুলের! অবশ্য তিনি প্রাসাদে আসেন নি, ন্যগ্রোধারাম বিহারে শিষ্যপরিবৃত হয়ে বাস করছেন। কাল সন্ধ্যায় এসেছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা আয়ুষ্মান নন্দের আলয়ে ভিক্ষা করতে। ভ্রাতৃবধূ কল্যাণী ভদ্রা অত্যন্ত আদর ক'রে তাঁকে অন্ন পরিবেশন করেছিলেন, অতি সুস্বাদু অন্ন। যাবার সময় অনেকগুলো সুপক্ক ফল দিয়েছিলেন সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে। ভগবান তথাগত কনিষ্ঠকে আদেশ ক'রে গেলেন—এ ফলগুলো তুমি কাল সকালে নিশ্চয়ই আমার কাছে নিয়ে আসবে। তুমি নিজে এসো। অন্য কারও হাতে পাঠিও না।

তাই আজ রাজকুমার নন্দ সেই ফলগুলি একটি বেতসলতায় প্রস্তুত আধারে রক্ষা ক'রে আধারটি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চললেন।

সুন্দরী ভদ্রাকে ছেড়ে নন্দ একদণ্ডও থাকতে পারেন না কোথাও! মাত্র সম্বৎসর অতীত হয়েছে নন্দ বিবাহ করেছেন। নবপরিণীতা কিশোরী পত্নীকে চোখের আড়াল করার সাধ্য নেই নন্দের। দুজনে মিলে একসঙ্গে অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, স্নান, গাত্রসংবাহন, আমিষ ও মধু সেবন, চিত্রকর্ম, মাল্যধারণ, চন্দন-অনুলেপন—এই সব চলছে। এই কয়দিনের প্রতিদিনই নন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাগুরু ভগবান তথাগত জিনকে দর্শন করতে গিয়েছেন—কিন্তু না, বেশিক্ষণ থাকতে পারেন নি। সর্ব্বদা ভদ্রার মুখ মনে পড়ে। সমস্ত জগতের মধ্যে ওই একখানি সুন্দর মুখ গড়েছিলেন বিধাতাপুরুষ। ওই একখানি রূপের মধ্যে সারা পৃথিবীর রূপের মঞ্জুষা। ওকে ব'লে বোঝাতে হয়না, ফুটন্ত ফুলের মত ওর বাণী ওর রূপের মধ্যেই মুখর হয়ে উঠেছে দিনরাত।

ভগবান জিন বললেন, নন্দ, এখুনি যাবে?

সলজ্জ শিরঃকম্পনের সঙ্গে নন্দ বলতেন, হ্যাঁ দাদা।

—বেশ, যাও।

কদিনই এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন প্রশান্তবুদ্ধি, দূরদর্শী মহাপুরুষ, কিছু বলেন না। কনিষ্ঠের গমনপথের দিকে স্নেহ ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখেন।

আজ এত সকালে এখনই যেতে হবে বধূকে ছেড়ে, মন সরছিল না রাজকুমারের। কিন্তু উপায় নেই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য নেই। যেতে হবেই।

ভদ্রা বললে, কখন আসবে?

—বেলা দুদণ্ডের মধ্যে।

—ভগবান জিনকে আমার প্রণাম জানিও। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।

—একসঙ্গে অভ্যঞ্জন করব ফিরে এসে। স্নান ও কেলিও।

ভদ্রার বিশাল নয়ন দুটি কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হাততালি দিতে দিতে বললে, খুব ভাল খুব ভাল, শীগগির এসো আয়ুষ্মান, অপেক্ষা করে থাকব তোমার জন্যে—

একটা পেচক কর্কশ রবে হর্ম্যের উপর দিয়ে উড়ে গেল কি?

নন্দ বা ভদ্রা কেউ শুনতে পেলেন না সে রব। সুখী নন্দ, সুমনা ভদ্রা। কপিলাবাস্তর প্রাসাদশিখরে দিবসের প্রথম প্রহর ঘোষণা করেছে সূর্য্যদেবের তরুণ কিরণ।

ন্যগ্রোধারাম বিহারে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের প্রভাত-পরিচর্য্যা সমাপ্ত হয়েছে। ভগবান জিন আজ যেন আগ্রহের দৃষ্টিতে বার বার চাইছেন পথের দিকে।

একজন ভিক্ষুককে বললেন, আবুস, রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নি।

—কেন?

—এ স্থানে কীটের উপদ্রব। এক পাত্র সুবচল রস আমাকে দিও পানের জন্যে।। নতুবা অনিদ্রাহেতু শিরঃপীড়া উপস্থিত হবে।

—আপনার যেমন আজ্ঞা। আপনার ইচ্ছাই তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি।

এমন সময়ে বিনীত হাস্যমুখে রাজকুমার নন্দ জ্যেষ্ঠের পাদবন্দনা ক'রে ফলপূর্ণ করণ্ডকটি তাঁর সামনে স্থাপন করলেন। ভগবান জিন কনিষ্ঠের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে নন্দ, শরীর ভাল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ফলপূর্ণ করণ্ডকটি কি খুব ভারী?

—আজ্ঞে না।

—ওই ভারটি স্বচ্ছন্দে বহন করলে কেন, বল তো? অন্য কারও জন্যে কি বহন করতে?

—ভন্তে, না।

—এ কথা সত্যি কি না?

—হ্যাঁ ভন্তে, এ কথা সত্যি।

—তবে এখন কেন বহন করলে ওটি?

—ভগবান, আপনাকে ভালবাসি। আপনার কর্ম্মে আমার আনন্দ। কষ্ট হবে কেন?

রাজকুমার নন্দ আরও কিছুক্ষণ পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বললেন। বিহারের এদিকে-ওদিকে গেলেন। এদিকে মন ছটফট করছিল, বেশিক্ষণ আর থাকা চলে না। চক্ষু-লজ্জার খাতিরে আরও অর্দ্ধদণ্ড এদিক-ওদিক করতে হল। তারপর ভগবান জিনের পাদ-বন্দনা ও প্রদক্ষিণ ক'রে বিদায় প্রার্থনা করলেন। হায়, তখন তিনি জানতেন না যে বাজ-পাখীর কবলগত তিনি। বুদ্ধদেব কনিষ্ঠের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, কোথায় যাবে নন্দ?

—গৃহে।

—গৃহ? গৃহে আসক্ত হয়ো না। কেননা, গৃহ—তৃষ্ণা, রাগ, বিবাদ, মন্যু, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য, মনঃপীড়া ইত্যাদির নিদান এবং জন্ম-মরণের আলবাল। গৃহ ছেড়ে বাইরে এসেছ আমারই ইচ্ছায়। আমি তোমাকে স্নেহ করি। তোমার মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা রয়েছে। বৃথা গৃহবাসী হয়ে সে সম্ভাবনা নষ্ট ক'রো না। জাগতিক সুখ দুদিনের, তার জন্যে চিরস্থায়ী সুখকে নষ্ট করবে কেন? আমার ইচ্ছা তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।

রাজকুমার নন্দের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এ কি সর্ব্বনেশে কথা পূজনীয় জ্যেষ্ঠের মুখে! ভগবান জিন তাঁর সঙ্গে রহস্য করছেন না তো?

বুদ্ধদেব কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিরুত্তর দেখে আবার বললেন, কি নন্দ? কথা বললে না যে?

নন্দ অতীব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ভন্তে, আমি সম্প্রতি বিবাহ করেছি, আপনি জানেন। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার যোগ্য নই। মন যদি—মানে—সংসারের দিকেই থাকে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা মিথ্যাচার হবে না কি? মিথ্যাচারে অভিরুচি হয় না, দেব।

নন্দ জানতেন না মহামানবের বজ্রকঠোর নির্ম্মম দৃষ্টি তাঁর ওপর নিপতিত। পাথরের দেবতার মত তিনি নির্বিকার, শিষ্যের কোনও দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নন। তাকে তিনি সাধনোজ্জ্বল আত্মার সত্যদৃষ্টি ও নির্ব্বাণ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাবে কোথায় বাবাজি।

ধীরে ধীরে বুদ্ধদেব বললেন, শোন। প্রেম ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য। যতদিন যৌবন, প্রেম ততদিন। রমণীর সৌন্দর্য্যও দুদিনের। স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যাঘ্র বা অপ্সরী স্বপ্নদ্রষ্টার নিজেরই একটি অংশ। এক অখণ্ড আমিই মোহগ্রস্ত অবস্থায় নিজেকে বহুরূপে দেখছে। জগৎ কোথায়? জগৎ নেই।

রাজকুমার নন্দ আয়ত সুন্দর চক্ষু দুটি তুলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চক্ষে ব্যাধপীড়িত মৃগের কাতর দৃষ্টি।

ভগবান জিন বললেন, শোন নন্দ। তোমার কথা মিথ্যা নয়, তুমি ঠিকই বললে। কিন্তু, কি জান, পুরুষকার একটা খুব বড় জিনিস। চেষ্টা ছাড়া কিছু হয় না। হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকলে জন্ম বৃথা যাবে, বার বার জন্মমৃত্যুর যূপকাষ্ঠে ব্রাহ্মণদের যজ্ঞীয় পশুর মত বলি প্রদান করবে নিজেকে নিজে। এ থেকে কোন দিন উদ্ধার পাবে না, মুক্তি পাবে না। সেটা ভাল, না এই এক জন্মেই দেহ, কালও অহঙ্কাররূপে বন্ধকে নির্ম্মম ভাবে ধ্বংস ক'রে

শাশ্বত শান্তি ও আনন্দ লাভ করা ভাল ? বল শুনি।

রাজকুমার নন্দ বললেন, ভন্তে, জন্ম-মৃত্যু নিরোধ করাই ভাল।

—বেশ। তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। আর গৃহে ফিরে যেও না। এই শুভ মুহূর্ত্তটির প্রতীক্ষাতেই আমি ছিলাম। শুভ মুহূর্ত জীবনে একবার আসে, দুইবার আসে না। হেলায় হারিও না সে মুহূর্ত্ত। যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন দেখবে সংসার-সুখ তার কাছে অতি তুচ্ছ।

নন্দ শাক্যকুলজাত ক্ষাত্র বীর। আজ্ঞানুবর্ত্তিতা তে কুলের ধর্ম্ম।

বীরের মতই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে তরুণী পত্নী প্রেমময়ী ভদ্রাকে মন থেকে মুছে ফেলে মাথা নীচু করে ঈষৎ হেসে বললেন, আপনি যা বলেন।

—প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে ?

—আপনি যা বলেন।

—আজই মস্তক মুণ্ডন করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। আর একটি কাজ করতে হবে। বড় কঠিন কাজ।

—আদেশ করুন।

—ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করতে যেতে হবে তোমার জননী ও পত্নীর কাছে। আজই।

—আপনি যা বলেন।

এক বৎসর অতীত হয়েছে।

পুনরায় ফাল্গুন মাস। কিংশুক ও চম্পক ফুলের মেলা বসেছে বনে বনে, শৈলসানুতে, অধিত্যকার গর্ভদেশে। প্রকাণ্ড একটি ভেরীর মত শিমূল বৃক্ষের কাণ্ড বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের নিম্নে। মাথায় তার ফুটন্ত ফুলের শোভা।

শ্রাবস্তিপুরের জেতবনবিহারে ভগবান তথাগত একটি নাগকেশর বৃক্ষের ছায়ায় ব'সে শক্তুর পিণ্ড ভোজন করছেন, পার্শ্বে একটি স্থালীতে শালিধানের সিদ্ধান্ন—পুষ্পভদ্রক-বিহারের ভিক্ষুণী উর্ম্মিমাতার প্রেরিত, ভগবান তথাগতের সেবার জন্য।

এমন সময়ে জনৈক ভিক্ষু এসে কাছে দাঁড়াতেই বুদ্ধদেব বললেন, আবুস, কিছু বলবে ?

—ভন্তে, নিবেদন আছে।

—বল।

—ভন্তে, আজ আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিক্ষু নন্দ আর একজন ভিক্ষুর কাছে বলছিলেন, তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনে ইচ্ছুক। ব্রহ্মচর্য্যপালন আর তাঁর দ্বারা নাকি সম্ভব হচ্ছে না।

—কার কাছে বলছিল ?

—ভিক্ষু ভেণ ও ভিক্ষু উল্মুকের কাছে।

—আবুস, তুমি আমার নাম ক'রে আয়ুষ্মান নন্দকে বলো, আমি তাকে ডেকেছি। আর সামান্য লবণ পাঠিয়ে দিও ওর হাতে।

—ভন্তে, আপনার যা আজ্ঞা।

আয়ুষ্মান নন্দ জ্যেষ্ঠের ডাক শুনে প্রমাদ গণলেন। সমবয়সী ভিক্ষুক উল্মুকের কাছে আজই সকালে দু-একটা বেফাঁস কথা ব'লে ফেলেছিলেন বটে মনের দুঃখে। কিন্তু—

ভগবান জিন কনিষ্ঠের মুখের দিকে স্নেহভরে চেয়ে বললেন, নন্দ, তুমি কারও কাছে কিছু বলছিলে আজ ?

—ভন্তে, বলেছি।

—বলেছ যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা আর তোমার দ্বারা সম্ভব নয়, তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনে উৎসুক ?

—ভন্তে, এ কথা সত্য।

—কারণ কি আমাকে বলবে ?

রাজকুমার নন্দ মাথা হেঁট ক'রে নীরব রইলেন। কোনও কথা বললেন না।

ভগবান জিন বললেন, লবণ এনেছ ?

—ভন্তে, এনেছি।

—স্থালীতে নিক্ষেপ কর।

—যথা আজ্ঞা।

এখন বল, ব্রহ্মচর্য্য পালন কেন তোমার দ্বারা অসম্ভব ? গৃহত্যাগ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছ, এখন আবার গৃহে ফিরতে চাও কি জন্যে খুলে বল।

আয়ুষ্মান নন্দ অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চোখ মাটির দিকে রেখে বলতে আরম্ভ করলেন, ভন্তে, আমায় প্রগল্‌ভতার জন্যে ক্ষমা করবেন। আমার সংসার ভোগ করার স্পৃহা গেল না। আর একটি কথা, যখন সেদিন ফলপূর্ণ করণ্ডক হস্তে আপনার সমীপে ন্যগ্রোধারামে যাই, তখন আপনার ভ্রাতৃবধূ জনপদকল্যাণী গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে সপ্রেম দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বার বার ব্যাকুল স্বরে বলেছিল, ফিরে এসো তাড়াতাড়ি, প্রিয়, বিলম্ব ক'রো না যেন। তার সেই আলুলায়িতকুন্তলা মূর্ত্তিতে আজও যেন সে সেই দ্বারে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছে। আমি তার সে মূর্ত্তি ভুলতে পারছি না, দেব। আমায় গৃহস্থাশ্রমে ফিরে যেতে অনুমতি দিন।

বুদ্ধদেব প্রসন্ন হাস্যে বললেন, সাধু আয়ুষ্মান নন্দ, সাধু! তুমি সত্যবাদী, অকপট। এই জন্যেই তোমাকে গৃহের বাহিরে এনেছিলাম। তুমি কুলপুত্র, সত্যজ্ঞানের জন্যে গৃহত্যাগ ক'রে এসে আবার গৃহে ফিরে গেলে অত্যন্ত নিন্দার কথা হবে সেটা। বংশ পতিত হবে। তপস্যা কর, নতুবা জ্ঞান লাভ হবে না। কর্ম্মই কর্ম্মকে জানিয়ে দেবে; ক্রমে আনন্দ ও বল পাবে মনে। আপাতমধুর অনিত্যবস্তুর প্রলোভনে শ্রেয় ত্যাগ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ ? যাও, খুব মনোযোগের সঙ্গে চেষ্টা কর।

রাজপুত্র আয়ুষ্মান নন্দ নিজের কুটিরে ফিরলেন। আবার কিছুদিন ধ'রে একমনে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন চালান অধ্যবসায়ের সঙ্গে। বিনয়গুলি যথাযথ প্রতিপালন

করবার চেষ্টায় সারাদিন বেশ কেটে যায়; কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে পদচিহ্নহীন প্রান্তরের দিকে চেয়ে মন কেমন ক'রে ওঠে।

মনে হয় কতদূরে সে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় সেই গৃহদ্বারটিতে। এখনও সে আশা ছাড়েনি তার। ভদ্রার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। যেদিন ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, সেদিন রাজপ্রাসাদে মহাপ্রজাপতি মাতা গোমতী তাঁকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন; কিন্তু ভদ্রা মূর্চ্ছিতা ও জ্ঞানহীনা ছিল প্রাসাদকক্ষে, ভিক্ষুর কাষায়বেশে তাঁর আগমন শ্রবণ করে। আয়ুষ্মান নন্দের সঙ্গে ছিলেন ভিক্ষু স্থবির উপালী।

নন্দের ইচ্ছা ছিল পত্নীর মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্যে অপেক্ষা করেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ স্থবির উপালী অপেক্ষা করতে দেননি নন্দকে। বলেছিলেন, চল, চল, আয়ুষ্মান। জননীর নিকট ভিক্ষা করলেই বিনয় প্রতিপালিত হল। যাই চল।

নন্দ রাজপ্রাসাদে চিত্রশিক্ষকের নিকট চিত্রকর্ম্ম শিখেছিলেন, ভাল চিত্র অঙ্কন করতে পারতেন।

কিছুকাল পরে তিনি এক উপায় বার করলেন।

ভদ্রাকে না দেখে আর সত্যি থাকা যায় না। এক এক নির্জ্জন সন্ধ্যায় মনে হয়, প্রাণ যেন আর দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে বিনয় প্রতিপালনের শৃঙ্খল থেকে, অষ্টাঙ্গিক মার্গের পাশবন্ধন থেকে, সেই বহুদূরে প্রাসাদ-অলিন্দে, যেখানে এই বসন্তে নাগকেশর বৃক্ষে কুঁড়ি নেমেছে, বকুল ফুল ঝুর ঝুর ক'রে ঝ'রে পড়ছে শিলাবেদিকায়, অতিমুক্তলতায় কচি রাঙা পত্রের উদ্গম হচ্ছে; ভদ্রা বাতায়ন-বলভিতে পুষ্পমাল্য রেখে একদৃষ্টে তাঁর আগমনপথের দিকে চেয়ে আছে। সেখানেই শান্তি, সেখানেই সুখ। নন্দ এক প্রস্তরফলকে ভদ্রার এক প্রতিমূর্তি আঁকলেন। সেই প্রতিমূর্ত্তির সঙ্গে নির্জ্জনে কথা বলেন, কত হাস্যপরিহাস করেন, কখনও অশ্রুপাত করেন।

অনেক সময় সারারাত্রি এমন ভাবে কাটে।

নন্দ আকুলস্বরে স্ত্রীর ছবির দিকে চেয়ে কত প্রেম-সম্বোধন করেন, অনুচ্চস্বরে গান গেয়ে শোনান।

নন্দের কুটিরের কাছাকাছি যে সব ভিক্ষুরা থাকেন, তাঁরা ক্রমে ব্যাপারটা জানতে পারলেন।

দু-একজন বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু নন্দকে অনেক প্রবোধ দিলেন, অনেক সদ্ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন। দিলে কি হবে, মন মানে না, তিন-চার মাস ধ'রে ব্যাপারটা সমানে চলতে লাগল। প্রথমে কেউ বুদ্ধদেবের কানে কথাটা তুলতে সাহস করেননি। মঠে বাস ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে এ রকম ব্যবহার সদ্ধর্ম্মের বিরোধী, বিনয়-আচরণের বিরোধী, সাধন-তপস্যার বিরোধী। সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জা ও সঙ্কোচের ব্যাপার এই যে, ইনি ভগবান জিন তথাগতের মাতৃষসার পুত্র।

কয়েকজন ভিক্ষুতে মিলে যুক্তি ও পরামর্শ ক'রে একদিন একজন বিজ্ঞ ভিক্ষু পদ্মপাদ

বুদ্ধদেবের নিকট গিয়ে ধীরে ধীরে নন্দের কাণ্ডকীর্ত্তি সব নিবেদন করলেন।

ভগবান বুদ্ধদেব মনোযোগের সঙ্গে সবটুকু শুনে বললেন, আবুস, আয়ুষ্মান নন্দকে গিয়ে বলুন যে, আমি তাকে ডেকেছি।

—ভন্তে, আপনার যা আজ্ঞা।

নন্দ কিছুক্ষণ পরে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে কিছুদূরে বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তথাগত বললেন, নন্দ, শুনলাম তুমি পুনরায় ব্রহ্মচর্য্যে অমনোযোগী হয়েছ, বিনয়গুলি রীতিমত প্রতিপালন কর না ?

—ভন্তে, এ কথা সত্য।

—তুমি পাথরের গায়ে তোমার পত্নীর চিত্র অঙ্কন ক'রে তারই দিকে তাকিয়ে রাত্রিবেলা হাস কাঁদ ?

—ভন্তে, হ্যাঁ।

—কেন এমন আশ্রমবিরুদ্ধ আচরণ কর ?

—ভন্তে, এ কথা আমি পূর্ব্বেই আপনাকে নিবেদন করেছি। আপনার ভ্রাতৃবধূ শাক্যানী জনপদকল্যাণীর কথা বিস্মৃত হতে পারছি না, তিনি আমার সমস্ত মন বুদ্ধি অধিকার ক'রে আছেন ব'লেই আমি ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতিলাভ করতে পারছি নে। আপনি আদেশ করুন, আমি গৃহস্থাশ্রমে ফিরে যাই। আমার কিছুই হচ্ছে না। দু' দিকই গেল।

ভগবান জিন স্নেহ ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে এই তরুণবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর তাঁকে ইঙ্গিত করলেন নিকটে এসে উপবেশন করতে।

ধীরে ধীরে বললেন, নন্দ, একটা পুরনো কথা বলি শোন। যখন উরুবিল্ব গ্রামের অরণ্যে আমি অভিসম্বোধি লাভ করলাম, তখন আমি ভাবলাম এ ধর্ম্ম সাধারণের কাছে প্রচার করব কি না। ভোগাসক্ত বিচারশক্তিহীন ভাবপ্রবণ মানবসমূহের পক্ষে ধর্ম্মের এ আদর্শ উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন হবে। আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে সেই বনে কিছুকাল অবস্থান করি। একদিন সাহম্পতি ব্রহ্মা আমাকে এসে অনুরোধ করেন মানবসমাজের কল্যাণের জন্য এই ধর্ম্ম প্রচার করতে। তাঁরই কথায় আমি পূর্ব্বসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করি। তারপর মনে ভাবলাম, সর্ব্বাগ্রে কার কাছে এ ধর্ম্ম প্রচার করব। কে বুঝবে ?

অনেক চিন্তার পরে আমার দুই পূর্ব্বতন গুরু আবাদ কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রের কথা মনে পড়ল। তখনই ধ্যানে ব'সে দেখলাম, ঐ দুই মহাত্মা মাত্র দশ দিন পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেছেন। তা হ'লে উপায় ? মানুষ নেই, সবাই তোমার মত নির্ব্বোধ। তখন আমার পাঁচজন সাধন-সঙ্গীর কথা মনে পড়ল। তাঁরা ছিলেন ঋষিপত্তন মৃগদাবে সাধনারত। এঁদের গিয়ে উপসম্পদা দান ক'রে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত করলাম। শীঘ্রই তাঁরা সত্যতত্ত্বের ধ্যানে সম্পূর্ণ অধিকারী হলেন এবং জনসমাজে সদ্ধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃত যোগ্যতা লাভ করলেন। আমিও এই পঁয়ত্রিশ বছর সত্যের প্রচারে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছি। আমার নিজের উপলব্ধি এই যে,

শিষ্য নিজের সংযম পবিত্রতা ও তপস্যার দ্বারাই মুক্তিলাভ করে, এ জন্যে চাই তার নিজের দৃঢ় ইচ্ছা ও অধ্যবসায়। আমি তোমাকে শুধু পথ দেখিয়ে দিতে পারি। বাকীটুকু করতে হবে তোমার নিজের উদ্যমে ও সত্যসঙ্কল্পে। এখন কী তোমার অভিরুচি? জীবনের দুঃখের লবণ-জলধি পার হতে চাও, না পথভ্রান্ত নাবিকের মত ঘুরে বেড়াবে জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে?

নন্দ মাথা নীচু ক'রে বললেন, ভন্তে, আমি অত্যন্ত দুর্ব্বলচেতা। আমি বিনয় প্রতিপালন করতে পারছি না। আমাকে আদেশ করুন, আমি গৃহে ফিরে যাই। আমি আপনার স্নেহের ও কৃপার অযোগ্য।

ভগবান বুদ্ধদেব তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে স্নেহভাজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তধারণ ক'রে বললেন, চল, এস আমার সঙ্গে।

অবাক হয়ে গেলেন নন্দ। দাদা তাঁকে নিয়ে নক্ষত্রবেগে উড়ে চলেছেন নীল শূন্য পথ বেয়ে। পদতলে গোটা পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গেল। উভয়ে এক অপূর্ব্ব সুন্দর মহাদেশে উপস্থিত হলেন। দিকে দিকে সে দেশের সৌন্দর্য্যের মোহন লীলা; বিদ্যুতের, জ্যোৎস্নার, রমণীয় পুষ্পরাজির ও সংগীতের সমাবেশে যেন গোটা মহাদেশ স্বপ্নময়। বিদ্রুমবেদী ও হর্ম্যস্থলী স্থানে স্থানে যেন উপবন মধ্যে বিরাজমান।

এমন সময়ে চারুহাসিনী লজ্জাবতী ঈষৎহাস্যময়ী বহু দিব্যনারীকে পরস্পর হাত-ধরাধরি ক'রে অদূরে আবির্ভূতা হতে দেখে নন্দ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন। রূপের জ্যোতিতে ভরিয়ে তুলেছে ওরা দশ দিক।

তারপর জ্যেষ্ঠের দিকে চেয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভন্তে, এ কোন্ দেশ? এই দেবীরাই বা কারা?

বুদ্ধদেব বললেন, এ দেশ ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ। এরা এ দেশের অপ্সরী। কামজয়ী পুরুষ ভিন্ন এরা অন্য কারও দৃষ্টিগোচর হয় না। আচ্ছা নন্দ, বল দেখি এরা শাক্যানী জনপদকল্যাণী অপেক্ষা অধিক সুন্দরী, না শাক্যানী জনপদকল্যাণী এদের অপেক্ষা সুন্দরী?

মুগ্ধ নন্দ উত্তর দিলেন, ভন্তে, এদের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্যই নেই, তুলনা করা সম্ভব নয়।

—তবুও?

—ভন্তে, এদের তুলনায় শাক্যানী জনপদকল্যাণী নাসিকাকর্ণহীনা মর্কটীর ন্যায়।

—বেশ, শোন নন্দ, যদি তুমি মনোযোগসহকারে ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, তবে আমি এই সমস্ত অপ্সরী তোমাকে লাভ করিয়ে দেব—প্রতিশ্রুতি দিলাম। এখন চল, জেতবনবিহারে ফিরে নিষ্ঠার সঙ্গে বিনয় ও ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করবে। কেমন তো? রাজী?

নন্দ কেমন যেন হয়ে গিয়েছেন। অদূরে ওই কি কুলাচল পর্ব্বত? এই কি স্বর্গ? আশ্চর্য্য দেশ! ওখানে কি হেমন্ত ও শিশির ঋতুর চার অষ্টকাতে ভগবান শক্র এই অপরূপ রূপসী দেবকন্যাদের সঙ্গে বিহার করেন? মরি, মরি, এই পিঙ্গলবর্ণনীবীশোভিতা, চঞ্চলচরণা, হাস্যময়ী দেবীগণের অপাঙ্গে যেন শাণিত তীর। এদের চরণকমল নূপুরের ঝিনিঝিনিতে

শব্দায়মান, কটিতটস্থ দুকূলরাজি কাঞ্চীকলাপে বিলাসান্বিত, এঁদের ক্ষীণ কটিদেশ কুচযুগের ভারে যেন পরিশ্রান্ত, কমলকোরকের সহিত স্পর্দ্ধাধারী সকটাক্ষ নয়ন যেন সকল পুরুষার্থের সাধক।

বেচারী নন্দ! তাঁর মাথাটি ঘুরে গেল। তিনি সব বিস্মৃত হলেন। ভুললেন কপিলাবাস্তুর রাজপ্রাসাদ, ভুললেন কল্যাণী জনপদলক্ষ্মী ভদ্রার ব্যাকুল নয়ন দুটি। বললেন, ভন্তে, যদি এঁদের লাভ করতে পারি এমন প্রতিশ্রুতি দেন, তবে আমিও কথা দিলাম, আজ থেকে অতি নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে বিনয় প্রতিপালন করব।

ভিক্ষুগণ ক্রমে শুনলেন যে ভগবান তথাগতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দ একপাল দেবকন্যা লাভের আশায় পুনরায় ব্রহ্মচর্য্য পালনে মনোযোগী হয়েছেন।

এবার অধ্যবসায় আগেকার চেয়ে অনেক বেশী।

দু' চারজন সমবয়সী ভিক্ষু ঠাট্টা ক'রে বলতে লাগলেন, বাহবা নন্দ, ভাল মজুরি বটে! একেবারে একটি দল দেবকন্যা লাভ!

কেউ কেউ বললেন, আরে বাবা! নন্দ বোকা নয়। দাদার কাছ থেকে পুরস্কারটি আগে আদায় করবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তবে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করেছে। পাকা ঘুঘু নন্দ।

আয়ুষ্মান নন্দ কারও কোন ঠাট্টা-বিদ্রূপে কর্ণপাত না ক'রে একাগ্র মনে প্রচণ্ড উৎসাহ ও অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনা করতে লাগলেন। তাঁর কঠোর আত্মসংযম ও বিনয় প্রতিপালনের দৃঢ়তা প্রৌঢ় ভিক্ষুগণকে পর্য্যন্ত তাক লাগিয়ে দিল।

পাঁচ বৎসর এইভাবে দিনরাত্রি কোথা দিয়ে কেটে গেল, নন্দ তার কোন খবরই রাখেন না। অদূরবর্ত্তী নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর বারিপতনে যেন সত্যতত্ত্বের আভাস ভেসে আসে। সকল প্রকার গার্হস্থ্য সুখের চিন্তা তিনি ক্রমে পরিত্যাগ করলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যশ, মুক্তি, বিলোপ ও নির্ম্মললোক প্রভৃতির সমুদয় আশা আকাঙ্ক্ষা ও ঋতুসমূহের পুষ্পস্তবক ফল ও নবীন কিশলয়রাজি বারংবার তাঁর উগ্র তপস্যার সম্মুখে নতমস্তকে অভিবাদন জানিয়ে গেল।

একদিন রজনীর শেষযামে ঊষার অরুণচ্ছটা দিগ্বলয়ে উঁকি দেবার উপক্রম করেছে, এমন সময় হঠাৎ জেতবন দিব্য-জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে গেল। এক দীপ্তিমান দেবতা ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ভগবান তথাগতের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে বিনীতভাবে জানালেন, ভগবান, অদ্য ভগবানের মাতৃস্বসাপুত্র আয়ুষ্মান নন্দ ক্ষীণাস্রব হয়ে চেতোবিমুক্তি লাভ করলেন। তাঁর জয় হোক!

ভগবান জিন ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, এ আমি অবগত হয়েছি।

—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

দেবদূতের অন্তর্দ্ধানের অল্প পরেই বনে বনে বিহঙ্গকুল কলরব ক'রে উঠল। ভিক্ষুগণ শয্যাত্যাগ করলেন। সূর্য্যোদয়ের চিহ্ন প্রকাশ পেল পূর্ব্ব আকাশে। ভিক্ষু উপালী প্রতিদিনের

মত নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর শীতল জলে অবগাহন স্নান করতে চললেন। ভিক্ষু তিষ্য ভগবান জিনের জন্য দন্তকাষ্ঠ রেখে গেলেন।

এমন সময় অর্হৎ-জীবনের প্রথম নবীন প্রভাতে আয়ুষ্মান নন্দ ধীরপদবিক্ষেপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমীপে উপস্থিত হলেন। নিম্নস্বরে নতমস্তকে নিবেদন করলেন, ভন্তে, আমাকে যে জন্য উপসম্পদা দান করেছিলেন, তা আজ সফল হয়েছে। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

ভগবান বুদ্ধ বললেন, আমি জানি, নন্দ। তোমার জন্মগ্রহণ অদ্য সার্থক। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

নন্দ বললেন, ভন্তে আর একটি কথা—

—বল।

—পূর্ব্বে আমাকে আপনি একটি প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন।

—করেছিলাম।

—ভন্তে, আমার আর তাতে কোন আবশ্যক নেই।

—অপ্সরাদের তুমি গ্রহণ করতে চাও না ?

—ভন্তে, ক্ষমা করবেন। আপনিই আমায় সাংসারিক আসক্তি থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

—তোমার ভ্রম, নন্দ। মুক্তি কেউ কাউকে দিতে পারে না। তুমি নিজেই নিজেকে মুক্ত করেছ। আমি শুধু উপায় ব'লে দিয়েছি মাত্র। আর একটি কথা—

—ভন্তে, বলুন।

—আমি স্বর্গে তোমাকে নিয়ে যাইনি। এখানে এই বৃক্ষতলে ব'সেই ওই দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি। যখন দেখলাম, তোমার তরুণ চিত্তবৃত্তি নারীতে আসক্ত, তখন সেই পথেই যাতে তুমি প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ কর, তার জন্যে ওই একটি অলীক কল্পনার আশ্রয় আমার নিতে হয়। ওই সব অপ্সরা কোথাও ছিল না, স্বপ্নে দৃষ্ট গন্ধর্ব্বনারীর মতই ওই স্বর্গও অলীক।